সূচীপত্র ।

ওঁ
পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ | বৈশাখ, ১৩১৫ সাল। | ১ম সংখ্যা।

আমাদের দ্বাদশ বৎসর।

আমাদের পন্থার গত বৎসরের কর্ম্মফল যথাপূর্ব্ব ও শাস্ত্রবিহিতমতে শ্রীভগবানের প্রীতি কামনায় মহাপুরুষগণের চরণ কমলে অর্পিত হইল। মহাপুরুষগণ ভগবানের অসিপদ এবং তাঁহাদের সাহায্যেই মর্ত্ত ও মূর্ত্ত লোকের বিশিষ্ট কর্ম্ম শ্রীভগবানে পৌছিতে পারে। ওঁ শান্তি ওঁ।

কর্ম্ম ও ত্যাগের রহস্য বড়ই দুরূহ। বিশিষ্ট ভাবাপন্ন ভেদভাবশীল জীব যে কর্ম্ম করে তাহাতে বিশিষ্টভাবের ফলই উৎপন্ন হয়। পন্থার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রথমে কারকরহস্যের আভাস পাই। তিনি আজ ইহধামে থাকিলে এই বিষয়টী বিশদরূপ বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য ভার অপাত্রে অর্পিত হইল।

যে অহংকর্ত্তারূপ বিশিষ্ট জ্ঞানে কর্ম্ম কৃত হয় তাহাই কর্তৃকারক। সূক্ষ্ম-ভাবে স্থিত বিশিষ্ট অহংজ্ঞানে অনুষ্ঠিত যোগরূপ কর্ম্মের দ্বারা মানব সূক্ষ্মতর "আমিতে" পর্য্যবসিত হয়।

ইন্দ্রিয়াদি করণশক্তিকে বিশিষ্টভাবে দেখিলে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়শক্তি পরিপুষ্ট হয়; ইহাই সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়শক্তি বিকাশের মূলরহস্য। দূরস্থিত বস্তুকে সূক্ষ্মভাবে দেখিতে প্রয়াস করিলে মানব হঠাৎ ঐ শক্তি নির্ভিন্ন করে এবং তাহার ফলে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থূলের দ্বারা অপ্রতিহত দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে, ইহাই করণকারক।

যাহার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম কৃত হয়, কর্ম্মের ফলের কিয়দংশ সেই ভাবকে পুষ্ট করে। বিশিষ্ট ভগবদ্ভাবে কৃত কর্ম্ম দ্বারা তত্তৎ ভাব পরিপুষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয়ান তাহার উপাস্য দেব যীশুকে মূর্ত্তিমান্ পৃথক চৈতন্যরূপে গ্রহণ করে। এইরূপে শৈব শিবরূপকে, শাক্ত শক্তিরূপকে ও বৈষ্ণব বিষ্ণুরূপকে বিশিষ্টভাবাপন্ন ও অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক সত্ত্ব বলিয়া মনে করে। এইরূপে সাধনা দ্বারা আপন আপন মনোমত ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করে। কিন্তু পৃথক্‌-ভাবে দেখে বলিয়াই ইষ্টদেবতা পৃথকরূপে প্রতীত হন। সম্প্রদান কারকই এই রকম রহস্যের মূলে অবস্থিত। গীতা বলেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।'

দেহাদি জ্ঞানকে অধিকরণ কারক বলে। অহংভাব হইতে পৃথক্ দেহ বা উপাধিজ্ঞানে আমরা কর্ম্ম করি ও তাহার ফলে চৈতন্যের কিয়দংশ দেহ-ভাব পরিপুষ্ট করিতে যায়। স্থূল দেহকে অবলম্বন করিয়া ও দেহকে চৈতন্যের বিকাশের জন্য নিতান্ত আবশ্যকীয় মনে করিয়া আমরা কর্ম্ম ও সাধনা করি, তাহার ফলে অহং ভাবাতিরিক্ত দেহ বিশেষের জ্ঞান অল্পে অল্পে পুটিত হইয়া যায়। সেইজন্য সাধনাবলে আমাদের অহং সূক্ষ্মভাবাপন্ন হইলেও সূক্ষ্মতর লোকের প্রকৃত ভাব গ্রহণে অসমর্থ হই এবং সূক্ষ্মতর লোকে উপনীত হইলেও সেই সেই লোককে ক্ষিতি তত্ত্বের বিশিষ্টভাবের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া তত্রস্থ চৈতন্যের বিকাশসমূহকে পৃথিবীর শারীরিক জ্ঞানে আবদ্ধ করিয়া দেখি। তান্ত্রিক অংশে astral plane বা ভুবর্ল্লোক বাসনা-দ্বারা উজ্জীবিত, বাসনাই তত্রস্থ চৈতন্যের রূপ। কিন্তু স্থূল-অধিকরণ শক্তির প্রভাবে আমরা বাসনার রূপ দেখিতে পাই না, এবং তত্রস্থ জীবকে পার্থিব হস্ত পদাদি অবয়ব সংযুক্ত বলিয়া দেখি।

যাহা হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় তাহার নাম অপাদান। বাসনা, কামনা

ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে আমাদের কর্ম্ম কৃত হয়। সেই জন্য কর্ম্মের ফলে অহং জ্ঞান হইতে পৃথক্ সত্ত্ব কামনাদির ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের পরিপুষ্ট হয়।

সম্পর্ক জ্ঞানের (Relational) নাম সম্বন্ধ (ষষ্ঠী)। এই সম্পর্কজ্ঞান হইতেই দ্বন্দ্ব ভাব উৎপন্ন হয়। আপনাকে বিশিষ্ট ও ভেদ-বিবক্ষা দ্বারা বঞ্চিত বলিয়া দেখিলে অন্যান্য কারকগুলিও বিশিষ্টভাবাপন্ন ও আমাদের অহং জ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপে একদিকে বিশিষ্ট অহং, অপরদিকে বিশিষ্ট দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবগুলি প্রকট হইয়া অহংকে বিশিষ্ট ভাবে সম্বদ্ধ করিয়া ফেলে। সম্বন্ধই ভেদভাবশীল কর্ত্তার নিকট কর্ম্মের বন্ধনীশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। এবং বিশিষ্ট কর্ত্তাকে বিশিষ্ট অধিকরণাদি জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়।

এইত গেল কর্ম্মের কথা। এক্ষণে কর্ম্মফলত্যাগ শব্দের অর্থ কি? বিশিষ্ট কর্ত্তা কর্ম্মজ্ঞানে কৃত কর্ম্মশক্তি পুনরায় বিশিষ্ট কর্ত্তা কর্ম্ম করণাদিরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এবং তাহার ফলে জাতি, আয়ুঃ, ইন্দ্রিয়, ভোগ, স্বভাব, রূপ, বিশিষ্ট ও পার্থিব বস্তু এবং শক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া পুনরায় জন্ম ও বন্ধের কারণ হইয়া উঠে। এই কর্ম্মের ফল বিশিষ্ট করণাদি উৎপন্ন করিয়াই নিঃশেষিত হইয়া যায়। উহা ঈশ্বরে পৌঁছিতে পারে না। সূক্ষ্মতর বিশিষ্টভাবে কর্ম্ম করিয়া যোগী পার্থিব সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারেন বটে কিন্তু তত্রাচ তাহার ফল ভগবানে যায় না। উহা সূক্ষ্মতর লোক, দেবতাদি সূক্ষ্মতর সত্ত্বা ও তাহাদের সহিত সূক্ষ্মতর সম্বন্ধ বা ভোগরূপে পরিণত হইয়া যোগীকে তাঁহার অহংজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী ভুবঃ ও স্বঃ প্রভৃতি লোকে লইয়া যায়। ভোগাবসানে ভেদভাবাত্মক অহং জ্ঞানের বলে যোগীকে পুনরায় ভেদ ও বিশিষ্টতার স্থান পৃথিবীতে পুনরায় আনয়ন করে।

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" এবং কর্ম্মোচিত লোকের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে যে উক্তি আছে তাহার মূলে এই মহাসত্য অবস্থিত। সেকালে ঋষিগণ যজ্ঞ করিতে গেলে দানবেরা আসিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া দিত। তদ্রূপ বিশিষ্টভাবে কৃত কর্ম্ম কখনও যজ্ঞরূপে পরিণত হয় না। তাহার ফলে

কেবল বিশিষ্ট ভাবাপন্ন কবণাদিরূপ দৈত্যভাবের পরিপুষ্টি হয়। সেই জন্যই ত্যাগের উপদেশ।

ত্যাগ অর্থে এই বিশিষ্ট ভাব অতিক্রম করিয়া তাহার মূলে অবস্থিত ভগবদ্ভাবকে গ্রহণ। করণগুলিকে যতদিন ভগবদ্ভাবে দেখিতে না পারিব ততদিন ভগবানের উদ্দেশে কর্ম্ম করিলেও তাহার ফলে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়শক্তিই নির্ব্বিঘ্ন হইবে। এইরূপে সকল কারকগুলিতে যে ভগবদ্ভাব অনুষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা দেখিতে না শিখিলে কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করা যায় না। কেবল সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম শরীর ও শক্ত্যাদি প্রকটিত হয়। কর্ম্মের ফল অর্পণ করিতে গেলে ভগবানের একতা অনুভূতি করা আবশ্যক এবং তজ্জন্য ত্যাগ শিক্ষা করা চাই।

ভেদ ভাব ও বিশিষ্টতা ত্যাগই ত্যাগ বা পরম যজ্ঞ। এই ভাব না থাকিলে যজ্ঞ সকল কর্ম্মজ হইয়া যায়। ত্যাগের রহস্য কি? প্রকাশ বা বিশিষ্টভাব এক পর্য্যায়ভুক্ত প্রকাশভাবে চিত্ত সংযম করিলে সূক্ষ্মতর বিভূতি জ্ঞান ও লোক সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা যজ্ঞ নহে, যজ্ঞই বিষ্ণু। উহাতে ভেদশীল বিশিষ্টতার লেশও নাই। বিশিষ্টভাবাপন্ন জীব তবে কি উপায়ে কারকগুলির বন্ধন শক্তি অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানে কর্ম্ম করিতে পারে? গীতা বলেন, "ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরং"। ত্যাগই শান্তি ও একতার কারণ। জ্ঞানভাবে দেখিলে যাহাকে "নেতি নেতি" বলে কর্ম্মভাবে দেখিলে তাহাকেই ত্যাগ বলে। ত্যাগের রহস্য কিঞ্চিৎ উৎঘাটন করিয়া দেখা যাউক। দুরন্ত মাঘ মাসের শীতে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে। হৃদয়স্থ ভগবানের অপরিস্ফুট আকর্ষণে তাহারা এই স্নান কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া দেখে। কি উপায়ে এই স্নান কার্য্য ধর্ম্মে পরিণত হয় তাহা তাহারা জানে না ও জানিতে ইচ্ছাও করে না। কেবল অপরিজ্ঞাত কি এক আকর্ষণী শক্তি-বলে দারুণ শীতে শয্যা সুখ প্রভৃতি স্থূল দেহের বিশিষ্ট সুখ সকল অকাতরে ত্যাগ করিয়া থাকে; এই সামান্য ত্যাগের ফলে তাহারা অল্পে অল্পে স্থূল দেহাত্ম মোহগুলি অতিক্রম করিয়া, অল্পে অল্পে অপরিজ্ঞাতরূপে দেহাতীত সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবসিত হয়, সেই জন্যই ঐ সকল অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ নির্ভীক ভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করিতে পারে। সামান্য বিষয়ে ত্যাগ অভ্যাস

করিয়া তাহার ফলে শরীরত্যাগ বিষয়েও বিচলিত হয় না। বিশিষ্ট জ্ঞান রূপ কর্ম্ম হৃদয়স্থ অপরিজ্ঞাত সুতরাং অবিশেষ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা বলে অনুষ্ঠিত হইয়া ত্যাগশক্তিবশে স্থূল দৈহিক বিশিষ্ট ফল উৎপন্ন না করিয়া সূক্ষ্মতর মত্তের চৈতন্যের অভিব্যক্তি করে। ত্যাগে বিশিষ্ট কর্ম্ম আছে সত্য, ত্যাগে আমাদের চক্ষু একভাবে বিশিষ্টতার দিকে থাকে সত্য কিন্তু অপর চক্ষু সেই অবিশেষ অপ্রকট ভাবের উপর ন্যস্ত হয় বলিয়া কৃত বিশিষ্টতার মধ্যে পরম একতারূপ অবিশেষ ভাবকে অল্পে অল্পে দেখিতে পায়। বিশিষ্টতা আর বন্ধন করিতে পারে না। পরন্তু স্বয়ংই অবিশেষ ভাবের পরিপোষক হয়। সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বকার্য্যে অনুষ্ঠিত ভগবদ্ভাব গ্রহণ করিতে গেলে ব্যক্ত আপাতঃ প্রতীয়মান ভেদ ভাবাত্মক বিশিষ্টভাব সমূহকে অপরিজ্ঞাত আকর্ষণী শক্তির সাহায্যে ত্যাগ করিতে হয়। ত্যাগে এক চক্ষু বিশেষের মধ্যে ভগবদ্ভাব অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়, অপর চক্ষু অবিশেষ সদা অপ্রকাশ একত্বের উপর ন্যস্ত হয়। যে তেরচ নয়নের বঙ্কিম মাধুরীতে গোপীগণ ভগবান্‌কে বশ করিয়াছিলেন সেই আড়নয়নে চাওয়ার নামই ত্যাগ। সুধু বিশিষ্ট কর্ম্ম করিলে ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করা যাইবে না, কেবল ভগবানের দিকে আমাদের ভেদাত্মক চক্ষু ফিরাইলে তাঁহাকে লাভ করা যাইবে না। ভগবদ্‌জ্ঞানকে বেদান্ত "সোহং" বলে, ব্যক্ত জগতে ভগবানের ভাব সংগ্রহ করাকে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলে, এই দুই ভাবের অপূর্ব্ব সম্মিলনের নামই ত্যাগ। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" ইত্যাদি উক্তিতে গীতা এই একই সত্য নির্দ্দেশ করিতেছেন প্রত্যেক হৃদয়ে ভগবান আছেন। তাঁহার ইঙ্গিত বাণী শ্রবণ করিবার শক্তিই ভগবদ্‌জ্ঞান, সবই তাঁহার বাণী। বিশিষ্ট কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও কামনাও তাঁহার বাণী। তবে তাহার মধ্যে ইঙ্গিত আছে, সমস্ত কারকগুলির মধ্যে সেই ইঙ্গিত বর্ত্তমান আছে, বিশিষ্ট ভাব ত্যাগ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় সত্য। কিন্তু ভগবানের ভাষা আমাদের জানা নাই। আমরা জগতের জীব জগতের ভাষাই বুঝি ও তাহাতে কেবল বিশিষ্টতা ও অহংকারই দেখিতে পাই, ভগবদ্ভাষা না বুঝিলে তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিব না। তবে কি প্রকারে ত্যাগ শিখিব? কি প্রকারে "ধীর সমীরে যমুনা তীরে" স্থিত বনমালীর সঙ্কেত বুঝিতে পারিব, সেই জন্য উভয় ভাষাবিৎ

হ্যাতির আবশ্যক। মহাপুরুষগণ উভয় ভাষা জানেন। তাঁহারা নিঃশেষিক্ত রূপে ভেদের সম্পর্কশূন্য ভাবে জগতে ভগবান্ ও ভগবানে জগৎ এতদুভয়েরই ভাষা জানেন। সেই জন্য কর্ম্মত্যাগ করিতে গেলে মহাপুরুষগণের শরণ ও অনুগতি আবশ্যক, তাঁহারা প্রত্যেকের বুদ্ধিরূপে অবস্থিত, তাঁহারা

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমস্তুতে॥

রূপ মহাবিদ্যাঅংশভূত। তাঁহারাই সমষ্টিরূপে দৈবী প্রকৃতিতে অবস্থিত। তাঁহারা বহু বচন ও এক বচন। অহঙ্কার অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা এক। বিভক্ত জীবে সুহৃৎ বলিয়া তাঁহারা বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন। এস আমরা সেই বুদ্ধিসংহিত ভেদভাবশূন্য শুদ্ধ, অপাপ এবং অ... ও জগতের সমন্বয়কারী গুরুশক্তিকে তাঁহার স্বাভাবিক উপাধি বুদ্ধি দ্বারা একতা পরিজ্ঞান ও একতার জন্য ত্যাগের দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্রে ধারণ করি। কায়, বাক্ ও মনের দ্বারা হৃদয়স্থ গুরুদেবের চরণে সর্ব্বতোভাবে উপগত হই। তাহা হইলে হৃদয় নির্ম্মল হইবে। নির্ম্মল হৃদয়ে কাত্যায়নী দেবীর প্রকাশ হইবে। সেই মহাযোগিনী শক্তির আনুকূল্যে ত্যাগ ধর্ম্ম প্রকাশিত হইবে। ত্যাগধর্ম্মে বিভিন্ন কারকগুলি একীকৃত হইয়া যাইবে। যে সকল কর্ম্মের বন্ধের ভয়ে আমরা ভীত তখন সেই সকল কর্ম্ম সেই একতা শক্তির বশে আমাদিগকে ভগবদ্ভাবে স্থাপিত করিয়া অহং ও জগৎ এই দুই জ্ঞানের সমন্বয় করিবে, সেই অদ্ভুত সমন্বয়ে আমরা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বস্ব ও সমস্ত কর্ম্ম অকাতরে সেই মন্মথমোহনের পদে অর্পণ করিতে পারিব। তখনই গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকের সার্থকতা হইবে।

সমংসর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তংপরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ব অবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

ওঁ অধ্যাত্মনে নমঃ ওঁ।

ব্রহ্মসূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরিণাম ও অদ্বৈতবাদ।

The first adhyaya has proved that all the Vedanta-texts unanimously teach that there is only one cause of the world, viz Brahman, whose nature is intelligence, and that there exists no scriptural passage which can be used to establish systems opposed to the Vedanta, more specially the Sankhya system. The task of the two first padas of the second adhyaya is to rebut any objections which may be raised against the Vedanta doctrine on purely speculative grounds apart from scriptural authority, and to show, again on purely speculative grounds, that none of the systems irreconcilable with the Vedanta can be satisfactorily established.

Thibaut.

প্রথম অধিকরণ—১-২ সূত্র

সাংখ্য-স্মৃতি অবলম্বন করিতে হইলে অন্য স্মৃতি ত্যাগ করিতে হয়।

দ্বিতীয় অধিকরণ—৩ সূত্র

সেই রূপ যোগ স্মৃতি অবলম্বন করিলেও অন্য স্মৃতির সহিত বিরোধ হয়। তাৎপর্য্য কেবল প্রধান বলিয়া ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব লইয়া।

তৃতীয় অধিকরণ—৪-১১ সূত্র

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসায় কেবলমাত্র শ্রুতি প্রমাণ সম্ভবপর হইতে পারে। কারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিধি নিষেধ কেবল শাস্ত্র দ্বারাই জানিতে পারা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় কেবল মাত্র শ্রুতির দোহাই মানিব কেন গোটাকতক উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সাংখ্য বাদীকে নিরস্ত করিল। কিন্তু যুক্তি ত হার মানিল না। ব্রহ্মত কেবল শ্রোতব্য নয়, মন্তব্যও বটে। এখন ব্রহ্ম হল চেতন পদার্থ। জগৎ হল জড় পদার্থ। এই বৈলক্ষণ্য থাকিতে ব্রহ্ম কিরূপে

জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে? আর তোমার শ্রুতিতেও জগৎকে জড় বলে।

"ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ"—চতুর্থ সূত্র।

পঞ্চম সূত্রের সূচনায়, শঙ্করাচার্য্য সনাতন ধর্ম্মের এক মহৎ সত্যের উল্লেখ করিতেছেন, যে সত্যের পতাকা আজি তত্ত্বজিজ্ঞাসু সভা (Theosophical Society) সভ্যজগতের মধ্যে অতি উচ্চে উড্ডীয়মান করিয়াছে। ভাষ্যকারের ভাষায় আমি সেই সত্য পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

"শ্রুত্যা জগতশ্চেতন প্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগৎ চেতনং ত্যবগমিষ্যামি প্রকৃতিরূপস্য বিকারেঽন্বয়দর্শনাৎ।

বেদদ্বারায় জানা যায় যে জগৎ চেতন প্রকৃতি বিশিষ্ট। এবং প্রকৃতির রূপ, সেই প্রকৃতির বিকারে দেখা যায়। এই জন্য সমস্ত জগৎ চৈতন্যময়।

অবিভাবনং তু চৈতন্যস্য পরিণাম বিশেষাৎ ভবিষ্যতি।

তবে যে কোন পদার্থে চৈতন্যের বিভাবন অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি হয় না, সে কেবল কোন পরিণাম বিরোধের জন্য। অথাৎ জড় পদার্থের একরূপ প্রাকৃতিক পরিণাম, যে সেই পরিণামের জন্য চেতনতা প্রকট হইতে পারে না।

যথা স্পষ্ট চৈতন্যানাং অপি আত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে, এবং কাষ্ঠলোষ্টাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে।

যাহারা স্পষ্ট চৈতন্য, যেমন মনুষ্যাদি তাহাদেরও চৈতন্য নিদ্রা কিম্বা মূর্চ্ছা আদি অবস্থায় অপ্রকট হয়। সেইরূপ কাষ্ঠ ও লোষ্ট আদি পদার্থেরও চৈতন্য অপ্রকট থাকে।

"অন্তঃকরণান্যপরিণামত্বাৎ সতোঽপি চৈতন্যস্য অনুপলব্ধিঃ"—আনন্দগিরি।

অন্তঃকরণ দ্বারাই চৈতন্যের উপলব্ধি হয়। যেখানে অন্তঃকরণ পরিণাম থাকে না, সেখানে চৈতন্যের উপলব্ধি হইতে পারে না জড় পদার্থে অন্তঃকরণ নাই এইজন্য চৈতন্যের উপলব্ধি হইতে পারে না

একথা সত্য হইলেও ইহা বলা চলে, যে ব্রহ্ম শুদ্ধ, জগৎ অশুদ্ধ। শুদ্ধ পদার্থ হইতে অশুদ্ধ পদার্থের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে? আর যদিও শ্রুতিতে পৃথিবী আদিকে চেতন বলা হইয়াছে, তথাপি "অভিমানী" শব্দের ব্যবহার আছে, যেমন "পৃথিব্যভিমানিনী দেবতা," "আকাশাভিমানিনী দেবতা"।

"অভিমানি ব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্"—পঞ্চম সূত্র।

কিন্তু ব্যাসদেব বলিতেছেন—"দৃশ্যতে তু"

পূর্ব্বপক্ষী যে বলে এক প্রকৃতির কারণ হইতে অন্য প্রকৃতির কারণ উদ্ভূত হইতে পারে না, সে কথা প্রামাণিক নহে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে চেতন মনুষ্যের শরীর হইতে অচেতন কেশ নখাদির উদ্ভব হয়। এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির শরীর নির্ম্মিত হয়। কারণ ও কার্য্য কখনও একরূপ হয় না, তবে কোন না কোন সাম্য থাকে। সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগতে অস্তিত্ব বা সত্ত্বার সমানতা আছে।

আর এক কথা দৃষ্ট পদার্থের উদাহরণ রূপাদি শূন্য ব্রহ্মে কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে?

ব্রহ্ম মন্তব্য বটে। তাই বলিয়া যে কোন তর্ক তোমার বুদ্ধিতে আসে সেই তর্ক অনুসারে ব্রহ্মের মনন অভিপ্রেত নহে। ব্রহ্মের মনন শাস্ত্র অনুসারে মনন।

আর যদি বল, শুদ্ধ ব্রহ্ম অশুদ্ধ জগতের কারণ হন, তাহা হইলে অবশ্য তোমাকে মানিতে হইবে, যে সৃষ্টির পূর্ব্বে অশুদ্ধ জগৎ ছিল না। এবং বেদান্তের মতে কার্য্য সৎ। সৎকার্য্যবাদী বেদান্তী কিরূপে বলিবে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না?

"অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধ মাত্রত্বাৎ"—সপ্তম সূত্র।

কার্য্য সর্ব্বদাই কারণাত্মক। উৎপত্তির পূর্ব্বে যদি কারণ থাকে ত কার্য্য থাকিবে না কেন? পূর্ব্বপক্ষী একথা বলিতে পারেন যে,

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্"—অষ্টম সূত্র।

প্রলয়কালে অশুদ্ধ জগৎ ব্রহ্মে লীন হইলে, জগতের অশুদ্ধি ব্রহ্মে অর্পিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রলয়ে অশুদ্ধির যদি নাশ হয়, তাহা হইলে পুনরায় জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, মুক্ত জীবেরও পুনরুদ্ভব হইতে পারে।

(চতুর্থতঃ) আর যদি বল প্রলয়কালেও জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলে প্রলয় কিরূপে হইল।

"নতুদৃষ্টান্তাভাবাৎ"—নবম সূত্র।

বেদান্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত আছে। পূর্ব্বপক্ষীর দৃষ্টান্ত নাই।

১। ঘটাদি নষ্ট হইলে মৃত্তিকা ঘটাদির সঙ্কীর্ণতা দোষে দূষিত হয় না। সুবর্ণ অলঙ্কার নষ্ট হইলে সুবর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে।

আর কার্য্য দোষে যদি কারণ দূষিত হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তিন অবস্থাতেই কারণ দূষিত হইবে। কেবল প্রলয় অবস্থাতে কেন দূষিত হইবে। কার্য্য কারণের একতা ত সকল অবস্থাতেই আছে।

এই ত গেল ব্যাসদেবের সূত্র অনুযায়ী দৃষ্টান্ত। এই ত গেল সৎকার্য্য বাদের দৃষ্টান্ত। এই ত গেল পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত। এই জন্য যেখানে পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, সেখানে শঙ্করাচার্য্য কিছুই বলেন নাই। তিনি ব্যাসদেবের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ভাষ্যকার ভাল রূপেই জানিতেন, ব্যাসের সিদ্ধান্ত পরিণাম। কিন্তু তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত বিবর্ত্ত। এই জন্য তিনি পরিণামবাদের কথা স্বয়ং অনেক স্থলেই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিবর্ত্তবাদ স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে ব্যাসের সূত্রের পরিণামবাদ ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না, সেখানে তিনি কোনরূপ হঠতা দেখান্ নাই। কিন্তু যেখানে দুই পক্ষেই অর্থ করা যায়, সেখানে তিনি বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়াছেন এবং রামানুজ পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়াছেন।

এই সূত্রের আনুপূর্ব্বিক প্রসঙ্গে, পরিণামবাদ অভিপ্রেত এই জন্য শঙ্করাচার্য্য অতি সাবধানতার সহিত বিবর্ত্তবাদের উল্লেখ করিতেছেন।—

যে মত অনুসারে কি সৃষ্টি কি স্থিতি উভয় কালেই কার্য্য ও কার্য্যের ধর্ম্ম সকল অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত, যে মত অনুসারে কার্য্যের সহিত কারণের সংসর্গ নাই, সে মত অনুসারে প্রলয়কালেও কার্য্যে সংসর্গ নাই সেই মত অনুসারে এই অপর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। স্বয়ং ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল মায়া বিস্তারিত করিয়া তিন কালেও সেই মায়া দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না সেইরূপ পরমাত্মাও সংসার মায়া দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন্ না। কারণ, মায়া অবস্তু স্বপ্নদ্রষ্টা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নদর্শনরূপ মায়া দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না। সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী পরমাত্মা তিন অবস্থায়

ব্যাভিচার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন্ না। পরমাত্মার অবস্থাত্রয়ে আত্মকর্তৃক অবভাসন কেবল মাত্র মায়া। যেমন রজ্জুর সর্পাদিভাবে অবভাস। বেদান্তার্থ সম্প্রদায়-বেত্তা গৌড়পাদ আচার্য্য এ বিষয়ে বলিয়াছেন-

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্ন মদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

ব্যাসের সূত্রে পরিণামবাদ থাকিলেও, পরম্পরাগত দুই সাম্প্রদায়িক বেদান্তার্থ প্রচলিত ছিল। এক বোধায়নাদিক্রমে পরিণামবাদ, এক গৌড়-পাদাদিক্রমে বিবর্ত্তবাদ। গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু। তাঁহার পূর্ব্বে মায়াবাদ প্রচলিত ছিল কি না; জানি না। কিন্তু গৌড়পাদের অদ্বৈত জীবের অনুভবাত্মক অদ্বৈত। কোন জীব সাধনবলে মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া মুক্তির অবস্থায় জাগরিত হইলে, মায়ার দ্বৈত জ্ঞান অনুভব করে না। সে কেবল স্বরূপস্থ হইয়া কেবল মাত্র আত্মাকে অনুভব করে। আত্মাতে অবস্থিত হইয়া অদ্বয়, অখণ্ড আনন্দ অনুভব করে। এই আত্মানুভবাত্মক অদ্বৈতের সঙ্গে জগতের সত্যত্ব কি মিথ্যাত্বের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। শঙ্করাচার্য্য অনেকস্থলে এই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে এই অদ্বৈতবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া জগৎ মিথ্যা, জীব মিথ্যা এই সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব জীবের অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন। ব্রহ্মসাযুজ্য বা নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব তাঁহার মতে অসম্ভব নহে, কিন্তু প্রার্থনীয় নয়। তবে জীবনাশী, জগৎনাশী অদ্বৈতবাদকে তিনি ভ্রান্ত মায়াবাদ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন।

রামানুজের কাছে অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদও ভ্রমমূলক। তাঁহার চিদ্রূপী জীবের সাযুজ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। শরীর অনন্তকালের তরে শরীর থাকিবে। এবং শরীরী শরীরী থাকিবেন।

২। প্রলয়কালের একতা হইতে নানাত্বময় জগৎ কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে? দৃষ্টান্ত, সুষুপ্তি কাল হইতে জাগ্রৎ অবস্থার উদ্ভব।

শঙ্করাচার্য্য মতে মিথ্যা জ্ঞান ইহার কারণ।

৩। মুক্তের মিথ্যা জ্ঞান থাকে না। এই জন্য তাঁহার পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না।

৪। প্রলয়কালে জগৎ নষ্ট হয় না একথা বেদান্তীরা স্বীকার করেন না। এ জন্য সে কথার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।

"স্বপক্ষদোষাচ্চ"—১০

সাংখ্যমত সম্বন্ধেও এই সকল তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। সাংখ্য ও বেদান্ত—এই দুই মতের মধ্যে এক মত ত অভ্রান্ত হইবে। সাংখ্যমত ভ্রান্ত পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, অতএব বেদান্তমত অভ্রান্ত।

রামানুজ এই অধিকরণের ভাষ্য করিতে গিয়া নিজের শরীরবাদ প্রতিপন্ন করিতে অতিরিক্ত চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বনাশী বিবর্ত্ত ছাড়িয়া অন্য অংশে শাঙ্কর ভাষ্যই অবলম্বন কবিব।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৪। দ্বিতীয় মহাদেশ (প্লক্ষ দ্বীপ—Hyperborean.)

দ্বিতীয় মৌলিকজাতি (কিম্পুরুষ জাতি)

যখন দ্বিতীয় মৌলিকজাতির আবির্ভাবের সময় আসিল, তখন পিতৃদেবগণ প্রথম জাতির ছায়াদেহের বহির্ভাগে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর পদার্থের আবরণ তৈয়ার করিলেন। কাজেই প্রথম জাতির দেহের বহির্ভাগে দ্বিতীয় জাতির দেহের অভ্যন্তর ভাগ হইল।

এইরূপে আস্তে আস্তে, অলক্ষিতে এবং অজ্ঞাতসারে প্রথম মৌলিকজাতি অদৃশ্য হইয়া পরবর্ত্তী দ্বিতীয় মৌলিক জাতিরূপে পরিণত হইল। এবং প্রথম জাতির ভাওদেহ (স্থূলদেহ, Gross physical body), যাহা

ছায়া ব্যতিরেকে আর কিছুই ছিলনা, তাহা দ্বিতীয় মৌলিকজাতির পিণ্ডদেহ (Etheric Double) হইল। তাহার বাহিরে স্থূলদেহ গঠিত হইল।

(ক) দ্বিতীয় মহাদেশ (প্লক্ষ দ্বীপ)।

গণনাতীতকাল ব্যাপিয়া প্রথমজাতি পৃথিবীতে বাস করিল। নৈসর্গিক দুর্ঘটনা সমূহের উপশম হওয়াতে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করিল। কথিত উৎপাত ও দুর্ঘটনাগুলি সর্ব্বব্যাপী না হইয়া স্থান বিশেষে ঘটিতে লাগিল। অগাধ ও বিশাল জল রাশির মধ্যহইতে আস্তে আস্তে অধিকতর স্থলভাগ মস্তকোত্তলন করিল। এই নূতন স্থলভাগ বর্ণিত প্রথম মহাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বক্ষুরে লৌহ বিনামার আকার ধারণ করিয়া তাহার দক্ষিণভাগে অবস্থিত রহিল। প্রথম মহাদেশকে অপার জলধি গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই দ্বিতীয় দ্বীপের বা মহাদেশের নাম প্লক্ষ। বিদেশীয় ভাষায় ইহাকে হাইপারবোরিয়ান্ (Hyperborean কহে।

(খ) দ্বিতীয় মহাদেশের বিস্তার ও সীমা।

উত্তর-পশ্চিমে গ্রীণলণ্ড ও উত্তর-পূর্ব্বে কামশ্‌কাট্‌কাকে সংযুক্ত করিয়া বর্ত্তমান উত্তর-এসিয়ার সমগ্র ভূভাগটী ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে গবি মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশি যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা তখন জলরাশিপূর্ণ সমুদ্ররূপে এই মহাদেশের দক্ষিণসীমায় ছিল। সর্ব্বোত্তরে স্পিটেজবার্জ্জেন, সুইডেন ও নরওয়ে দেশ তাহার অন্তর্ভূত ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমদিগে ইহা ব্রিটিস দ্বীপসমূহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বেফিন্ উপসাগর তখন স্থলভাগ ছিল ; এই উপসাগরে যে সকল দ্বীপ আছে তাহা সেই স্থল ভাগের অন্তর্গত ছিল।

আর বাতাস নাতিশীতোষ্ণ ছিল। রবিকিরণদীপ্ত সমতল ভূমি প্রচুর শ্যামল শস্যরাজিতে সুশোভিত ছিল। এই মহাদেশ পরিশেষে নানারূপ প্রলয়কাণ্ডে ধ্বংশ হওয়ায় এই হাইপার্‌বোরিয়ান্ নামে পরবর্ত্তী সময়ে একটা গভীর বিষাদের ভাব মনে উদয় হয়, কিন্তু পুরাকালে সেই মহাদেশের উর্ব্বরা ভূমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইত, কাজেই এই নামে শস্যশ্যামল, অত্যুর্ব্বর এবং ফলফুল সুশোভিত দেশকেই বুঝাইত।

(গ) দ্বিতীয় মৌলিকজাতি (কিমপুরুষ জাতি)।

দ্বিতীয় মৌলিকজাতিকে কিমপুরুষ কহে। তাহারা রবি ও সোমের সন্তান। তাহারা পীতবর্ণ পিতার ঔরসে এবং শ্বেতবর্ণ মাতার গর্ভে জাত, অর্থাৎ তাহারা অগ্নি এবং জলের সংযোগে উৎপন্ন। বৃহস্পতির অধীনে ও অভ্যুদয়কালে এই জাতি জন্মলাভ করিয়াছে। শ্রবণও স্পর্শশক্তি ভিন্ন তাহাদের অপর ইন্দ্রিয়শক্তি কিছুমাত্র প্রবল অথবা ক্রিয়াশীল ছিলনা, কাজেই অগ্নি এবং জল ব্যতীত তাহাদের অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব বোধ ছিলনা। কাঁচা সোণার ন্যায় তাহাদের পীতবর্ণ দেহ ছিল। তাহা সময় সময় কমলা রঙের ন্যায় দেখাইত। বিচিত্র ও চাকচিক্যময় নানা রঙের, সূক্ষ্মসূত্রবৎ এই জীবসকল মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষের আকার, কতকগুলি প্রাণীর আকার, আবার কতকগুলি অর্দ্ধেক মনুষ্যাকার বিশিষ্ট ছিল। এই নানাকৃতির অদ্ভুত জীবসমূহ আকাশে জলে, স্থলে, বন উপবনে বাস করিত। কোন কোনটী আকাশ বায়ুতে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইত। কোন কোনটী জলস্রোতে ভাসমান হইয়া চলিত আবার কোনটী বা বৃক্ষারোহণ করিত। কেহ কেহ বাঁশির স্বরে চীৎকার করিয়া অপরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিত। তাহারা যে বনে বাস করিত, তাহা নানাবিধ সুগন্ধি ও সুন্দর পুষ্পসমন্বিত বহুবিধ বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ ছিল। তাহা একাধারে বিস্ময়কর এবং সৌন্দর্য্যে মনমুগ্ধকর ছিল। তাহাদের দেহ-পরিমাণ সাধারণতঃ ৮০ আশি হাত ছিল।

এই জাতির একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রথমাবস্থায় তাহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষচিহ্ন বিদ্যমান ছিল না। প্রথম জাতির ন্যায় তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইত। প্রথমতঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং প্রস্ফুটিত হইয়া পরে দ্বিধা, ত্রিধা বিভক্ত হইত। আবার এই বিভক্ত খণ্ডগুলি প্রত্যেকে বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য মানবের সৃষ্টি করিত। এখনকার ন্যায় স্ত্রী পুরুষ সংযোগে সন্তানোৎপত্তি হইত না। তাহার পর যখন তাহাদের দেহ কালক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল, তখন এই নিয়মে বংশ বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব হইল। তখন তাহাদের দেহ হইতে ছোট ছোট জীব সকল বাহির হইতে লাগিল। রূপকের ভাষায় বলে "তাহাদের কলেবর হইতে ঘর্ম্ম বিন্দু সব নিঃসৃত হইতে লাগিল।" যেহেতু

মানবদেহের লোমকূপ হইতে যেরূপ ঘর্ম্মবিন্দুসকল বহির্গত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহধারী জীবসমূহ নির্গত হইয়া কালসহকারে দৃঢ়কায় হইয়া নানা রূপ ধারণ করিতে লাগিল। পুরাণাদি পাঠে জানা যায়, মানবজাতি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মহাদেব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করার জন্য বীরভদ্রকে পাঠাইলেন, সেই বীরভদ্র তাহার লোমকূপ হইতে ভীষণ ও বিকটাকার অসংখ্য জীবকে বাহির করিয়াছিল।

আমাদের পুরাণাদিতে এইরূপ আরও অনেক অদ্ভুত গল্পাদি পাওয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় মৌলিক জাতির বর্ণিত বংশবৃদ্ধির নিয়ম জানা থাকিলে, এই সকল গল্পের মর্ম্ম সহজেই বোধগম্য হয়। দ্বিতীয় জাতির শেষ সময়ে যাহারা লোমকূপ হইতে ঘর্ম্মের ন্যায় জাত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কাল সহকারে যৎসামান্যরূপে স্ত্রীপুরুষ চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। একই দেহে এই উভয় জাতীয় চিহ্ন দেখা দিল। ইহা এখন ভাবনারও অতীত। তবে এখনও উদ্ভিদের মধ্যে এক দেহে এই উভয় চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় জাতিতে যে বীজ রোপিত হইল, সময়ে তাহা হইতে নানাজাতীয় স্তন্যপায়ী জীবের সৃষ্টি হইল।

তন্দ্রারোপ (Hypnotism)।*

পণ্ডিতবর মায়ার্স Human Personality নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে

---

* Hypnotism বা Mesmerism শব্দের বঙ্গানুবাদ অনেকে অনেক প্রকারে করিয়াছেন—যথা নিদ্রাতত্ত্ব, তন্দ্রাতত্ত্ব, মেস্মেরতত্ত্ব, মোহাবেশ, মোহনবিদ্যা ইত্যাদি। আমি তন্দ্রারোপ ও তন্দ্রাবেশ—এই দুইটী গ্রহণ করিয়াছি। সে যাহা হউক, Hypnotism ব্যাপারটা কি যাঁহারা আদৌ জানেন না তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে কোন কোন ব্যক্তি দৃঢ় ইচ্ছার সহিত ও একাগ্রচিত্তে অপর কোন ব্যক্তির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বা তাঁহার অঙ্গের উপর স্বীয় হস্ত সঞ্চালন করিয়া, শেষোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিনিচয়কে কিয়ৎকালের জন্য বাহ্যচৈতন্যশূন্য করিয়া ফেলিতে পারেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণকে Hypnotisers বা তন্দ্রাকারী এবং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকে Hypnotees বা তন্দ্রাবিষ্ট বলা হয়। এই অচেতন অবস্থার তন্দ্রাবিষ্টের প্রতি যে সকল আদেশ করা হয় তাহাদিগকে Suggestions বা সঙ্কেত বলে। তন্দ্রাবিষ্ট অধিকাংশ স্থলে এই সঙ্কেতানুসারে চলিতে বাধ্য হন অর্থাৎ ইহার অন্যথা করিতে পারেন না।

তন্দ্রাবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ের যে সকল বহুতর facts বা ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদেরই কতকগুলি কৌতুকজনক ও শিক্ষাপ্রদ বোধে এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল। তিনি বলেন তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তি (Hypnotee) যে সকল অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন, তাহা তাঁহার নিজেরই শক্তি। এই শক্তিগুলি জাগ্রৎ চৈতন্যে (Supraliminal consciousnessএ) প্রতিভাত না হইলেও, প্রচ্ছন্ন চৈতন্যে (Subliminal consciousnessএ) সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিয়া যখন তখন এই গুলিকে জাগ্রৎ চৈতন্যে আনয়ন করিতে পারিনা। কেন পারিনা তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তন্দ্রাকারী ব্যক্তি (Hypnotiser) তান্দ্রাবিষ্টে যে কোন নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার Suggestion বা সঙ্কেত দ্বারা তন্দ্রাবিষ্টের এই প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলিকেই জাগরিত বা প্রবুদ্ধ করিয়া দেন মাত্র। †

এই Suggestion বা সঙ্কেত গর্ভস্থ শিশুর উপরেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। (১) ডাক্তার লাইবোণ্ট (Dr. Liebeault) একটি সসত্ত্বা রমণীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে যখন তাঁহার একমাস গর্ভ তিনি একদা রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ একটি অস্বাভাবিক স্ত্রীলোক তাঁহার নয়ন-গোচর হয়। এই স্ত্রীলোকটির এক দিকের গণ্ডদেশ ঠিক সুরার ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল। এই দৃশ্যে উক্ত রমণী ভীত ও চমকিত হন এবং তদবধি সকল ব্যক্তিরই গাল ঐরূপ লালবর্ণ দেখিতে থাকেন। কিছুতেই এই ধারণাকে মন হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। অবশেষে দশমমাসে তাঁহার একটি কন্যা জন্মিলে দেখা গেল তাহার ঠিক সেই গালটি ঐরূপ লালবর্ণ

---

† "I define suggestion as successful appeal to the Subliminal Self." "... the hypnotiser can plainly do nothing by his word of command beyond starting a train of thought which the patient has in most cases started many times for himself with no result, the difference being that now at last the patient starts it again and it has a result. But why it thus succeeds on this particular occasion, we simply do not know. We cannot predict when the result will occur; still less can we bring it about at pleasure." Myers's Human Personality vol I

হইয়াছে। (২) কর্ণেল এম্ (Colonel M.) একজন সৈনিক ; সুতরাং কঠিন হৃদয় বীরপুরুষ ছিলেন। মনুষ্যের মস্তক চূর্ণ করিতেও তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইত না, কিন্তু কাহারও যদি নখ কাটিতে বাধিয়া যাইত, কিম্বা কোন আঘাতে নখ পেষিত হইত— এ দৃশ্য কর্ণেল সাহেবের অসহ্য হইত। তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইত, তিনি অন্ধকার দেখিতেন, এমন কি কখনও কখনও মূর্চ্ছিতও হইতেন শুনা গেল কর্ণেল ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার মাতার একটি নখ ভয়ানকরূপে আহত হইয়াছিল। ইহাই কি কর্ণেলের উক্ত বিশেষত্বের কারণ? (৩) ডাক্তার মাষ্টন্ (Dr. Maston M. D.) বলেন "বাইশ বৎসরের এক যুবক গুলি দ্বারা সাংঘাতিক আঘাত পায় গুলি পৃষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বক্ষ দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাঁহার স্ত্রী তখন প্রায় দুইমাস গর্ভিণী ছিলেন এবং রক্তস্রাব দেখিয়া বড়ই কাতরা হন। সৌভাগ্য ক্রমে যুবক আরোগ্যলাভ করিল। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে উক্ত স্বামী ও স্ত্রী একটি শিশুকে আনিয়া আমাকে বলিল 'মহাশয়, দেখুন এই শিশুর গাত্রেও সেই গুলির ছিদ্র হইয়াছে।' পরীক্ষা দ্বারা দেখিলাম তাহার পিতার যে যে স্থানে গুলির ছিদ্র ছিল শিশুটির ঠিক সেই সেই স্থানে দুইটি লালবর্ণ মাংসপিণ্ড জন্মিয়াছে। স্বামীর আঘাত দর্শনে স্ত্রীর মানসিক উত্তেজনাই কি গর্ভস্থ শিশুর দেহে এইরূপ বিকার উৎপাদন করিল?

মায়ার্স সঙ্কেতকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—যথা নিরোধক (Inhibitory) এবং শক্ত্যুৎপাদক (Dynamo genic)। যে সকল সঙ্কেত আমাদের বহু সঞ্চিত অভ্যাস ও প্রবৃত্তিনিচয়কে নিরোধ বা দমন করিতে পারে তাহারা নিরোধক এবং যদ্দারা নূতন বা অননুভূতপূর্ব্ব শক্তির উদয় বা আবির্ভাব হয়, তাহারাই শক্ত্যুৎপাদক সঙ্কেত।

নিরোধক সঙ্কেত (Inhibitory suggestions)।

বালকদিগের নানারূপ কু-অভ্যাস ও কু-প্রবৃত্তি দমন করিয়া ইহা তাহাদের শিক্ষার অনেক সহায়তা করিয়াছে। ইহা দ্বারা অনিদ্রা, চঞ্চলতা, শয্যামূত্র, মৃগী, লাজুকতা, ভয়, ক্রোধ, মিথ্যাকথন প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উল্লিখিত হইল।

(১) দৈহিক অভ্যাস (Bodily habits

একাদশ বর্ষীয় এক বালকের অঙ্গুলি চোষা অভ্যাস ছিল। এক বৎসর বয়স হইতে ইহার সূত্রপাত হয়। দশ বৎসর নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই ইহা ত্যাগ করাইতে পারা যায় নাই। বালককে তিনবার তন্দ্রাবিষ্ট করা হয়। ইহাতে সে উক্ত অভ্যাস হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে। প্রথম তন্দ্রাবেশের তিন দিন পরে সে বলে "চুষিতে আমার খুব ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু চুষিতে পারি না।" তৃতীয় তন্দ্রাবেশের পর তাহার ইচ্ছাও তিরোহিত হয়। পঁচিশ বর্ষ বয়স্কা এক স্ত্রীলোকের নিয়ত মস্তক সঞ্চালন (মাথানাড়া) রোগ ছিল। কোনও উপায়ে ইহা বন্ধ করা যায় নাই। অবশেষে তিনবার তন্দ্রা-রোগের পর সে রোগমুক্ত হয়।

(২) চৌর্য্যপ্রবৃত্তি (Kleptomania)

চুরি করিবার ইচ্ছা একটা রোগের মধ্যে পরিগণিত। একটি পরিণত বয়স্কা এবং সম্পন্না রমণীর এরূপ দুর্দ্দমনীয় চৌর্য্যাভ্যাস ছিল যে অর্থ সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই কোন না কোন দোকানে গিয়া বস্তু ক্রয়স্থলে এক আধটি জিনিষ অলক্ষ্যে স্বীয় গাউনের মধ্যে পূরিতেন। এরূপ না করিলে তাঁহার মনে শান্তি থাকিত না। কোন প্রকারে অভ্যাস দমন করিতে না পারিয়া পরিশেষে তিনি তন্দ্রাবেশের সাহায্যে প্রকৃতিস্থ হন।

(৩) মদ্যপানেচ্ছা (Dipsomania)

ডাক্তার ব্রামওয়েল (Dr. Bramwell) বলেন "মিসিস্ সি (Mrs. C.) একটি শিক্ষিতা রমণী, বয়ঃক্রম চুয়াল্লিশ বৎসর। বিংশতি বৎসর বয়সে মূর্চ্ছা-রোগ হওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁহাকে উত্তেজক মদ্যপানের ব্যবস্থা করেন। ক্রমশঃ এই অভ্যাস এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে কোন ক্রমেই মদ্য ব্যতীত তিনি থাকিতে পারিতেন না। অনেক চেষ্টা করিয়া ২।১ সপ্তাহ পানবন্ধ রাখিতেন বটে, কিন্তু তৎপরেই প্রবৃত্তি চতুর্গুণ প্রবল হইয়া তাঁহাকে সুরাস্রোতে নিমজ্জিত করিত। আমি চারি মাসের মধ্যে তাঁহাকে তিনবার তন্দ্রাবিষ্ট করিয়াছিলাম। এখন তাঁহার পানেচ্ছা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে

(৪) তামাকু সেবন।

পঁয়তাল্লিশ বর্ষ বয়স্ক এক ব্যক্তি (Mr X.) গত পনর বৎসর ধরিয়া চল্লিশ হইতে ষাটটি পর্য্যন্ত সিগারেট প্রত্যহ সেবন করিতেন। নানারূপ রোগে আক্রান্ত হইলেও এই কু-অভ্যাস কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় তামাকের প্রতি প্রবল ঘৃণা উৎপাদন করা হইল। তামাক একেবারে ছাড়িয়াছেন।

(৫) অহিফেন সেবনেচ্ছা।

একটি স্ত্রীলোক মরফিয়া-পিপাসা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বলিতেছেন "কি আশ্চর্য্য। মরফিয়া খাইতে আমার আর আদৌ ইচ্ছা হয় না কেন? কে বলিয়া দিতে পারে? আমার মনে হয় যদি কেহ খাওয়াইতে চেষ্টা করে আমি তাহাকে প্রাণপণে বাধা দিব। বলপূর্ব্বক কেহ আমাকে মরফিয়া খাওয়াইয়া দিবে ভাবিলেও আমার সর্ব্বশরীর সিহরিয়া উঠে।" অহিফেন সেবনের দোষ বিচার করিয়া তিনি যে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তন্দ্রাবেশের সঙ্কেতই এই অসাধ্য সাধন করিয়াছিল।

(৬) শারীরিক যন্ত্রণা।

তন্দ্রাবেশের দ্বারা মনুষ্য অনেক অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছে। বাতের বেদনা, মস্তকের যন্ত্রণা, পেটব্যথা, ফোড়ার কট্‌কটানি, অসহ্য স্নায়ুশূল প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া তন্দ্রাকারীর ইঙ্গিত মাত্রেই মুহূর্ত্তমধ্যে উপশমিত ও তিরোহিত হইয়াছে ইহার প্রচুর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্দ্রাকারী ইচ্ছামাত্রে রোগীর যে কোন অঙ্গ অসাড় করিয়া দেন এবং তৎপরে অস্ত্রচিকিৎসক সেই অঙ্গ ছেদন করেন ইহারও অনেক নিদর্শন আছে।

পণ্ডিতবর দেল্‌বিয়ফ্ (Delbauf) যন্ত্রণা নিরোধ বিষয়ক দু একটা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একটী স্ত্রীলোকের সম্মতিক্রমে তাহাকে তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া অগ্নিতে লালবর্ণ হইয়াছে এরূপ একটা লৌহশলাকাদ্বারা তাহার দুই হস্ত দগ্ধ করিলেন এবং বলিলেন "তোমার দক্ষিণ হস্তে আদৌ যন্ত্রণা হইবে না।" অবশ্য দুই হস্তেই শলাকাটী সমান উত্তপ্তাবস্থায় (at the same temperature এবং সমকাল রাখা হইয়াছিল। তন্দ্রাবিষ্ট সংজ্ঞাপ্রাপ্ত

হইয়া বামহস্তের যাতনায় কাতর হইল, কিন্তু দক্ষিণ হস্তের কিছুই যন্ত্রণা ছিলনা, এমন কি সামান্ত একটু দাগ ব্যতীত ইহাতে কোলা ফোস্কা কিংবা রক্তাভা পর্য্যন্ত হয় নাই। পরদিন পুনরায় তাহাকে তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া বলা হইল "যন্ত্রণা নাই। আহত স্থান শুকাইতেছে" কি আশ্চর্য্য! পরক্ষণ হইতেই যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইল এবং ক্ষতও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া গেল। আর একবার দেল্‌বিয়ফ অশীতি বর্ষ বয়স্ক একবৃদ্ধকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভয়ানক স্নায়ু শূল হইতে রক্ষা করেন। তিনি একটি ডাক্তারের সমভিব্যাহারে বৃদ্ধভবনে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ তখন যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছিলেন—যন্ত্রণা এরূপ বিষম যে তাঁহার কেশ কিম্বা দাড়ী পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার যো নাই, স্পর্শ করিলেই যন্ত্রণা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইত। সমস্ত শুনিয়া দেলবিয়ফ ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এই ব্যক্তির কিরূপ ভীষণ যন্ত্রণা দেখিতেছেন তো? কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার এ কষ্ট দূর হইবে। এই বলিয়া তিনি বৃদ্ধের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "নিশ্চই আপনার কোন যন্ত্রণা নাই এবং ঐ যাতনা আর কখনও হইবে না।" এই বলিতে বলিতে তিনি সবেগে বৃদ্ধের নিকটস্থ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহার দাড়ী ও কেশ টানিতে লাগিলেন। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার!! বৃদ্ধের কিছু মাত্র যন্ত্রণা নাই! ডাক্তার ও নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া জানিলেন বৃদ্ধ এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে যে যাতনায় মৃতপ্রায় ছিলেন এখন সম্পূর্ণরূপে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

যন্ত্রণা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে যে মুক্ত হওয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষিত ঘটনা, সুতরাং সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যন্ত্রণা কিরূপে দূরীভূত হয়? শারীরিক পেশী বা স্নায়ুর কি কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয়? অথবা যন্ত্রণা জাগ্রৎ চৈতন্যে অনুভূত না হইলেও, প্রচ্ছন্ন চৈতন্য সব অনুভব করে ও স্মরণ করিয়া রাখে? দেখা গিয়াছে কোন রোগীকে ক্লোরোফর্ম্ম (Chloroform) দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া সাঁড়াশি দিয়া দাঁত তুলিয়া ফেলা হইল। রোগী কিছুই অনুভব করিলনা। কিন্তু কয়েকদিন বা কয়েক মাস পরে স্বপ্নাবস্থায় সে পূর্ব্বের সমস্তই দেখিতে ও অনুভব করিতে পারিয়াছে, ডাক্তার আসা ও ক্লোরোফর্ম্ম বাহির করা হইতে অজ্ঞান অবস্থায় যাহা যাহা

ঘটিয়াছে যথা তিনি ছুরী ও সাঁড়াশি কিরূপে খুলিলেন, কিরূপে দাঁতে লাগাইলেন ও টানিলেন, কিরূপ যন্ত্রণা হইল ইত্যাদি যথাযথ বর্ণনা করিয়াছে। বলা বাহুল্য সে ইহার বিন্দুবিসর্গও কাহারো নিকট শুনে নাই। এই সকল ঘটনা হইতে মায়ার্স বলেন যে প্রচ্ছন্ন চৈতন্য সমস্তই অনুভব করে এবং কখন কখন এই অনুভূতি জাগ্রৎ চৈতন্যে ভাসিয়া উঠে। তিনি বলেন আমাদের প্রচ্ছন্ন চৈতন্যের কত বিভিন্ন স্তর আছে কে বলিতে পারে? এবং কোন্ স্তরে কিরূপ স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা রক্ষিত হইয়াছে তাহাই বা কে জানে? এই রক্ষিত শক্তি গুলির মধ্যে যখন যেটির প্রয়োজন, তখন (অপর শক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া কেবল সেইটিকেই জাগ্রৎ চৈতন্যে আনয়ন করা—ইহাই নিরোধক সঙ্কেতের কার্য্য।

শক্ত্যুৎপাদক সঙ্কেত (Dynamogenic Suggestions)।

নিরোধক সঙ্কেতকেও এক অর্থে শক্ত্যুৎপাদক বলা যায়, কারণ একটি ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিতে যে শক্তির প্রয়োজন তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তিতে সেই শক্তি নিশ্চয় আসিয়াছে এবং সঙ্কেতই সেই শক্তি আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু ইহা নিবারক বা নিবর্ত্তক শক্তি। সঙ্কেত দ্বারা আর এক প্রকার শক্তি উৎপাদিত হইতে পারে,—ইহা ক্রিয়া প্রবর্ত্তক। এই শেষোক্ত সঙ্কেতগুলিকেই প্রকৃত পক্ষে শক্ত্যুৎপাদক সঙ্কেত বলা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা (১) ইন্দ্রিয়ের শক্তি—(২) মস্তিষ্ক, রক্ত সঞ্চালক স্নায়ু ইত্যাদির শক্তি এবং (৩) চরিত্র ও ইচ্ছার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের শক্তি।

সঙ্কেত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শক্তি যথেষ্ট বাড়াইতে পারে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সি. লো (C. Low) শৈশব হইতে মূক ও বধির ছিলেন। দক্ষিণ কর্ণে অতি অল্পই শুনিতে পাইতেন। তন্দ্রাবিষ্ট হইবার পর বেশ শুনিতে লাগিলেন এমন কি কথা কহিতেও শিখিলেন। বিশেষত্ব এই যে তাঁহাকে যখন কিছু শুনিতে হইত তিনি আপনা আপনি তন্দ্রাবিষ্ট Self hypnotised) হইয়া পড়িতেন।

ডাক্তার ব্রাম্‌ওয়েল (Dr. Bramwell) একটি স্ত্রীলোককে তন্দ্রাবিষ্ট

করিয়া দেখিলেন যে সঙ্কেতানুসারে তাহার নাড়ী দ্রুত বা মন্দগতি করিতে পারা যায় এবং রোগীর স্পর্শশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অনেকাংশে বর্দ্ধিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে তন্দ্রারোপ দ্বারা যে কেবল বিলুপ্ত ইন্দ্রিয়ের পুনরুদ্ধার (Restitution of functions) হয় তাহা নহে, স্বাভাবিক শক্তির ও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি (Hyperaesthesia) সাধিত হয়।

এতদ্ব্যতীত তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তির (স্বেচ্ছাক্রমে তন্দ্রাবিষ্ট হউন্ বা অপরের দ্বারা তন্দ্রাবিষ্ট হউন) কখনো কখনো অভিনব ইন্দ্রিয় শক্তি ও (Heteraesthesia) জন্মিয়া থাকে যথা মৃত্তিকা গর্ভে কোন্ স্থানে জল পাওয়া যাইবে বা স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু পদার্থ আছে ইত্যাদি তাঁহারা জানিতে পারেন। অধ্যাপক ব্যারেট (Prof Barrett) এ সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে উক্ত ব্যক্তিগণের যখন এই ক্ষমতা দেখা যায় তখন তাঁহারা কতকটা বাহ্যচৈতন্যশূন্য অবস্থায় (Self-hypnotised) থাকেন এবং তাঁহাদের অঙ্গাদি কম্পন বা অপর কোন অস্বাভাবিক অনুভূতি নির্ণেয় পদার্থের অবস্থান জ্ঞাপন করিয়া দেয়।

অনুভব শক্তি, রক্ত সঞ্চালক স্নায়ুর শক্তি ইত্যাদি।

তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তির নাসিকার নিকট এমোনিয়া ধরিয়া বলা হইল "ইহা গোলাপ জল।" তিনি গোলাপের গন্ধ পাইতে লাগিলেন। এমোনিয়ার তীব্র তেজে তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইলনা, চক্ষে জল আসিল না। পুনরায় গোলাপ জল ধরিয়া বলা হইল "ইহা এমোনিয়া"। কি আশ্চর্য্য। তিনি হাঁচিতে লাগিলেন এবং নাক, মুখ, চোক হইতে জলধারা নির্গত হইতে লাগিল। প্রবল শীতের দিনে বলা হইল "উঃ বড় গরম! তৎক্ষণাৎ তাঁহার এরূপ গ্রীষ্ম বোধ হইল যে, তিনি সমুদায় গাত্রবস্ত্র উন্মুক্ত করিলেন, কিন্তু তথাপি গরম যায় না, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে ভাসিয়া গেল! মিস্ বি (Miss B.) পঞ্চদশবর্ষীয়া এক বালিকা। বাল্যকাল হইতে তাহার বাম কনুইয়ের নিম্নস্থ এক স্থান হইতে ক্রমাগত ঘর্ম্ম বাহির হইত। কিছুতেই ইহা বন্ধ করা গেল না। তাহাকে দুইবার তন্দ্রাবিষ্ট করাইয়া "ঘর্ম্ম হইবে না" এইরূপ সঙ্কেত করাতে ঘর্ম্ম একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে সঙ্কেত

রক্ত সঞ্চালক স্নায়ুর (Vasomotor nervesএর) ক্রিয়া বাড়াইতেও পারে, কমাইতেও পারে।

ডাক্তার বিগ্‌স (Dr. Biggs M. D) বলেন "অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক বালিকাকে তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া বলিলাম 'তোমার বক্ষঃস্থলের এই স্থানে প্রতি শুক্রবার একটি লালবর্ণের ক্রস (Cross) দেখা দিবে। কিছুদিনের মধ্যে উহার উপরে Sancta এবং নীচে crux-এই দুইটি বাক্য দৃষ্ট হইবে এবং সেই সময়ে উক্ত Cross হইতে একটু রক্ত পড়িবে।' মঙ্গলবার ইহা বলিয়াছিলাম শুক্রবার দেখিলাম নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রকৃতই একটি Cross দেখা দিয়াছে। প্রতি শুক্রবার ইহা দেখা দিতে লাগিল, কিন্তু অন্য দিনে থাকিত না। দুই মাস পরে Crossএর উপরে "S" অক্ষরটি স্পষ্ট দেখা গেল" এবং একটু রক্তও নির্গত হইয়াছিল, ইত্যাদি।"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল অধ্যাপক চারকট (Prof. Charcot) একটি স্ত্রীলোককে তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া বলিলেন 'তোমার দক্ষিণ হস্ত ও কবজি ফুলিয়া উঠিবে এবং নীলবর্ণ ও অসাড় হইবে।'' চারিদিনের মধ্যেই ঠিক তাহাই হইল। চারকট পুনরায় তাহাকে তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া বলিলেন "তোমার হাত সারিয়া গিয়াছে।" কি আশ্চর্য। পনর মিনিট পরেই তাহার হস্ত স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

সঙ্কেত দ্বারা অনুভব শক্তি এরূপ বিকৃত করিতে পারা যায় যে তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ মায়িক বা কাল্পনিক পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। কোন কুকুর কিম্বা বিড়াল তথায় নাই, কিন্তু বলা হইল "ঐ একটা কুকুর রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তি সেই কুকুর দেখিতে লাগিলেন (যদবধি না বিপরীত সঙ্কেত দ্বারা ঐ ধারণা নিরাকৃত হইল)। তন্দ্রাবিষ্টকে বলা হইল 'তুমি জাগরিত হইয়া দেখিবে এই স্থানে রামবাবু ব্যতীত আর কেহ নাই'' (অথচ সেই স্থানে শ্যাম, যদু, হরি, প্রভৃতি দশজন উপস্থিত আছেন)। তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া (সঙ্কেতের কথা অবশ্য তাহার কিছুই স্মরণ নাই) কেবল রামবাবুকেই তথায় দেখিতে লাগিলেন। হরি যদু, প্রভৃতি যে যে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন সেই সকল চেয়ার তাঁহার শূন্য বোধ হইল। তিনি তাহাদের মধ্যে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন (যদু বাবুর কোলে বসিলেন)

কিন্তু বসিতে অসুবিধা হইতেছে কেন বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাদের কোলাহল বা অঙ্গস্পর্শ হয়ত তাঁহার অনুভূতই হইল না, কখনো হয়ত তাহা অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু কোথা হইতে এরূপ আসিতেছে,—ইহার কারণ কি ইত্যাদি বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। বিপরীত সঙ্কেত ব্যতীত তিনি প্রকৃতিস্থ হইতেন না। মানুষ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াও (অপরের সঙ্কেত ব্যতীত) মায়া সৃষ্টি করিতে পারে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ডাক্তার হিউ উইংফিল্ড (Dr. Hugh Wingfield) বলেন তিনি যে সকল ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন (Mr. C) এইরূপ করিতে পারিতেন। তিনি ঘোটকারোহণে যাইতেছেন বা চতুর্দ্দিকে সর্প রহিয়াছে ইত্যাদি চিন্তা বা কল্পনা তাঁহার নিকট বাস্তব (Real) হইত।

আমরা সকলেই জানি পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাচ প্রকার অনুভূতির দ্বার, যথা চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি সম্পাদিত হয়। কিন্তু দর্শনকার্য্য চক্ষু ব্যতীত অপর কোন অঙ্গ দ্বারা সাধিত হয় কিনা? অধ্যাপক ফণ্ট্যান (Prof. Fontan) একটি পরীক্ষা দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন। এক ব্যক্তির চক্ষু আবদ্ধ করিয়া তাহাকে তন্দ্রাবিষ্ট করা হইল এবং বলা হইল যে "তোমার অঙ্গুলি দ্বারা তুমি দেখিবে।" এই বলিয়া বিচিত্র বর্ণের পশমী সূতা একত্র করিয়া তন্মধ্য হইতে লাল বর্ণের সূতাগুলি বাছিয়া লইতে তাহাকে আদেশ করা হইল। সে তাহাই করিল। এইরূপে যে বর্ণের আজ্ঞা করা হইল সে অভ্রান্তরূপে তাহাই বাহির করিল। মায়ার্স বলেন বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি (চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি) বিকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনুভব শক্তি আমাদের মধ্যে ছিল এবং প্রচ্ছন্নাত্মা (Subliminal Self) স্থূল জগতের অনুভূতির জন্য এই সকল ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে আত্মা এই সকল নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াও দর্শন, শ্রবণাদি করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তি সঙ্কেতানুসারে অঙ্গুলি দ্বারা দর্শন করিতেছে ইহা মনে করিতেছে বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ইহা আদৌ স্থূলদর্শন নহে, ইহা আত্মার সূক্ষ্মদর্শন (Telaesthesia or Clairvoyance)।

মানসিক শক্তি (স্মৃতি, বুদ্ধি, ইচ্ছা ইত্যাদি)

তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হইল "তুমি জাগরিত হইলে অমুক ব্যক্তি যখন

তিনবার কাসিবে তখন অগ্নিকুণ্ডে শলাকা দিও।" জাগরিত হইয়া তাঁহার উক্ত আদেশের বিষয় কিছুই মনে নাই। কিন্তু এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পরে ঐ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি যখন ঠিক তিনবার কাসিল, তিনি অগ্নি খুঁচিতে লাগিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারেন না, কেবল বলেন এইরূপ করিবার তাঁহার হঠাৎ একটা প্রবৃত্তি জন্মিল।

গার্ণি (Gurney) বলেন "২৬শে মার্চ্চ "পি" কে (Mr. P. কে) বলা হইল যে আজ হইতে একশত তেইশ (১২৩ দিন পরে সে চুপিটি সাদা একখানি কাগজ খামে পুরিয়া অমুক ব্যক্তিকে পাঠাইবে। জাগরিত অবস্থায় "পি"র একথা স্মরণ থাকিত না, কিন্তু এক মাস বা দুই মাস পরে যখনই তাঁহাকে তন্দ্রাবিষ্ট করা হইত, তিনি বলিতেন "আর এতদিন বাকি আছে।"

ডাক্তার ব্রামওয়েল (Dr. Bramwell) এ সম্বন্ধে অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হইত "৭ দিন ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট পরে, বা ৪৪১৭ মিনিট পরে, বা ১১৪৭০ মিনিট পরে ইত্যাদি (৫৫টি বিভিন্ন পরীক্ষা করা হইয়াছিল) তুমি জাগরিত বা নিদ্রিত থাক, একটি কাগজে ক্রুস চিহ্ন করিবে এবং সেই সময়টাও অনুমান করিয়া লিখিয়া রাখিবে।" এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে ৪৫টি সম্পূর্ণরূপে এবং ৮টি কতক পরিমাণে সফল হইয়াছিল।

তন্দ্রাবিষ্টের ইচ্ছা শক্তিও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। ভীরুকে সাহসী করা যায়, উদাসীন আগ্রহবান্ হয়, নিরাশ ব্যক্তি অধ্যবসায়ী, নিরুদ্যম কর্ম্মশীল এবং দুর্ব্বল সবল হয়। অনেকের ধারণা ছিল যে তন্দ্রাবিষ্টের ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া তন্দ্রাকারী তাহাকে যথেচ্ছ দুষ্কর্ম করাইতে পারেন। কিন্তু ব্রামওয়েল পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে এরূপ করা অসম্ভব। তন্দ্রাবিষ্টের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা শক্তিই বলবতী হয়। চরিত্রের অবনতি সম্পাদন দুরূহ এমন কি অসম্ভব হইলেও, উন্নতি সাধন সেরূপ নহে। ইহা সহজেই করা যায়। জিয়েন (Jeanne) নাম্নী এক রমণী অতিশয় দুশ্চরিত্রা ছিল। চৌর্য্য প্রভৃতি নানারূপ দুষ্ক্রিয়া করিয়া অবশেষে উন্মাদগ্রস্ত হয়। বয়সিন (M. Voisin) তাহাকে অনেকবার তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া কেবল যে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন—তাহা নহে, পরন্তু তাহার চরিত্রের এরূপ উন্নতিসাধন করেন

যে সে পূর্ব্বাপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পীড়িত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করে।

অতীন্দ্রিয় শক্তি (যথা Telaesthesia দূরানুভূতি প্রভৃতি)

তন্দ্রাবিষ্ট ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় ইহা প্রদর্শন করিয়া মায়ার্স অতীন্দ্রিয় শক্তির উদাহরণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি দেখাইয়াছেন যে স্বাভাবিক নিদ্রাবস্থায় অনেক মানবের এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর তন্দ্রাবিষ্টের অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

দূর হইতে তন্দ্রাবিষ্ট করা যাইতে পারে।

গিলবার্টের বাটী হইতে প্রায় এক মাইল দূরে লিওনি নাম্নী এক রমণী বাস করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর গিলবার্ট খুব দৃঢ়রূপে ইচ্ছা করিলেন যে লিওনি তন্দ্রাবিষ্ট হইবে এবং পদব্রজে তাঁহার বাটীতে আসিবে। ৮৫৫ মিনিটে তিনি ইচ্ছা করিতে আরম্ভ করেন, ৯। ২ মিনিটে লিওনি তন্দ্রাবিষ্ট হন, ৯।২৫ মিনিটে তিনি মুদ্রিত নেত্রে বাটী হইতে বহির্গতা হন এবং ৯।৫৫ মিনিটে (তন্দ্রাবস্থায় কত গাড়ী ঘোড়া ও জনতা অতিক্রম করিয়া) নির্ব্বিঘ্নে গিলবার্টের বাটীতে উপস্থিত হন। ইত্যাদি।

তন্দ্রাকারীর বেদনা, আস্বাদ প্রভৃতি তন্দ্রাবিষ্ট অনুভব করে।

গার্নি বলেন "কন্‌ওয়ে (Conway) নামক এক ব্যক্তিকে স্মিথ্ (Mr. Smith) তন্দ্রাবিষ্ট করেন। তন্দ্রাবিষ্ট চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিল এবং স্মিথ ও আমি তাহার পশ্চাতে কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান হইলাম। আমি তন্দ্রাবিষ্টকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কিছু অনুভব করিতেছে কিনা? এই বলিয়া আমি স্মিথের দক্ষিণ স্কন্ধে চিম্‌টী কাটিলাম। কন্‌ওয়ে "উঃ হু হু" বলিয়া নিজের সেইস্থানে হাত বুলাইতে লাগিল। অতঃপর কর্ণ, চক্ষু, মস্তক প্রভৃতি নানাস্থান পরীক্ষা করা হইল অনন্তর স্মিথ্ পর্য্যায়ক্রমে লবণ, চিনি, কড়ুকিরি, লঙ্কা, মরীচ ও আদা মুখে দিলে, কন্‌ওয়েও ঠিক তদনুরূপ আস্বাদ পাইতে লাগিল।"

তন্দ্রাবিষ্ট অজ্ঞাত অতীত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

ডবি (Mr. Dobbie) যে সকল ব্যক্তিকে তন্দ্রাবিষ্ট করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২।১ জনের এই শক্তি লক্ষিত হয়। ক্যাম্পবেলের একটি সোনার বোতাম হারাইয়াছিল ডবি দ্বারা এলিজা (Miss Eliza) তন্দ্রাবিষ্ট হইলে ক্যাম্পবেল তন্দ্রাবিষ্টাকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইলেন তন্দ্রাবিষ্টা বলিতে লাগিলেন "আমি দ্বিতল গৃহের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রহিয়াছি। এই ঘরে এতগুলি দরজা, এতগুলি জানালা, এইরূপ ড্রয়ার, চেয়ার ও ছবি (প্রত্যেক বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়া) দেখিতেছি।" তৎপরে তিনি বোতামটি কোন্ ড্রয়ারের কোন্ পার্শ্বে ছিল, কিরূপ একটি বালক ঐ ঘরে আসিল, কিরূপে উহা গ্রহণ করিল, কোথায় লুকাইয়া রাখিল, অতঃপর ক্যাম্পবেল ও তাঁহার পত্নী কোন্ কোন্ স্থানে ও কি প্রকারে ঐ বোতামের অন্বেষণ করিলেন ইত্যাদি এবং তৎকালে উহা কোথায় ও কি অবস্থায় ছিল —এইসব এরূপে বর্ণনা করিলেন যেন সমস্তই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতেছে। বলা বাহুল্য তন্দ্রাবিষ্টা, ক্যাম্পবেল বা তাঁহার বাটী ও পরিবারের বিষয় কিছুই জানিতেন না এবং তাঁহার বিবরণ বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছিল।

দূরবর্ত্তী বর্ত্তমান ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

মিসিস্ "ই" (Mis. E) ল্যাঙ্কাষ্টার নিবাসিনী এক রমণী। তিনি বল্টিমোর নগর দেখেন নাই। বল্টিমোর বাসী এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করা হইল যে "অমুক রাত্রিতে কোন বাটীর যে কোন স্থানে একটি বস্তু একটু অসাধারণ ভাবে রাখিবেন (যেন চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হয়)।" উক্ত রাত্রিতে ল্যাঙ্কাষ্টারে "ই" কে তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া বল্টিমোরের উক্ত ভবনে যাইতে বলা হইল। তন্দ্রাকারীও জানিতেন না ঐ বাটীটি কোথায় ও কিরূপ এবং কি বস্তুই বা অসাধারণ রূপে রক্ষিত হইয়াছে। যাহাহউক তন্দ্রাবিষ্টা রমণী ঐ বাটী প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যেক স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা করিলেন। তাহা লিখিয়া লওয়া হইল। অবশেষে ঐ গৃহের ঘড়ীর দিকে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট করাতে তিনি বলিলেন 'ঘড়ীর তলা হইতে সরু সূতার একটি কালবর্ণ ছিপিযুক্ত খালি শিশি ঝুলিতেছি।" পরদিন তন্দ্রাকারী

বস্টিবোরের নির্দ্দিষ্ট বাটীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বরাত্রির ঘটনার অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক হইয়াছে। অনুরুদ্ধ ব্যক্তি ঘড়ীর তলায় যে শিশিটি ঝুলাইয়াছিলেন তাহা ল্যাবরেটারে আনীত ও "ই"কে দর্শিত হইল। 'ই'' উহা চিনিতে পারিলেন, বলিলেন "কল্য আমি ইহাকে ঘড়ীতে ঝুলিতে দেখিয়াছি।"

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, বি-এ।

মহা-যজ্ঞ।

"যদি বাঁচিবে, তবে জীবন বিসর্জ্জন কর''।

এই সংসার মহাশ্মশান, যে এক মহা বিশ্বগ্রাসী চিতানল হেথায় জ্বলিতেছে, যে এক দিগন্তব্যাপী প্রলয়-অগ্নি সারাদিন সারারাত হেথায় গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিষ নাই। যাহাকে বিজ্ঞানবিৎ জড়-পদার্থ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন তাহাও জ্বলিতেছে, তাহাও পুড়িতেছে, তাহাও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে; আর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রাণী, মানবের আদর্শ, স্বয়ং যীশুখৃষ্ট, তিনিও জগতের তরে, জগতের এই কালানলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন। নানা রূপে বিশোভিত মৃৎখণ্ডাণু আপন স্বাধীন অস্তিত্বে কেমন বিরাজিত ছিল, কাহারও অনিষ্ট জানিতনা, কাহারও শত্রুতা সে কখনও করে নাই, তবুও প্রকৃতির তাহা সহিল না; প্রকৃতি আপনার উদ্ভিদের পরিপোষণার্থে তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণিত করিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অণুতে পরিণত করিয়া ফেলিল। কেবলি কি তাহাই? অবশেষে তাহার মৃৎ অবস্থা ঘুচাইয়া বৃক্ষের শরীর উপাদানে পরিণত করিয়া ফেলিল। তাহাই দার্শনিক অশ্রুপরিপ্লুত নয়নে শোক বিজড়িত ভাষায় রোদন করিয়া বলিয়া উঠেন "জগৎ মহাশ্মশান—এক চিতানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে— তাহাতে প্রকৃতি জড়পদার্থকে বৃক্ষের কল্যাণ কামনায় আহুতি দিতেছেন।"

এই খানেই প্রকৃতির মর্ম্মঘাতী ক্রীড়া সাঙ্গ হয় নাই। তাঁহার আদরে বর্দ্ধিত, অপরের স্বত্বায় পরিপোষিত উদ্ভিদেরও সেই প্রলয়-অগ্নিতে নিস্তার নাই। জঙ্গম প্রাণীর পোষণে তাহারাও উৎসর্গীত হইতেছে। সেইরূপ আবার ইতর প্রাণী, সেইরূপেই আবার মনুষ্য সকলেই এই চিতানলের আকার বর্দ্ধিত করিতেছে। তবে প্রভেদ এই মাত্র, মৃত্তিকা বৃক্ষ কীট ইতর প্রাণীতে দহনে যে জ্বালা ছিলনা মানব আহুতিতে সেই জ্বালা আরম্ভ হয়। সেইজন্মই দার্শনিক বলিয়াছেন, এই স্থান দুঃখের স্থান ; কবি এই স্থানের নাম করিয়া সেইজন্মই কাঁদিয়াছেন। এই স্থানে যে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা কখনও নিবিবে না। কিন্তু, ভাই, আর এক দিক দিয়া দেখ দেখি সংসারে কি কেবল মৃত্যু, কেবল ধ্বংস, কেবল আর্ত্তনাদ। ইহাতে কি কেবল বিজয়ার ক্রন্দন আছে, আগমনীর আনন্দোৎসব নাই ? আত্মীয়ের মৃত্যু আছে, তনয়ের জন্মোল্লাস নাই ? মৃত্তিকা জন্মের অবসান আছে, উদ্ভিদ্ জন্মের আরম্ভ নাই, উচ্চ পশুর, উচ্চ ভাবের বর্দ্ধন নাই, মানবের চরম বিকাশ নাই ? ভাই, দেখ দেখি ধাতুর ধাতবত্ব ঘুচিতেছে কেন—উদ্ভিদ-প্রাণ লভিবার জন্য ; সেই রূপ উদ্ভিদের উদ্ভিদত্ব যাইতেছে জঙ্গমত্ব পাইবার জন্য। আমরা কেবল দেহের নাশ দেখি কিন্তু তাহার নাশে প্রাণের যে বিকাশ হয় তাহা দেখিতে পাই না। মানবের বর্ত্তমান দেহের নাশকে, আমরা মৃত্যু বলি, আমরা ভাবিনা যে তাহার পুরাতন দেহ তাহার জীবনের স্ফুরণের অনুপোযোগী বলিয়াই খসিয়া পড়িল।

অতএব আমরা দেখিতেছি এই প্রকৃতির মহাযজ্ঞ বিশ্বকল্যাণেই অধিষ্ঠিত আছে। এই বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে এক মহাযজ্ঞ—যাহার ফলে সৃষ্টিব্যাপার। নির্গুণ ব্রহ্মের গুণাদিতে আবদ্ধ হওয়াই সেই যজ্ঞ। আবার দেখিলাম মহাযজ্ঞের উপরই এই সৃষ্টির স্থিতি নির্ভর করিতেছে। আবার এই মহাযজ্ঞ-সেতুই জীবকে পূর্ণতায় লইয়া যায়। অতএব সর্ব্ব ধর্ম্ম মূলেই মহাযজ্ঞের কথা লিখা আছে। এইটী ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা এবং অনেক দুরূহ যোগতত্ত্ব এই যজ্ঞনীতির উপর নির্ভর করে। আমাদিগের সাধারণ ধারণা যে উৎসর্গ করিতে হইলে আমাদিগের প্রাণে যন্ত্রণা বোধ হয় ; অতএব এই যে শেষোক্ত মহাযজ্ঞের কথা বলিলাম, যাহার ফলে মানব জীবন্মুক্তি লাভ করে, সেই

মহাযজ্ঞে যে ত্যাগ তাহা কত গুরুতর—তাহাতে নিশ্চয়ই আমাদিগের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। আমাদিগের সাধারণতঃ এই ভ্রম আছে বলিয়াই আমি ব্রহ্মের এই মহা যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখিব উৎসর্গে দুঃখ নাই—কেবল পবিত্র আনন্দ—উৎসর্গেই আমাদিগের সুখ।

আমাদিগের দুঃখ হয় কিসে? উৎসর্গকারীর হৃদয়ে দুইটী ভাব আছে—তাহারা যেন বিভিন্ন আচারী দুইটী মানব। উচ্চতরের সুখ দানে, অপরের সুখ আদানে বা গ্রহণে। অতএব প্রত্যেক উৎসর্গেই এই দুইটীর সংগ্রাম উপস্থিত হয়—ইহার ফলেই আমাদিগের দুঃখ। অতএব আমরা বুঝিতেছি—যে উচ্চতর ভাব ও ইতর ভাবের এই বিবাদই দুঃখের মূল। কিন্তু যিনি সকল ভাবের সমন্বয়, যিনি অনন্ত সুখের ঐকাতান, তাঁহার কাছে আর বিবাদ আসিবে কোথা হইতে? সেইজন্যই তাঁহার উৎসর্গে কেবলি অনন্ত সুখ ও অনন্ত আনন্দ।

আমরা যে পূর্ব্বে আদি মহাযজ্ঞের আভাস দিয়াছি সেই মহাযজ্ঞ কি? ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশ করিতে সীমাবদ্ধ হইলেন। আমরা এই দুরূহ বিষয় একটী উদাহরণে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একটী অনন্ত আলোক-সাগরের কল্পনা কর- তাহার প্রতি স্থানেই কেন্দ্র বিদ্যমান, কিন্তু বৃত্ত কোথায়ও নাই। এইটী পরমব্রহ্মের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাহার পর যাহা অনন্ত কেন্দ্রযুক্ত ও বৃত্তহীন ছিল তাহা হইতে এককেন্দ্রযুক্ত ও সবৃত্ত আলোক-গোলক উদ্ভূত হইল। ইনিই আমাদিগের মহেশ্বর। যে বৃত্তের দ্বারা এই গোলক খণ্ড আবদ্ধ, তাহাই তাঁহার আপনাকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশে সীমাবদ্ধ হইবার ইচ্ছা। এই অবগুণ্ঠন-পরিচ্ছদের অপর নাম মায়া। মায়া ব্রহ্মের আপন শক্তি যাহার দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন—এবং তাহা হইতেই অনন্ত জীবের উৎপত্তি। ব্রহ্মের আপন ভাবের ফলে Spirit (পুরুষ) এবং মায়ার ফলে Matter (প্রকৃতি)। ব্রহ্মের এই উৎসর্গের উদ্দেশ্য তিনিই জানেন, তিনিই ইহার স্রষ্টা এবং তাঁহা হইতেই অনন্ত প্রাণীর উদ্ভব।

তিনি অখণ্ড, কিন্তু অখণ্ডের বিভাগ অসম্ভব। তিনি স্বেচ্ছায় আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই অনন্ত আকৃতিধারী জীবের জন্ম

হইয়াছে। এই প্রত্যেক প্রাণীই তাঁহার প্রাণেই জীবিত—যেন তাঁহার নিকট হইতে অনন্ত স্ফুলিঙ্গ আসিয়া সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া আছে। এই আদি মহাযজ্ঞের অপর নাম "মহাকর্ম্ম"।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ॥

গীতা ৮।৩

যতদিন এই বিশ্ব থাকিবে ততদিন তাঁহার উৎসর্গ চলিবে। যতদিন তিনি আপন জালে আবদ্ধ থাকিবেন ততদিন এই বিশ্বের বিচ্ছিন্ন জীবের অস্তিত্ব রহিবে। তিনি প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক বস্তুতে, আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কোনটীর আকারগত পিঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত বিশ্ব ছড়াইয়া থাকিতে পারেন—সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু তাহা তিনি করিতেছেন না। প্রত্যেক আকারধারী ধীরে ধীরে আপনাকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া উৰ্দ্ধে উঠিতেছে; এবং অবশেষে তাঁহারই মত অনন্ত শক্তির কেন্দ্রে পরিণত হইতেছে। পুত্র সুদূর ভবিষ্যতে পিতার মত হইবেন, অথচ তাঁহার পূর্ব্বের অনন্ত জীবনের স্মৃতি রহিয়া যাইবে। পুত্র তখন পিতার সহিত অভেদভাবে সচ্চিদানন্দময় মহান সংগীত গাহিতে থাকিবেন। এই যে ব্রহ্মের আদি উৎসর্গ এই যে তাঁহার আপনাকে আবদ্ধ করা— এই আদি মহাযজ্ঞের ইহাই উদ্দেশ্য। এই যজ্ঞ হইতেই অনন্ত প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে—ইহা দ্বারা তাহাদিগের ধারণ হইতেছে—এবং তাহার ফলেই প্রত্যেকটী ক্রমে অনন্ত শক্তিমান হইয়া, তাঁহার সহিত অভেদ হইয়া, তাঁহার আপন ভাবে—সচ্চিদানন্দ ভাবে বিভোর হইতেছে।

এই যথার্থ যজ্ঞ। যিনি যাহাই ভাবুন—যজ্ঞ অর্থে সর্ব্বত্রই এই ভাব ব্যক্ত হয়। আপনার যাহাতে সুখ সেইটুকু বিসর্জ্জন কর কেন? না আপনি যে সুখ-প্রয়াসী তাহা অপরেও উপভোগ করুক এই বলিয়া,—আপনার যাহা একবার ছিল তাহা আরও দশ জনের হউক এই ভাবিয়া,—যে ক্ষীণ সুর আপনার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতেছিল তাহা আরও দশ জনের ঐক্যতানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মহান সংগীততরঙ্গ তুলিবে এই বলিয়া। কর্ত্তব্য শক্তির ক্রিয়াতেই তাহার সুখ। বিহঙ্গ তাহার কূজনে আনন্দে কাঁপিতে থাকে।

চিত্রকর স্বমনোকল্পিত চিত্রের অঙ্কনে সুখ পায়। সেইরূপ আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দ তাঁহার আপন আনন্দ ছড়াইয়া দেওয়া। তাঁহার আকাঙ্ক্ষার কিছুই নাই। তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হইলেই—তাঁহাকে প্রকাশ করিতে হইবে—সেই সচ্চিদানন্দ ভাব বাহিরে ছড়াইতে হইবে। সৃষ্টির অপর নাম তাঁহার কর্ম্ম। অতএব আমরা বুঝিলাম এই সৃষ্টি-যজ্ঞে অশান্তি বা অসুখ হইতে পারে না—ইহা কেবল আনন্দময়। যেখানেই তাঁহার এই ভাব ব্যক্ত আছে সেই খানেই আমরা দেখিতেছি তিনি হাস্যময় ও দান রত। অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি একবার কল্পনা কর অষ্ট মূর্ত্তির পূজায় আছে "নমঃ শিবায় যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ।'

যেমন পুরুষের ক্রিয়া দানে, সেইরূপ আবার প্রকৃতির ক্রিয়া গ্রহণে। জীবনতরঙ্গ লইয়াই প্রকৃতি আকারধারিণী। যতক্ষণ ঐশ তরঙ্গদ্বারা অনুপ্রাণিত ততক্ষণ তাহার প্রকাশ। ঐশ তরঙ্গ যখনই তাহা হইতে বিমুক্ত হইবা পড়িবে, প্রকৃতির কার্য্যও বন্ধ হইয়া পড়িবে। এইজন্য আমরা তাহাকে কেবল আত্মকরণ করিতে বা তাহাকে রক্ষণশীলা দেখিতে পাই। একবার সাধারণ স্ত্রীলোককে ভাবিতে পারিলে এইটী আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের স্বভাব এই—যে জিনিষটী মনোমত হয় সেইটীই সে আপন করিতে ইচ্ছা করে। কেবল আপন করণ নহে—তাহা অপরকে দান করিতে কুণ্ঠিত হয়। আমি এক কথায় সমস্ত স্ত্রীলোককে স্বার্থপর ও পুরুষকে স্বার্থত্যাগী বলিতেছি না, আমি কেবল পুরুষ ও স্ত্রীর সাধারণ ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। সর্ব্বদেশেরই স্ত্রীলোকের ভিতর এই ভাব বিদ্যমান আছে। স্ত্রীলোক রক্ষণশীলা, পুরুষ দাতা। সাহেবের সুখ মেমকে বিবিধ বসনে সাজান, সাহেবের কিন্তু সাধারণ পরিচ্ছদ। প্রকৃতির আনন্দ গ্রহণে তাঁহার আনন্দ ধারণে যেমন কেহই স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চাহে না সেইরূপ প্রকৃতিও দানে পরাঙ্মুখ।

এখন বুঝিলাম ত্যাগে বা যজ্ঞে সাধারণের এত অনিচ্ছা বা দুঃখ কেন। আমরা দেখিলাম যে পুরুষের কার্য্যই কেবল যজ্ঞ—কেবল ত্যাগ। তিনি যখন কোনও নির্দ্দিষ্ট দেহে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া আবার সেই দেহ ছাড়িয়া দেন—তাহাতে তাঁহার কিছুই দুঃখ হইতে পারে না; কারণ

তিনি জানেন তাহাতে তাঁহারত নিজের কোনও নাশ হইতেছে না। তবে যে দেহান্তর তিনি গ্রহণ করিতেছেন তাহা আপনাকে বিভিন্নরূপে কেবল প্রকাশ করিবার জন্ত। কিন্তু প্রকৃতির ভাব অন্যরূপ। তিনি দেখিতেছেন যে তাঁহার নিকট হইতে জীবনী স্রোত সরিয়া যাইতেছে— তিনি আরও বলের সহিত সেই জীবনী স্রোতকে ধরিয়া রাখিতে চান। পুরাণে এই প্রকৃতি ও পুরুষের ভাবটী সুন্দরভাবে আছে—পুরুষ যেন নির্ব্বিকার স্থির—আর প্রকৃতি চাহে কেবল পুরুষকে শত চেষ্টায় ধরিয়া থাকিতে—তাহার শক্তি কেবল আদানে বিকাশ। জীবনীশক্তি একটী দেহ সত্ত্বে ছাড়িতেছেন— জীবনী শক্তির এই যজ্ঞে কিছুই দুঃখ নাই, কিছুই তাপ নাই; কিন্তু—সেই প্রকৃতিরূপা দেহ কবিতেছেন কি? তিনি দেখিতেছেন তাঁহার সমস্ত দাইক্ত বসিয়াছে—যাহাব অবলম্বনে, যাহাকে ধরিয়া তিনি জীবিত ছিলেন সেই জীবনীশক্তি তাঁহাকে ছাড়িতেছে—অতএব দ্বিগুণিত আবেগে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহেন।

অতএব জীবের জীবনে এই দুইভাব দেখা যায়। যাহাদিগের উপর প্রকৃতির আধিপত্য অধিক, তাহাদিগের যন্ত্রণা ত্যাগে, তাহাদিগের ক্রিয়াশক্তি কেবল গ্রহণে, কেবল ধারণে প্রয়োগিত হয়। আবার যাহাদিগের উপর পুরুষের আধিপত্য তাহাদিগের ত্যাগে সুখ, তাহাদিগের ক্রিয়াশক্তি ত্যাগে প্রয়োজিত হয়। উচ্চতর মানব এই দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং নিকৃষ্ট জীব প্রথম শ্রেণীর। আমরা তাহাই দেখি যে, যে সকল মনুষ্য আপন দেহকে আপনি বলিয়া জানে তাহারা উৎসর্গকে অশ্রুনেত্রে দেখে; সেইরূপ উন্নত মানব মহাসুখে যন্ত্রণাকে বক্ষে লইয়া বলে "ঈশ্বর, তোমার অভিলাষ আমি পূরাইতে আসিয়াছি, আমি ইহাতে সুখী" Lo; I come to do thy will, O God; I am content to do it."

যতদিন মনুষ্য দেহকে আপনি বলিয়া ভাবিবে—যতদিন দেহের দাস থাকিবে—ততদিন তাহাকে ভীষণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যেদিন হইতে ভাবিবে যে দেহ আমি নয়, আমি ভগবানের অংশ—সেইদিন হইতে তাহার সমস্ত যন্ত্রণা সরিয়া যাইবে। যিনি উন্নত হইয়াছেন—তাঁহার দেহ তাঁহার অধীন-ভৃত্য—তাঁহার বিকাশের উপাদান মাত্র—যখন আবশ্যক,

অসন্দিগ্ধ চিত্তে ও সুখে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদিগের সমস্ত যন্ত্রণা আমাদিগের দুই ভাবের সংগ্রামে হয়—কিন্তু একবার এই দুইয়ের ঐক্যতান আরম্ভ হইলেই সব সুখ, সব শান্তি।

ক্রমশঃ

পন্থা—সেবক।

রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা।

সনাতন গোস্বামীর অসাধারণ বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট কৃপাও করিলেন। তাঁহার কৃপায় সনাতন গোস্বামীর তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অধিকার জন্মিল। পূর্ব্বে যেরূপ রায় রামানন্দ তাঁহার কৃপায় তাঁহার প্রশ্ন সকলের উত্তরদানে সমর্থ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সনাতন গোস্বামীও তদ্রূপ তাঁহার কৃপায় তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ে প্রশ্নকরণে সমর্থ হইলেন। সনাতন গোস্বামী দৈন্য ও বিনয় সহকারে দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক প্রভুর চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ;—

"নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঁয়াইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিলে উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে যে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি"॥

সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—"প্রভো, আমি বিষম বিষয়ান্ধকূপে পতিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম, সাধ্যতত্ত্ব বা সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসাতেও আমার অধিকার নাই। যদি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিলেন, তবে বলুন; আমি কে? আমি যে প্রতিনিয়ত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তাপিত হইতেছি, ইহার বা কারণ কি? আমার কর্ত্তব্য কি? কি করিলে আমার হিত হয়?—এই সকল বিষয়, এবং এতদ্ভিন্ন আরও যদি কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে, তাহাও, আমাকে উপদেশ করুন"

"প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥
যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥

সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"সনাতন, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে পূর্ণ কৃপা করিয়াছেন। তুমি সকল তত্ত্বই বিদিত আছ। তোমার ত্রিতাপও নাই। তুমি যে তত্ত্বজ্ঞ এবং তাপরহিত হইয়াও ঈদৃশ প্রশ্ন করিতেছ, তাহা কেবল তোমার বিদিত বিষয়ের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত। সাধুদিগের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা জ্ঞাত বিষয়ের দৃঢ়তা-সম্পাদনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তুমি ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তনের যোগ্যপাত্র। আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে সকল তত্ত্বই বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥"

যেমন সূর্য্যের আলোক, যেমন অগ্নির উষ্ণতা, তেমনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। মণি ও মন্ত্রাদির শক্তির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের ঐ স্বাভাবিকী শক্তিও অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধা; চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি হইতে ধামপরিকরাদির, জীবশক্তি হইতে জীবসমূহের এবং মায়াশক্তি হইতে জগতের প্রকাশ হইয়া থাকে। অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি চিচ্ছক্তিরই নামান্তর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির নামান্তর। তটস্থাশক্তি জীবশক্তির নামান্তর। জীবশক্তি নিজের স্বসংবেদ্যত্ব অর্থাৎ স্বপ্রকাশভাব হইতে বিচ্যুত ও অসম্যক্‌প্রকাশ-স্বভাব হওয়াতেই তাঁহাকে স্বপ্রকাশভাবা অন্তরঙ্গা শক্তি ও অপ্রকাশস্বভাবা বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী তটস্থাশক্তি বলা হয়। ঐ তিন শক্তিই শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া ভক্তপর্য্যায়। অতএব জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির ন্যায় তাঁহারই প্রকাশ-সামর্থ্য, অতএব তাঁহা হইতে অভিন্ন হইয়াও, নিজের মায়াধীনত্ব ও অণুত্বাদি হেতু, মায়াধীশত্ব ও বিভুত্বাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদই জানিতে হইবে।

জগৎ জীবজড়াত্মক। এই জীবজড়াত্মক জগতে পরস্পর-বিভিন্ন-স্বভাব-সমন্বিত দুইটি সামর্থ্য বা শক্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একটি জীবসামর্থ্য, অপরটি জড়সামর্থ্য; একটি দেহী, অপরটি দেহ, একটি চিৎ, অপরটি অচিৎ। জগতে সামর্থ্য দুইটি না হইয়া একটি হইলে, কেবল দেহী বা কেবল দেহ হইলে, আমি কে, এইরূপ প্রশ্ন উত্থিতই হইতে পারিত না। সামর্থ্য দুইটি হওয়াতেই, আমি কে, আমি দেহ না দেহী, এই প্রশ্নটি অনেকেরই মনে উত্থিত হইতে দেখা যায়। আবার শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদ হইতেও, আমি কে, আমি শক্তি না শক্তিমান্, এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। প্রথম প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত, অর্থাৎ আমি দেহ না দেহী এই প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত, দেহ ও দেহীর স্বরূপনির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। দেহ-গুণক্রিয়াত্মক এবং দেহী জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মক। দেহের স্বরূপভূত বা মূলভূত গুণ ও ক্রিয়া আবার পরস্পরসাপেক্ষ। গুণ ব্যতিরেকে ক্রিয়া এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে গুণ প্রকাশ পায় না। পরস্পরসাপেক্ষ গুণ ও ক্রিয়া সকল

কাজেই দেহ। তন্মধ্যে গুণসকল দেহের উপাদান এবং ক্রিয়াসকল উহার নিমিত্ত ;— কারণ, গুণসকলের সংযোগ বিয়োগেই দেহের উৎপত্তিবিনাশ দৃষ্ট হয়। এক মহীয়সী মায়াকেই আবার ঐ সকল গুণক্রিয়ার মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেহ কেহ এক মহীয়সী মায়াকে ঐ সকল গুণ ক্রিয়ার মূল না বলিয়া পরমাণুসমূহকেই ঐ সকল গুণক্রিয়ার মূল বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না ; কারণ, গুণক্রিয়ার মূল অণু না হইয়া বিভু হওয়াই সঙ্গত। গুণের জ্ঞানে দেশ কারণ। বাহ্য জগতের গুণ বহু প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ; কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই ঐ সকল গুণ দেশবৃত্তিত্ব অপেক্ষা করে দেশবৃত্তিত্ব ভিন্ন গুণের ধারণাই হয় না, আমরা গুণের পরিবর্ত্তনের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু দেশ সম্বন্ধরহিত গুণ বুঝিতে পারি না। আমরা গুণাভাবের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু দেশাভাব আমাদিগের বুদ্ধির অতীত। দেশাভাব বুদ্ধির অতীত হইলে, দেশের বিভুত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া উঠিল ; কারণ, দেশকে বিভু না বুঝিয়া অণু বুঝিতে হইলে তদন্তে দেশের অভাবও বুঝিতে হয়। ক্রিয়ার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ক্রিয়ার জ্ঞানে কাল কারণ। ক্রিয়া বহু প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই ঐ সকল ক্রিয়া কালবৃত্তিত্ব অপেক্ষা করে। কালবৃত্তিত্ব ভিন্ন ক্রিয়ার ধারণাই হয় না। আমরা ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কালসম্বন্ধ-রহিত ক্রিয়া বুঝিতে পারি না। আমরা ক্রিয়াভাবের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কালাভাব আমাদিগের বুদ্ধির অতীত। কালাভাব বুদ্ধির অতীত হইলে, কালের বিভুত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া উঠিল ; কারণ কালকে বিভু না বুঝিয়া অণু বুঝিতে হইলে,তদন্তে কালের অভাবও বুঝিতে হয়। বিভুত্বের ন্যায় নৈয়ত্য বা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বও দেশ ও কালের অপর একটি লক্ষণ। দেশ গুণের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কাল ক্রিয়ার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। দেশ গুণের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া গুণসকলের যৌগপদ্যরূপ দৈশিকসম্বন্ধের ঘটক হয় ; আর কাল ক্রিয়ার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া ক্রিয়া সকলের পারম্পর্য্যরূপ কালিকসম্বন্ধে ঘটক হয়। গুণ ও ক্রিয়া যেরূপ পরস্পরসাপেক্ষ, দেশ ও কালও তদ্রূপ পরস্পরসাপেক্ষ। কাল ব্যতিরেকে দেশের এবং দেশ ব্যতিরেকে কালের ধারণা করা যায় না। গুণকার্য্যের নিমিত্তস্বরূপ কাল ব্যতিরেকে গুণের অপ্রকাশ হেতু তদাশ্রয় দেশ

জ্ঞানের বিষয় হয় না এবং গতির বা অবস্থার উপাদানস্বরূপ দেশ ব্যতিরেকে ক্রিয়ার অপ্রকাশ হেতু তদাশ্রয় কাল জ্ঞানের বিষয় হয় না। দেশ ও কাল পরস্পর বিভিন্ন গুণাংশের ও ক্রিয়াংশের সম্বন্ধ-ঘটকরূপে পরস্পর-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জ্ঞেয়বস্তু সকলের সহিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। জাতি যেরূপ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানের বিষয় হয় না, দেশও তদ্রূপ গুণক্রিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানের বিষয় হয় না। এইরূপ হইলেও জাতিজ্ঞান যেরূপ ব্যক্তি-জ্ঞানের নিয়ত পরবর্ত্তী ফল, দেশকালজ্ঞান তদ্রূপ গুণক্রিয়ার জ্ঞানের নিয়ত-পরবর্ত্তী ফল নহে, পরন্তু নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী মূল। ঐ দেশ ও কাল মহীয়সী মায়াশক্তির দুইটি প্রান্ত। গুণাত্মক দেশ মায়াশক্তির অন্ত্য প্রান্ত এবং ক্রিয়াত্মক কাল উহার আদ্যপ্রান্ত। মায়াশক্তির স্পন্দনজনিত গুণক্ষোভ হইতেই কারণবারির উৎপত্তি। ঐ কারণবারি ক্রমশঃ পরস্পন্দিত হইয়া স্পন্দনতারতম্যে অংশতঃ মহদাদি তত্ত্বসমূহের আকারে পরিণত হয়। পরে উক্ত মহদাদি তত্ত্বসকল স্বান্তর্নিহিত স্পন্দনাত্মক কালের প্রেরণায় চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত পরমাণু, অণু বা দ্ব্যণুক ও ত্র্যসরেণু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ধারণ পূর্ব্বক এই বিচিত্র গুণময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকে। তাপ, আলোক শব্দ, তড়িৎ ও বিভিন্ন-গুণ-নাম-সমন্বিত আকর্ষণ সকল জড় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত একই স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াসামর্থ্যের প্রকাশভেদমাত্র। যে জড়শক্তির স্পন্দন হইতে এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি, ঐ স্পন্দন ও জড়শক্তি একই তত্ত্ব কিনা, ইহাই অতঃপর বিবেচ্য। জড়বিজ্ঞান তন্নির্ণয়ে অসমর্থ। তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশ সকল জড়ের সহজ ধর্ম্ম বা জড়াতীত কোন বস্তুর সামর্থ্য-বিশেষের প্রেরণা-জনিত আগন্তুক ধর্ম্ম, তাহা জড়বিজ্ঞান নিরূপণ করিতে অক্ষম। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলেন,—তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশ সকল জড়ের সহজ ধর্ম্ম নহে, পরন্তু জড়াতীত কোন বস্তুর সামর্থ্যবিশেষেরই প্রেরণাজনিত আগন্তুক ধর্ম্ম। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের এইরূপ বলিবার হেতু আছে। পরমাণুতে যে ক্রিয়াশক্তি অনুমিত হয়, তাহা পরমাণুতে থাকে না, পরমাণুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অবকাশাত্মক দেশেই থাকে। উহা জড় পরমাণুর ধর্ম্ম নহে, কিন্তু জড়সত্তা-প্রকাশিকা চিদ্বৃত্তি। জড়ে ক্রিয়া করা ভিন্ন জড়ের সহিত উহার অপর কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। ক্রিয়া যে জড়ের সহজ ধর্ম্ম নহে, ইহা অনুভব

সিদ্ধ। ক্রিয়ার কারণ ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছাও আবার স্বয়ংসিদ্ধা নহে; কারণ-ইচ্ছার মূলে জ্ঞান অপরিহার্য্য। অতএব জগতে জড়সামর্থ্যের ন্যায় জড়াতীত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মক জীবসামর্থ্যও সিদ্ধ হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

অলৌকিক ঘটনা।

আজ যে অলৌকিক ঘটনার বিষয় বর্ণিত হইতেছে ইহা প্রায়, ২৫৷২৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কোথায় এবং কাহার বাটীতে এই অলৌকিক ঘটনাটী ঘটিয়াছিল কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সেই স্থান ও ব্যক্তির নাম অপ্রকাশিত রহিল। তবে ঘটনাটী যে সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দুইটী সুকুমারমতি বালক বালিকা—যাহারা জগতের কিছুই জানিত না—যাহারা জানিত না মৃত্যু কি—প্রেতযোনি কি—এই অদ্ভুত ঘটনাটী সেই অজ্ঞান শিশু-দিগের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত অমুকের (নাম অপ্রকাশিত) মাতুলালয় অমুক (গ্রামের নাম অপ্রকাশিত) গ্রামে। তাঁহার মাতুলানীর দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন। প্রসবান্তে মাতুলানী দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইলে শ্রীযুতের সহোদরা ভগিনী তাঁহার সেবা শুশ্রূষার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিতেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পীড়া এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, তাঁহার জীবনের আর কোন আশা রহিল না—সকলেই হতাশ-চিত্তে ম্রিয়মান হইয়া মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে যথাসময়ে করাল কাল আসিয়া মৃত্যুশয্যাশায়িনী মাতুলানীর জীবন অপহরণ করিল। যে রাত্রে মৃত্যু হয় সেই রাত্রির প্রথম যামে শ্রীযুতের স্ত্রী ও তাঁহার এক মাতুলকন্যার মনে এক প্রকার ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। কি ভয় এবং তাহার কারণ কি তাহা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। "ঐ কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ঐ কে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিতেছে"—এইরূপ প্রলাপবাক্য আমরা অনেক সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মনে কি এক প্রকার অব্যক্ত ভয়ের সঞ্চার

হয়।, বোধ হয় তাঁহাদের এইরূপ কোন ভয় হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, ফলতঃ তাঁহারা কিছু ভয় পাইয়াছিলনে।

মাতুলানীর মৃত্যুদিবস হইতে শ্রীযুতের জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যাটীকে আপনার দুই পার্শ্বে রাখিয়া রাত্রে নিদ্রা যাইতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটী মাতুলের নিকট শয়ন করিত। তখন কন্যাটীর বয়স ৫।৬ ও কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ৩।৪ বৎসর হইবে। নিশীথকালে শ্রীযুতের ভগিনী পুত্র কন্যা দুইটীকে শয্যা হইতে উঠাইয়া প্রস্রাব করাইয়া আনিতেন। এক রাত্রে প্রস্রাব করিবার সময় ছোট মেয়েটী অকস্মাৎ শ্রীযুতের ভগিনীকে বলিল—"দিদি, ঐ দেখ আমার মা দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমাকে ডাক্‌চে।" এই কথা শুনিয়া তিনি বালিকার দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সত্বর অতি যত্নের সহিত ভাই ভগিনী দুইটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া আসিলেন এবং নানা কথায় উহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিলেন। এই বিষয় মাতুল মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলে তিনি "দুর্গা" "দুর্গা" ভিন্ন আর কিছুই বলিলেন না। প্রত্যহ নিশীথে এইরূপ ঘটিত। কিছু দিনের মধ্যে বালিকাটীর জ্বর হইতে আরম্ভ হইল এবং কিছুদিন পরে ঐ পীড়াতে তাহার মৃত্যু হইল। এ পর্য্যন্ত ছেলেটী কিছু দেখে নাই। কিন্তু ভগিনীর মৃত্যুর পর হইতে সে প্রত্যহ ঠিক সেই একই সময়ে সেইরূপ দেখিতে লাগিল। শ্রীযুতের ভগিনীও অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িলেন এবং পূর্ব্বমত মাতুল মহাশয়কে জানাইলেন কিন্তু তিনি সেই দুর্গানাম উচ্চারণ ব্যতীত আর কিছুই করিলেন না। অল্পদিন মধ্যে বালকও পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে "মা আমাকে কোলে নাও" বলিয়া চিরনিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

মৃত্যুর পরেও বোধ হয় জননী ছোট ছেলে মেয়ে দুইটীর স্নেহ ভালবাসা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই সেইজন্য প্রত্যহ প্রতি নিশীথ সময়ে তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেন এবং তাহাদিগের অদর্শনজনিত দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া হৃদয়ের প্রিয় বস্তু দুইটীকে নিজের নিকটে লইয়া যাইলেন। এরূপ অনেক বিষয় আমরা অনেক ইংরাজী গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু ব্যাপার কি এ পর্য্যন্ত কেহ স্থির নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্মঃ

১২শ ভাগ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল। { ২য় সংখ্যা।

রাসতত্ত্ব।

১

প্রিয়বন্ধু রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের উপরোধে কলিকাতার ফেডারেশন সভায় রাসতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'চারি কথা বলিতে প্রয়াস করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। তাই আমার বন্ধুর উপরোধে কতকগুলি প্রবন্ধ দ্বারা সেই ভাব প্রস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা—সৎ, চিৎ, আনন্দ। সৎ, চিৎ, ও আনন্দরূপে ব্রহ্মের আবির্ভাব।

সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ ভিন্ন আর কিছু নাই। যদি মনে মনে ভাবিয়া দেখি যে আমি কি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি—যে আমি আছি অর্থাৎ আমার সত্তা আছে, এবং কতকগুলি বিষয় আমি জানি এবং আমি আনন্দ অনুভব করি। এই সংস্কারের বিপরীত সংস্কারও আমার হয়। আমি আছি

[illegible]গেলে আমি থাকিব না। আমি অনেক বিষয় জানি, কিন্তু অনেক বিষয় জানি ন। আমি আনন্দ অনুভব করি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে-নিরানন্দও অনুভব করি।

সৎ, চিৎ, আনন্দের লুকোচুরি লইয়াই আমি।

সত্তা আছে, নাই। জ্ঞান আছে, নাই। আনন্দ আছে, নাই।

শ্রুতিতে বলে ভগবানের পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ। আমরা ভগবানের অংশ। তাই আমাদের আংশিক সত্তা, আংশিক জ্ঞান ও আংশিক আনন্দ।

শ্রুতিতে ইহাও বলে যে যেমন সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যের অংশ হইলেও সূর্য্যে অবস্থিত হইলে পূর্ণ হয়, সেইরূপ জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব যখন ব্রহ্মে অবস্থিত হয় তখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জীব প্রথমে ব্রহ্মে অবস্থিত হয়, পরে ব্রহ্মে লীন হইতে পারে।

ব্রহ্ম কি? ব্যক্ত, অব্যক্ত ও অক্ষর, এই তিন লইয়া ব্রহ্মের প্রকাশ।

আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই ভাবে থাকে। সৃষ্টি ও স্থিতি কালে ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত। প্রলয় কালে ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত। ব্রহ্মের মায়া শক্তিদ্বারা এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুইই প্রকাশিত। শক্তিরূপে ব্রহ্মই এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড। এবং মায়ার ঈশ্বররূপে তিনিই ব্যক্ত ও অব্যক্তের প্রাণ, প্রেরয়িতা ও অধিষ্ঠান।

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্।" অক্ষরই পরম ব্রহ্ম।

আবার ব্যক্ত ও অব্যক্ত লইয়াই অক্ষর। এই জন্য ব্যক্ত, অব্যক্ত ও অক্ষর—এই তিনকেই অপর ব্রহ্ম বলে। আবাব তিনিই অন্যভাবে পরব্রহ্ম।

"তস্মাৎক্ষরমতীতোঽহং অক্ষরঞ্চাপি।"

ব্যক্ত ও অব্যক্তকে শ্রুতিতে 'মৃত্যু' বলে। অক্ষরকে 'অমৃত' বলে। অর্থাৎ জীব অব্যক্ত মূল প্রকৃতির ক্ষেত্রে এবং ব্যক্ত মহদাদির ক্ষেত্রে আংশিক অবস্থায় থাকে। অক্ষরে অবস্থিত হইয়াই জীব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উপনিষদের শিক্ষা, শ্রুতির উপদেশ এই যে, জীব আংশিক সত্তা বা অসত্তা হইতে পূর্ণ সত্তা লাভ করে, আংশিক জ্ঞান বা অজ্ঞানময় অন্ধকার হইতে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে এবং আংশিক আনন্দ বা নিরানন্দ হইতে পূর্ণ আনন্দ লাভ

করে। অর্থাৎ এক কথায় জীব মৃত্যু হইতে অমৃত্যু বা অমৃত লাভ করে। উপনিষদের প্রার্থনা এই যে—"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা মৃতং গময়।"

যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইবার শ্রুতিবাক্যের অনুশীলন করিব।

কঠ উপনিষৎ—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—প্রেয়ঃ দ্বারা মৃত্যু ও শ্রেয়ঃ দ্বারা অমৃতলাভ হয়।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরো ভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥

মনুষ্যের সম্মুখে দুই পথ আছে। শ্রেয়োলাভের পথ ও প্রেয়োলাভের পথ। যিনি ধীর তিনি এই দুই পথের সম্পূর্ণ আলোচনা করিয়া, দুই পথের বিভিন্নতা নির্দ্দিষ্ট করেন। এইরূপ বিচার দ্বারা ধীর ব্যক্তি প্রেয়োলাভের পথ ত্যাগ করিয়া শ্রেয়োলাভের পথ আশ্রয় করেন। মূঢ় ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি জন্য এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের জন্য প্রেয়োলাভের পথ অনুসরণ করেন।

শ্রেয়োলাভের পথ বিদ্যা, প্রেয়োলাভের পথ অবিদ্যা।

"দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।"

ব্যক্ত ও অব্যক্তময় পথই অবিদ্যা। তাহার ফল প্রেয়ঃ। অক্ষরময় পথই বিদ্যা। তাহার ফল শ্রেয়ঃ।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎপুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥

এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয় হইতে মহৎ পর্য্যন্ত ব্যক্ত, তাহার পর অব্যক্ত, তাহারে

পর পুরুষ অর্থাৎ অক্ষর। কঠোপনিষদেই তিনি 'অক্ষর' শব্দে কথিত হইয়াছেন—

"যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরম্।"

এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া, নচিকেতা "ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু"— ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া বিরজ ও বিমৃত্যু হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন উপনিষৎ—

বিজ্ঞানাত্মা সহদেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ॥

বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গণ সহিত যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, প্রাণ ও ভূত সকল যাহাতে প্রতিষ্ঠিত সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন এবং সকলের অন্তরে প্রবেশ করেন

মুণ্ডক উপনিষৎ—

বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—অপরা বিদ্যা।

অথ পরা যথা তদক্ষরমধিগম্যতে।

সেই অক্ষর যাহা দ্বারা জানিতে পারা যায়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলে।

"অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।"

অক্ষর হইতে এই বিশ্ব সম্ভূত হইয়াছে।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥

যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে বিবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাহাতেই লীন হয়

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥

সেই অক্ষর অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ　শঙ্করাচার্য্য বলেন শেষোক্ত অক্ষর হিরণ্যগর্ভ।

যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম ··
তদেতৎসত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্যবিদ্ধি।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃ ভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবমুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইহারা সংযুক্ত। যেখানে ক্ষর, সেই খানেই অক্ষর। যেখানে ব্যক্ত, সেই খানেই অব্যক্ত অক্ষর হইতেই ক্ষরের উৎপত্তি। অব্যক্ত হইতেই ব্যক্তের আবির্ভাব। ঈশ্বর এই সংযুক্ত ভাবময় বিশ্বকে পালন করিতেছেন।

জীবাত্মা আপনাকে ভোক্তা মনে করিয়া ভোক্তৃ—ভোগ্য সম্বন্ধ দ্বারা নানা রূপ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং বদ্ধজীব ঈশ্বরতা শূন্য হইয়া এই বিশ্ব মধ্যে বিরাজ করেন। সেই জীব ঈশ্বরকে জানিয়া সকল পাশ হইতে বিমুক্ত হয়।

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা
বজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

যিনি 'জ্ঞ' তিনি ঈশ। যিনি "অজ্ঞ" তিনি অনীশ জীব। ঈশ্বর অজ। জীব ঈশ্বরের স্বরূপ এই জন্য জীবও অজ। ভোক্তার ভোগ্য অর্থ যুক্ত মূল প্রকৃতিও অজ। যে হেতু সেই মূল প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি। (মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।) অনন্তাত্মা ঈশ্বর বিশ্বরূপ হইলেও অকর্ত্তা।

"ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ"।

এই তিনকে অর্থাৎ জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে জ্ঞানী ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। ঈশ্বরের অংশ ও ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। অংশময় ও শক্তিময় ঈশ্বরই ব্রহ্ম।

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্ত ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥

ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (প্রকৃতি) এবং প্রেরয়িতা ঈশ্বর, এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম।

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্রগূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোহন্যঃ ॥

ব্রহ্মপর, অনন্ত, অক্ষরে বিদ্যা ও অবিদ্যা গূঢ় রূপে নিহিত রহিয়াছে। অবিদ্যা ক্ষর এবং বিদ্যা অমৃত। বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুয়ের যিনি ঈশ্বর তিনি অন্য।

প্রশ্ন উপনিষদে ওঙ্কারকে পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম দুই বলা হইয়াছে। তৃতীয় মাত্রার সাধন দ্বারা সাধক ব্রহ্মলোকে উপনীত হয় এবং ব্রহ্মলোক হইতে পরাৎপর, পুরিসয় পুরুষকে দর্শন করে। তাহার পর অপর ব্রহ্মের এইরূপ বর্ণনা আছে—

"শান্ত মজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি।"

মাণ্ডুক্য উপনিষদে প্রণবের চতুর্থ মাত্রা রূপ পরব্রহ্মের এইরূপ বর্ণনা আছে—

"অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্য মলক্ষণ মচিন্ত্য
মব্যপদেশ্যমেকাত্ম্য প্রত্যয় সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং
মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।"

পুরাণের ব্রহ্ম

এইত গেল উপনিষদের কথা। উপনিষদের অক্ষর ব্রহ্ম, আত্মা বা পুরুষ

—পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মরূপে দ্বিবিধ। বেদের অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ পুরুষ। বেদের পরব্রহ্ম পরম পুরুষ কিম্বা অব্যপদেশ্য অক্ষর।

পুরাণ উপনিষদের ভাষ্য মাত্র। যাহা উপনিষদে পরিস্ফুট নাই, পুরাণ সেই অর্থ বিশদ রূপে বর্ণনা করেন। পুরাণ শ্রুতিকেই অনুসরণ করেন এবং পুরাণ ও শ্রুতি দুইই পরম পুরুষকে অনুসরণ করেন।

উপণিষদের 'ব্যক্ত' পুরাণ মতে সপ্তলোকাত্মক। সেই সপ্তলোকের মধ্যে আবার ত্রিলোকী ও চতুর্লোকী এই দুই ভাগ।

ত্রিলোকের ঈশ্বর তৃতীয় পুরুষ। সপ্তলোকী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর দ্বিতীয় পুরুষ। অব্যক্তের ঈশ্বর প্রথম পুরুষ। "বিষ্ণোস্তত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।"

'ব্যক্ত' ত্রিগুণময়ী মায়ার প্রকাশ স্থান
'অব্যক্ত' ত্রিগুণময়ী মায়ার সাম্যাবস্থা।
অব্যক্তের পর শুদ্ধ সত্ত্বময় বৈকুণ্ঠ।
সেই বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর বিষ্ণু বা কৃষ্ণ।

তাঁহারই মায়া শক্তি। তিনিই সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ। তিনি সচ্চিদানন্দময়+ বেদের অক্ষর ব্রহ্ম ও সচ্চিদানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ সেই "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্।" তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। তিনি ত্রিলোকীর অধিপতি Planetory Logos। দ্বিতীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। আবার তিনিই সবিতৃমণ্ডলবর্ত্তী নারায়ণ—Logos of the Solar System

প্রথম পুরুষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন—"এক আমি নানা হইব।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণুর কথা পুরাণে প্রকাশিত হইয়াছে। শিবের যথার্থ তত্ত্ব এখনও পুরাণ প্রকাশ করেন নাই। এখন ও তাহার সময় আসে নাই। এখন বিষ্ণুর শাসন কাল। প্রলয় প্রবণ কালে শিবের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইবে। পুরাণের শিব এখন বৈষ্ণব শিব।

এইত গেল মোটামুটি দিগ্ দর্শন। এখন জিজ্ঞাস্য কিরূপে জীবের সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ অক্ষর ব্রহ্মের অনুরূপ হইতে পারে। কিরূপে জীব অমৃত লাভ করিতে পারে।

প্রথমে আমরা উপনিষদের প্রদর্শিত পথ অনুশীলন করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

ব্রহ্ম ও মায়া।

দৃশ্য ও অদৃশ্য যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের যে এক আদি কারণ (The First cause) আছেন যাঁহাতে এই জগদাদি মহাসমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত ও বিলীন হইতেছে যিনি দেশ, কাল ও অবস্থার অতীত, ইহা পৃথিবীর চিন্তাশীল ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাকেই আর্য্য ঋষিগণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম আখ্যা দিয়াছেন।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ছান্দোগ্য।

হে সৌম্য, অগ্রে এক এবং অদ্বিতীয় এই সৎমাত্র ছিলেন।

"যদা তমঃ তৎ ন দিবা ন রাত্রি ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।

শ্বেতাশ্বতর।

যৎকালে সেই অন্ধকারমাত্র (ছিল), (তৎকালে) দিবারাত্রি, সৎ অসৎ কিছুই ছিল না কেবল মঙ্গলময় (তিনি ছিলেন)।

এই ব্রহ্মই সব,—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ইনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই।

ইহার স্বরূপ কি ? তাহা জানিবার উপায় আছে কিনা ও জানা সম্ভব কিনা ? এতদুত্তরে সকলেই বলেন তিনি নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প, ও নিরুপাধি, সুতরাং তাঁহাকে জানা অসম্ভব।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

অর্থাৎ তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ নাই বলিয়া উপনিষদ্ তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে তটস্থ লক্ষণের আশ্রয় লইয়াছেন,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি-
সংবিশন্তি তৎ ব্রহ্মেতি।"

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভগবান দাস প্রণীত "The Science of Peace" নামক অতুলনীয় গ্রন্থের নিকট বর্ত্তমান প্রবন্ধ অনেকাংশে ঋণী। প্রবন্ধের বিষয়টি অতীব দুরূহ সুতরাং নানারূপে ও নানাভাবে বুঝিতে চেষ্টা করায়, এক কথা বারবার উল্লেখ করিতে হইয়াছে। ইহাতে যদি পুনরুক্তি দোষ হইয়া থাকে, উদার পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।——লেখক।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই সকল পদার্থ (জগদাদি) উৎপন্ন হয়, যাঁহা দ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং অন্তিমে যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তিনি ঠিক কি তাহা বলা যায় না; এই জন্যই উপনিষদ্ তিনি কি নহেন্ তাহা বলিয়াছেন। তিনি "নেতি নেতি" ইহা নহেন, উহা নহেন্, হ্রস্ব নহেন দীর্ঘও নহেন, স্থূল নহেন সূক্ষ্মও নহেন, দৃশ্য নহেন, গ্রাহ্য নহেন ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে অজ্ঞেয় মনুসংহিতাতে তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

তিনি তমোভূত (অন্ধকার সদৃশ), এমন্ কোন লক্ষণ নাই যদ্দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়, সুতরাং অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে জানা অসম্ভব। স্বামী সুব্বারাও তাঁহার Lectures on the Bhagabat Gita নামক পুস্তকে বলিয়াছেন "পরব্রহ্মকে আত্মা (Self), চৈতন্য (Consciousness), কিংবা জড়পদার্থ (Matter),- কিছুই বলা যায় না, অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের কোনটিই নহেন; অথচ সকল জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। যিনি জ্ঞাতা, তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় অবশ্য কিছু আছে এবং জ্ঞানও আছে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহা হইলেই একাধিক বস্তু আসিয়া পড়ে। কিন্তু তিনি এক ও অদ্বিতীয়; অতএব তিনি জ্ঞাতা হইতে পারেন না। আবার সসীম ও সোপাধিক জীব "জ্ঞান" (Consciousness) শব্দে যাহা বুঝেন, পরব্রহ্ম তাহা হইতে পারেন না; কারণ নিরুপাধিক অবস্থায় জ্ঞান থাকে কিনা বা কিরূপ জ্ঞান থাকে, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ ধারণাতীত." (Pages 13 and 14)। শ্রীমতী ব্লাভাট্স্কি ও তাঁহার Secret Doctrine এ বলিয়াছেন,—"Consciousness implies limitations and qualifications, something to be conscious of and some one to be conscious of it" অর্থাৎ "জ্ঞান" বলিলেই সসীমতা আসিয়া পড়ে, কারণ যেখানে জ্ঞান, সেইখানে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা থাকিবেই থাকিবে। অতএব তিনি পরব্রহ্মকে "জ্ঞান" না বলিয়া Absolute Consciousness বলিয়াছেন। এই Absolute Consciousness কিরূপ

তাঁহা কেহই জানে না, সোপাধিক জীবের নিকট ইহা Unconsciousness বা চৈতন্যশূন্যতা বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

(Secret Doc. Vol 1. PP. 86, 87.)

কোন কোন উপনিষদ্ তাঁহাকে "অসৎ" বলিয়াছেন। ব্রহ্ম অসৎ—কিছুই নহেন। ইহার অর্থ কি? তাৎপর্য্য এই যে তিনি নির্দ্দিষ্ট কিছুই নহেন। তিনি "ইহা" অথবা তিনি "একটা কিছু" এরূপ বলিলে তাঁহাকে সীমাবিশিষ্ট করা হয়; অতএব তিনি "কিছু"ই নহেন—অসৎ। অসীমের ধারণা করা সসীম জীবের পক্ষে অসম্ভব। তবে অতি বৃহৎ বা অতি প্রকাণ্ড কোন একটা বস্তুর চিন্তা করিলে, অসীমের একটু ছায়া,—অনন্তের একটু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন নক্ষত্রগুলি এক একটী সূর্য্য এবং আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার) মাইল বেগে গমন করিয়াও কোন কোন নক্ষত্র হইতে লক্ষ বৎসরেও পৃথিবীতে উপনীত হইতে পারে না। পাঠক, একবার ভাবিয়া দেখুন ঐ সকল নক্ষত্রের পৃথিবী হইতে দূরত্ব কত। দূরবীক্ষণের যতই উন্নতি হইতেছে ততই দূরবর্ত্তী হইতে দূরতর নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কৃত হইতেছে, ইহা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন বিশ্বের অন্ত কোথায় বা আছে কিনা জানা যায় না। এখন যদি আমরা স্মরণ করি যে প্রত্যেক নক্ষত্র এক একটী ব্রহ্মাণ্ড এবং এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড (সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায়) ব্রহ্মে সমুদ্ভূত ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইলে যেন অনন্তের একটা ক্ষীণ জ্যোতিঃ মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুতের ন্যায় আমাদের মনের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে তিনটি চরম তত্ত্বের (Pen-ultimatesএর) অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহারা এই :—(১) "আমি" (অহং), (২) সমস্ত জ্ঞেয় বস্তু (প্রকৃতি) এবং (৩) এই দুইটির মধ্যে সম্বন্ধ (গ্রহণ প্রত্যাখ্যান, অনুরাগ বিরাগ বা আকর্ষণ বিকর্ষণ)। এই তিনটি লইয়াই জগৎ, তিনটিই সব,—আর কিছুই নাই। উদাহরণ স্বরূপ যে কোন পদার্থ (জীব) গ্রহণ করিলে দেখা যায় তাহার একটা "আমি" বা অহং আছে, "আমি"—ছাড়া অন্য বস্তুর (Not-selfএর) জ্ঞান

আছে, এবং ঐ বস্তুর সহিত তাহার একটী সম্বন্ধ (রাগ বা দ্বেষ) আছে। ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে যে কোন বস্তুই বিশ্লেষণ করা যাক্ না কেন দেখা যাইবে, অন্য কিছুই নাই,—সর্ব্বত্রই এই তিনটি তত্ত্ব—আত্মা, প্রকৃতি ও এতদুভয়ের মধ্যে অনুরাগ বিরাগাত্মক সম্বন্ধ। কিন্তু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ব্রহ্মই সব; অতএব ব্রহ্মই এই তিনটি তত্ত্ব। এই তিনটি তত্ত্ব যখন এরূপে একীভূত ও সম্মিলিত হইয়া থাকে যে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করিয়া (neutralising each other) এক অচিন্ত্য ও অননুমেয় সাম্যভাব উৎপাদন করে, সেই ভাব বা অবস্থাই ব্রহ্ম। যেমন প্রত্যেক স্থির জড়পদার্থে একাধিক বিপরীত বল কার্য্য করিলেও উহা সাম্যাবস্থায় থাকে (কোনও বলের ক্রিয়া লক্ষিত হয় না), যেমন প্রত্যেক বস্তুতে দুই বিরুদ্ধাত্মক তড়িৎ (Positive and Negative electricities) বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা পরস্পরকে খণ্ডন করিয়া আছে, যেমন বিভিন্ন বর্ণ (পীত, রক্ত, হরিৎ ইত্যাদি) পরস্পর সংমিশ্রিত ও একীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব বর্ণশূন্যতা (শুভ্রতা) উৎপাদন করে, সেইরূপ জগতের যাবতীয় দ্বন্দ্ব (Relatives) ও বিপরীত বস্তু (Opposites) (যথা পুরুষ প্রকৃতি, সৎ অসৎ, সৃষ্টি লয়, জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, বৃদ্ধি হ্রাস ইত্যাদি ইত্যাদি) একীভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যে এক বিরাট শান্তি বা ঘোর নিস্তব্ধতা উৎপাদন করে, তাহাই ব্রহ্ম। *

উপনিষদ্ পুনঃ পুনঃ প্রণব বা ওঙ্কারকে ব্রহ্মবাচক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "ওম্"ই ব্রহ্ম। ইহার অর্থ কি? ওম্ একটি শব্দ। অ, উ, ম্ এই তিন অক্ষরে ইহা গঠিত। এই তিনটি অক্ষর পূর্ব্বোক্ত তিন তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত নাম (Symbols) মাত্র। "অহং" বা প্রত্যগাত্মাকে (Universal Self কে) সংক্ষেপে "অ" বলা হইয়াছে, মূল প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হইয়াছে—

---

* আমরা এইস্থানে মনস্বিনী শ্রীমতী আনি বেসান্তের নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "All that has been, is, will be, can be, ever is in that Fulness, that Eternal. Only Itself knows Itself in its infinite unimaginable wealth of Being Because it contains all pairs of opposites and each pair in affirming itself to the eye of reason, annihilates itself and vanishes, It seems a Void. But endless universes arising in It proclaim It a plenum." (A Study in Consciousness, Page 44).

"উ" এবং এতদুভয়ের বিপরীতাত্মক সম্বন্ধের নাম "ম্"। তাহা হইলে ওম্ শব্দের অর্থ হইতেছে "অহম্ এতৎ ন" I Not-I not)। অর্থাৎ যখন প্রত্যগাত্মা, মূলপ্রকৃতি এবং ইহাদের (আকর্ষণ বিকর্ষণ) সম্বন্ধ যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিয়াও পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করে, সুতরাং কোনটির গুণ বা ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, তখন তাহাদের সেই সাম্যাবস্থার নামই ওম্ বা ব্রহ্ম।

এখন আমরা ওম্ বা ব্রহ্মের এই উপাদান-ত্রয়ের বিষয় একটু চিন্তা ক'রয়া দেখিব। প্রথমতঃ "অ" বা "অহং" (Universal Self)। ইহাঁর স্বরূপ কি? স্বামী সুবারাও বলেন "ইহা পরব্রহ্মের একটি শক্তিকেন্দ্র (Centre of Energy)। ইনি নানা ধর্ম্মে নানা নামে অভিহিত হইয়াছেন, যথা ঈশ্বর, প্রত্যগাত্মা, সগুণ ব্রহ্ম, Christos, অবলোকিতেশ্বর, Logos ইত্যাদি। ইনি পরব্রহ্মের ন্যায় অজ্ঞেয় নহেন। প্রলয়-কালে বা ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ইনি ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন এবং সৃষ্টির প্রাক্কালে আবির্ভূত হন্। ইনি সচ্চিদানন্দ এবং ইনিই একমাত্র চৈতন্যময় বিরাট্ পুরুষ। (I may as well say that it is the only Personal God ."। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস যাহা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় অধিকতর সুস্পষ্ট। তিনি বলেন "প্রত্যগাত্মার কোন ব্যক্তিগত সত্ত্বা নাই ; কারণ ব্যক্তিগত সত্ত্বা আছে বলিলে তিনি অন্যান্য চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ইহাও বলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি নহেন। পরন্তু সেই Self বা অসীম "আমি"র আভাস (Reflection) হইতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সসীম "আমি" (*Limited selves*) উৎপন্ন হইয়াছে।" * অতিক্ষুদ্র জীবাণু বা *Protozoon* হইতে আরম্ভ করিয়া পশু, পক্ষী, মানব, দেবতা, মনু, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর পর্য্যন্ত (যাঁহাদের Individual existence বা ব্যক্তিগত সত্ত্বা আছে, তাঁহারা) সকলেই এক একটি সসীম "আমি"। এবং এই সকল সসীম

---

* "... it is not personal, not individual, not some one that is separate from other ones, not the single ruler of any particular Kosmic system, but the Universal Self that is the very substratum of and is immanent in all such particular Ishvaras." The Science of Peace, Pages 115,116.

"আমি" সেই এক অদ্বিতীয় অসীম "আমি" হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। তাঁহার আলোকেই সব আলোকিত।

"ওম্" এর দ্বিতীয় অক্ষর বা ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ—"উ" অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি। এই মূলপ্রকৃতি কি? ইহার বিভিন্ন নাম হইতেই বুঝা যায় যে ইহা "অহং" বা আত্মার বিপরীত। "অহং" চিৎ, "এতৎ" বা মূলপ্রকৃতি অচিৎ; "অহং" এক, মূলপ্রকৃতি নানা; "অহং" জ্ঞাতা, প্রকৃতি জ্ঞেয় বা বিষয়। "অহং" যাহা নহে, মূলপ্রকৃতি তাহাই। এই জন্যই ইহার নাম "অনহং", "অসৎ" ও "অনৃত"। প্রকৃতপক্ষে "অহং" ও "এতৎ" একই ব্রহ্মের দুই বিপরীত মেরু (Opposite poles)। মনে করুন আমার সমীপে একটি ঘট বা একখানি কাগজ রহিয়াছে। ইহারা যখন অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থায় ছিল, তখন কাগজের এ পিঠ ও পিঠ বা ঘটের ভিতর বাহির ও সম্মুখ পশ্চাৎ ছিল কি? কিন্তু যেমন উহা ব্যক্ত হইল তৎক্ষণাৎ যুগপৎ উহাদের সম্মুখ পশ্চাৎ ও ভিতর বাহির আবির্ভূত হইল। ব্যক্ত ঘটের ভিতর আছে বাহির নাই বা ব্যক্ত পটের এক পিঠ আছে অপর পিঠ নাই, ইহা অসম্ভব। একটি থাকিলে অপরটিকে থাকিতেই হইবে, একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুতে তড়িৎ অব্যক্তাবস্থায় আছে; কিন্তু যেমন উহা ব্যক্ত হইল, দুইটি বিপরীত তড়িৎ (Positive ও Negative) যুগপৎ আবির্ভূত হইবেই হইবে। কেবল একটি প্রকাশিত হইয়াছে, অপরটি হয় নাই ইহা হইতে পারে না। একটির প্রকাশের জন্য অপরটির প্রকাশ অনিবার্য্য। ঠিক সেইরূপে ব্রহ্মে পুরুষ প্রকৃতি বা চিৎ জড় মিলিত ও সাম্যভাবাপন্ন হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় আছে। ব্যক্ত হইতে হইলে, তাহাদের যুগপৎ আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য। *

* কাশীর Central Hindu College হইতে প্রকাশিত "সনাতন ধর্ম্ম" নামক পুস্তকেও ঠিক এই কথা লিখিত হইয়াছে; যথা, "The emergence is simultaneous, for He cannot become manifest save by clothing Himself in This (Mula Prakriti) and This cannot become manifest save as illumined, ensouled by Him. This Two-in-one, by nature Sat and Asat, the Self and the Not-self, Purusha and Prakriti, ever-lasting, but appearing and disappearing, is the cause of all things."

এখন "ওম্"এর শেষ অক্ষর "ম্" বা ব্রহ্মের তৃতীয় উপাদানের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের কর্ত্তা বা কর্ত্রীই ইনি। "অহম্" ও "এতৎ"এর মধ্যে দ্বিবিধ সম্বন্ধ আছে; যথা, আকর্ষণ বিকর্ষণ (Attraction and Repulsion), মিলন বিচ্ছেদ (Union and Disunion) বা স্বীকার প্রত্যাখ্যান (Affirmation and Denial)। এই উভয়বিধ সম্বন্ধ স্থাপন ইহাঁরই করতলগত। ইহাঁর অসীম প্রভাব ইহাঁরই প্রভাবে প্রত্যগাত্মা মূলপ্রকৃতিকে "অহম এতৎ" বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং ইহাঁরই প্রভাবে "অহম্ এতৎ ন" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। যখন তিনি প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন ও বলিতেছেন "আমি এই সব", তখনই সৃষ্টি বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হইতেছে এবং যখন তিনি বলিতেছেন "আমি এসব কিছুই নহি", তখনই প্রলয় বা বিশ্বের তিরোধান হইতেছে। অতএব সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্রীই এই তৃতীয় তত্ত্ব। এই জন্যই ইহাঁকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হইয়া থাকে। ইনি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুবারাও ইহাঁকে "The light or energy of the Logos" বলিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থে Fohat, গীতায় দৈবী-প্রকৃতি, বেদান্তে মায়া, তন্ত্রে ও পুরাণে আদ্যাশক্তি, ভগবতী, মহাবিদ্যা, দেবী, মহামায়া, জগদম্বা ইত্যাদি নানা শব্দে আখ্যাত হইয়াছেন।

অ, উ, ম্—এই তিন অক্ষরের মিলনে "ওম্" শব্দ উৎপন্ন। এই তিনটি অক্ষর যাহা, "ওম্"ও তাহাই। প্রভেদ এই যে অক্ষরত্রয় যখন পৃথক্ অবস্থিত তখন বহু এবং যখন তাহারা মিলিত তখন এক বা একটি মাত্র শব্দ ওঁ। অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা, মূলপ্রকৃতি ও উভয়ের সম্বন্ধ যখন বিযুক্ত বা বিভক্ত হয়, তখনই জগদাদির আবির্ভাব এবং ইহারা সংযুক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করিলে একটিমাত্র পদার্থ থাকিয়া যান যিনি নির্গুণ ও নির্ব্বিকল্প। কিন্তু তত্ত্বত্রয় সংযুক্তই থাক্ বা বিযুক্তই থাক, তাহারা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে; অর্থাৎ জগদাদি প্রকটিতই থাকুক বা অপ্রকটিতই থাকুক সমস্তই ব্রহ্ম—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

ব্রহ্মে তিনটি তত্ত্বই একত্র অবস্থান করিতেছে। এখন আমরা এরূপ কল্পনা করিতে পারি যে ইহাঁর প্রথম তত্ত্বটি অর্থাৎ "অহং" অনন্তকাল ধরিয়া

(For eternity) "এতৎ"কে কেবল প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, অর্থাৎ অহং কেবল এই কথাই বলিতেছেন বা বলিয়াই আছেন—"অহং অনহং ন।" ইহার ফল কি হয় দেখা যাউক। ১মতঃ—একটি বস্তুকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে বস্তুটি কি তাহা আমার নিশ্চিত জানা আছে, নচেৎ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিব কিরূপে? "আমি ইহা নহি" বলিবার সময় "ইহা" বস্তুটির জ্ঞান আমার নিশ্চিত বর্ত্তমান। অতএব "অহং" "এতৎ"কে প্রত্যাখ্যান করিয়া পরোক্ষে (Indirectly) তাহাকে স্বীকারও করিতেছেন, অর্থাৎ 'অহং এতৎ' এবং 'অহং এতৎ ন'—এই দুই চিন্তা পরস্পর বিরোধী হইলেও যুগপৎ ঘটিতেছে। ২য়তঃ—'অহং অনহং ন' অর্থাৎ 'আমি' আমি ব্যতীত অন্য কিছুই নহি, এই চিন্তার ফল কি এই দাঁড়াইতেছে না যে আমিই একমাত্র সৎ পদার্থ, অন্য কিছুই নাই? অতএব দেখা যাইতেছে 'অহম্' ও 'এতৎ' এর মধ্যে নিত্য প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধই প্রকৃত সম্বন্ধ, কারণ একই ব্রহ্মে কিরূপে এই জগদাদির আবির্ভাব হইতেছে ইহা কেবল এই সম্বন্ধের দ্বারাই বুঝা যায়। অহম্ এতৎ ন এই নিত্য প্রত্যাখ্যান স্বীকার প্রচ্ছন্ন থাকায়, একমাত্র সৎ পদার্থে কিরূপে এই অসংখ্য অসতের উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে,—কিরূপে সৃষ্টি লয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, জন্মমৃত্যু, অহোরাত্রি ইত্যাদি দ্বন্দ্বযুক্ত বিশ্বের আবির্ভাব হইতেছে,—তাহা বেশ বুঝা যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি তৃতীয় তত্ত্বটিকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়। ব্রহ্মের নির্গুণ বা অপ্রকট অবস্থায় এই শক্তি প্রসুপ্তা, নিদ্রিতা বা ব্রহ্মে বিলীনা থাকেন। কোন অজ্ঞেয় কারণে যেমন এই শক্তি প্রবুদ্ধা হইলেন, অমনি ব্রহ্মের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিল,—প্রবুদ্ধা শক্তি প্রথম তত্ত্বকে আশ্রয় করিলেন। এই শক্তিপ্রভাবে তিনি (অহং) বলিলেন "একোঽহং বহুঃ স্যাম্" অর্থাৎ তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা হইল। এই শক্তিপ্রভাবেই তিনি 'এতৎ'কে দেখিতে পাইলেন ও চিনিতে পারিলেন এবং 'আমিই এই' বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিলেন। এখন আর তিনি নির্গুণ নহেন,—সগুণ; অপ্রকট নহেন, প্রকট। এই প্রকটাবস্থা শক্তি সাপেক্ষ বা (বেদান্তের ভাষায়) ব্রহ্ম মায়োপাধি গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর হইলেন। এক ব্রহ্ম ত্রিধা প্রকাশিত হইলেন,

যে তত্ত্বত্রয় মিলিত ও একীভূত হইয়াছিল, এখন তাহারা বিভক্ত হইয়া যুগপৎ আবির্ভূত হইল।

ব্রহ্ম মায়োপাধি ধারণ করিয়া ঈশ্বর হইলেন এই বাক্য হইতে অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে দেখা যায়। তাঁহারা ভাবেন সগুণ ব্রহ্ম মায়া দ্বারা বদ্ধ ও দেশ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এক বিরাট্ ব্যক্তি (A great individual) বাস্তবিক তাহা নহে। ইনি মায়ী অর্থাৎ মায়ার প্রভু ও দেশ কালের অতীত এবং ইঁহার কোন স্বতন্ত্র বা ব্যক্তিগত সত্ত্বা Individuality) নাই। ইনি পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ইনিই ব্রহ্ম। ইনি স্বপ্রকাশ। ইচ্ছাক্রমে ইনি স্বয়ং প্রকাশিত হন্ এবং জগদাদি আপনার ভিতর হইতে বাহির করেন এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই প্রপঞ্চ তন্মধ্যে বিলীন হয় "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ"। তবে নির্গুণ সগুণে প্রভেদ কি? যখন তিনি মূল প্রকৃতি ও মায়াশক্তি নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া এক অজ্ঞেয় ভাব ধারণ করেন তখন তিনি নির্গুণ, এবং যখন ঐ দুটিকে প্রকাশ করতঃ স্বয়ং প্রকাশিত হন্ তখনই সগুণ। সগুণাবস্থায় তিনি প্রত্যগাত্মা (Universal Self)। বিশ্বে অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বিশাল পর্য্যন্ত যত 'আমি' বা individuality আছে তিনিই তাহাদের একমাত্র উৎস ও উৎপত্তি স্থল। যেমন এক ও অসীম আকাশ যখন যে জড় পদার্থের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, তখন তাহাকে তদাকাশ বলা হয়, যেমন এক ও বিশ্বব্যাপী সূর্য্যালোক যখন যে পদার্থে প্রতিবিম্বিত হয় তখন তত্তৎ সূর্য্য বলিয়াই অভিহিত হয়, সেইরূপ এই অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী 'অহং' (Universal Self) প্রকৃতির অসংখ্য উপাধি দ্বারা উপহিত হইয়া অসংখ্য জীব বা সসীম 'আমি' উৎপাদন করেন। প্রকৃত পক্ষে যেমন আকাশ পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয় মাত্র, সেইরূপ আত্মা বস্তুতঃ বিভক্ত হন না, অনন্তকাল এক ও অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান। সমগ্র মূল

* স্বামী সুব্বারাও ইহা এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন. "Now we see the first manifestation of Parabrahman is a Trinity—the highest Trinity that we are capable of considering. It consists of Mulaprakriti, Eswara or the Logos, and the conscious energy of the Logos, which is its power and light." A lecture on the Gita, Page 22.

প্রকৃতিকে উপাধিরূপে স্বীকার করিয়া তিনি ঈশ্বর এবং মূলপ্রকৃতির অসংখ্য পরিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া তিনিই অসংখ্য জীব। এই পরিচ্ছিন্ন অংশ একটি পরমাণুও হইতে পারে বা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিও হইতে পারে। উপাধি যত ক্ষুদ্র ও স্থূল, তৎপ্রতিবিম্বিত 'অহং' ও তদনুরূপ ক্ষুদ্র এবং উপাধি যত বিশাল ও সূক্ষ্ম, তদুপহিত অহং ততই সুব্যক্ত ও শক্তিশালী হইয়া থাকে, কারণ আকাশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও যে বস্তুর যতটুকু আয়তন তাহা ততটুকুই ধারণ করিতে পারে এবং সূর্য্য সকল বস্তুকে সমভাবে আলোক দান করিলেও, দর্পণে যে পরিমিত আলোক প্রকাশ পায়, গোময়ে তাহা পায় কি? (ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

আমি ও আমার দেহ।

মনোময় কোষ।

ভুবর্লোক। কামময় দেহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উন্নত সুগঠিত কামময় দেহ জ্ঞান সঞ্চয়ের অপূর্ব্ব যন্ত্র। কিন্তু যতদিন স্থূলদেহ তৎ কর্তৃক সঞ্চিত জ্ঞানের অংশভাক না হয় ততদিন আমরা জাগ্রত অবস্থায় সে জ্ঞানের ব্যবহার করিতে পারিনা। কৃপণের ধনের ন্যায় তাহা সঞ্চিতই থাকিয়া যায়, ইহলোকে আর তাহা বড় ভোগে আসেনা। সুখের বিষয় এই যে অধিকাংশ স্থলে কামময় দেহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্থূল-দেহের সহিত তাহার সম্বন্ধ আপনা হইতেই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসে। যে স্থলে হয় না সেস্থলে বুঝিতে হইবে যে কর্ম্ম-দোষেই এরূপ হইতেছে। এরূপ স্থলেও নিরুৎসাহ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। যথাশক্তি কামময় দেহের

উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হউন, দেখিবেন এমন একদিন আসিবে, যেদিন স্থূলদেহ ও কামময় দেহের মধ্যে এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানটুকু একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়া উভয়ের মধ্যে এক সুন্দর সুগম সেতুর সৃষ্টি হইবে।

এই শেষোক্ত অবস্থা বাস্তবিকই স্পৃহনীয়। যাঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, তিনি নিদ্রিত অবস্থায় ভুবর্লোকে যে সকল কার্য্য করেন তাহা আর জাগ্রত অবস্থায় বিস্মৃত হন না। তাহাতে ফল হয় এই যে নিদ্রিত অবস্থায় লব্ধ জ্ঞান তাঁহার জাগ্রত জীবনের পথ আলোকিত করিয়া তাঁহাকে ইহলোকে বহু ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উন্নতি ও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই স্থলে হয়ত অনেক পাঠকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হইবে। তাঁহারা বলিবেন, "একি কথা! কোনটা অধিক সত্য? স্বপ্ন না প্রত্যক্ষ জীবন? স্বপ্ন দ্বারা প্রত্যক্ষ জীবন নিয়ন্ত্রিত হইলে যদি উন্নতি হয় তাহা হইলে পাগলের দোষ কি?" কথাটা একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

আমরা নিদ্রিত অবস্থায় যাহা দেখি শুনি বা অনুভব করি তাহাকেই আমরা 'স্বপ্ন' নাম দিয়া থাকি। কিন্তু গতবারে বলিয়াছি সকল স্বপ্ন এক প্রকৃতির নহে। আমরা জাগ্রত অবস্থায় নানারূপ চিন্তা করিতেছি এবং তাহার ফলে আমাদের স্থূল মস্তিষ্কে নানাবিধ স্পন্দনের উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু চিন্তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল স্পন্দনের নিবৃত্তি হয় না। ষ্টীমার চলিয়া যাইবার পরও যেমন নদীবক্ষ কিছুক্ষণ ধরিয়া আলোড়িত হইতে থাকে, সেইরূপ চিন্তা অপসৃত হইয়া গেলেও তজ্জনিত মস্তিষ্কের আণবিক কম্পন কিয়ৎকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। শুধু তাই নয়। পথের উপর শকট চক্র যেমন আপন চিহ্ন রাখিয়া যায়, সেইরূপ চিন্তা-স্রোতও আপন প্রভাব মস্তিষ্কের উপর কতকটা স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিয়া দেয়। ফলে রক্তাধিক্য প্রভৃতি কোন স্থূল কারণে মস্তিষ্কে আলোড়ন উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বাভ্যস্ত স্পন্দন সমূহের পুনরাবৃত্তি হয়। নিদ্রিত বা অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় এই সকল স্পন্দনগুলিকে শাসন করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তখন আমরা অনেকটা তাহাদের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা স্বরূপ হইয়া পড়ি, তাহারা আমাদিগকে যাহা দেখায় আমরা তাহাই দেখিয়া থাকি। বলা

বাহুল্য এরূপ স্বপ্ন দর্শনে কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি যথেষ্ট আছে। ইহা বাস্তবিকই অসার, ভিত্তিশূন্য ও অলীক। ইহা ভোজবাজী মাত্র, আর কিছুই নহে। স্থূল ইন্দ্রিয়গণই ইহার দ্রষ্টা, স্থূল দেহ যথার্থ নিদ্রিত হইলে এরূপ স্বপ্নদর্শন সম্ভব নহে। অতএব 'নিদ্রাকালে' যাহা দর্শন করা যায় তাহাই যদি 'স্বপ্ন' হয়, তাহা হইলে ইহাকে 'স্বপ্ন' নামে অভিহিত করাতে বিশেষ আপত্তি আছে।

যথার্থ স্বপ্নসমূহ কামময় দেহস্থ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থূল দেহের স্থূল ইন্দ্রিয়গণ সুনিদ্রিত হইলে কামময় দেহের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ বিশেষরূপে সজাগ হইয়া উঠে ও ভুবর্লোক হইতে নানা তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। এই সকল তথ্য ইহলোকে স্থূল ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক সংগৃহীত ঘটনানিচয় হইতে কম সত্য নহে। উভয়ই "প্রত্যক্ষ" ঘটনা। পরন্তু ভুবর্লোকে যাহা আমরা দেখি তাহা অধিকতর বিশ্বাস্য। কারণ ভূর্লোকে জ্ঞানসঞ্চয়ের পথে যে সকল বাধা বিদ্যমান তাহার অনেকগুলি ভুবর্লোকে নাই। এই মনে করুন, ইহলোকে সত্য তথ্য নির্দ্ধারণের পথে একটী প্রধান বাধা,—দূরত্ব। ভুবর্লোকে এ বাধার অস্তিত্ব নাই। সেখানে আপনাকে পোষ্ট-আফিস বা টেলিগ্রাফ-আফিসের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা করিলেই আপনি তথায় যে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সেখানে পক্ষপাতী বিকৃতবুদ্ধি "রয়টার" বা একদেশদর্শী অজ্ঞানতা-ভরা "সংবাদ পত্র" কর্তৃক মোহান্ধকারে আবৃত হইবার ভয় আপনার নাই। ইহলোকের অর্দ্ধেক ভ্রমের জনয়িতা 'জনরব' সেখানে উৎপন্ন হইবার অবসর পায়না। সুতরাং সত্য নিরূপণ সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

বলিতে পারেন, ভুবর্লোকের সংবাদ লইয়া ভূর্লোকবাসীর লাভ কি? এই যে মঙ্গল গ্রহের ভিতর কয়টা খাল আছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য জন কয়েক বৈজ্ঞানিক বিষম গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে ইহলোকের ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি? ইহার উত্তর এই যে, মঙ্গলগ্রহের সহিত পৃথিবীর যেরূপ সম্বন্ধ, ভূর্লোকের সহিত ভুবর্লোকের সেরূপ সম্বন্ধ নহে। মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর সম্পূর্ণ বাহিরে;

ভুবর্লোক ভূর্লোকের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শুধু তাই নয়। ভূর্লোকের একটা আদর্শ, একটা সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি ভুবর্লোকে বিদ্যমান। সুতরাং ভূর্লোক সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান ভুবর্লোক হইতে সংগ্রহ করা যায়। অপিচ কোন ঘটনা ভূর্লোকে ঘটিবার পূর্ব্বে ভুবর্লোকে তাহার ছায়াপাত হয়। আগে কামনা পরে কার্য্য। ভুবর্লোকের সূক্ষ্ম ছবিই ভূর্লোকে স্থূলতর হইয়া ফুটিয়া উঠে। সুতরাং ভুবর্লোক হইতে ভূর্লোকের তথ্য সমূহ চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইবার পূর্ব্বেই অবগত হইতে পারা যায়।

আমরা শুদ্ধ চর্ম্মচক্ষের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করি, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। চর্ম্মচক্ষের ভ্রম এই সকল যন্ত্রের দ্বারা বিদূরিত হয়। কিন্তু এই সকল পার্থিব যন্ত্রের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সে গুলিও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণের তুলনায় শৈশবসঙ্গী সামান্য ক্রীড়নক ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না। এক্ষণে বুঝুন, যিনি ইহলোকে জাগ্রত অবস্থায় এই সকল ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত জ্ঞানের অধিকারী, তাঁহার অবস্থা কত উন্নত। মহা বৈজ্ঞানিকেরাও তাঁহার নিকট শিশু মাত্র।

এইরূপ ব্যক্তির চেতনার কখন বিচ্ছেদ হয় না। আমরা জাগ্রত অবস্থায় চেতন থাকি, নিদ্রিত অবস্থাতেও চেতন থাকি ; কিন্তু উভয় চেতনার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, যেন 'জাগ্রত আমি' একজন, 'নিদ্রিত আমি' আর একজন। আমি সমস্ত দিন কার্য্য করিয়া রাত্রে নিদ্রা গেলাম, সকাল বেলা উঠিয়া দেখিলাম নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যতটুকু বিজ্ঞ ছিলাম ততটুকুই আছি, এক পদও অগ্রসর হই নাই। কিন্তু যিনি জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রিত অবস্থায় লব্ধজ্ঞান বিস্মৃত হন না তাঁহার জীবন ওরূপ দ্বিমুখ নহে। বৈজ্ঞানিক যেমন এক যন্ত্র ছাড়িয়া যন্ত্রান্তর ব্যবহার করেন এবং উভয় যন্ত্র দ্বারা লব্ধজ্ঞানের সমষ্টি করিয়া নানাবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তিনিও সেইরূপ জ্ঞান লাভার্থে কখন স্থূল দেহ, কখন কামময় দেহ অবলম্বন করেন। কিন্তু যখনই যে দেহ অবলম্বন করেন, জানিয়া শুনিয়া সম্পূর্ণ সজ্ঞান ভাবেই করিয়া থাকেন। তাঁহার জাগ্রত জীবন ও নিদ্রিত জীবন পরস্পর দৃঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ,—পরস্পরের সহায়, পরস্পরের নিয়ামক।

এই অবস্থায় মৃত্যুভয় সহজেই দূর হইয়া যায়। অপরিচিতকেই ভয়, পরিচিতকে ভয় কি? আজন্ম এই স্থূল দেহে বাস করিতেছি, বরাবর ইহাকেই আশ্রয়স্থল বলিয়া জানি, এই গৃহ ভাঙ্গিয়া গেলে কোথায় গিয়া দাঁড়াইব জানিনা; সুতরাং এই দেহকে ধ্বংসোন্মুখী দেখিলে মনে স্বভাবতই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। যদি বুঝিতে পারি এ আবাস-গৃহ বিনষ্ট হইলেও নিরাশ্রয় হইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিতে হইবে না, যেমন ছিলাম তেমনই থাকিব, বা ইহা অপেক্ষা আরও ভাল অবস্থায় থাকিব, তাহা হইলে এ ভিটা-টুকুর জন্য আর সেরূপ মায়া থাকে না। এখন আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে মৃত্যুর পর কেবল অন্ধকার দেখি তাই মৃত্যুকে এত ভয় হয়। 'নিদ্রা'কে ভয় হয়না, কারণ তন্নিবন্ধন আমাদের চির পরিচিত আশ্রয়বৃক্ষ উৎপাটিত হয় না। নতুবা 'নিদ্রা' ও 'মৃত্যু'র মধ্যে অন্য প্রভেদ নাই। বলিতে গেলে, প্রতি রাত্রেই আমাদের মৃত্যু হয়, কারণ ভূর্লোক পরিত্যাগ করিয়া ভুবর্লোকে গমনের নামই মৃত্যু। "মৃত্যু" ও "পরলোক গমন" একার্থ-বোধক। "জাগ্রত আমি"র সহিত এই পরলোকের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাই সে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ বিভীষিকা কল্পনা করিয়া বসে। আমার নিত্য পরলোক ভ্রমণের বৃত্তান্ত জাগ্রত অবস্থায় যদি আমার অজ্ঞাত না থাকে, তাহা হইলে আর আমি পরলোককে ভয় করিব কেন? সে যে তখন আমার পরিচিত দেশ, আমার নিত্য বিহারভূমি, আমার প্রাত্যা-হিক শিক্ষালয়,—সেখানে যাইতে শঙ্কা হইবে কেন? এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের সহিত আমার প্রকৃত সম্বন্ধ কি এবং তাহার মূল্যইবা কতটুকু, তখন আমার তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। তখন বেশ বুঝিতে পারি যে এই ক্ষুদ্র ধ্বংসপ্রবণ ভিটাটুকুই আমার একমাত্র সম্বল নহে, অন্যত্রও আমার বিস্তীর্ণ সম্পত্তি আছে। এইরূপে যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কোটীপতি আমি একটা কাণা কড়িকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাহার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আছি তাহা অন্তর্হিত হইবার সূত্রপাত হয় এবং আমি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জীবনের সম্মুখে যে কত বড় মহত্তর অনন্ত প্রসারিত জীবন পড়িয়া আছে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। সাধারণ অজ্ঞ মনুষ্যের চক্ষে যে আকাশ কেবল মাত্র একখানা সুন্দর চন্দ্রাতপের সহিত তুলনীয়, পৃথিবীর অন্ধকার দূর

করিবার জন্য গোটা কয়েক প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখাই যাহার কার্য্য, সেই আকাশই বৈজ্ঞানিকের চক্ষে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের আধার; তাহার কারণ বৈজ্ঞানিকের যে চক্ষু খুলিয়াছে, অজ্ঞ লোকের সে চক্ষুর এখনও উন্মেষ হয় নাই। সেইরূপ ভুবর্লোকদর্শনক্ষম ব্যক্তি যেরূপ ভাবে জীবন উপলব্ধি করেন, আমরা তাহার কণামাত্রও পারি না।

মৃত্যুকে আমরা আর এক কারণে ভয় করি। মৃত্যু যে কেবল আমাদিগকে অনির্দ্দিষ্ট অপরিচিত দেশে নির্ব্বাসন করিবার ভয় দেখায় তাহা নহে, মৃত্যু আমাদের আত্মীয়-বিচ্ছেদও ঘটায় কিন্তু যিনি আপনার জাগ্রত চেতনার জ্ঞাতসারে ভুবর্লোকে বিচরণ করেন, তাঁহাকে আত্মীয়-বিয়োগ জনিত দুঃখে কাতর হইতে হয়না, কারণ, তাঁহার পক্ষে "মৃত আত্মীয়"গণ মৃত নহে, প্রবাসী মাত্র; আর তাও খুব দূর প্রবাসী নহে, ইচ্ছা করিলেই তিনি ভুবর্লোকে গিয়া তাহাদের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম প্রশ্নটি মীমাংসিত হইল অনন্তর দ্বিতীয় প্রশ্নটীর মীমাংসার অবসর। দেহী জীব শক্তি না শক্তিমান্? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যে দেহের সৃষ্টিস্থিতি নিয়মনাদির উপপাদনার্থ জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়া সমন্বিত যে দেহী জীব স্বীকৃত হইলেন, তিনি সেই দেহের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সমর্থ কিনা? তিনি সমর্থ হইলে, আর তাঁহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়া সমন্বিত চিদ্বস্তুর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। আর তিনি যদি সমর্থ না হন, তবে তাহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়া সমন্বিত চিদ্বস্তু বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়।

অবদারি অনুজীবের যে সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তাহা সর্ববাদি-সম্মত। এই নিমিত্তই বেদান্তসূত্রে অনুজীবের জগৎব্যাপার বা জগৎ কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। মায়াধীন অনুজীবের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব অসম্ভব বিধায় প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক মায়াধীশ বিভু চৈতন্যের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। তিনিই শক্তিমান পুরুষ, জীব জড়াত্মক জগৎ তাঁহারই শক্তি বৈচিত্র্য জীবাদি সর্বশক্তি সমন্বিত সেই পুরুষই এই জীবজড়াত্মক জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনিই এই সৃষ্ট জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ঐ পুরুষ। তিনিই শক্তিবর্গের মূলাশ্রয়। তিনিই শক্তিমান্; শক্তিসকল তাঁহার বিশেষণ। তিনিই পরমব্রহ্ম—পরমাত্মা। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাঁহারই আবির্ভাব ভেদে নাম ভেদ মাত্র। তিনি সূর্য্য-স্থানীয়। জীব সকল তাঁহার মণ্ডল বহিশ্চর কিরণ পরমাণু স্থানীয়। মণ্ডল বহিশ্চর কিরণ পরমাণু সকল স্বরূপতঃ সূর্য্যেরই অংশ বলিয়া সূর্য্য বলিয়াই গণ্য হইতে পারেন। তদ্রূপ অণুজীবাত্মা সকলও বিভু পরমাত্মারই শক্ত্যংশ বলিয়া নিজাংশ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন, "সোহহম্"—আমি সেই বস্তু। কিরণ পরমাণু সকল যেমন সূর্য্যাংশ বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, অনুজীবাত্মা সকলও তদ্রূপ পরমাত্মার শক্ত্যংশ বলিয়া পরমাত্মার ন্যায় জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়াবিশিষ্ট। জীবন যখন বহির্ম্মুখ অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের গ্রহণে উন্মুখ হয়েন, তখন তাঁহার ক্রিয়াবৃত্তির প্রকাশ হয়, তিনি যখন অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ বহির্ম্মুখতার পরিবর্ত্তনে উন্মুখ হয়েন, তখন তাঁহার ইচ্ছা বৃত্তির প্রকাশ হয়। অব তিনি যখন শান্ত বা কৃষ্ণনিষ্ঠ হয়েন, তখন তাঁহার জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশ হয়। এই তিনটী বৃত্তি তাঁহার স্বাভাবিকী। তাঁহার অস্তিত্বের সহিত উক্ত বৃত্তিত্রয়ের অস্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য। জীবের সত্তার সহিত উক্ত বৃত্তিত্রয়ের সত্তাও অবশ্য স্বীকার্য্য। জীবের সত্তা কেহই অস্বীকার করেন না। 'আমি আছি' ইহা কেহই অস্বীকার করেন না; 'আমি নাই' ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না। কারণ আত্মার সত্তা সকল তর্কের অতীত। উহা সর্বানুভব সিদ্ধ। উহা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না।

সকল প্রমাণই আত্মসত্তাসাপেক্ষ। আত্ম-সত্তা স্থির হইলে, সঙ্গে

সঙ্গেই উহার বৃত্তিত্রয়ের সত্তাও স্থির হইতেছে। কারণ, 'আমি আছি' আত্মার জ্ঞানবৃত্তির প্রমাণ; ইচ্ছা ও ক্রিয়া জ্ঞানেরই প্রকাশ বিশেষ মাত্র। অতএব আত্মাস্তিত্বের সহিত আত্মবৃত্তি জ্ঞানাদিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানাদি সমন্বিত হইলেও নিজের অণুত্ব ও বহিশ্চরত্ব হেতু বিভু আশ্রয় তত্ত্বের জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত অনাদি কাল হইতে বহির্মুখ অর্থাৎ পরতত্ত্বে বিমুখ। এই পরতত্ত্ব বৈমুখ্যই জীবের ছিদ্র। এই ছিদ্র দ্বারাই মায়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। মায়ার প্রবেশে জীবের স্বরূপ জ্ঞান আবৃত হইয়া যায়। স্বরূপ জ্ঞানের আবরণে তাঁহার কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটিলেই মায়া জীবকে প্রকৃতিগুণ দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক দণ্ডার্হ ব্যক্তির ন্যায় বিবিধ সংসার-দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই জীবের তাপত্রয়ের কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, —

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

সংসারচক্রে ভ্রমণকারী জীবের ঈশ্বরবৈমুখ্য স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক ঈশ্বরবৈমুখ্যই আবার তাহার মায়াধীনের হেতু, অর্থাৎ জীব স্বভাবতঃ ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াই মায়ার অধীন হইয়াছে। ঈশ্বরবিমুখ জীবকে মায়া আবরণ করিয়া থাকেন। মায়ার আবরণে জীবের ঈশ্বরবিস্মৃতি উপস্থিত হয়। ঈশ্বর স্মৃতি বহির্ভূত হইলেই জীবের স্বরূপের জ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া যায়। আত্ম স্বরূপের জ্ঞান অন্তর্হিত হইলে বিপর্য্যয় ঘটে। বিপর্য্যয় বলিতে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহে পর পর আত্মাভিমান ও তদনন্তর তাহাতে অভিনিবেশ। সত্ত্বগুণপ্রধান কারণ শরীরে আত্মার জ্ঞান শক্তির প্রকাশ

দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের কারণ শরীর দ্বারা বন্ধন হয়। রজোগুণপ্রধান সূক্ষ্ম শরীরে আত্মার ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা বন্ধন হয়। আর তমোগুণ প্রধান স্থূল শরীরে আত্মার ক্রিয়া শক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের স্থূল শরীর দ্বারা বন্ধন হয়। উক্ত বন্ধনই জীবের তাপ-ত্রয়ের মূল। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি দেহ বন্ধনের ভয় হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত গুরুতে দেবতা বুদ্ধি ও প্রিয়তা বুদ্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন।

"সাধু শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়"।

পরমেশ্বর জীব সকলের পরমাশ্রয় হইলেও জীবগণ পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া পরমেশ্বরকেও ভুলিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জ্ঞানও হারাইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন যে আত্মবিষয়ক অজ্ঞান তন্নিমিত্ত জীবসমাজে 'আত্মা আছেন ও আত্মা নাই' এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। উক্ত বিভিন্ন মতবাদের খণ্ডনার্থ জীবগণ পরস্পর ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকেন। এই বিবাদ নিস্ফল হইলেও উহা সহসা নিবৃত্ত হয়না। তাদৃশ বিবাদের সহসা নিবৃত্তি হয় না বলিয়াই তন্নিমিত্ত পরম কারুণিক সাধু ও শাস্ত্র সকল তাঁহাদিগকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল উপদেশ হইতে জীবগণ প্রথমতঃ ইহাই বিদিত হয়েন যে, তাঁহারা জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশালী চিন্ময় পুরুষ এবং পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগৎ জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়া রহিত জড় বস্তু; কারণ জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া তাঁহাদেরই, জড় জগতের নহে। পরিশেষে তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারেন যে, কি পিণ্ডাণ্ড কি ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে অবস্থিত হইয়া বা যাহার সাহায্য তাঁহারা জানিতেছেন বা ইচ্ছা করিতেছেন অথবা ক্রিয়া করিতেছেন, উহা তাঁহাদের আয়ত্তাধীন নহে, পরন্তু কোন এক অচিন্ত্যশক্তি পুরুষের শক্তিদ্বারা নিয়মিত। এইরূপে যখন আত্মার অবধিত্ব, দ্রষ্টৃত্ব, জাগ্রদাদ্যবস্থার সাক্ষিত্ব ও প্রেমাস্পদত্ব এবং অপরের আগমাপায়িত্ব, দৃশ্যত্ব সাক্ষ্যত্ব অর্থাৎ জাগ্রদাদ্যবস্থা বিশিষ্টত্ব ও দুঃখাস্পদত্বের সহিত আত্মার আত্মা পরমাত্মার পরমাশ্রয়ত্ব অবধারিত হয়, তখনই তাঁহারা

কৃষ্ণোন্মুখ হয়েন। যে জীব সৌভাগ্য ক্রমে একবার কৃষ্ণোন্মুখ হয়েন, তিনি নিস্তার পাইয়া থাকেন।

মহা-যজ্ঞ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥—গীতা-৩,১০
যজ্ঞসহ প্রজাগণে করিয়া সৃজন,
কহিলেন প্রজাপতি, শুন প্রজাগণ,
এ যজ্ঞে বর্দ্ধিত হোক আত্মা তোমাদের,
ইহাতে অভীষ্ট লাভ হোক সকলের।—

আমরা বুঝিলাম যে এক মহা যজ্ঞে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই মহাযজ্ঞের উপর তাহার স্থিতি ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে। অতএব এই উন্নতিশীল বিশ্বের প্রতি পাদক্ষেপে এই যজ্ঞের সাধন হওয়া উচিত। জীব একদেহ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, —অপর দেহে আপনাকে বিকাশ করিবে বলিয়া, আবার যেমন জীব এক দেহ ত্যাগ করিতেছে, সেই দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। তাই যাঁহারা প্রকৃতির দিক দিয়া দেখেন তাঁহাদিগের চক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ড এক মহা শ্মশান বলিয়া মনে হয়; কিন্তু অপর দিক দিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হইবে যে অমর জীবাত্মা দেহ হইতে দেহান্তর কেবল আপনার বিকাশ সাধন করিবার জন্যই লইতেছেন। তাঁহারা কেবল প্রাণের উত্থান-গান শুনিতে পান। কোটী কোটী জন্মের অবসানে মানবহৃদয়ে এই মহাযজ্ঞনীতি প্রতিফলিত হয়—মানব বুঝিতে পারে এই যজ্ঞের উপর বিশ্বের উন্নতি নির্ভর করিতেছে; ইহার উপর তাহার আপন অভিব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। সে বুঝিতে পারে দেহের পাতে প্রাণের প্রসার হয়, অতএব সে আর পরের তরে আপনাকে বলিদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, যে শিক্ষা আপনা হইতে লাভ করিতে মানবের এতগুলি জন্ম আবশ্যক সেই শিক্ষা আমরা মহাপুরুষদিগের জন্ম-

কল্পায় অনেক পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। মানবজীবনের শৈশব হইতেই এই মহাপুরুষগণ আমাদিগের নিকট আসিয়া, আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া এই যজ্ঞনীতির আবশ্যকতা শিখাইয়া আসিতেছেন, এবং আমাদিগের দৈনিক আচার ব্যবহারে, আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, এমন ভাবে তাহা মিশাইয়া দিয়াছেন, যাহাতে আমাদিগের তাহা অনুসরণ করিতে বিশেষ দুঃখ পাইতে হয় না।

তাঁহারা এইরূপ সহজ ভাবে না শিখাইয়া, একেবারেই মনুষ্যকে আপনার সমস্ত প্রিয় জিনিষকে ছাড়িতে যদ্যপি শিক্ষা দিতেন ;—তাঁহারা যদি বলিতেন যাহা তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে এবং এই ত্যাগের বিনিময়ে কিছুই পাইবেনা, তাহা হইলে কে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করিত? কেহই নহে।

তাঁহারা ধীরে ধীরে মনুষ্যকে আপন ইচ্ছায় আপনার সুখ, আপনার বাসনার, আপনার প্রিয় আকাঙ্ক্ষিত ত্যাগ করিয়া, পরের তরে আপন উৎসর্গ শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা শিখাইলেন, মানব স্বাধীন জীব নহে, সে এই বিশ্বের অনন্ত প্রাণী-পারাবারে এক বিন্দু জল,—সে অনন্ত জীব শৃঙ্খলের একটী ক্ষুদ্র অংশ সুসম্বদ্ধিত ও পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। আমাদিগের স্থূলদেহ ইতর প্রাণীদিগের জীবনের উপর, উদ্ভিদের উপর, পৃথিবীর উপর নির্ভর করিতেছে।

মনুষ্যের দৈনিক আহার ও আবশ্যক সামগ্রী বিচার করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে মানব দেহ ধারণ ও বর্দ্ধন কি রূপে ধাতবাদি পদার্থের উপর, ধান্যাদি উদ্ভিদের উপর ও দুগ্ধাদি প্রাণিজের উপর, নির্ভর করিতেছে। অতএব যখন আমরা এত গুলির উৎসর্গে বর্দ্ধিত ও পরিপোষিত, যাহাতে অপরের কল্যাণ হয় এই রূপ উৎসর্গ আমাদিগেরও করা কর্ত্তব্য। অপরে যেমন মানবকে পোষণ করিতেছে, মানবেরও অপরকে সেই প্রকার করা উচিত। ভুবর্লোকের সত্ত্বাদিগের উদ্যম আমাদিগের কল্যাণে প্রয়োজিত হয়। অতএব আমাদিগেরও যজ্ঞদ্বারা তাহাদিগের নষ্ট শক্তির পুনঃসঞ্চার করিয়া দেওয়া উচিত।

আমাদিগের শাস্ত্রে সেই জন্য যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে—এবং এই-সকল বৈদিক ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি করণ রূপ বা নষ্ট শক্তির উদ্ধার রূপ

কার্য্য অতি সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়। আবার আমরা গীতার অমর বাক্য উদ্ধৃত করিব।

দেবান্ ভাবয়তানেন তেদেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫
—গীতা—তৃতীয় অধ্যায়

দেবগণ তুষ্ট হন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে,
তোমারা সকলে যজ্ঞ কর মন প্রাণে,
এই যজ্ঞ কর সবে দেবতা-বর্দ্ধন,
দেবগণ করিবেন মঙ্গল সাধন;
পরস্পর সংবর্দ্ধন হোক তোমাদের,
পরম মঙ্গল তাহে হবে সকলের।১১
যজ্ঞেতেই পরিতৃপ্ত হলে দেবগণ,
করিবেন তোমাদের অভীষ্ট পূরণ,
দেবদত্ত দ্রব্য দেবে না করি অর্পণ,
ভোগ করে যেই,তার চৌর্য্য আচরণ।১২
যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভাগ করিয়া ভোজন,
সর্ব্ব পাপ হতে মুক্ত হন সাধুগণ,
কিন্তু যারা পাক করে আপনার তরে,
পাপই ভোজন সেই পাপিগণ করে ১৩
অন্ন হ'তে সমুৎপন্ন জীব সমুদয়,
অন্ন জন্মে বৃষ্টি হ'তে যজ্ঞে বৃষ্টি হয়;। ১৪
কর্ম্ম হ'তে যজ্ঞ হয়, বেদ হ'তে কর্ম্ম,
ব্রহ্ম হ'তে বেদ, তাই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম;
সর্ব্বদাই সেই ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত,
এই চক্র জানি জ্ঞানী ব্রহ্মে নিয়োজিত। ১৫ (ক্রমশঃ)

শ্রীপন্থা-সেবক

শ্বেতসরোজোৎসব।

(পরাবিদ্যা সমিতির কলিকাতাস্থ "মদন-মোহন" শাখার শ্বেতসরোজোৎসব উপলক্ষে পঠিত।)

সপ্তদশ বৎসর গত হইল এই দিবসে ব্রহ্মবাদিনী 'হেলেনা' দুইটী বস্তু রাখিয়া তাঁহার ভৌতিক দেহ-ত্যাগ করেন। সেই দুইটী বস্তুর মধ্যে একখানি তাঁহার অপ্রকাশিত গুপ্ততত্ত্ব-কথার তৃতীয় পুস্তক (The Secret Doctrine, Vol III) এবং অন্যতর তাঁহার শেষ অভিলাষ-পত্র। তাঁহার শেষ অভিলাষ মতে সর্ব্ব পরাবিদ্যা-সমিতির সভ্যগণকে এই দিবসে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ও Light of Asia পড়িতে হয়।

আজি শ্বেতসরোজোৎসব। ঋষিদুহিতা মহামতী মাতা হেলেনার জগৎ-হিতার্থে একটী মানবজনমের অবসানের দিন--উচ্চতর উদ্দেশ্যে তাঁহার পার্থিব দেহের বিসর্জ্জনের দিন। যেমন অগ্নিতে উৎসর্গীকৃত হবিঃ দেবসেবার উপযোগী হয়, সেইরূপ মানবকল্যাণে উৎসৃষ্ট জীবন, অনন্ত দেবের নিকটে পৌঁছায় এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের করুণা-তরঙ্গের ও প্রেম-প্রবাহের বাহক হয়।

যে রমণী, শৈশব হইতে আজীবন, প্রতি মুহূর্ত্তে পরার্থে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন, আপনার সাংসারিক সুখ, দেহের শান্তি, বুদ্ধির ও জ্ঞানের বিশালতা প্রত্যেকটীই তাঁহার ঋষিপিতার ও গুরুদেবের চরণে ভক্তিপুষ্পের মত অঞ্জলি দিয়া আসিয়াছেন, শেষে অকাতরে, স্মিতমুখে, তাঁহাদিগের আদেশে আপনার দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার আমাদিগের প্রতি গভীর স্নেহ ও অনুকম্পা প্রযুক্ত যে মহান উৎসর্গ সেই জীবন বিসর্জ্জন, যাহার ফলে আজ এই পরাবিদ্যা সমিতি জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং মহাপুরুষদিগের দৈব শক্তি ধারণে সমর্থ হইয়াছে সেই মহান বিসর্জ্জনের দিনে আমাদিগের মন স্বতই তাঁহার দিকে ধাবিত হয়, এবং আমাদিগের অপরিস্ফুট জীবনও তাঁহার জীবনের বিসর্জ্জনের বিজয়বাদ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সেই বিসর্জ্জনের সুখ অনুভব করে; সংসার ও ইন্দ্রিয়াসক্ত আমাদিগের ক্ষুদ্র প্রাণ, কিয়ৎ পরিমাণে যেন পৃথিবীর মোহকরী ক্রীড়া হইতে ফিরে ও ফিরিয়া যেন অনন্তের দিকে ছুটিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার দৈব পীযূষ উপভোগ করিতে থাকে।

ক্ষুদ্র আমাদিগের এইরূপ ক্ষুদ্রচিন্তা মিলিয়া অন্তর আকাশে একটী বিসর্জ্জন-মূর্ত্তি সৃষ্টি করে এবং তাহাতে তাঁহার তেজো-জ্যোতিঃ হইতে বিচ্ছুরিত মহতী,

শক্তি আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মানবের উপর আশীর্ব্বাদের মত বিমল অনুগ্রহ ও দয়া বিকীরণ করে। নাস্তিকতার কঠিন দিনে, মানব জন্মান্তর বিশ্বাস করে না ; পাপ পুণ্য বিচার করে না ; দেবতার অস্তিত্বে ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে আস্থাবান হয় না। কাম যে পথে লইয়া যায় তাহারা অতিশয় দম্ভে সেই পথে যায়, দেবতা হারাইয়া অসুর শক্তির বশীভূত হয়।

তাই আমাদিগের গুরুদেব আমাদিগকে এই ভ্রম হইতে উদ্ধার করিতে, আমাদিগকে রক্ষা করিতে, আমাদিগের হৃদয়-পদ্মে দৈবশক্তির বীজমন্ত্র বপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যত্নে ও অনুগ্রহে প্রতিপালিত, শত জন্মের প্রিয় শিষ্য ও দুহিতা অমলা সরসিজ-বাণী, মাতা হেলেনাকে প্রেরণ করিযাছেন। মাতা আমাদিগের—শ্বেত কমলের উপর বসিয়া আছেন- তাঁহাকে ঘেরিয়া পুণ্ডরীক দলে দলে শোভা পাইতেছে। সিতাম্ভোজ শ্রীকৃষ্ণের নাভি হইতে উত্থিত ; ব্রহ্মা শ্বেত-পদ্মের কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত ; শ্বেত সরসিজ বেদ অধিষ্ঠাত্রী ভারতীর ক্রীড়া স্থান ; শ্বেতপদ্মের আর এক নাম শম্ভুবল্লভ ; আবার তাহা ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি-সিঞ্চিত এবং রাসবিহারীর চরণপূত। গুহ্য বিদ্যার অতি গূঢ় কথা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ হইবার নহে। গুরুদেব বৈখরি ভাষায় তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে শিক্ষা দেন না। শিষ্য আপনার মানসের অতি দুরূহ সন্দেহের মীমাংসা প্রত্যক্ষীভূত করেন। সেই মীমাংসা আমাদের নিকট রূপকের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাই Symbolism এর সৃষ্টি-কারণ। এই শ্বেতপদ্মেও গূঢ় রহস্য আছে এবং হেলেনার শেষ অভিলাষ—তাঁহার মৃত্যু বাসরকে শ্বেতসরোজোৎসব বলা হইবে তাহারও কারণ আছে। বিমল রবিকরে পদ্ম বিকশিত হয় নির্ম্মল পবনে তাহার গন্ধ বিকীর্ণ হয় এবং স্বচ্ছ থাকিলে তবে সলিল তাহার প্রতিবিম্ব ধারণে সমর্থ হয়। আবার তাহার জন্ম পঙ্কে হইলেও ইহা তথায় বিকশিত হয় না, ইহার দেহ সলিলে নিমজ্জিত থাকিলেও তথায় ইহার স্ফূর্ত্তি নাই ; ইহার বিকাশ রবিকররূপ আধ্যাত্মিক রশ্মিতে। ইহা পঙ্করূপ স্থূল লোকের সামগ্রী নহে, তথাচ তাহার উপর তাহার স্ফূর্ত্তি নির্ভর করে, সলিলরূপী সূক্ষ্ম লোকের ইহা সামগ্রী নহে, অথচ বিমল সলিল না থাকিলেও ইহা জন্মায় না এবং অচঞ্চল নির্ম্মল মনোরূপী সলিলেই ইহার প্রতিবিম্ব পড়ে। কেবল পবনরূপী বুদ্ধিতত্ত্বেও ইহাঁর বিকাশ হয় না ;- ইহার স্ফূর্ত্তি আধ্যাত্মিক বা দৈব-প্রকৃতিরূপী সূর্য্য-রশ্মিতে। আবার

তন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রস্ফুটিত পদ্মের আকার ধারণ করে; তাই পদ্মে ব্রহ্মার বাস; পদ্মে বীণাপাণির বিহার; ভক্তের হৃদ্‌পদ্মে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিহার। পদ্ম চারি বর্ণের—রক্ত, নীল, কনক ও শ্বেত। রক্তের সহিত ভুবর্লৌকিক, নীলের সহিত মানসিক, কনকের সহিত বুদ্ধি সম্বন্ধীয় চিন্তার সম্বন্ধ, শ্বেত ইহারও উর্দ্ধে ইহা তামসিক, রাজসিক বা সাত্বিক নহে,—ইহা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ- ইহাতে তিনই আছে অথচ কিছুই নাই —ইহা প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা, ইহা দৈব প্রকৃতি ব্যঞ্জক। অতএব আমরা বুঝিতেছি, এই উৎসবে আমরা আত্মতত্ত্বের বা আত্মবিদ্যার বা Theosophyর উপাসনা করি আমরা মহাবিদ্যার, পাপবিনাশিনী দুর্গা দেবীর পূজা করি। দুর্গা, পূর্ব্বে দেবগণকে অসুর ভয় হইতে রক্ষা করিতে, আবির্ভূতা হন,—দুর্গ প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে পরাভূত করতঃ দেবগণকে স্ব স্ব আধিপত্য প্রদান করেন। দুর্গ বা দুর্গা শক্তিকেন্দ্র আমরা শুনিতে পাই তিব্বতে মহর্ষিদিগের শক্তিকেন্দ্রের সন্নিহিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে—দৈত্য, মহাবিঘ্ন, কর্ম্মবশে ভববন্ধ, শোক, দুঃখ, নরক, বারংবার জন্ম, দুর্গ শব্দের বোধক এবং "আ" হননার্থক—এই সমস্ত যিনি হনন করেন তিনিই দুর্গা। তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা বা Theosophy; তাহাই আমাদিগের স্নেহময়ী মাতা, আমাদিগের প্রতি অনন্ত করুণাবশতঃ তাঁহার শেষ অভিলাষ-পত্রে এই উৎসব প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন যে নৈতিক গ্রন্থের শীর্ষস্থানীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ Light of Asia এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা পূর্ণ শ্রীভগবানমুখনিঃসৃত গীতা গ্রন্থ যেন এই পুণ্য বাসরে সমস্ত ব্রহ্মবাদী পাঠ করেন। যেমন স্বচ্ছ, স্থির সলিল না হইলে পদ্মের নিটোল প্রতিবিম্বপাত হয় না, সেইরূপ মহানীতির দ্বারা মন পবিত্র ও স্থির না হইলে আধ্যাত্মিক প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়ে না। অতএব পূর্ব্বে Light of Asia পাঠের ব্যবস্থা, তাহার পরে গীতাপাঠ। ঋষি দুহিতা শ্বেতসরোজোৎসব উপলক্ষে দুর্গা পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন

যিনি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতির পূজ্যা, বন্দনীয়া, সনাতনী, নারায়ণী, বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবী ও বিষ্ণুভক্তিদাত্রী; যিনি কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কৃষ্ণ-স্তুতা, কৃষ্ণ-পূজ্যা ও রূপাময়ী, এস ভাই তাঁহাকে নমস্কার করি; যিনি স্রষ্টার সৃষ্টি বিষয়ে শিল্পস্বরূপা, পালন কার্য্যে পরমা সংহাররূপিণী,

এস তাঁহাকে আপনা ভুলিয়া আজি আমরা নমস্কার করি; যিনি শুম্ভ-ঘাতিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, পূর্ব্বে ত্রিপুর যুদ্ধকালে মহাদেব কর্তৃক সম্ভূতা, মধুকৈটভের যুদ্ধকালে বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী, নিখিল অসুর বিনাশিনী, রক্তবীজনাশিনী এস, ভাই আমরা তাঁহাকে ধ্যান করি। সেই হিরণ্যকশিপুর বধকালে, নৃশিংহের শক্তি স্বরূপা, হিরণ্যাক্ষ বিনাশকালে মহাবরাহের বারাহী শক্তিরূপিণী, পরমব্রহ্ম স্বরূপিণী দেবী দুর্গাকে ধ্যান করিলে আর অসুর-সংস্পর্শ-ভয় থাকিবে না, আর দুঃখ ত্রাস থাকিবে না। আর ব্রহ্মবাদিনী হেলেনা যিনি ভগীরথের মত দুষ্কর তপস্যা করিয়া এই দেবগঙ্গা মানব ত্রাণার্থে মর্ত্তে আনিয়াছেন—আমাদিগকে পাপে প্রলোভিত ও বিমোহিত অবলোকন করিয়া মানবের দুঃখে আপন কথা ভুলিয়া মানবসেবাই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্য হেতু জন্মে জন্মে সেই ব্রতে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন—সেই পরার্থ-প্রাণা বিদেশিনী হইলেও আমাদিগেরও নিকট পূজ্যা ও বরণ্যা। এস ভাই, সকলে মিলিয়া আজ পুণ্যবাসরে তাঁহাকেও হৃদয়ে রাখিতে চেষ্টা করি।

শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৫। তৃতীয় মহাদেশ (শাল্মলী দ্বীপ Lemuria) তৃতীয় মৌলিক-জাতি (দানব জাতি Lemurians Titans.)

(ক) শাল্মলী দ্বীপ।

ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন ঘটিল। উর্ম্মিমালার নীচে মা বসুমতীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তৃতীয় মৌলিক জাতি এবং তৃতীয় মহাদেশকে প্রসব করার জন্য মা বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার কটি ও নাভিদেশ জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিল। ইহা পবিত্র হিমাবত। মেখলা-স্বরূপ সমস্ত পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া আছে। প্লক্ষ মহাদেশের দক্ষিণে যে প্রকাণ্ড সমুদ্র ছিল, তাহা বর্ত্তমান গবি মরুভূমি, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়াকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপার জলরাশির দক্ষিণদিক হইতে

প্রকাণ্ড হিমালয় গিরি মস্তকোত্তোলন করিল। দক্ষিণদিকে স্থলভাগ দেখা দিল। তাহা হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ, সুমাত্রা, অষ্ট্রেলিয়া, টেস্‌মেনিয়া এবং ইষ্টার দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। পশ্চিমে মাডাগাস্কার এবং আফ্রিকার কতকাংশ ভাসমান হইল। নরওয়ে, সুইডেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাইবিরিয়া এবং কামসকাট্‌কা ইহারা দ্বিতীয় মহাদেশের অংশ ছিল; এই সকল দেশ সহ তৃতীয় মহাদেশ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিল। পুরাণে ইহাকে শাল্মলী দ্বীপ কহে। বিদেশীয় ভাষায় ইহার নাম লিমুরিয়া (Lemuria)। এই মহাদেশে সুপ্রসিদ্ধ তৃতীয় মৌলিক জাতি আবির্ভূত হইল। পুরাণাদিতে ইহাদিগকে দানব কহে। বিদেশীয় ভাষায় তাহাদিগকে লিমুরিয়ান কহে (Lemurians)। এই জাতিতে প্রথমে মানববুদ্ধির আবির্ভাব হইল।

কালসহকারে নানারূপ দৈব দুর্ঘটনায় এই মহাদেশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল; তাহাতে অনেক দ্বীপের সৃষ্টি হইল। আগ্নেয়গিরির উপদ্রব ও প্রবল ভূকম্প দ্বারা এই মহাদেশ সময় সময় খণ্ড খণ্ড বিভক্ত হইতে লাগিল। উত্তরে নরওয়ের দিকে ধীরে ধীরে স্থলভাগ জলমগ্ন হইতে লাগিল। তাহাতে এই পুরাতন দেশ কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হইল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের টার্সিয়ারির অন্তর্গত ঈওছিনি (The Eocene of the Tertiary) কাল বিভাগের সাতলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আগ্নেয় পর্ব্বতের ভীষণ অত্যাচারে মহাসাগরের তলদেশ বিদীর্ণ হইয়া গেল; তাহার গর্ভে এই শাল্মলী দ্বীপ নিহিত হইল। এই মহাদেশের অতীত ইতিহাসের সাক্ষিস্বরূপ কেবল তাহার অংশ অষ্ট্রেলিয়া ও মাডাগাস্কার, এই দেশদ্বয় বর্ত্তমান রহিল। ইষ্টার দ্বীপ জলমগ্ন হইয়া পুনরায় ভাসিয়া উঠিল।

দানবজাতির উন্নতির মধ্যাহ্ন সময়ে যে ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহাতে দ্বিতীয় জাতির অবশিষ্ট এবং তাহাদের বংশধর অর্থাৎ প্রাচীন দানবকুল বিনাশপ্রাপ্ত হইল। কালচক্রনেমির মেরুদণ্ড পরিবর্ত্তিত হইল, তাহাতে ঘোর অবস্থান্তর ঘটিল। এই মহাকায় জাতির মস্তকোপরি আর চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইল না। মানুষ প্রাণী ও উদ্‌ভিদ্ আকারে ক্ষুদ্র হইতে লাগিল। প্রবল তুষারপাতে দেশ ধবলাকার ধারণ করিল, এবং বনরাজির শ্যামল সৌন্দর্য্য ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া কালসহকারে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

মেরু প্রদেশে ছয় মাসকাল ব্যাপী দিনমান ও ছয়মাস ব্যাপী রাত্রিমান আরম্ভ হইল। কিছুদিনের জন্য প্লক্ষ মহাদেশের ধ্বংসাবশেষভাগে লোকসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু এই সকল উপদ্রব অতিক্রম করিয়া মেরুপ্রদেশে সেই সুপ্রসিদ্ধ, অক্ষয়, পবিত্র দেশ সুস্মিতমুখে চির বিরাজমান রহিল। ইহা পূর্ব্বোক্ত শ্বেতদ্বীপ।

প্রথম, মধ্য ও শেষ, এই তিন স্থূলভাগে তৃতীয় জাতিকে বিভাগ করা যায়। কেবলমাত্র আত্মার সংস্পর্শে প্রথম জাতিতে যেমন একত্ব, আত্মা-বুদ্ধি সংযোগে দ্বিতীয় জাতিতে যেমন দ্বিত্ব, সেইরূপ আত্মা-বুদ্ধি-মনঃ সংযোগে তৃতীয় জাতিতে ত্রিত্ব বিদ্যমান ছিল।

(খ) তৃতীয় জাতির সন্তানোৎপত্তি এবং বংশবৃদ্ধিক্রম।

দ্বিতীয় জাতির অভ্যুদয়ের শেষভাগে ঘর্ম্মবিন্দুবৎ কোমল পদার্থের ন্যায় জীবগণ মানবদেহ হইতে নির্গত হইত। তৃতীয় জাতীর অভ্যুদয়ের প্রথম-ভাগে এই কোমল দেহসকল ক্রমশঃ দৃঢ় ও গোলাকার হইল। "রবি তাহা-দিগকে উষ্ণ করিলেন, শশী তাহাদিগকে শীতল ও নির্দ্দিষ্টআকার বিশিষ্ট করিলেন এবং পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত বায়ু তাহাদের আহার যোগাইতে লাগিলেন"। কালে ঐ সকল কোমল দেহ দৃঢ় আবরণে আবৃত হইয়া ডিম্বাকার ধারণ করিল। ডিম্বের কঠিন আবরণের মধ্যে থাকিয়া সন্তান বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। তাহাদের স্ত্রী, পুরুষ, এই উভয় চিহ্ন একাধারে, এক দেহে বিদ্যমান থাকিত। ডিম্বের দৃঢ় আবরণ ভাঙ্গিয়া যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইত, তখন তাহাকে সবিশেষ পরিপুষ্ট দেখা যাইত, এবং পশু শাবকের ন্যায় জন্মলাভ করিয়াই মানবসন্তান ভ্রমণ করিতে এবং দৌড়িতে পারিত।

বর্ত্তমানে পক্ষীজাতি জননেন্দ্রিয় দ্বারা ডিম্ব প্রসব করে; এই ডিম্ব হইতে কালে শাবক জন্মে। কিন্তু এই তৃতীয় জাতির অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে, মানবদেহ হইতে ডিম্ব বহির্গত হইত; এই ডিম্বের মধ্যে থাকিয়া জীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত; কালপূর্ণ হইলে মানবসন্তান ডিম্ব ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াই বেড়াইতে ও দৌড়িতে পারিত। তখন তাহারা স্ত্রী পুরুষ এই উভয় জাতির চিহ্নধারী ছিল। তাহারা উভলিঙ্গ ছিল। এই জাতির মধ্যভাগে একজাতীয় চিহ্ন

অপর জাতীয় চিহ্নের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। শেষে এই ডিম্ব হইতে পৃথক পৃথক ভাবে পুত্র এবং কন্যা সন্তান জাত হইতে লাগিল। এই নিয়ম যতই চলিতে লাগিল, ততই কথিত নবজাত শিশুসন্তানগুলি ক্রমশঃ অসহায়াবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরে তাহারা ডিম্বের খোসা ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়ার অব্যবহিত পরেই আর পূর্ব্বের ন্যায় বেড়াইতে ও দৌড়িতে পারিত না।

বর্ত্তমানেও মনুষ্যভ্রূণ মাতৃগর্ভে বর্দ্ধিত হওয়ার কালে, এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ তাহা অতিক্রম করিতে থাকে। প্রথম মৌলিক জাতির ছায়াদেহ ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়; পরে তাহারা দ্বিতীয়-মৌলিক জাতির সূক্ষ্মসূত্রবৎ দেহ দ্বিতীয়াবস্থায় ধারণ করে; তৎপর স্ত্রী পুরুষ জাতীয় উভয় চিহ্ন একধারে ভ্রূণে বিদ্যমান দেখা যায়। তাহার পর তৃতীয় মৌলিক জাতিতে যেমন স্ত্রী পুরুষ চিহ্ন স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে, ঠিক সেই রূপ তাহার পরের অবস্থায় ভ্রূণে স্ত্রী বা পুরুষ চিহ্ন স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা ইহা স্ত্রী কি পুরুষ জাতীয় জীব তাহা জানা যায়। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মানবজাতির বর্ত্তমান উন্নতির সময়ে পুরুষদেহে অতি প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্মভাবে এবং অতি সামান্যাকারে স্ত্রীচিহ্ন এবং স্ত্রীদেহে এই রূপ পুংচিহ্ন অদ্যাপি ও বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে তাহা দৃষ্টি-শক্তির অগোচর।

আমাদের পুরাণাদিতে অনেক গল্প আছে, যাহা ইতিহাস হইতে ও সত্য; তাহাতে নানা রকমের অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব্ব নিয়মে সন্তান সন্ততি জাত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রহেলিকা এবং আজগবি বলিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। দক্ষ যজ্ঞের সময় ডিম্ব, বাষ্প, উদ্ভিদ্, লোম-কূপ হইতে, এবং সর্ব্বশেষ জরায়ু হইতে নানারূপ মানবের উৎপত্তি বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই তৃতীয় জাতির শেষ সময়ে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র স্ত্রীপুরুষ সংসর্গে সন্তান জাত হইতে আরম্ভ হইল। তখন মানস পুত্রগণ উপযুক্ত বোধে এই জাতিতে জন্মলাভ করিলেন।

এক কোটি আশি লক্ষ বৎসর গত হইল, এই জাতির মধ্য সময়ে মানব-

জাতিতে স্ত্রীপুরুষ লক্ষণ এবং তাহাদের পরস্পর ক্রিয়া পৃথক হইল, অর্থাৎ স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইল। এই রূপে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর বিভিন্ন হওয়ার পূর্ব্বে দেবগণ মানবরূপে রাজা মহারাজার ঘরে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যেও এক দেহেই স্ত্রীপুরুষ জাতীয় উভয় চিহ্ন বিরাজমান ছিল। তাহারা অতি প্রকাণ্ড দেহ হইলেও তাহাদের সেই দেহ সৌন্দর্য্যে, প্রতিভায় এবং কান্তি পুষ্টিতে অতুলনীয় এবং অনুপম ছিল। ধরাতলে তাহাদের আবির্ভাবের পর এবং স্ত্রীপুরুষ জাতি পরস্পরে বিভিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে সত্য যুগের অবসান হইল।

শুক্রের অধীনে এই তৃতীয় জাতির আদি ভাগ জন্ম গ্রহণ করে, উভলিঙ্গজাতি এই সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তা ভার্গবের তত্ত্বাবধানে উন্নত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লোহিতাঙ্গ মঙ্গলের তত্ত্বাবধানে স্ত্রীপুরুষ জাতি পৃথক ভাবে বিভক্ত হইল। কারণ তিনিই কামের প্রাতমূর্ত্তি রতিপতি কামদেব। তিনি ধরণী সুত, কার্ত্তিকেয়, কুমার ইত্যাদি নামে অভিহিত। তিনিই খ্রীষ্টিয় বাইবেলের আর্কেঞ্জেল মাইকেল (Michael)

(গ) তৃতীয় চক্ষু বা হরনেত্র।

তখনকার উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজগতের জীব জন্তুর ন্যায় মানুষ অতি প্রকাণ্ডকায় ছিল। তাহাদের দেহপরিমাণ সাধারণতঃ ৪০ হাত ছিল। অতি ভীষণ রাক্ষসাকৃতি জীবসকল তখন বর্ত্তমান থাকায় তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া মানুষকে জীবন ধারণ করিতে হইত। তৃতীয় জাতিতে দর্শনেন্দ্রিয় পরিস্ফুট হইয়াছিল। প্রথমতঃ ললাটের মধ্যভাগে একটী মাত্র চক্ষু সমুদিত হইল, তদ্দ্বারা দর্শনের কার্য্য চলিত। এই চক্ষুটী পরে ললাটদেশেই বিলীন হইয়া গেল। তাহার পর বর্ত্তমানের ন্যায় দুটী চক্ষু হইল। তৃতীয় চক্ষুটী কালে হরনেত্র বা শিবনেত্র নামে অভিহিত হইল। যোগীগণ সাধনবলে এই চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারেন; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাকে পিনিএল্ গ্লাণ্ড (Pineal gland) কহে। ললাটের চক্ষুটী অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া দুইটী চক্ষু হইল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রথম প্রথম বড় বিশেষভাবে দর্শনের কার্য্য চলিত না। প্রকৃত পক্ষে এই জাতির শেষ সময়ে এবং পরবর্ত্তী চতুর্থ জাতির

আরম্ভ হইতেই এই চক্ষুদ্বয় এখনকার ন্যায় দর্শনেন্দ্রিয়রূপে সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিতে লাগিল। এই তৃতীয় জাতির দেহ লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট ছিল।

যে সকল উভলিঙ্গ দেবগণ এই জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাভ লোহিতবর্ণবিশিষ্ট দেহ ছিল। এই বর্ণ এত প্রতিভাসম্পন্ন এবং উজ্জ্বল ছিল যে তাহা ভাষা এবং বর্ণনার অতীত। তাহাদের অনুপম দেহের অতুলনীয় ও স্বর্গীয় কান্তি এবং আভা, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠনের অনুরূপ ছিল। উজ্জ্বল সুবর্ণখচিত রক্তাভ রাজমুকুটের মধ্যভাগে যেরূপ দীপ্তিশালী মণিরত্নরাজি ধক্ ধক্ জ্বলিতে থাকে, ঠিক্ সেইরূপ একটী মাত্র চক্ষু তাহাদের ললাটদেশের মধ্যভাগে জ্বলন্ত আভায় উদ্ভাসিত হইত। এই অনুপম প্রভাসম্পন্ন স্বর্গীয় দেবমূর্ত্তিসকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আবার লোহিতবর্ণ, কদাকার, প্রকাণ্ড ও কর্কশদেহ নরনারীর প্রতি দৃক্‌পাত করিতে আদৌ ইচ্ছা হইত না। বাস্তবিক সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রী ও পুরুষ দেহ পরস্পর বিভিন্ন হওয়ার পর, তাহারা অতিশয় প্রকাণ্ড কর্কশদেহ, কদাকারই ছিল।

তাহাদের দেহ রাক্ষসের ন্যায় অতিশয় দীর্ঘ এবং সেই পরিমাণে স্থূল ছিল। এই অত্যুন্নত, প্রকাণ্ড বপুঃ অতুল ক্ষমতা এবং প্রবল পরাক্রম পরিচায়ক। দেহায়তন এবং বল বিক্রম সম্বন্ধে সেই জাতি এবং বর্ত্তমান মানবজাতির মধ্যে তুলনাই হয় না। পরস্পর আকাশ পাতাল প্রভেদ। হাতির সঙ্গে যেরূপ মূষিকের প্রভেদ, তখনকার প্রাণীজগতের সঙ্গে এখনকার প্রাণী-জগতের ততোধিক প্রভেদ।

তাহাদের অনুন্নত ললাটদেশের উপরিভাগ চাপা। জ্যোতিঃ এবং আভা-হীন একটী মাত্র রক্তবর্ণ চক্ষু তাহাদের চেপ্‌টা নাসিকার উপরিভাগে ঝিকিমিকি জ্বলিতে থাকিত। প্রকাণ্ড এবং মাংসল চোওয়াল দুইটী নীচের দিকে যেন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান রুচি অনুসারে এই সব আকার প্রকার বিসদৃশ ও কদাকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

গ্রীক জাতির ইতিহাসে এই তৃতীয় চক্ষুর বিবরণ পাওয়া যায়। তাহা-দের গ্রন্থে ইহার বিবরণ অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্‌কবি হোমারের রচিত "ওডেসি" (Odyssey) নামক মহাকাব্যে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, জগদ্বিখ্যাত ট্রোজান যুদ্ধের পর গ্রীস্ দেশীয় যুদ্ধবীর ইউলাইসিস (Ulysses) যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি পথে একচক্ষু বিশিষ্ট সাইক্লপসের Cyclops) ললাটস্থিত উজ্জ্বল চক্ষুটী নষ্ট করিয়া নিজ বুদ্ধির কৌশলে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, ইউলাইসিস্ চতুর্থ (আট্লান্টীয়ান জাতির অন্তর্গত দৈত্য এবং সাইক্লপ্স্ তৃতীয় (লিমুরিয়ান) জাতির অন্তর্গত দানব বিশেষ ছিল। গ্রীক্ জাতির ভাষায় "সাইক্লপ্স্" অর্থে এক চক্ষুষ্মান্, যাহার একটী মাত্র চক্ষু আছে। এই এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বড় প্রখর ছিল। পরবর্ত্তী দুই চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা সেই এক চক্ষুর শক্তি বহু পরিমাণে খরতর ছিল। সম্প্রতি এই চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির ও উন্নতির দিকে চলিয়াছে, এবং কালে শীঘ্রই তাহা পূর্ব্বের এক চক্ষুর শক্তি হইতে অধিকতর তীক্ষ্ণ ও খরতর হইবে।

তৃতীয় চক্ষু দ্বারা বাহ্য বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইয়া মোটা মোটি ভাবে হইত। কালে ইহা নিমীলিত হওয়ায় মানবের দর্শনশক্তি অধিকতর পরিষ্কার হইয়াছে। সেই বর্ষের আদিম অধিবাসীগণ অসভ্য হইলেও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিল। তখনকার স্বর্গীয় রাজাগণের তত্ত্বাবধানে এবং শাসনাধিকারে থাকিয়া তাহারা সুবৃহৎ রাজধানী, নগর, অত্যুচ্চ ও অতিদৃঢ় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহাদের সেই অলৌকিক শক্তির এবং অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশলের প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান সম্ভল নগরী (পবিত্রধাম) এখনও কীর্ত্তিনাশী কালে প্রতির ভ্রুভঙ্গি করিয়া অক্ষুণ্ণ এবং অটুটভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মানবের মানসিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা কালে এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আরও কিছু বলা যাইবে।

(ঘ) সপ্তর্ষি।

বর্হিষদ পিতৃগণ প্রথম জাতিকে তাহাদের ছায়া প্রদান করিয়া কিছু কালের জন্য মহর্লোকে আরোহণ করিলেন। তৎপর নূতন জাতির সৃষ্টি সময়ে তাঁহারা পুনরায় ধরাতলে অবতরণ করিয়া সেই জাতিকে পরিচালিত এবং তাহাদের উন্নতি কল্পে সাহায্য করার জন্য তাহাদের মধ্যে জন্মলাভ করিলেন। ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের মধ্যে কাহারো কাহারো সন্তান সন্ততিরূপে

এই পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। এই মানস পুত্রগণকে সপ্তর্ষি কহে। মরীচি অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সপ্তর্ষি। পূর্ব্বের ন্যায় তৃতীয় জাতির স্থূলদেহ নির্ম্মাণকার্য্যে তাঁহারা নিযুক্ত হইলেন। এবং তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের যোগী ও জ্ঞানী সন্তানগণের মানবজন্মধারণের উপযোগী করিলেন।

(ঙ) দানব ও দৈত্য।

স্ত্রীদেহ এবং পুরুষদেহ পরস্পর পৃথক হওয়ার পর অত্রির পুত্রগণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তৃতীয় জাতিকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এই অত্রির পুত্রগণেরই বিশেষ নাম বর্হিষদ। কোন কোন পুরাণে তাহাদিগকে মরীচির সন্তানও বলা হইয়াছে। এই তৃতীয় লিমুরিয়ান্ জাতিকে হিন্দু গ্রন্থাদিতে দানব বলা হইয়াছে। মহাভারতে এই দানবদের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাদের অহঙ্কার ও অভিমানবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহারা ক্রমেই অবনত হইতে লাগিল। প্রথমাবস্থায় যখন তাহারা পবিত্র এবং ধর্ম্মশীল ছিল, তখন দেবী কমলার অপাঙ্গদৃষ্টিতে ধনে জনে তাহারা নিরতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা লোভপরবশ এবং স্বার্থপর হইয়া ক্রমশঃ অবনত হইতে লাগিল, তখন তাহারা শ্রীভ্রষ্ট হইল। পিতৃগণ পরবর্ত্তী দানবগণের রাজা হইলেন। উভলিঙ্গ যে সকল স্বর্গীয় দেবগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের অধীনে থাকিয়া সেই পিতৃগণ রাজা স্বরূপ দানবদিগকে শাসন করিতে এবং বিবিধ শিল্প এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এ জন্য তাহাদিগকে দানবের পিতৃপুরুষ কহে। পরবর্ত্তী চতুর্থ বা আট্লান্টিয়ান (Atlantean) জাতিকে হিন্দুদের পুরাণাদিগ্রন্থে দৈত্য কহে। দানবকুল ধ্বংস হওয়ার পর এই দৈত্যগণের অভ্যুদয়ে পিতৃগণ পুনরায় তাহাদেরও রাজা হইয়া শাসন করিতে এবং বিবিধ শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এ জন্য তাহাদিগকে দৈত্যদেরও পিতৃপুরুষ (পূর্ব্ব পুরুষ) বলা হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যসৃষ্টির আরম্ভ হইতে দেব ও পিতৃগণ তাঁহাদিগকে অভিনব বিজ্ঞান ও নানাবিধ শিল্প শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং নানাবিধ কৌশল ও কলকারখানার আবিষ্কার করিয়া তাহা লোক-সমাজে বিস্তার এবং শিক্ষার পথ পরিসর করিয়াছিলেন। নতুবা সামান্য মনুষ্যবুদ্ধিতে কি তাহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারিত ?

(ক্রমশঃ)

যুগল সেবক।

অলৌকিক ঘটনা।

অনেক দিনের কথা; আমার ঠিক মনে নাই; কিন্তু বোধ হয় এই ঘটনা বিশ বৎসর পুর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী ইলছোবা মণ্ডলাই নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় হুগলি-নর্ম্মাল স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন, একদিন বেলা ১টার পর তিনি প্রথম শ্রেণীর বালকগণকে পড়াইতেছিলেন। হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া হাস্যমুখে বলিয়া উঠিলেন,—"কখন আসিলেন" কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া বালকগণ একটু স্তম্ভিত হইল; তিনিও তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভভাবে কহিলেন—আমি হঠাৎ একটা প্রলাপ বাক্য বলিয়াছি—বোধ হয়, তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছ। প্রকৃত ঘটনা কি বলিতেছি শোন। আমি যখন সংস্কৃত কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজের হেড্‌পণ্ডিত হইয়া যাই, সেই সময়ে তথায় জনৈক ধনী ও ধার্ম্মিক মহাত্মা বাস করিতেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রামদাস সেন। তাঁহার লাইব্রেরীতে অনেক পুস্তক ছিল; আমার যখন যে পুস্তক প্রয়োজন হইত, তিনি অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমাকে পড়িতে দিতেন। ইহার মধ্যে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। যেদিন আমি যে পুস্তক পাঠ করিব, মনে করিয়া যাইতাম যাইয়া দেখিতাম, সেই পুস্তকখানি তিনি আলমারি হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার সহিত আমার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল।

আমি তাঁহাকেই আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান দেখিয়া—"কখন আসিলেন" এই প্রলাপ বাক্য বলিয়া ফেলিয়াছি। আজ তোমাদের ছুটী। এই ঘটনার রহস্য সম্বন্ধে যদি কখন কিছু জানিতে পারি তোমাদিগকে বলিব। বালকগণ চলিয়া গেল। বেলা ৩॥টার সময় তিনি একখানি টেলিগ্রাম হস্তে লইয়া বোর্ডিংএর বাহিরে আসিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রথম শ্রেণীর বালকগণকে ডাকিয়া কহিলেন—আমি যে সময় বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে দেখিয়া "কখন আসিলেন" বলিয়াছিলাম সেই সময়েই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; এই টেলিগ্রাম তাঁহার মৃত্যু সংবাদ—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন—বোধ হয় সে সময়ে আমি তাঁহার সুক্ষ্মদেহই দেখিয়াছি। ইহা কিরূপে ঘটে তোমরা পরে বুঝিতে পারিবে। ইহা বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। বালকগণ স্তম্ভিত হইয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
বৈঁচি।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ } আষাঢ়, ১৩১৫ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

ব্রহ্ম ও মায়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নির্গুণ ব্রহ্ম এক, সেখানে দ্বিতীয় নাই। যেখানে সৎমাত্র বর্ত্তমান সেখানে অসৎ কিরূপে থাকিবে? তাই সেখানে "অসৎ" অনন্তকাল নাশপ্রাপ্ত, প্রত্যাখ্যাত। অনন্তকালই বা বলি কেন? সেখানে কাল (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান) অথবা দেশ ব্যবধান) নাই, থাকিতে পারে না। কারণ কাল পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ, যেখানে পরিবর্ত্তন নাই সেখানে কালও নাই। এবং দেশ বা ব্যবধান থাকিতে হইলে অন্ততঃ দুইটি বস্তুর প্রয়োজন; কিন্তু তিনি এক, সুতরাং দেশও নাই। 'অহম্ এতৎ ন' ইহার অর্থ এই যে একমাত্র ব্রহ্মই আছে, অপর কিছুই নাই, অপর সমস্তই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে স্বীকার (Affirmation) কিরূপে অব্যক্ত ও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতএব একই পদার্থের এক দিক্ হইতে দেখিলে একটি মাত্র বস্তু দেখা যায়, অপর দিক্ হইতে দেখিলে তিনটি বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। একে তিন্, তিনেই এক

একটি নিমেষও হইতে পারে বা কোটি পরার্দ্ধ কল্পেও হইতে পারে। আজ একটি জীব প্রকৃতির যে অংশটুকু "আমি ইহা" বলিয়া ধরিতেছে, কল্য বা কয়েক মাস, বা কয়েক বৎসর, বা কয়েক যুগ, বা কয়েক কল্প পরে "আমি ইহা নহি" বলিয়া তাহা ত্যাগ করিতেছে। কিন্তু আর একটি বৃহত্তর বা সূক্ষ্মতর অংশ ধরিয়া তবে পূর্ব্বটি পরিত্যাগ করে। যেমন জলোকা একটি আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তবে পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করে ইহাও সেইরূপ। এইরূপে প্রত্যেক জীব প্রকৃতির এক অংশ ছাড়িয়া আর এক অংশ ধরিতেছে, কিয়ৎকাল পরে তাহাতেও বিরক্ত হইয়া আরও বৃহত্তর ও সূক্ষ্মতর অংশ গ্রহণ করিতেছে, - এই গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, স্বীকার ও ত্যাগ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে। ইহার অন্যথা হওয়া অসম্ভব, কারণ ইহা পুরুষ প্রকৃতির পূর্ব্বকথিত নিত্য সম্বন্ধের অনিবার্য্য ফল। জীব যখন যে অংশটুকু স্বীকার করে, তাহাই তাহার তাৎকালিক জগৎ ও উপাধি। আজ যে জীব বা আত্মার যে অংশ ক্ষুদ্র কীটাণুরূপ এক সূচ্যগ্রপবিমিত রক্তবিন্দুকে স্বীয় বিশাল জগৎ ভাবিতেছে, কোটি কোটি কল্পান্তে তাহাই একটি সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় উপাধি রূপে গ্রহণ করিয়া এক ব্রহ্মা হইতেছে। ইহারই নাম জীবের ক্রমোন্নতি বা Evolution। এই উন্নতির শেষ বা সীমা নাই। ইহাতে আত্মার কোন উন্নতি অবনতি বা হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কারণ তিনি পূর্ণ ও সনাতন। উপাধির উৎকর্ষাপকর্ষই জীবের উন্নতি ও অবনতি।

আত্মা ওতপ্রোত ভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজিত। অতএব তাঁহার যুগপৎ স্বীকার—প্রত্যাখ্যান বিশ্ব-রঙ্গালয়ের সর্ব্বত্র পর্য্যায়ক্রমে অভিনীত হইতেছে। অতি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হইতে অতি ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থে এই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভাব (Activity and Passivity) বিদ্যমান। সৃষ্টি লয়, জন্ম মৃত্যু, জাগরণ সুষুপ্তি, প্রশ্বাস নিশ্বাস, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, জোয়ার ভাঁটা, শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ, দিবারাত্রি, বসন্ত শীত, যৌবন জরা প্রভৃতি কত উদাহরণ দিব? বিশ্বের সর্ব্বত্রই এই পর্য্যায় ও পরিবর্ত্তন (succession and change)। এই পরিবর্ত্তন লইয়াই জগৎ। যতকাল পুরুষপ্রকৃতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ রক্ষিত হইবে ততকাল জগৎও থাকিবে। যখন এই সম্বন্ধ পরমেশ্বরে লীন হইবে, তখন সমুদায় জগৎ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি

পরমেশ্বরে বিলীনা হইয়া যাইবে। এই সম্বন্ধটী বা সম্বন্ধ স্থাপনের কর্ত্রী কে? মায়া।

এই মায়া কি? ইহা ব্রহ্মের শক্তি। পঞ্চদশী বলেন, "শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।"

অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে শক্তিদ্বারা সকল বস্তুই নিয়মিত হইতেছে তাহাই মায়া। দেবীভাগবতের টীকায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "যেমন অগ্নি ও দাহিকা-শক্তি বা চন্দ্র ও কিরণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্বন্ধ, পরমেশ্বর ও মায়াও সেইরূপ।" শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও একস্থানে বলিয়াছেন,—"শক্তি-শক্তিমতো-রভেদাৎ" অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। বাস্তবিক কোন বস্তু হইতে তাহার গুণ বা শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না। প্রকৃত বস্তু কি তাহা আমরা কখনই জানিতে পারি না, কেবল তাহার গুণসমষ্টিই জানি। ঐ গুণ-গুলিকেই আমরা বস্তু বলি এবং গুণগুলি বাদ দিলে কিছুই থাকে না অথবা কি থাকে আমরা জানি না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন হইতে একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমি একটি মানব। আমার অনেকগুলি শক্তি আছে। দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি, স্পর্শ শক্তি, গতি শক্তি, বিচার শক্তি, কল্পনা শক্তি, স্মৃতি শক্তি, রচনা শক্তি ইত্যাদি বহুতর শক্তি লইয়াই আমি। জাগ্রৎ অবস্থায় এই শক্তিগুলি ক্রিয়াযুক্ত (active) রহিয়াছে। ইহাদের সাহায্যেই আমার জগতের সত্তা অনুভূত হইতেছে এবং "আমি এই জগদাদি হইতে স্বতন্ত্র" এই জ্ঞান (অর্থাৎ আমিত্ব বোধ) জন্মিতেছে এবং তৎসঙ্গে এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি লইয়াই আমি ইহাও বোধ হইতেছে। কিন্তু সুষুপ্তাবস্থায় এই বাহ্য জগৎ বা তাহার জ্ঞান (consciousness) থাকে কি? এবং এই শক্তিগুলিই বা কোথায়? তাহারা কি নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে? একটিরও নাশ হয় নাই, সকল গুলিই আমার মধ্যে বিলীন (latent বা inactive) রহিয়াছে। পরদিন প্রত্যূষে তাহারা পুনরায় প্রকাশিত বা প্রবুদ্ধ হইয়া আমিত্বের উদ্রেক করিয়া দিবে এবং আমাকে এই জগৎ দেখাইবে। সুষুপ্তি কালে যেমন শক্তিগুলি বিলীন হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই জগৎ প্রপঞ্চ এবং আমিত্বও লয়প্রাপ্ত হয়। তখন কি থাকে জানা যায় না; সেই অবস্থাটি সম্পূর্ণ শূন্য (blank) বলিয়া বোধ হয়।

শক্তিগুলির আবির্ভাবেই আমিত্ব ও প্রপঞ্চের আবির্ভাব, শক্তির বিলয়ে প্রপঞ্চ ও আমিত্বের লয়। আমরা এই সুষুপ্তাবস্থাকে নির্গুণ ব্রহ্ম, আমিত্বকে (Personality) সগুণ ব্রহ্ম, শক্তিপুঞ্জকে মায়া এবং জগৎপ্রপঞ্চকে মূল প্রকৃতির সহিত তুলনা করিতে পারি। যেরূপ এই শক্তিপুঞ্জই আমি বা Personality, শক্তিপুঞ্জ হইতে স্বতন্ত্র আমি কিরূপ তাহা ধারণাতীত, সেইরূপ এই মায়াই ব্রহ্ম (পরমেশ্বর), মায়া নির্মুক্ত অবস্থা অজ্ঞেয়। এই জন্যই দেবী স্বয়ং বলিতেছেন,—

"সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহমহং যোঽসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

দেবীভাগবত, ৩।৬।২

অর্থাৎ উঁহার ও আমার মধ্যে কোনও ভেদ নাই, আমরা দুইই এক। উনি যাহা, আমিও তাহাই। মতিভ্রম বশতঃই ভেদ দৃষ্ট হয়।

মায়া ব্রহ্মের শক্তি। কিন্তু এই শক্তি কীদৃশী ও কিম্ভূতা? শাস্ত্র বলেন ইনি ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি। যথা দেবীভাগবতে,—

"তস্য চেচ্ছাস্ম্যহং দৈত্য সৃজামি সকলং জগৎ।
স মাং পশ্যতি বিশ্বাত্মা তস্যাহং প্রকৃতিঃ শিবা॥" ৫।১৬।

অর্থাৎ হে দৈত্য, আমি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি। আমিই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করি। বিশ্বাত্মা তিনি আমাকে দর্শন করেন। আমি তাঁহার কল্যাণদায়ক স্বভাব। পাশ্চাত্য দর্শন-জগতেও এই কথার পোষকতা পাওয়া যায়,— "The Will is the first of all powers, for through the Will of the Supreme-cause all things came into existence." Van Helmont, (quoted in "Magic, White and Black.")। অর্থাৎ ইচ্ছাই সকল শক্তির মূল, কারণ ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই জগদাদি আবির্ভূত হইয়াছে। ইহা যে আদৌ অসম্ভব নহে, মানবের ইচ্ছাশক্তির বিপুল প্রভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মাণ্ডের এই ক্ষুদ্র কীট মানবই তাহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কত অসাধ্য সাধন করিতে পারে, কত অঘটন ঘটাইতে পারে—আধুনিক তন্দ্রাতত্ত্বের (Hypnotism বা Mesmerismএর) আলোচনা করিলে আমরা কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তন্দ্রাকারী (Hypnotiser) তাঁহার

ইচ্ছাশক্তিদ্বারা তন্দ্রাবিষ্টকে (Hypnotizedকে) 'কলের পুতুলের' ন্যায় চালাইতে ফিরাইতে পারেন। এক ঘরে দশটি ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তন্দ্রাকারী তন্দ্রাবিষ্টকে বলিলেন "এখানে কেহই নাই"। তন্দ্রাবিষ্ট ঐ ঘর শূন্য দেখিতে লাগিলেন। এক বৃদ্ধ ভয়ানক স্নায়ু-শূলে (Neuralgiaতে) ছটফট করিতেছেন, কয়েক দিন অবধি তাঁহার আহার নিদ্রাও বন্ধ হইয়াছে। তন্দ্রাকারী তৎসমীপে গিয়া বলিলেন "আপনার নিশ্চয়ই কোন যন্ত্রণা নাই।" তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ যন্ত্রণা মুক্ত হইলেন। সম্মুখে কিছুই নাই অথচ তন্দ্রাকারীর ইঙ্গিত মাত্রেই তন্দ্রাবিষ্ট কুকুর, বিড়াল বা নানারূপ অপূর্ব্ব বস্তু দেখিতে লাগিলেন। এই প্রকারের শত শত ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার রহস্য কি? কেহ কেহ বলেন তন্দ্রাকারীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এইরূপ ঘটে এবং কেহ বা বলেন তন্দ্রাবিষ্টের প্রচ্ছন্ন (Sub-liminal) ইচ্ছাশক্তিকে তন্দ্রাকারী উদ্বোধিত করিয়া দেন মাত্র, অর্থাৎ তন্দ্রাবিষ্টের নিজের ইচ্ছাশক্তিই ইহার কারণ। যাহাহউক ইচ্ছাশক্তি বটে, তন্দ্রাকারীরই হউক বা তন্দ্রাবিষ্টেরই হউক।

ইচ্ছাশক্তিদ্বারা মানব বস্তুর তথা-কথিত নিত্যগুণ গুলির (of the so-called immutable properties of object) কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে, কিরূপে গোলাপ জলকে এমোনিয়া এবং এমোনিয়াকে গোলাপ জল, শীতকে গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মকে শীত, লবণকে চিনি ও চিনিকে লবণ করিতে পারে, তাঁহার ইচ্ছামাত্রে ধনজনকোলাহলপূর্ণ নগর কেমন মরুভূমির আকার ধারণ করে এবং নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ প্রান্তর ভীষণ গর্জ্জনময় উত্তালতরঙ্গযুক্ত সমুদ্রে পরিণত হইয়া যায় তাহা চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয় এবং মনে হয়, বুঝি বা বস্তুর কোন সত্তা (Reality) নাই, ইচ্ছাশক্তিদ্বারা আমরা যেরূপ কল্পনা করি তাহাই দেখিতে পাই। চিন্তাশীল ও তত্ত্বজ্ঞ হার্টমান বলেন, "যদি বলবতী কল্পনা আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দেয় যে আমার সম্মুখে একটি দেবতা বর্ত্তমান, তাহা হইলে ঐ দেবতা (অপরের নিকট অপ্রকৃত হইলেও) আমার সম্মুখে প্রকৃতই কার্য্যতঃ বিরাজমান থাকিবেন। যদি প্রবল কল্পনা প্রভাবে তুমি অরণ্যে একটি স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পার, তাহাহইলে তোমার নিকট ঐ স্বর্গ বস্তুতঃই

থাকিবে।"* বাস্তবিক আমাদের চৈতন্য বা জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র একটা জগৎ যে আছে ইহা অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন সমস্তই আমাদের ভাবনা বা কল্পনা। এবং এই কল্পনা ইচ্ছাশক্তিদ্বারা নিয়মিত। ইচ্ছাশক্তি যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই আমরা জগৎকে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিতে পারিব। যোগী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সমাসীন থাকিয়াও মলয়-মারুতের স্নিগ্ধতা অনুভব করিতে পারেন, ভক্ত ন্যক্কারজনক পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করিয়াও ধূপ ধুনা চন্দনাদির সৌরভে বিভোর হইয়া স্বীয় ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিতে পান। ইহা কি মিথ্যা, তাঁহাদের কাল্পনিক সৃষ্টি মাত্র? এই কলিকাতা সহর, গাড়ীঘোড়া, বাজারহাট, লোকজন, চন্দ্রসূর্য্য (সংক্ষেপে, এই সমগ্র স্থূল জগৎ) যে পরিমাণে সত্য (real), যোগী বা ভক্তের পূর্ব্বোক্ত অনুভূতি তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য বা সত্যের অধিকতর সন্নিকট। অবশ্য দুইই মিথ্যা—ইচ্ছাশক্তির কল্পনা মাত্র। তবে সূক্ষ্ম জগৎ স্থূল অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী এবং অল্প আবরণে আবৃত, তাই সত্যের অধিকতর নিকট। সে যাহাহউক, "কোন্ শক্তিদ্বারা যোগী বা ভক্ত ঐরূপ করিতে সমর্থ হন? ইচ্ছাশক্তিদ্বারা। এবং এই ইচ্ছাশক্তিই অনন্ত মহামায়ার এক কণা। যোগী, ঋষি, ইন্দ্র, বায়ু অগ্নি, মনু, প্রজাপতি প্রভৃতি জীব মাত্রই এই মহামায়ার আরাধনা করিতেছেন,—মহামায়াকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। যখন তিনি প্রসন্না হইয়া পূর্ণভাবে সেবকের হৃদয়ে উদিতা হইবেন, অর্থাৎ যখন জীব সমগ্র মায়াশক্তিকে করায়ত্ত করিতে পারিবেন, তখন তিনি আর জীব নহেন—শিব।

জীব যে শক্তির দাস, যে শক্তির সেবক, যে শক্তিকে পাইবার জন্য নিয়ত আরাধনা করিতেছে, পরমেশ্বর তাঁহারই প্রভু। তিনি যতক্ষণ এই শক্তিযুক্ত,

---

* "If my imagination is powerful enough to make me firmly believe in the presence of an angel, then that angel will be there for all my practical purposes, no matter how unreal it may be to another If your imagination is strong enough to create for you a paradise in a wilderness, then that paradise will have for *for you* an objective existence." Magic, white and black, by F. Hartman, Page 21.

ততক্ষণই তিনি প্রকট ও জ্ঞেয় ; শক্তি তন্মধ্যে বিলীনা হইলে, তিনি শূন্য বা অজ্ঞেয়। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
নচেৎ এবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥

সৌন্দর্য্যলহরী।

অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে শক্তি বাদ দিলে একটা নিষ্ক্রিয়, নির্জীব, ও নিঃস্পন্দ পদার্থ পড়িয়া থাকে। হার্টম্যান বলেন প্লেটোর মতে "The Cosmos is looked upon as consisting of Will and its Manifestation."। বাস্তবিক ও তাহাই। এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল শক্তি ও শক্তির বিকাশ মাত্র। এই শক্তির প্রভাব অসীম ও অচিন্ত্য। ইনি অঘটন ঘটন পটীয়সী। যিনি চির "অসৎ" কে সৎ করিতে পারেন, যেখানে কিছুই নাই সেখানে এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগদাদির সৃষ্টি করিতে পারেন, যিনি সূর্য্যরশ্মিতে জল-ভ্রমবৎ এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দে জগৎ ভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি অঘটন ঘটাইতে পারেন বই আর কি? আমরা পুনরায় একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। এক ঐন্দ্রজালিক একটি রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে বসিয়া ইচ্ছা করিলেন তিনি দর্শকদিগকে নিম্নলিখিত দৃশ্যটি দেখাইবেন একটি কৃষ্ণবর্ণ কুকুর অকস্মাৎ তথায় আসিয়া তিন বার শব্দ করিবে এবং অমুক অমুক দর্শকের হস্ত ও পদ লেহন করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ঐন্দ্রজালিক কি করিবেন? ঐ চিত্রটি অনন্তরিতভাবে তাঁহার মানস পটে বর্ত্তমান রাখিয়া বলবতী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সঙ্কল্প করিবেন যে দর্শকেরা ঐরূপ দেখুন। ইহাতে দর্শকগণ উক্ত ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। সেইরূপ, যে ইচ্ছাপ্রভাবে ব্রহ্মে জগদাদির চিন্তা (idea) উদিত হইতেছে, সেই ইচ্ছাশক্তিই (মায়াই) উক্ত চিন্তাকে তাঁহার বদ্ধ অংশগুলির (অর্থাৎ জীবের) প্রত্যক্ষীভূত করিতেছেন। দৃষ্টান্তটি সর্ব্বাংশে ঠিক না হইলেও, এতদ্দ্বারা মোটামুটি একটা ধারণা হইতে পারে। ঐন্দ্রজালিক জানিতেছেন যে, কুকুরের ব্যাপারটি তাঁহার চিন্তা বা কল্পনা মাত্র, কিন্তু দর্শকদিগের নিকট উহা বাস্তব (real)। সেইরূপ পরমেশ্বর মূল প্রকৃতিকে (জগদাদিকে) চির অসৎ বলিয়াই জানিতেছেন, কিন্তু জীবের নিকট উহা সৎ বা বাস্তব।

ধর্ম্ম।

(পরাবিদ্যা-সমিতির "মতিহারি শাখা"র সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত)

আমরা সকলে প্রত্যেক রবিবারে সমবেত হইয়া করি কি? ধর্ম্মের বিষয় কিছু আলোচনা করি এবং কিছু পড়ি। আমাদের বন্ধু বান্ধবগণকেও আমরা ধর্ম্মের পথে আনিতে চেষ্টা করি এবং আনিবার চেষ্টা করাকে নিজেদের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া থাকি। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "ধর্ম্ম" জিনিষটা কি, তাহা হইলে বুঝাইবার যাহাতে সুবিধা হয়, তজ্জন্য এ বিষয়ের কিছু আলোচনা করা আমাদের উচিত আমি যতদূর পড়িয়া ও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতে অগ্রসর হইলাম।

আমাদের "ধর্ম্ম" শাস্ত্র কেবল ধর্ম্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি কেহ করেন ধৃ ধারণে এবং কেহ কেহ করেন ধৃঙ্ অবস্থানে। এই ধাতুর উত্তরে মন্ প্রত্যয়। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি, এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যে শক্তি বা প্রকৃতি অথবা গুণবিশেষ (যে নামেই বলুন না) সূক্ষ্ম বীজ ভাবে থাকাতে আমরা মনুষ্য, যাহার বিনাশে মনুষ্যত্বের নাশ, যাহা না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, তাহাই আমাদের ধর্ম্ম। মহাভারতে লেখা আছে "ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহু, ধর্ম্মো ধারয়তি প্রজা " কতক-গুলা বিশ্বাস যাহা আমাদের দৈনিক কার্য্যে আবশ্যকীয়, তাহাই ধর্ম্ম নহে, পরন্তু, ইহা আমাদের জীবনে সকল সৎকার্য্য করিবার ভিত্তি স্বরূপ।

উপনিষদে বলে "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" এই ব্রহ্মাণ্ডে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বর্ত্তমান। ছান্দোগ্য বলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," জগতের সমস্ত পদার্থেরই তাঁহা হইতে উৎপত্তি ও তাঁহাতেই লয়। আমাদের বুঝিবার পথ সুগম করিবার জন্য উহাতেই লেখা আছে "এষ মে আত্মান্ত হৃদয় এতদ্ ব্রহ্ম।" এই যে আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে আছেন, ইনিই ব্রহ্ম। এই আত্মাই পরমাত্মা, যেমন অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। যদি তাহাই হয়, পরমাত্মা ক্রিয়াহীন সুতরাং আত্মাও নিষ্ক্রিয়। পরমাত্মার আবার ধর্ম্ম কি? সুতরাং আত্মার ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। যদি পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা পর্য্যন্ত সকলেই নিষ্ক্রিয়, তাহা হইলে কর্ম্ম করে কে? ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "প্রকৃতেঃ ক্রিয়-

মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।" প্রকৃতি সব কার্য্য করেন, গুণের মধ্য দিয়া। আর একস্থলে ভগবান বলিয়াছেন, তাঁহার দুই প্রকৃতি—অপরা এবং পরা। অপরার বিষয়ে বলিয়াছেন,

"ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

পৃথিবী, জল, তেজ বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার, এই হইল অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতির বিষয় বলিয়াছেন,

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ এই যে অষ্ট সংজ্ঞা বলিলাম, তাহা আমার অপরা প্রকৃতি। ইহা ভিন্ন আমার আর একটী প্রকৃতি আছে, যাহা জীব স্বরূপা, অর্থাৎ যাহা জগৎ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক ক্ষমতা দ্বারা জগৎকে ধারণ করিয়াছে। ইহা দ্বারা ভগবান বলিলেন যে তাঁহার পরা প্রকৃতি জগৎকে ধারণ করিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম। এই ব্যাখ্যা দ্বারায় গীতোক্ত পরা প্রকৃতিকে কি লক্ষ করা হয় নাই? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পরমাত্মা স্বরূপ জীবাত্মাও নিষ্ক্রিয়। তাঁহার যেরূপ দুই প্রকৃতি আছে, এবং সেই দুইটী কার্য্য করে, জীবাত্মার সেইরূপ দুইটী পরা ও অপরা প্রকৃতি আছে এবং দুইটীই কার্য্যশীলা। অপরা প্রকৃতি হইতে জীবাত্মার স্থূলাদি শরীর সকল, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতির উৎপত্তি। অপরা প্রকৃতির মধ্য দিয়া পরা প্রকৃতির বিকাশ। আমাদেরও মন বুদ্ধির মধ্য দিয়া পরা প্রকৃতির বিকাশ হয়। পরা প্রকৃতি শুদ্ধ, স্ব প্রকাশ এবং নির্ম্মল স্বরূপ, কিন্তু আমাদের পক্ষে বুঝিবার পথ সহজ করিবার জন্য ভগবান তাঁহার কতকগুলি গুণ দৈবী সম্পদ বলিয়া গীতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা এই :—

"অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধি র্জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জবং॥" ১—১৬
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচ মদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী অভিজাতস্য পাণ্ডব ॥

অর্থাৎ (1) অভয় (Fearlessness), (2) সত্ত্বশুদ্ধি (Purity of Heart), (3) জ্ঞানযোগে পরা নিষ্ঠা (Steadfastness in Yoga of wisdom), (4) দান (Charity), (5) দম (Self restraint), (6) যজ্ঞ (Sacrifice), (7) স্বাধ্যায় (Study of Shastras), (8) তপ (Austerity), (9) আর্জব অবক্র স্বভাব (Rectitude), (10) অহিংসা (Harmlessness), (11) সত্য (Truth), (12) অক্রোধ (Absence of anger), (13) ত্যাগ, (ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ Renunciation), (14) শান্তি (Peacefulness) (15) অপৈশুণ পরদোষ অকার্ত্তন (Absence of calumny), (16) সর্ব্বভূতে দয়া (Compassion to all living beings) (17) অলোভ (Uncovetousness), (18) মৃদুতা (Mildness) (19) লজ্জা (Modesty) (20) অচাপল্য (Absence of fickleness) (21) তেজ (Boldness), (22) ক্ষমা (Forgiveness), (23) ধৃতি (Fortitude), (24) শৌচ (Purity), (25) অদ্রোহ (Amity), এবং (26) অমানিত্ব (Absence of Pride)। পরমাত্মার এ গুণগুলি যেমন কার্য্যকারিণী, তদংশ জীবাত্মায় এই গুণ গুলির ও তদনুরূপ কার্য্যশালী হওয়া উচিত। এখন বিবেচ্য, পরমাত্মা যখন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, "তাঁহার" প্রকৃতি বলি কি করিয়া? প্রকৃতিদ্বয় নিজেদের ইচ্ছায় কি কর্ম্ম করে এবং নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিশ্রাম করে? শাস্ত্রকারেরা বলেন তাহা নহে। একোহহং বহুস্যাম। পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন বা মনন্ করিলেন "এক" আমি বহু হইব। এই মনন করার জন্য তিনি অসীম হইতে সসীম হইলেন। এবং এইজন্য "তাঁহার' প্রকৃতি বলা হয়। এই মনন জন্য প্রকৃতি ও কার্য্য করিতে সক্ষম। এইরূপ জীবাত্মার ও কার্য্যের গোড়া মনে। এই জন্যই আমাদের মনের উপর শাস্ত্রের এত লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যেই উপাসনার আবশ্যকতা। এই জন্য যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান ও সমাধির ব্যবস্থা। এই গুণগুলির সম্পূর্ণ বিকাশের চেষ্টাকেই ধর্ম্মার্জ্জন বলে। সাধারণতঃ আমাদের অপরা প্রকৃতিই অধিক

কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ আমাদের মনোময় দেহ, বিষয় ইত্যাদিতেই বদ্ধ। ইহা হইতে মুক্ত হইয়া পরা প্রকৃতিতে কার্য্য করিলে তবেই আত্মবোধ সম্ভব। আমাদের দুই প্রকৃতির সম্পূর্ণভাবে ও স্বাধীনভাবে কার্য্যকারিণী অবস্থাকেই সাম্য অবস্থা বলে। প্রথমে আত্মযোগ হইলে পরে পরমাত্মাযোগ হইবে। তখন সাচ্চদানন্দ সংস্পর্শে জীব ও সচ্চিদানন্দ অবস্থা ভোগ করিবে। সেই অবস্থা প্রাপ্তিই জীবের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই কারণে জীব মাত্রেরই ধর্ম্মার্জ্জন অত্যন্ত আবশ্যক। এতৎকারণে যোগী যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন :— "অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্ম দর্শনম্।" বর্ণাশ্রম এই যোগ প্রাপ্তির সোপানস্বরূপ। তদনুসারেই মনুষ্যগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই দুই প্রকৃতি বিকাশের অবস্থা বিভিন্ন। সুতরাং সকলের জন্য একরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না। এই বলিয়া ব্যবস্থারও বিভিন্নতা। জ্ঞান ও ভক্তিযোগ ইহারই সিঁড়ি। অবশ্য কর্ম্মযোগ ভিন্ন কোনটাই হইতে পারে না। যে কর্ম্ম জীবের সঙ্গে পরমাত্মার যোগ করিয়া দেয়, স্থূলতঃ তাহাকেই কর্ম্মযোগ কহে। ভগবান অর্জ্জুনকে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন যে, সকল কর্ম্মের ফল তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে। আমরা সাধারণতঃ যাহা কিছু করি তাহা কোন ফলের উদ্দেশে করি, অর্থাৎ শরীরাদির দ্বারা যদিও কর্ম্ম করি বটে কিন্তু মনে মনে তাহার সম্বন্ধ বা যোগ ফলের সহিত স্থাপন করিয়া দিই। এই কর্ম্মের যোগটুকু ফলের সহিত স্থাপন না করিয়া ঈশ্বরের সহিত স্থাপন করার নাম কর্ম্মযোগ। এ কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফলে যে কোন হানি হয় তাহা নহে, কারণ কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। আমি যাহাই মনে করিয়া অগ্নিতে হাত দিই না কেন, হাত পুড়িবে নিশ্চয়ই! আমি যত কিছু অর্থ নিজের জন্য রাখিনা কেন, আমার কখনই থাকিবে না। ভাইকে না দিলে পুত্র লইবে, মাতাকে ভগিনীকে না দিলে স্ত্রী লইবে। এইরূপে আমার কিছুই থাকিতে পারেনা, কারণ জীব মাত্রের কর্ম্মের সমষ্টিই বিরাট কর্ম্ম। আমাদের শরীর ক্রমে ক্ষয় হইতেছে। যাহাদিগকে আমরা এই রূপজ সম্বন্ধ লইয়া ভ্রাতা, পুত্র, ভগিনী, স্ত্রী ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেছি, এই শরীর নাশের সহিত তাহাদের সঙ্গে ঐ

সকল সম্বন্ধ উঠিয়া যাইবে। তখন যাহা কিছু "আমার জন্য, আমার জন্য" করিয়া আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, পাঁচ ভূতে লুটিয়া খাইবে। কিন্তু আমরা যাহা কিছু করি, যদি তাহা ঈশ্বরের উদ্দেশে করি যাহা কিছু সংগ্রহ করি, তাহা যদি জগতের হিতে আসিবে বলিয়া সংগ্রহ করি, তাহা হইলে ফল উভয়েরই একই থাকিবে, আগুন লাগিয়া কিছুই পুড়িয়া যাইবে না, অধিকন্তু আমাদের মনের সংকীর্ণতা নাশ হইবে ও প্রসারতা বৃদ্ধি পাইবে। ইহারই নাম হইল কর্ম্মযোগ।

এইরূপে আমরা জ্ঞানযোগ দ্বারা আমাদের কল্পিত কর্ম্মফল (যাহা আমাদের উন্নতির পথ অবরোধ করিতেছে) নাশ করিতে পারি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম-প্রকৃতিক, সুতরাং জীবের আত্মা পরমাত্মাকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণী শক্তি জীবের স্বভাবসিদ্ধ, কেবল কতকগুলা আবর্জ্জনা দ্বারায় ঢাকা আছে বলিয়াই তাহা পরিস্ফুট হইতে পারিতেছেনা। এই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া উপরোক্ত "আকর্ষণী শক্তি"র দ্বারা আত্মায় ও পরমাত্মায় যে যোগ, তাহাকেই ভক্তিযোগ কহে। এই যোগের এতদূর শক্তি যে ভগবানকে বলিতে হইয়াছে যে :—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥"

আমি সংক্ষেপতঃ, যাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিয়াছে, বলিলাম। ইহা দ্বারা চিন্তা করিবার "বিষয়ে" কিছু সঙ্কেত করা হইল মাত্র। আশা করি আমার শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতৃবৃন্দ ইহাকে বিস্তারিতভাবে চিন্তা করিবার প্রয়াস পাইবেন ও তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল আমার মতন ছোট ও অবোধ ভাইকে বণ্টন করিয়া দিবেন ওঁ॥

শ্রীবঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বরূপ।

গীতায় বিশ্বরূপ সম্বন্ধে যাহা কথিত আছে, যেরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন মহাভীত হইয়া ভগবানকে শান্তরূপ দর্শনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত মহাকালরূপ। মহাকালরূপ ত্রিকালাতীত। যিনি ত্রিকালজ্ঞ তিনি এইরূপের দর্শন উপযোগী। ইহা ভিন্ন আর কেহ এই রূপ দর্শনের অধিকারী নহেন। যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কাল একই সময়ে দর্শন করিতেছেন, তিনি ত্রিকালজ্ঞ ও জ্ঞানী। তখন তাঁহার জ্ঞান জন্মে ও নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে কি হইতেছে, কি হইয়া গিয়াছে, ও পরে কি হইবে তাহা অর্জ্জুন এক কালেই সমগ্র দেখিয়াছিলেন। এই তিন কাল একে সংযোগ করিয়া মহাকাল রূপ ধরিয়া অর্জ্জুনকে ভগবান দেখাইলেন যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বজীবই কালগ্রাসে পতিত হইয়া রহিয়াছে, তখন অর্জ্জুনের ভ্রম দূর হইল, এই মহাকালরূপ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন (অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান হইল যে এই বিশ্বে সকলেই মরিয়া রহিয়াছে) বাস্তবিকই তিনি কাহাকেও মারিবেন না তিনি ভবিষ্যৎ কালের রূপ দেখিতেছেন, যে এই মহাকাল স্রোতে এই বিশ্ব কালগ্রাসে পতিত হইবে তাহা অর্জ্জুন বর্ত্তমান কালেই দেখিতেছেন, কারণ তখন তিনি ত্রিকালজ্ঞ; এবং আরও দেখিতেছেন যে এই সমগ্র বিশ্বটী যেন একটী কেন্দ্রস্থল মধ্যে রহিয়াছে (অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব দ্রব্যই তাঁহার নখদর্পণে রহিয়াছে)। তাহাদের রূপান্তর অবস্থা ও বহু মুণ্ডমালা ইত্যাদি ভীষণরূপ যাহা গীতায় একাদশ অধ্যায়ে কথিত আছে যেন সমস্তই তাঁহার সম্মুখে দৃশ্যের ন্যায় বোধ হইতেছে তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া অর্জ্জুন ভগবানকে শান্তরূপ দেখাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাকে শান্তরূপও * দেখাইয়াছিলেন।

আমরা যে কেন্দ্র স্থলটীর কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহার অর্থ কি? মহাযোগিগণ এই কেন্দ্রস্থল সম্বন্ধে বলেন যে এই বিশ্বটীকে একটী

---

* শান্তরূপ নামক অন্য প্রবন্ধ পরে প্রকাশ হইবে।

বিন্দুতে আনয়ন করিতে যিনি সমর্থ হয়েন, তিনি সেই বিন্দুটীর মধ্যদিয়া এই বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হয়েন, সেই মহাজ্যোতির্ম্ময় বিন্দুই কেন্দ্রস্থল বা নিরাকার ব্রহ্ম।

একটী ক্ষুদ্র বিন্দু, এই বিন্দুটীর মধ্য হইতে সমগ্র বিশ্বটী কিরূপ দৃষ্ট হইবে? যদি কেহ এইরূপ বলেন তাঁহাকে এই বলি যে, একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুরী উপরিস্থ একটী ক্ষুদ্র আতসকাচ মধ্য দিয়া একটী বৃহদাকার ছবি যদি কেহ দেখিয়া থাকেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে বিশ্বরূপের মহাছবিটীও ঠিক সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বিন্দু মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু তাঁহার যোগাভ্যাস দ্বারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করা আবশ্যক। যিনি দিব্য চক্ষু লাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে যোগাভ্যাস করিতে হইবে। বিনা যোগাভ্যাসে অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত হয় না, অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত না হইলে দিব্যজ্ঞান জন্মে না। যোগ অভ্যাস করিতে করিতে অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত হইবে। ক্রমশঃ দিব্যজ্ঞান বা দিব্যচক্ষু লাভ হইবে। সেই দিব্যচক্ষু দ্বারা এই বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইবে। তখন সেই বিন্দুটীর একটী অভাবনীয় জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে পাইবে। সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি যদি একত্রিত হয় সেইরূপ মহাজ্যোতির ন্যায় যে জ্যোতির্বিন্দু ইহাই কেন্দ্রস্থল বা জ্যোতির্বিন্দু। তাহাই অন্তর্জগতে রাখা যোগাভ্যাস। স্থূল চক্ষে এইরূপ দেখা যায় না।

অর্জ্জুন যোগাভ্যাস দ্বারা অন্তর্নিহিত এই জ্যোতির্বিন্দুটীর মধ্য দিয়া বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই বিশ্বরূপ।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রাসতত্ত্ব।

জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ এক। কিন্তু জীব অসম্পূর্ণ। জীবের পরিচ্ছিন্ন সত্তা, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, পরিচ্ছিন্ন আনন্দ। কিরূপে জীব পূর্ণ হইবে? কিরূপে জীব অমর হইবে? কিরূপে জীবের পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ হইবে?

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ এই গূঢ় সমস্যার নিবাকরণ অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন।

ক্ষরং প্রধান মমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ যোজন ৎ তত্ত্বভাবাৎ
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥

প্রধান বা প্রকৃতি ক্ষর। অমৃত রূপ পরমেশ্বর অক্ষর। প্রকৃতি ও জীবাত্মা এই দুইয়ের ঈশ্বর হন সেই এক দেব। সেই দেবের অভিধ্যান, পরে সেই দেবের সহিত যোজন এবং অবশেষে সেই দেবের সহিত তত্ত্বভাব দ্বারা নিঃশেষ বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। সেই দেব কোন উপনিষদে অপর ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ পুরুষ এবং কোন উপনিষদে পর ব্রহ্ম। হিরণ্যগর্ভ পুরুষের অভিধ্যান দ্বারা জীব ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়। ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক ব্যক্ত জগতের শীর্ষস্থানীয়। সেই ব্রহ্মলোক বিরজ বা রজোগুণ শূন্য।

"তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু
জিহ্মমনৃতং মায়াচেতি।" -প্রশ্ন উপনিষৎ

আবার পর ব্রহ্মের ধ্যান দ্বারাও জীব ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যম নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন—

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধেবাক্ষরংপরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

এখানে অক্ষর পরব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারা জীবের ব্রহ্মলোক গমন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অব্যক্তের অতীত যে পুরুষ যিনি সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ—তাঁহার

বৈকুণ্ঠ লোকের কথা উপনিষদে নাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও এই জন্ম ব্রহ্মলোক গমনের উল্লেখ করিয়াই শারীরক সূত্রের শেষ করিয়াছেন। কৌষীতকীর ব্রহ্ম একবারে পরিষ্কার ব্রহ্মা বা অপর ব্রহ্ম।

"ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি"—কৌষীতকী।

ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে যায়।

"তং ব্রহ্ম পৃচ্ছতি কোঽ সীতি"

ব্রহ্মলোকে গমন করিলে সাধককে ব্রহ্ম (এখানে ব্রহ্ম নিঃসন্দেহই ব্রহ্মা) জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কে? কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দেব—পরব্রহ্ম অর্থাৎ অব্যক্তের অতীত ব্রহ্ম। অব্যক্তের উপর ঈশ্বর। তিনি প্রথম পুরুষ বা Lord of the unmanifested universe। পরব্রহ্ম তাহারও পর। কিন্তু পরব্রহ্ম বলিলেই একবারে নির্গুণ বুঝিতে হইবে না। তিনি এককালে সগুণ ও নির্গুণ। শক্তি লইয়া তিনি সগুণ এবং তাঁহার শক্তির দিকে লক্ষ্য না করিলে তিনি নির্গুণ।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি—"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ" এই কথা বলিয়া, সেই দেবের যে বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোন উপনিষদে সেরূপ বর্ণনা নাই। গীতার বর্ণনা ও শ্বেতাশ্বতরের বর্ণনা এক। মনে হয় নরনারায়ণ রূপে যিনি বদরিকাশ্রমে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনিই ভগবদ্গীতা দিয়াছেন।

"আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" সেই দেব "হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং" আবার "হিরণ্য গর্ভং পশ্যত জায়মানং।" অবশ্য সেই দেব হিরণ্য গর্ভের পর।

সেই দেব—"সর্ব্বাননশিরো গ্রীবঃ সর্ব্বভূত গুহাশয়ঃ" আবার তিনি "অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" তিনি "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং" আবার "সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।"

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি আরও বলেন -"সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ"। আবার ভাগবত পুরাণ বলেন,

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

প্রতিপন্ন এই হইল—ভগবানের অভিধ্যান, ভগবানের সহিত যোজন

এবং অবশেষে ভগবানের সহিত তন্ময়ভাব দ্বারা বিশ্বমায়া নিঃশেষরূপে নিবৃত্ত হয় এবং জীবের পূর্ণতা লাভ হয়।

ভগবানের অভিধ্যান।

জীব ত ভগবান্‌কে জানিতে পারে না, বিশেষতঃ উপনিষদের ভগবান্ অনির্দেশ্য—নির্দেশ্য, অব্যপদেশ্য ব্যপদেশ্য অক্ষর। সেই অক্ষরের অভিধ্যান কিরূপে হইতে পারে।

শ্রুতি ভগবতী এই সমস্যার উত্তর দিলেন। জীবের কল্যাণের জন্য এক অপরূপ রহস্যের উদ্ভেদ করিলেন। সেই পবিত্র উপদেশ সেই অমৃতময় দেববাণী শুনিয়া মনুষ্য স্তম্ভিত ও পুলকিত হইল। দেবের দুর্লভ বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দেবতারা যে অমৃত লাভ করেন নাই মনুষ্য সেই চিন্তার অতীত অমৃত লাভ করিল। ভবিষ্যতে রাসলীলার দুর্গম পথ পরিষ্কৃত হইল।

শ্রুতি ভগবতী বলিয়া দিলেন—ভগবান্ যে তোমার হৃদয়ের মধ্যে। দূরে যাইতে হইবে কেন?

কঠ উপনিষৎ

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

তিনি দুর্দর্শ হইলেও আমাদের হৃদয় গহ্বরে গূঢ় ভাবে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা সেই দেবকে জানিয়া হর্ষ ও শোকময় সংসার পরিত্যাগ করেন।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

সেই অব্যক্তাতীত পরম পুরুষ সকল ভূতের আত্মা এবং সকল ভূতের

হৃদয় মধ্যে গূঢ় ভাবে আছেন। সূক্ষ্মদর্শীরা অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পান্।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।

ঈশানো ভূত ভব্যস্য নততো বিজুগুপ্সতে॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের ঈশ্বর। এই জন্য কাহাকেও ঘৃণা করিবে না।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।

ঈশানো ভূত ভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥

অধূমক জ্যোতির ন্যায় সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ। তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের ঈশ্বর। তিনিই আজ আছেন। তিনিই কাল থাকিবেন।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা য করোতি।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

সেই ঈশ্বরকে যাঁহারা আত্মায় দেখেন তাহাদেরই শাশ্বত সুখ ও শাশ্বত শান্তি, অন্যের নহে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র. পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।

তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেন॥

সেই অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ সর্ব্বদা লোকের হৃদয় মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। যেমন শরের কাষ্ঠদণ্ড যত্নে ঘাসের খোলস হইতে একে একে ছাড়াইতে হয়, সেইরূপ ধৈর্য্যের সহিত সেই অন্তরাত্মাকে নিজের শরীর হইতে পৃথক্ করিতে হয়।

প্রশ্ন উপনিষৎ

'হৃদি হ্যেষ আত্মা।' হৃদয়ের মধ্যেই এই আত্মা আছে।

মুণ্ডক উপনিষৎ

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্মপরামৃতম্।

এতদ্ যোবেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥

যিনি সেই পুরুষকে হৃদয় গুহার মধ্যে নিহিত জানেন, তিনি অবিদ্যা গ্রন্থির নাশ করেন।

শ্বেতাশ্বতর

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ঠঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অন্তরাত্মা সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সর্বদা লোকের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। তিনি মনের ঈশ্বর। অতএব মনের দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন্।

এই একটি গভীর তত্ত্ব। মনের ঈশ্বর মনদ্বারা প্রকাশিত হন। জীব ও ঈশ্বরের ছোঁয়া ছুয়ি হইবার জন্য ঈশ্বরকে মনের ঈশ্বর হইতে হয়। জীব ও ঈশ্বরে ঘাত প্রতিঘাত না হইলে, অভিধান, যোজন ও তত্ত্বভাব কিরূপে হইতে পারে? দুইয়ের মধ্যে সমান অঙ্গ হওয়া চাই। তবেত দুইয়ে মিস খাইবে। তবেত দুয়ে যোজন হবে।

দুইপক্ষে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। একজনকে কতক উপাধি পরিত্যাগ করিতে হয়। একজনকে কতক উপাধি গ্রহণ করিতে হয়। নিরুপাধি ব্রহ্মকে মন দ্বারা উপহিত হইতে হয়। দেহাদি উপাধি যুক্ত জীবকে কামনা সংলগ্ন উপাধি সকল ত্যাগ করিতে হয়। নিষ্কাম মন লইয়া জীবকে মনোময় ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে হয়। এখন দেখি কি করিয়া ঈশ্বর মনোময় হন্ এবং কি করিয়া জীব নিষ্কাম মনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কি করিয়া ঈশ্বর মনোময় হন্

হিরণ্যগর্ভ পুরুষরূপে ঈশ্বর মনোময় হন্। ব্রহ্মা নৈমিত্তিক প্রলয়কালে মনোমধ্যে প্রলয়োন্মুখ জগতের ছায়া অঙ্কিত রাখেন। প্রলয়কালে মনের নাশ হয় না। মনের বৃত্তি সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। সৃষ্টিকালে ঈশ্বরাধিষ্ঠান দ্বারা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার মন প্রথমে প্রকাশিত হয়। সেই মন প্রকাশিত হইলে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল, কর্ম্ম, স্বভাব দ্বারা সৃষ্টির প্রকাশ হয়। প্রথমে নিষ্কাম জীবের হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সহিত মিলন হয়। এই জন্য পরম পুরুষকে স্বতন্ত্রভাবে মনোময় ঈশ্বর হইতে হয় না।

মুণ্ডক শ্রুতির নিম্নলিখিত মন্ত্র বিশেষরূপে বিবেচ্য—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীর নেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ—যাঁহার এই মহিমা ভুবনে প্রকাশিত—সেই আত্মা এই দিব্য হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা। তিনি এই অন্নময় কোষে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিয়া পণ্ডিতেরা সেই অমৃতময় পুরুষকে দেখিতে পান্, যিনি আনন্দরূপে প্রকাশিত হন্।

হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে বিশেষরূপে জানিয়া কিরূপে সেই আনন্দরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় এবং কিরূপে ভগবানের অভিধ্যান হয় তাহা পরে বলিব। এখন জীব কিরূপে নিষ্কাম মনোময় হয় তাহার আলোচনা করা যাউক।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

আমি ও আমার দেহ।

মনোময় কোষ। কামময় দেহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কামময় দেহ সুগঠিত ও আয়ত্তাধীন হইলে আর একটী সুবিধা হয়। ইহলোকে জীবিত অবস্থাতেই সেই দেহ অবলম্বন করিয়া দূরস্থ আত্মীয়-স্বজনাদির সহিত আলাপ করা চলে। মনে করুন আপনি বাঙ্গালা দেশে, আর আপনার বন্ধু আমেরিকায় রহিয়াছেন; আপনার ইচ্ছা হইল বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আপনার কামময় দেহটী যদি আপনার স্ববশে

আসিয়া থাকে, তাঁহা হইলে এরূপ স্থলে আপনি সহজেই তাহাকে স্থূলদেহ হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্ধু সমীপে উপস্থিত হইতে পারিবেন। কিন্তু বন্ধুর যদি সূক্ষ্মদৃষ্টির উন্মেষ হইয়া থাকে তাহা হইলেই তিনি আপনাকে দেখিতে পাইবেন; নতুবা এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন দিতে হইলে চতুষ্পার্শ্ব হইতে স্থূল জগতের উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপনার কামময় দেহটীকে কতক পরিমাণে "স্থূলীভূত" করার প্রয়োজন হইবে। বলা বাহুল্য কামময় দেহ "স্থূলীভূত" হইলে চর্ম্মচক্ষে তাহাকে প্রত্যক্ষ করার আর কোন বাধা থাকে না।

সুতরাং সূক্ষ্ম কামময় দেহকে স্থূলী-করণের উপায়টী ও শিক্ষণীয়। অনেক সময় প্রবল বাসনাবশে এই স্থূলী-করণ আপনা হইতেই ঘটিয়া যায়। মনে করুন "ক" একজন ব্যবসায়ী, ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছেন, যাইবার সময় বিশেষ প্রয়োজনীয় কতকগুলি কাগজপত্র বা কোন গুপ্ত সম্পত্তি গৃহে রাখিয়া গিয়াছেন, অথচ তৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ আত্মীয় স্বজনকে দিয়া যান নাই বা দিবার অবসর পান নাই। এরূপ অবস্থায় সহসা তাঁহার বিদেশে মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে উক্ত সম্পত্তি বা কাগজ পত্র সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গকে উপদেশ দিবার জন্য তাহার প্রাণ স্বভাবতই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অথচ নিকটে এমন কেহ নাই যাহার উপর সেই ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ফলে তাঁহার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল ও ক্রমে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। অধিকাংশ স্থলেই এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার কামময় দেহ আত্মীয় স্বজনগণের নিকট ছুটিয়া যায় এবং সময়ে সময়ে শুধু প্রবল বাসনার বলে স্থূল জগতের উপাদান আকর্ষণ ও আত্মসাৎ করিয়া স্থূলীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন ও মনোমত উপদেশাদি দেয়। এরূপ ঘটনা যে নিতান্ত বিরল নহে, আমাদের মধ্যে অনেকের অভিজ্ঞতাই তাহার সাক্ষী। পন্থার পাঠকবর্গ এরূপ বহু ঘটনার কথাই শুনিয়াছেন, সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে উদাহরণ স্বরূপ আমরা পাঠকবর্গকে পন্থার গত সংখ্যায় প্রকাশিত "পরলোকাগত বর" শীর্ষক গল্পটী আর একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উক্ত গল্পে উল্লিখিত বর বিবাহ করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে দৈব দুর্ব্বিপাকে হত হইয়াও কিরূপে বিবাহ-সভায় সর্ব্ব সমক্ষে

উপস্থিত হইয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে প্রবল বাসনাবশে যে কামময় দেহ সময়ে সময়ে স্থূলীকৃত হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সময়ে সময়ে স্নায়ুর অত্যধিক উত্তেজনা বশতঃ কিয়ৎকালের জন্য আমাদের সূক্ষ্ম-দৃষ্টির উন্মেষ হইতে পারে। রোগ, চিন্তা, শোক প্রভৃতি কারণে স্থূল দেহে জীবনীশক্তির হ্রাস হইলে এই রূপ হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। মনে করুন, পুত্র বিদেশে, সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত,- সংবাদ পাইয়া অবধি স্নেহময়ী জননার চক্ষে আর নিদ্রা নাই, দিবারাত্র ঘোর মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন এরূপ অবস্থায় পুত্র স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া কামময় দেহ অবলম্বনে মাতার সমীপে উপস্থিত হইলে মাতার তাহাকে দেখিতে পাওয়া অসম্ভব নহে। রাত্রিকালে যে সময় স্থূল দেহের জীবনী-শক্তি স্রোতে ভাটা পড়ে, সেই সময়ই এরূপ ঘটনা ঘটিবার প্রকৃষ্ট সময়।

ভূর্লোক ও স্থূলদেহের যেমন সকল উপাদানগুলি সমান স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে, ভুবর্লোক ও কামময় দেহের উপাদানগুলিও সেইরূপ সমান স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে। স্থূলতার তারতম্য অনুসারে এখানকার পদার্থ সমূহকে যেমন সপ্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, ভুবর্লোকের পদার্থ সমূহকেও সেইরূপ সপ্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। তবে ভুবর্লোকের সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ক্ষিতি এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ব্যোম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। সুতরাং এখানকার সূক্ষ্মতম উপাদান নির্ম্মিত দেহ লইয়াও ভুবর্লোকে বিচরণ করা চলে না। তাই ভুবর্লোকে যাইবার সময় এই স্থূল দেহটাকে ফেলিয়া যাইতে হয়। অপিচ সকল কামময় দেহ লইয়া ভুবর্লোকের সর্ব্বত্র যাওয়া যায় না। যে কামময় দেহে ভুবর্লোকের স্থূলতর উপাদানের ভাগ বেশী সে কামময় দেহ লইয়া ভুবর্লোকের সূক্ষ্মতর ও উচ্চতর অংশে বিচরণ করা যায় না সেইজন্য ভুবর্লোকের উচ্চতর অংশে যাইতে হইলে কামময় দেহ হইতে স্থূল আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ভুবর্লোকের এই উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর অংশের নাম দিয়াছেন "পিতৃলোক"। নিম্নতর ও স্থূলতর অংশের নাম "প্রেতলোক"।

যতদিন কামময় দেহ স্থূল দেহের সহিত জড়িত থাকে, অর্থাৎ যতদিন আমরা ইহলোকে জীবিত থাকি, ততদিন কামময় দেহের স্থূল ও সূক্ষ্ম

অংশগুলি পরস্পরের সহিত মিশ্রিত থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাহার বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন ভাবে বিন্যস্ত হয়। এই বিন্যাসের প্রণালী কিছু বিচিত্র; প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তারপর সূক্ষ্ম, তারপর আরও সূক্ষ্মতর—এইরূপ ক্রম অনুসারে স্থূলতম হইতে সূক্ষ্মতম অংশগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়। স্তরগুলির মধ্যে স্থূলতমটী সকলের বাহিরে থাকে। আর সূক্ষ্মতমটী সকলের অভ্যন্তরে থাকে। এই অবস্থায় কামময় দেহকে একটী মোচার সহিত কতকটা তুলনা করা যাইতে পারে। মোচার যেমন সর্ব্বাপেক্ষা পুরু খোলাটী উপরে থাকে, তারপর যতই ভিতরদিকে যাওয়া যায়, ততই খোলাগুলি ক্রমশঃ পাতলা হইতে দেখা যায়, মৃত্যুর পর কামময় দেহেরও সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল অংশটী বহির্ভাগে থাকে, এবং অপর অংশগুলি অভ্যন্তরের দিকে সূক্ষ্মের পর সূক্ষ্মতর ক্রমে বিন্যস্ত থাকে। এই বহির্ভাগের আবরণটীর স্থূলতা অনুসারে ভুবর্লোকে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেটী যেরূপ স্থূল, আমরা ভুবর্লোকের সেইরূপ স্থূল অংশে নিবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হই। যত দিন সে আবরণটী থাকিবে, ততদিন আমাদের তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর অংশে বিচরণ করিবার ক্ষমতা জন্মায় না। যে মুহূর্ত্তে সেই আবরণটী ক্ষয় হইয়া পরবর্ত্তী সূক্ষ্মতর আবরণটী প্রকাশ হইয়া পড়িবে, আমরা অমনি তদনুরূপ সূক্ষ্ম অংশে বিহার করিবার অধিকারী হইব। এইরূপে যতই একটী আবরণের পর আর একটী আবরণ ক্ষয় হইতে থাকে, আমরা ততই ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে গমন করিতে থাকি। যাঁহার কামময় দেহে স্থূল উপাদানের আধিক্য, তাঁহাকে বহুদিন প্রেত-লোকে 'প্রেত' হইয়া থাকিতে হয়। পক্ষান্তরে যাঁহার কামময় দেহ সুমার্জ্জিত ও সুপরিষ্কৃত তিনি সহজেই প্রেত-লোক ছাড়িয়া পিতৃ-লোকে গমন করেন। সুতরাং কামময় দেহ হইতে তাহার স্থূলভাগ যতই ঝরিয়া পড়ে ততই মঙ্গল।

শ্রাদ্ধ-মন্ত্রের দ্বারা এই কার্য্যের কতকটা সহায়তা হয়। কিন্তু মন্ত্রের ফল পাইতে হইলে কিছু দিন ধরিয়া সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য করিয়া তবে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়। কারণ সংযত ব্যক্তি দ্বারা মন্ত্রোচ্চারিত হইলে মন্ত্রের বল বৃদ্ধি হয়। এই সংযম-কাল কতকটা শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার প্রকৃতি ও জীবন-যাপন-প্রণালী এবং কতকটা যাঁহার শ্রাদ্ধ হইতেছে তাঁহার কামময় দেহের অবস্থার উপর

নির্ভর করে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা যদি সাধারণতঃ সংযমী হয়েন তাহা হইলে তাঁহার অধিক দিন ব্রহ্মচর্য্য করিবার প্রয়োজন হয় না। অপিচ যাঁহার শ্রাদ্ধ তাঁহার কামময় দেহ যদি পূর্ব্ব হইতে পরিষ্কৃত থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে উর্দ্ধলোকে তুলিবার জন্য অত্যধিক সংযমের আবশ্যকতা নাই। এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় বিভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন "অশৌচকাল" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে স্থলে শুদ্ধ সংযমী ব্রাহ্মণের দশদিন 'অশৌচ' যথেষ্ট হয়, সে স্থলে স্বভাবতঃ অসংযত-জীবন শূদ্রের একমাস 'অশৌচ' প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাস্তবিক ব্রাহ্মণ যদি যথার্থ ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে তাঁহার মন্ত্র ফলবান করিবার জন্য দশদিনের অধিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আজকাল সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই শাস্ত্রীয় নিয়মে কার্য্য করিলে কতটা ফল পাওয়া যায় তাহা বলা বড় দুরূহ। সম্ভবতঃ শাস্ত্রকারেরা গলদেশস্থ সূত্র বা নামের শেষে পদবী বিশেষের দিকে লক্ষ্য করিয়া এই নিয়মটী বিধিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল জীবনের দিকে। এখানে "ব্রাহ্মণ" শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণ-জীবন-ধারী," "শূদ্র" শব্দের অর্থ "শূদ্র-জীবন-ধারী"। বলিতে কি প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র নিয়ম প্রযোজ্য। শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় একটা মোটামুটী গড় পড়তা হিসাব করিয়া উপরি উক্ত নিয়মটী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

যাঁহারা সংযমী ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, যাঁহাদের ইহজীবন কাম ক্রোধাদি হীন রিপুগণের দ্বারা চালিত হয় না, তাঁহাদের কামময় দেহের স্থূল উপাদান গুলি পরিচালনা অভাবে ক্রমে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। মৃত্যুর পর সেগুলি তাঁহাদিগকে কিছু কালের জন্য প্রেতলোকে টানিয়া রাখে বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। তাঁহারা যতদিন সেখানে থাকেন তত দিন 'ঘুমাইয়া' কাটিয়া যায়। যে নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রেতলোকের স্থূল স্পন্দন সকল অনুভূত হয়, তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয় গুলিই যখন অনুশীলন অভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তখন তথাকার স্পন্দন সমূহ তাঁহাদের কোনরূপ কষ্ট উৎপাদন করিতে পারেনা। ক্লোরোফরম প্রয়োগে হতচেতন ব্যক্তি যেমন অস্ত্রাঘাতের

জান্‌না অনুভব করেনা, তাঁহারাও সেইরূপ সেখানকার কোন ব্যাপার দ্বারা ক্লিষ্ট হন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৬। বর্ণ ও জাতিভেদ।

পঞ্চম মৌলিক জাতির নাম আর্য্যজাতি। এবং এই জাতির সপ্ত *বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের নামও আর্য্যজাতি।* এই জাতির শাসন সংরক্ষণ এবং শিক্ষাকল্পে বৈবস্বান মনু শাসনপ্রণালী ও সমাজপদ্ধতি গঠন এবং বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল গুরুতর কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য পঞ্চম মৌলিক জাতির মধ্যে প্রধান চার শ্রেণীর পিতৃগণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ভৃগুর পুত্রগণের কারণশরীরই সমধিক উন্নত ও কার্য্যকারী ছিল। তাহাদিগকে সোমপ, কব্য বা সৌম্য পিতৃগণ কহে।

পুরাকালে মানবকুলে জন্মধারণোপযোগী জীবসমূহের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বোন্নত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণবর্ণ বা ব্রাহ্মণজাতিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ভৃগুর সন্তান কথিত সোমপ পিতৃগণ এই ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদের ছায়াদান করিয়াছিলেন। এই ছায়াই আদর্শ ব্রাহ্মণগণের সূক্ষ্ম শরীররূপে পরিণত হইল। অঙ্গিরার পুত্র হবিষ্মান্ পিতৃগণের মানসদেহ সমধিক কার্য্যক্ষম ছিল, তাঁহারা যোদ্ধাগণকে তাঁহাদের ছায়াদান করাতে সেই ছায়া ক্ষত্রিয়গণের সূক্ষ্ম শরীর হইল। পুলস্ত্যের পুত্র আজ্যপ (অজপা) পিতৃগণের কামদেহ কার্য্যকারী ছিল। আদর্শ বৈশ্যদের সূক্ষ্ম দেহ নির্ম্মাণের জন্য এই পিতৃগণ তাঁহাদের ছায়াদান করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের পুত্রগণকে সুকালী পিতৃগণ কহে। কখন কখন তাঁহাদিগকে দক্ষের সন্তানও বলা হইয়া থাকে।

তাঁহাদের ছায়াদেহ কার্য্যকারী ছিল। আদর্শ শূদ্রের সূক্ষ্মদেহ নির্ম্মাণের জন্য এই পিতৃগণ তাঁহাদের ছায়াদান করিয়াছিলেন।

এই জাতি চতুষ্টয়ের সূক্ষ্মদেহ মধ্যে এক এক জাতির সূক্ষ্ম দেহে এক, এক বিশেষ বিশেষ বর্ণ প্রাধান্য লাভ করাতে পূর্ব্বে এই চারি জাতিকে চারি বর্ণ বলা হইত। যাঁহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিশালী, তাঁহারা প্রত্যেক জাতির সূক্ষ্মদেহের বিশেষ বিশেষ বর্ণ দ্বারা জাতির পরিচয় পাইয়া থাকেন, এবং কোন্ মনুষ্য কোন্ জাতীয়, তাহা তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ দেখিয়া নিঃসন্দেহরূপে ও অভ্রান্ত ভাবে ঠিক করিতে পারেন।

যাঁহাদের সূক্ষ্মদেহে নীল রং (Indigo colour) প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, তাঁহাদের কারণশরীর ক্রিয়াশীল, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীরে হরিদ্বর্ণ বা সবুজ রং (Green colour) প্রধান ও অত্যুজ্জ্বল, তাঁহাদের মনোময় দেহ ক্রিয়াশীল, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। যাঁহাদের সূক্ষ্ম দেহে লোহিত বর্ণ (Red colour) প্রধান ও অতিশয় উজ্জ্বল, তাঁহাদের কামদেহ ক্রিয়াশীল, তাঁহারাই বৈশ্য। এবং যাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীরে বেগুণে রং (Violet colour) প্রধান ও সাতিশয় উজ্জ্বল, তাঁহাদের ছায়াদেহ (Etheric Double) ক্রিয়াশীল, তাঁহারাই শূদ্র।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতির বা বর্ণের ইহাই মূল কারণ ও গূঢ় তত্ত্ব। এই জন্যই ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত মানবের পক্ষে জাতি পরিবর্ত্তন ও জাত্যন্তর গ্রহণ অসম্ভব। মানুষের জাত্যন্তর গ্রহণ করিতে হইলে, পূর্ব্ব কর্ম্মফলে ইহজীবনে যে সূক্ষ্ম শরীর লাভ করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতনরূপে তাহা গঠিত করিতে হইবে। ইহা রাজা বা মন্ত্রিসভার আইন কানুনের দ্বারা, অথবা কোন সভা সমিতির প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার বিষয় নহে।

এই বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণেরই কয়েকটী বিশেষ বিশেষ গুণ আছে। এই গুণগুলি স্বভাবজাত অর্থাৎ জন্ম হইতেই লোকে সঙ্গে লইয়া আইসে। তাহা স্ব স্ব চরিত্রের সঙ্গে গ্রথিত থাকে। তদ্দ্বারা লোকের বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রের এই বিশেষ বিশেষ গুণ বিদ্যমান থাকাতেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে।

তাহাতেই পুরাকালে এই বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণেঃ ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ॥
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

গীতা।

কর্ম্ম বিভাগানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষানুক্রমে এইরূপে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাতে কালক্রমে সমাজে তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বহু জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কাল প্রভাবে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে জাতিভেদ কথিত বর্ণগত বা গুণগত নহে। এখন সার ভাগটীর প্রতি আর লোকের তত লক্ষ্য নাই, কেবল খোসার দিগে নজর।

পুরাকালে এক জীবনেই এক বর্ণের লোক উন্নতিলাভ করিয়া উচ্চতর বর্ণে উন্নীত হইতে পারিত। এখনও যে তাহা সম্পন্ন না হইতে পারে এমন নহে তবে এক উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে না। পিতৃগণের সাহায্য ব্যতীত বর্ণান্তর গ্রহণের আর উপায় নাই। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেই জীবনেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্য তপোবলে এবং যোগবলে পিতৃগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণের সূক্ষ্মদেহোপযোগী এক নূতন ছায়া দান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি মহাতপা ব্রাহ্মণ হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

যদি আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থাদি সত্য হয় ও তাহাদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তবে বলিতে হইবে যে এক জাতি হইতে জাত্যন্তরে

উন্নীত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা বড় শক্ত কাজ, সহজসাধ্য নহে। পিতৃগণের সাহায্য ভিন্ন কেবল মানুষের কথায় তাহা কখনই হইবার নহে।

এই জাতিভেদ সম্বন্ধে আজকাল দুই শ্রেণীর লোক দুইটী ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। এই দুইটী মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। তন্মধ্যে এক মতাবলম্বীগণ বলেন যে জাতি বিশেষে জন্ম লাভই মানবের প্রকৃতজাতি। গুণের দরকার কি? জাতি গুণ সাপেক্ষ নহে। অপর মতাবলম্বীগণ বলেন, জাতি বিশেষে জন্মলাভ কবা কিছুই নহে। গুণই মূল। জাতি বিশেষের প্রকৃত গুণ থাকা চাই; গুণ না থাকিলে তাহাকে সেই জাতির লোক বলা যায় না! যাঁহার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণের গুণ আছে তিনি শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য। কিন্তু এই দুইটী পবস্পর বিবোধী মতের মধ্যে একটীতেও পূর্ণ সত্য বিদ্যমান নাই, কারণ জাতি বিশেষে জন্ম লাভ, কোনরূপ খাম খেয়ালি ভাবে বা বিনা কারণে, যদৃচ্ছাক্রমে হয় না। জীবের সূক্ষ্ম দেহ এবং স্থূল শরীর একই নিয়মে গঠিত হইয়া থাকে। পরন্তু জীব যে জাতির সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণের উপযোগী ও যে জাতির সূক্ষ্ম শরীব লইয়া জন্মলাভ করে, তাহার স্থূল শরীরও যথাসম্ভব সেই জাতির অনুরূপই হইয়া থাকে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল জাতি বিশেষে জন্মলাভ করিলেই বা কেবল জাতি বিশেষের গুণ পাইলেই মানুষকে সেই জাতীয় বলা যাইতে পারেনা। জন্ম এবং গুণ, এই উভয়ের একত্র সমাবেশ চাই। ব্রাহ্মণের শম দমাদি গুণ ব্যতীত কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মলাভ করিলেই যেমন ব্যক্তি বিশেষকে ব্রাহ্মণ বলা চলেনা, সেইরূপ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মলাভ না করিয়া কেবল ব্রাহ্মণের গুণ সম্পন্ন হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারেনা। একাধারে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মলাভ ও ব্রাহ্মণের গুণ সম্পন্ন হইলেই মানুষ প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য হয়। নতুবা নহে। অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। জাতি ও বর্ণে, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে, পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। একটী অপরটীর সাপেক্ষ। জীব যে জাতিতে জন্মলাভ করে, তাহাতে সেই জাতির গুণও অর্শে। তবে কাল মাহাত্ম্যে সমাজে এখন নানা মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে মানবের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্তের বর্ণনা করা হইয়াছে; এই অধ্যায়ে দৈহিক ইতিবৃত্ত বলা হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মানসিক ইতিবৃত্ত

বলা হইবে। এই মানসিকটী আধ্যাত্মিক ও দৈহিক, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং সংযোজক। যুগল সেবক।

শ্বেত সরোজোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রহ্লাদের তপস্যা সিদ্ধ হইলে ভগবান আসিয়া তাঁহাকে যখন বর দিতে অগ্রসর হইলেন, তিনি বলিয়াছিলেন :—

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তি কামা।
মৌনং চরন্তি বিজনেন পরার্থ নিষ্ঠাঃ॥
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো।
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

হে দেব মুনিগণ প্রায় নিজ মোক্ষ অভিলাষ করিয়া নির্জ্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন,—পরের জন্য তাঁহাদিগের যত্ন নাই। এই সমস্ত দীন বালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমি মুক্তি কামনা করিনা। ইহাই যথার্থ ভক্তি, ইহাই যথার্থ প্রেমের সাধনা। এই সাধনার উপর ব্র্যাভাট্‌সকির সমস্ত জীবনের কর্ম্ম নির্ভর করিয়া আছে। বহু সপত্নীর ন্যায় অতৃপ্তা রসনা এক দিকে. শিশ্ন অন্যদিকে, ত্বক, উদর ও শ্রবণ অন্য কোন দিকে; নাসিকা ও চপলচক্ষু অপরদিকে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আর কোনদিকে মানবকে ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে। এই প্রকার সংসার-বৈতরণী নদী মধ্যে নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা পতিত,—পরস্পর সম্ভূত জন্ম ও মরণ দ্বারা অতীব ভীত, ভেদ বুদ্ধিশালী এই মূঢ় লোকদিগকে তাহাদিগের অজ্ঞানতার মধ্যে ফেলিয়া তিনি কিরূপে আপনার মোক্ষ লাভেপ্সু হইবেন। এটী বড় সামান্য স্বার্থ ত্যাগ নহে। তবে তিনি বিসর্জ্জনানন্দের ভাব অন্তরে ধরিয়াছিলেন তাই তিনি [illegible]দানন্দ।

ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত জাতিতেই অল্প বিস্তর ভাবে পরিস্ফুট আছে, কিন্তু মানবের কর্ম্মদোষে তাহার উপর এতদূর কলঙ্ক ও আবর্জ্জনা আশ্রয় করিয়াছে

যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার প্রকৃত জ্যোতিঃ হারাইয়া স্বার্থপর লোকের বাণিজ্যপণ্য রূপে পরিণত হইয়াছে। Mabel Collins (ম্যাবেল কলিন্স) এই ব্রহ্মবিদ্যাকে শ্বেত শতদলের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—The Royal Flower of Egypt dwells upon the sacred waters which in their purity and peace fitly furnish its external resting place. I am the Spirit of this Flower ; I am sustained upon the waters of Truth and my Life is formed of the breath of the Heavens, which is Love. But the degradation of my earthly resting place, over which my wings of love brood is driving from it the Light of heaven which is Wisdom. Not long the Spirit of White Lotus live in darkness ; the flower droops down and dies, if the Sun be withdrawn from it.

এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অপসরণার্থেই জগতে আধ্যাত্মিক নিয়ন্তারা তাঁহাদিগের প্রিয় শিষ্যাকে কার্য্যক্ষম বিবেচনা করিয়া এই দুরূহ ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। এই উৎসব হেলেনার প্রতি শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয় নাই। অশ্রু, দেবতার অমৃতভাণ্ড হইতে নিসৃত সত্য, কিন্তু সে অশ্রু শোকের নহে, তাহা ভক্তির, তাহা উৎসর্গের। যে ব্রহ্মবাদিনী কত জন্ম জীবের হিতের তরে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং এখনও অন্তর্লোকে সেই হিত ব্রতে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার তরে কি ক্ষুদ্রশোক করিবে ভাই ? সেই ক্ষুদ্রশোক তাঁহার নিকটে কি পৌঁছিতে পারে ? আমরা যদি নিজেদের জীবন জগতের হিতার্থে উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা জগৎহিতে উদ্‌যাপিত জীবনা মহারমণীকে স্পর্শ করিতে পারিবে, নতুবা নহে। তুমি যদি বাহ্যশোকে পৃথিবী ভাসাইয়া দাও, তাহা হইলেও তাঁহার বৃত্তান্ত সেথানে কেহ বহন করিবেনা ; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যদ্যপি কখনও আপনার স্বার্থ ভুলিয়া কাহারও তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে ক্ষণিকের তরে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকশিত করিয়া দাও অমনি দেখিবে জগৎমাতা তোমাকে অঙ্কে রাখিয়াছেন। তুমি যদি ভাই, কেবল আপনার শক্তির ও অর্থের প্রচারার্থে, ফুল্ল কোকনদে জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া, মহা মহা পণ্ডিত আময়ন

করিয়া সমগ্রগীতা ব্যাখার সহিত অধ্যয়ন করিয়া, যদি লক্ষ লক্ষ অতিথিগণকে আহার্য্য ও বস্ত্র দিয়া উল্লসিত মানসে ভাব যে, 'ম্যাডাম' তোমার অর্থে ও শক্তিতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে ভাই, নিশ্চিত জানিও তোমার কল্পনা অমূলক কল্পনার দূর ছায়া মাত্র। এইরূপ নিকৃষ্ট স্বার্থের তামসিক স্পন্দন তাঁহাদের নিকট হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকে। আমরা কি সামান্য অর্থের ও শক্তির জন্য অহঙ্কার করি। যে সামান্য শক্তি ও অর্থ আমাদের নিজের স্বার্থের সামান্য অভাব মোচন করিতে পারেনা তাহা মহাপুরুষদিগের অধীনে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত অনন্ত রত্নভাণ্ডারের তুলনায় কপর্দ্দকও নয়। তাঁহারা কি এই অর্থের সং সামান্য অংশও আপনার তরে কখনও ব্যবহার করেন? তবে আর অর্থ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে কি আকর্ষণ করিবে। তবে চাই কি? চাই জগৎ মাতান ভক্তি, চাই জীবন জগতের তরে উৎসর্গ। শ্রীমতী হেলেনা, আপনার স্মৃতি রাখিতে এই উৎসব প্রচার করিয়া যান নাই। তাহা হইলে White Lotus day শ্বেতশতদলোৎসব না হইয়া, ইহার নাম Blavatsky day ব্ল্যাভট্স্কি উৎসব হইত।

ভাই, তুমি, আমি, সকলেই আজ সমাজে গণ্য মান্য হইব বলিয়া সতত ঘুরিতেছি ফিরিতেছি, কতই যে কি করিতেছি তাহার গণনা নাই, সকলে তোমাকে এখন কত আদর করিতেছে; কিন্তু ভাই কাল বসিয়া আছে—আজ তুমি আদরের শীর্ষে বসিয়া আছ, কাল কে জানে তোমাকে ঘৃণায় মৃতপ্রায় হইতে হইবে। তবে ভাই পার্থিব বিষয়ে তুমি বা আমি শ্রীচরণে কেন দুঃখী বা সুখী মনে করি। আমাদের যাহাকিছু দোষ বা গুণ আছে ভগবতীর উৎসর্গ করিয়া দিই এস, একবার অনন্তের দিকে হৃদয় উন্মুক্ত করিলে তিনি আপন শক্তির জ্যোতিতে দোষ বা গুণকে শোধিত করিয়া দিবেন। বিষয় ভোগেচ্ছা আমাদিগের অতিশয় প্রবল, তাহাই ইহা সুসাধ্য হয় না। কিন্তু ইহার একটী উপায় আছে। পূর্ণকাম স্বরূপিনী শান্তিরূপা জগজ্জননী দুর্গার অঙ্কলাভে কৃতার্থ, কামজয়ী, মহাপুরুষগণের এবং তাঁহাদিগের শিষ্যের করুণা প্রার্থনাই সেই এক মাত্র উপায়। তাঁহারা সাধনাদ্বারা ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর স্তন্যপান করিয়া যে ব্রহ্মতেজ হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাও জগতের ও আমাদিগের জন্য, সেই ব্রহ্মতেজবিন্দু তাঁহারা যাহাকে দেন,

সর্ব্বভূতস্থা ব্রহ্মময়ী তাঁহার হৃদয়ে দেখা দেন। এস ভাই, আমরা মহাপুরুষগণের নিকট হইতে এই ব্রহ্মতেজবিন্দু লাভের চেষ্টা করি। তাঁহারা সোমরসাত্মক চন্দ্রবিন্দু হৃদায় ধরিয়া আছেন, তাহা ও যজ্ঞের উদ্দেশে—আমরা যদ্যপি আমাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ অগ্নি জ্বালিতে পারি তাহা হইলে তাঁহারাও ওই বিন্দু আহুতি দিবেন। গুরুদেব, আমি যাহা কিছু দেহের কর্ম্ম বা জ্ঞানের কর্ম্ম করিতেছি, তাহা উৎসর্গীত করিয়া দিতেছি, এই ভাবকে অগ্নি বলিতেছি। এই অগ্নি জ্বলিতে আরম্ভ করিলেই তাঁহাদিগের দৃষ্টি অমনি পতিত হয়। অপদেবতাগণ অমনি সরিয়া যান এবং অগ্নি সম্পূর্ণ হইলে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হইলে, সাধক গুরু ও ব্রহ্মময়ী মিসাইয়া এক হন। ইহাই যথার্থ ব্রহ্ম বস্থা। এবং এই উদ্দেশ্যেই আধুনিক ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি (Theosophical Society) ঋষিপুত্রি ও শিষ্যা পূ[illegible] মাতা হেলেনার দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

এই ব্রহ্মবিদ্যার উৎসবের দিনে, আমরা হেলেনাকে পূজা করি। তাঁহাকে ভুলিলে,তাঁহার প্রতি ভক্তি হারাইলেই এই আধ্যাত্মিক মহাশক্তির কেন্দ্র হইতে আমরা সরিয়া পড়িব, ইহার স্নিগ্ধ গম্ভীর স্পন্দন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই মহা সমিতিতে প্রবেশ করিয়া, অথচ তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তিশূন্য হইয়া অবস্থান করা বিড়ম্বনা। যদ্যপি যথার্থ মুক্তিপিপাসু হইয়া থাক, যদি যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যায় আস্থা থাকে, যদি যথার্থ এই মহাশক্তি-স্রোতে জীবনকে ভাসাইতে সাধ থাকে, পূতসলিলা দেবগঙ্গায় আত্মহারা হইবার বাসনা থাকে, তবে এস ভাই, অদ্যকার পুণ্যদিন হইতে ব্রহ্মাণ্ডময় শ্বেত কহ্লারের সমুদ্র মাঝে, রজত পঙ্কজের শ্বেত তরঙ্গ মাঝে দৈব প্রকৃতির বিকচ কমলের অমানুষী,অপূর্ব্ব, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মাঝে,তাহার কিরণে উজ্জ্বলিত মানবদেবী হেলেনাকে ভাবিতে, ভাবিতে আমাদের জীবন, শক্তি ও জ্ঞান, জগতের হিতের তরে উৎসর্গ করিতে আরম্ভ করি। তাহা হইলে যবনিকা অন্তরালে যে মহাপুরুষদ্বয় আপনাদিগের অনন্ত সুখ ছাড়িয়া পরহিত-ব্রতে নিরত, তাঁহাদের অনুগ্রহলাভ করিবে ; তাহা হইলে আশ্রয়হীন, ভরসাহীন, জীবন তরির একটি অবলম্বন হইবে, এক মহামূল্য রত্নের অধীশ্বর হইবে, যাহার জন্য তোমার স্থান পৃথিবীর রাজা হইতে অনেক উচ্চে স্থাপিত

হইবে। এস ভাই, আমরা সমস্বরে একবার বলিয়া লই হেলেনাইঃ নমঃ। এস বলিয়া লই শ্রীগুরবে নমঃ, শ্রীগুরুদেবায় নমঃ, শ্রীইষ্টদেবায় নমঃ॥

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কস্তুরী প্রকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তপঃ পূরং পাথোমুচমিব মরুৎসংহরতি যঃ
কৃপা কেলিং মুস্তাঙ্কুরমিব বরাহঃ খনতি যঃ।
সুহৃদ্ ভাবং নাশং হিমমিব পয়োজং নয়তি যঃ
স কোপঃ সাটোপঃ প্রবিশতি সতাং চেতসি কিমু।৩৪।

যঃ কোপঃ (ক্রোধঃ) মরুৎ (বায়ু) পয়োমুচং (মেঘং) ইব, তপঃ পূরং (তপঃ সমূহং) সংহরতি (অপনয়তি) তথা যঃ (কোপঃ) বরাহঃ (শূকরঃ) মুস্তাঙ্কুরং (মুস্তাপ্ররোহং) ইব, কৃপাকেলিং দয়া কেলিং) খনতি (উৎপাটয়তি) যঃ কোপঃ হিমং (শিশিরং) পয়োজং (পদ্মং) ইব, সুহৃদ্ভাবং (সৌহার্দ্দং) নাশং নয়তি (বিনাশয়তি) স (তাদৃশঃ) কোপঃ (রোষঃ) সাটোপঃ (আটপেন সহ বর্ত্তমানঃ সন্) সতাং (সাধুজনানাং) চেতসি (মনসি) প্রবিশতি কিমু? (প্রবিশতি কিং?) ন প্রবিশত্যেব, সাধু চেতসি কোপস্য প্রবেশঃ অসম্ভব ইতি ভাবঃ। ৩৪।

বায়ু যেমন মেঘ সমূহকে সংহার করে, সেইরূপ যে তপঃ সমূহকে সংহার করে; শূকর যেমন মুথা উৎপাটিত করে, সেইরূপ যে দয়াকে উৎপাটিত করে, হিম যেমন পদ্মকে নষ্ট করে, সেইরূপ যে সৌহার্দ্দ নষ্ট করে; সেই কোপ সগর্ব্বে সাধু ব্যক্তিদিগের চিত্তে প্রবেশ করে কি? (সাধুচিত্তে ক্রোধ স্থান পায় না)। ৩৪।

তে ধন্যা অভিবন্দনীয়মিহ তৎ পাদারবিন্দদ্বয়ং
তে পাত্রং সকল শ্রিয়াং জগতি তৎকীর্ত্তির্নরীনর্ত্তি চ
তন্মাহাত্ম্যমসন্নিভং সুরনরা সর্ব্বেঽপি তৎ কিঙ্করা
যে কোপদ্বিপ সিংহশাব সদৃশং স্বান্ত শমং বিভ্রতি।৩৫।

যে জনা ইতি শেষঃ। কোপদ্বিপ সিংহশাব সদৃশং (কোপঃ ক্রোধঃ দ্বিপঃ হস্তী ইব, তস্য সিংহ শাব সদৃশং কেশরি শিশু তুল্যং ক্রোধ বিনাশক মিত্যর্থঃ) শমং (শমগুণং) স্বান্তে (আত্ম চেতসি) বিভ্রতি (ধারয়ন্তি) তে ধন্যাঃ, তৎপাদারবিন্দদ্বয়ং (তেষাং পাদপদ্মযুগলং অভিবন্দনীয়ং (পূজ্যং) তে সকল শ্রিয়াং (সর্ব্বসম্পদাং) পাত্রং, তৎকীর্ত্তিঃ (তেষাং যশঃ) ইহ জগতি (ভুবনে) নরীনর্ত্তি (ভৃশং নৃত্যতি) তন্মাহাত্ম্যং (তেষাং মহিমা) অসন্নিভং (অসদৃশং) (নিরুপম মিত্যর্থঃ) সর্ব্বে (সমস্তাঃ) সুরনরাঃ (দেবমনুষ্যাঃ) তৎকিঙ্করাঃ (তেষাং দাসাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। ৩৫।

যাঁহারা কোপরূপ হস্তীর বিনাশক সিংহশিশু সদৃশ, শমগুণকে চিত্তে ধারণ করেন এ জগতে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদের পাদপদ্মদ্বয় পূজ্য, তাঁহারাই সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী, এবং তাঁহাদের যশঃ জগতে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করে, তাঁহাদের মাহাত্ম্য অনুপম ; দেবতা এবং মনুষ্যেরাও তাঁহাদের কিঙ্কর সদৃশ হয় ॥৩৫॥

বন বহ্নির্নবঃ কোঽপি কোপরূপঃ প্ররূপিতঃ
আন্তরং যত্তপোবিত্তং ভস্মসাৎ কুরুতে ক্ষণাৎ।৩৬।

কোপরূপঃ (ক্রোধরূপঃ) কোঽপি নবঃ (নবীনঃ) বনবহ্নিঃ (দাবানলঃ) প্ররূপিতঃ (অঙ্গীকৃতঃ) যঃ ক্রোধরূপো বহ্নিঃ আন্তরং (মানসং) (তপোধনং) তপোবিত্তং, ক্ষণাৎ (ক্ষণকালেনৈব) ভস্মসাৎ কুরুতে (করোতি)। ৩৬।

কোপ নূতনতর দাবানল রূপে স্বীকৃত, যেহেতু ঐ কোপানল ক্ষণকাল মধ্যে মানস তপঃ সম্পদকে ভস্মীভূত করে। ৩৬।

জাত্যৈশ্বর্য্য বল শ্রুতান্বয় তপোরূপোপলব্ধি শ্রিতং
গর্ব্বং সর্ব্বগুণৈক পর্ব্বত পবিংমাত্মন্ কৃথাঃ সর্ব্বথা
সঙ্গং গচ্ছন্তি যত্র যত্র যদসৌ তত্তদ্বিনা সাম্পদং
প্রেত্য প্রাণ ভৃতো ভবন্ত্যভিমত প্রাপ্তিপ্রহীণাঃ ক্ষণাৎ।৩৭।

আত্মন্ (দেহিন্) জাত্যৈশ্বর্য্যবল শ্রুতান্বয় তপোরূপোপলব্ধিশ্রিতঃ (জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিঃ ঐশ্বর্য্যং সম্পৎ, বলং সামর্থ্যং শ্রুতং—বিদ্যা অন্বয়ঃ—কুলং তপঃ তপস্যা, রূপং সৌন্দর্য্যং, তেষাং উপলব্ধিঃ লাভঃ তং শ্রিতঃ আশ্রিতঃ তং) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারেণ) সর্ব্বগুণৈক পর্ব্বত পবিং (সর্ব্বে গুণাএব পর্ব্বতাঃ তেষাং পবিঃ বজ্রং তং) গর্ব্বং (অহঙ্কারং) মা কৃথাঃ (ন কুরু) যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ

অসৌ (অয়ং গর্ব্বঃ) যত্র যত্র (যস্মিন্ যস্মিন্) সঙ্গং গচ্ছতি (ব্রজতি) তৎতৎ বিনাশাস্পদং (বিনাশকারণং) ভবতীতি শেষঃ। প্রাণভৃতঃ (জীবাঃ) ক্ষণাৎ (ক্ষণকালেনৈব) প্রেতা (প্রেতীভূয় মৃত্যুপ্রাপ্যা ইত্যর্থঃ) অভিমত প্রাপ্তি প্রহীনাঃ (স্বাভিষ্ট প্রাপ্তি বিহীনাঃ) ভবন্তি ক্ষণেনৈব মরণান্তরং জাত্যাদয়ো বিনশ্যন্তি অতঃ তমবলম্ব্য গর্ব্বো ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। ৩৭।

হে জীব, জাতি, ঐশ্বর্য্য, বল, বিদ্যা, এবং রূপের লাভে মত্ত হইয়া সর্ব্ব-গুণরূপ পর্ব্বতের বজ্র স্বরূপ অহঙ্কারকে স্থান দিও না। যেহেতু অহঙ্কার যেখানে যেখানে স্থান পাইয়াছে সেখানেই বিনাশের কারণ হইয়াছে। জীব-গণ ক্ষণকাল মধ্যে কালের কবলগত হইয়া অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। (মৃত্যু হওয়াতে ক্ষণকাল মধ্যে অনিত্য জাতিকুল প্রভৃতি লুপ্ত হইয়া যায় অতএব ঐ সকল লইয়া গর্ব্ব করা উচিত নয়)। ৩৭।

ঔচিত্য চারু চরিতাম্বুজ শীত পাদং।
সৎকর্ম্ম কৌশল কুমুদ কঠোর পাদং।
সংসেব্য সেবন বন দ্রুম সামযোনিং
মানং বিমুঞ্চ সুকৃতাম্বুধি কুম্ভযোনিং॥ ৩৮॥

ঔচিত্য চারু চরিতাম্বুজ শীত পাদং (ঔচিত্যমেব চারু চরিত্রম্ মনোজ্ঞ চরিত্রং তদেব অম্বুজং পদ্মং তস্য শীত পাদং চন্দ্রং) ঔচিত্য চারু চরিত্র বিনাশকম্ ইত্যর্থঃ। সৎকর্ম্ম কৌশল কুমুদ কঠোর পাদং (সৎকার্য্য নৈপুণ্য মেব কুমুদং তস্য সূর্য্যং সূর্য্যো যথা কুমুদং নাশয়তি তদ্বৎ সৎকর্ম্ম কৌশল বিনাশকমিত্যর্থঃ সংসেব্য সেবন বন দ্রুম সামযোনিং (সম্যক্ সেবনীয়ঃ সেবনারণ্য বৃক্ষঃ তস্য হস্তিনং সেবন বিনাশকমিত্যর্থঃ)। সুকৃতানাং পুণ্যাণাং অম্বুধিঃ সমুদ্রঃ তস্য কুম্ভ যোনিং অগস্ত্যং সুকৃত বিনাশকং ইত্যর্থঃ তথাভূতং মানং (অহঙ্কারং) বিমুঞ্চ ত্যজ। ঔচিত্য সৎকর্ম্ম সেবন সুকৃত বিনাশকস্য মানস্য ত্যাগোঽবশ্যং কর্ত্তব্য ইত্যাশয়ঃ। ৩৮।

ঔচিত্যরূপ চারুচরিত্র কমলের বিনাশক চন্দ্র সদৃশ সৎকর্ম্মনৈপুণ্যরূপ কুমুদের বিনাশক সূর্য্যসদৃশ সুখসেব্য সেবনরূপ বনবৃক্ষের বিনাশক হস্তী-সদৃশ এবং পুণ্য সাগরের বিনাশক অগস্ত্যমুনি সদৃশ অহঙ্কারকে পরিত্যাগ কর। ৩৮।

বিপদাং সদ্ম গর্ব্বোঽয়মপূর্ব্বঃ পর্ব্বতঃ স্মৃতঃ।
প্রাপ্নুবন্ত্যুদ্ধমূর্দ্ধানো যমারূঢা অধোগতিং। ৩৯।

বিপদাং (আপদাং) সদ্ম (স্থানং) অয়ং (এষঃ) গর্ব্বঃ অহঙ্কারঃ) অপূর্ব্বঃ (অভিনবঃ) পর্ব্বতঃ (গিরিঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ) যং গর্ব্বপর্ব্বতং আরূঢাঃ (অধিরূঢাঃ) উদ্ধমূর্দ্ধানঃ (উন্নতমস্তকাঃ) অধোগতিং (অধঃপতনং) প্রাপ্নুবন্তি (লভন্তে) অহঙ্কারিণোঽচিরাদেবাধঃ পতন্তীতিভাবঃ। ৩৯।

আপদের আবাসস্থান অহঙ্কার, অভিনব পর্ব্বতসদৃশ যাহাতে আরোহণ করিয়া উন্নতশিরঃ পুরুষেরাও অধোগতি পায়। ৩৯।

দষ্টো যেন জনো জহাতি বিনয় প্রাণান্ প্রসিদ্ধি প্রদান্
যদ্দষ্টেন বিবেকনীতিনয়নে সংমীলা সংস্থীয়তে।
যদ্দষ্টস্য চ কীলকীলিত মিব স্তব্ধং বপুর্জায়তে
দর্পংসর্পমিবাতিজিহ্মগহনং কস্তং স্পৃশেৎ কোবিদঃ। ৪০।

যেন (দর্পেন) দষ্টঃ জনঃ (প্রাণী) প্রসিদ্ধি প্রদান্ (খ্যাতিদায়কান্) বিনয়প্রাণান্ (বিনয়া এব প্রাণাঃ জীবনানি তান্) জহাতি (ত্যজতি) তথা যদ্দষ্টেন (যেন দর্পেন দষ্টঃ তেন) বিবেকনীতি—নয়নে (বিবেকঃ বিচারঃ নিস্তীর্ণয় ইতি নেনয়নে চক্ষুষী) সংমীল্য (মীলয়িত্বা) সংস্থীয়তে (অবস্থীয়তে) তথা যদ্দষ্টস্য (যেন দষ্টস্য জনস্য ইতি শেষঃ) বপুঃ (শরীরং) কীলকীলিতং (অর্গলাবদ্ধং) ইব স্তব্ধং (নিশ্চলং) জায়তে (ভবতি) তং সর্পং (অহিং) ইব অতিজিহ্মগহনং (অত্যন্ত ভয়প্রদং) দর্পং (অহঙ্কারং) কঃ কোবিদং (পণ্ডিতঃ) স্পৃশেৎ (স্পর্শং কুর্য্যাৎ) ন কোঽপীতি ভাবঃ। ৪০।

যাহার দংশনে খ্যাতিপ্রদ বিনয়রূপ প্রাণ পরিত্যাগ করে, যাহার দংশনে বিবেক ও নীতিরূপ নয়নদ্বয় নিমীলিত হয়, যাহার দংশনে মানবশরীর কীলকবদ্ধ বস্তুর ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকে, সেই সর্প সদৃশ অতিভয়ানক দর্পকে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি প্রশয় দেয়? ৪০।

দম্ভং বকা ইব বিধায় দুরাশয়া যে
মীনানিবাখিল জনান্ প্রতিবঞ্চয়ন্তি।
তৈ সৌহৃদাদমল কীর্ত্তি লতা পয়োদা
দাত্মা প্রপঞ্চ চতুরোঽ চতুরৈরবঞ্চি। ৪১।

যে দুরাশয়া (দুষ্টতৃষ্ণয়া) দম্ভং (কাপট্যং) বিধায় (অবলম্ব্য) বকাঃ (বকীকাঃ) মীনান্ (মৎস্যান্) ইব জনান্ প্রাণিনঃ প্রতিবঞ্চয়ন্তি— প্রতারয়ন্তি) তৈঃ অচতুরৈঃ (দুর্বুদ্ধিভিঃ) অমল কীর্ত্তিলতাপয়োদাৎ (নির্ম্মল যশ-লতায়াঃ মেঘাৎ কীর্ত্তি বর্দ্ধকাদিতিভাবঃ) সৌহৃদাৎ (সৌহার্দ্দাৎ) প্রপঞ্চচতুরং (প্রপঞ্চ কুশলং) আত্মা অবঞ্চি (বঞ্চিতঃ)।

যাহারা দুরাশা হেতু কপটতাবলম্বন করিয়া বকেরা যেরূপ মৎস্যগুলিকে প্রবঞ্চনা করে সেইরূপ জীবসমূহকে প্রবঞ্চনা করে; সেই অচতুর পুরুষেরা নির্ম্মল কীর্ত্তিলতার বর্দ্ধনকারী জলদ সদৃশ সৌহার্দ্দ হইতে প্রপঞ্চ চতুর আত্মাকে বঞ্চিত করে। ৪১।

মায়া মিমাংকুটিলশীলবিহার বিজ্ঞাং
মন্যামহে হৃদি ভুজঙ্গ বধূং নবীনাং।
দষ্টোঽনয়া স্মিত সরোজ সহোদরাস্যো
মোহংনয়েদ্ যদি তবান্মধুরং ব্রুবানঃ। ৪২।

ইমাং মায়াং, হৃদি কুটিলশীলবিহারবিজ্ঞাং (কপটাচার বিহার পণ্ডিতাং) নবীনাং (অভিনবাং) ভুজঙ্গবধূং (ভুজঙ্গীং) মন্যামহেং যৎ যতঃ, অনয়া দষ্টঃ জনঃ ইতিশেষঃ স্মিতসরোজ সহোদরাস্যঃ (ঈষদ্ধাস্যরূপকমলযুক্ত বদনঃ সন্) মধুরং (শ্রুতি সুখকরং, ব্রুবানঃ (কথয়ন্) ইতরান্ (কাপাট্যরহিতান্ ইতি-শেষঃ) মোহং নয়তি (প্রাপয়তি)। ৪২।

কপটাচারনিপুণা মায়াকে আমি অভিনবা ভুজঙ্গী বলিয়া মনে করি; যেহেতু ঐ ভুজঙ্গদষ্ট মানব হাস্যমুখে মধুর কথা বলিতে বলিতে অপর সরল-হৃদয় পুরুষোত্তমদিগকে মুগ্ধ করে। (অন্য ভুজঙ্গদষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় মায়া ভুজঙ্গীদষ্ট ব্যক্তির তাৎকালিক মৃত্যু হয় না কিন্তু ঐ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া আত্মজ্ঞান শূন্য হয় ও অন্যকে মোহিত করে, এইজন্য মায়াকে নূতনতরা ভুজঙ্গী বলা হইল)। ৪২। (ক্রমশঃ)

অলৌকিক ঘটনা।

এই মহানগরী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুইটী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠার নাম ইন্দুবালা, কনিষ্ঠার নাম চারুবালা। দেখিতে দেখিতে ইন্দুবালা বড় হইয়া উঠিল, হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে তাহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িল। কন্যার বিবাহের জন্য তিনি বিস্তর চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, অনেক চেষ্টার পর একটী সুপাত্র মিলিল কিন্তু অর্থাভাববশতঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহা বিপদে পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বসতবাটী বন্ধক দিতে মনস্থ করিলেন। অবশেষে সেই উপায় অবলম্বনেই ইন্দুবালাকে ইহ-জীবনের মত সেই মনোনীত সৎপাত্রের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন—এবং স্নেহপালিতা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সুপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া বড়ই সুখ বোধ করিলেন।

বিবাহের অচিরকালমধ্যেই ব্রাহ্মণের স্নেহের কন্যা ইন্দুবালা দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইল। নানাবিধ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল, সকলই ব্যর্থ হইল, করাল কাল আসিয়া অকালে তাহার প্রাণবায়ু হরণ করিল। ব্রাহ্মণের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শোক দুঃখে তিনি অতীব কাতর হইয়া পড়িলেন।

সময়স্রোতে সকলই ভাসিয়া যায়। ক্রমে তাঁহার শোকদুঃখ কতক উপশমিত হইল। তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন। দুঃখের অকূল পাথারে পড়িয়াও মানুষ সুখের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—"এই সুপাত্র হস্তান্তরিত করা হইবে না, ইহার সহিত যে স্নেহের সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া গিয়াছে তাহা আর ছিন্ন করা হইবেনা, চারুবালাকে ইহার হস্তে সমর্পণ করি, তাহা হইলে সমস্তই বজায় থাকিবে।" পরে তাহাই হইল। সেই পাত্রের সহিত চারুবালার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিয়তির গতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নহে। সুখ দূরে থাকুক, এই বিবাহের পর হইতে আবার এক নূতন দুঃখের সূত্রপাত হইল। মৃতা ইন্দুবালা প্রত্যহ রজনীযোগে চারুবালাকে দেখা দিতে লাগিল। এক দিন বলিল—"তুই আমার স্বামীকে বিবাহ করেছিস, মনে করে'ছিস তাকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করবি তা হবে না, আমার স্বামী তোকে নিতে দেব না।" বালিকা চারুবালা মৃতা ভগিনীকে সম্মুখে দেখিয়া ও এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ভয়ে এক প্রকার বিকট চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যায়। সেই বিকট চীৎকার শুনিয়া বাটীর অপর সকলে চারুবালার গৃহের দিকে দৌড়িয়া যাইয়া দেখিল চারুবালা অজ্ঞানাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। নানাপ্রকার চেষ্টার পর তাহার চেতনা সম্পাদন করিয়া সকলে তাহার মুখে ব্যাপারটী আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল। চারুবালাও তদবধি দিন দিন শুকাইয়া কৃশ হইতে লাগিল এবং কিছু দিনের মধ্যেই কি একপ্রকার অপরিজ্ঞাত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিল। তাহার ও তাহার সর্ব্বস্বান্ত বৃদ্ধ পিতার সুখের শেষ হইয়া গেল। কনিষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যুর পর মৃতা ইন্দুবালার কথা আমরা আর কিছু শুনি নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আর কোন সংসারবন্ধন ছিল না, তিনি কাশীবাসী হইয়াছিলেন, জানি না অদ্যাপি তিনি জীবিত আছেন কি না এবং তাঁহার জামাতারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ | শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

রাসতত্ত্ব।

৩

জীবের কিরূপে নিষ্কাম মন হয়।

পিতৃগণের অধিপতি সোম সকাম মনের নেতা। সকাম মন যতদূর উন্নতি সাধন করিতে পারে, চন্দ্রমা ততদূর পর্য্যন্ত উন্নতর পথ খুলিয়া দেন। কিন্তু সেই উন্নতির সঙ্গে কামের বন্ধন থাকে। কামনা পূরণ করিবার জন্য জীবকে এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয়। যতদিন কামনার শেষ না হয় ততদিন রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া জীবকে স্বর্গলোক হইতে পুনঃ পুনঃ আগমন করিতে হয়। সুখ ও দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সত্ত্বা ও মৃত্যু তাঁহার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয় এবং তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃদেবগণের উন্নতির সীমা অতিক্রম করিতে পারেন না। তিনি পিতৃদিগের মার্গ পিতৃযান মধ্যেই ভ্রমণ করেন।

এই সৌর ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সবিতা দেব, সেই আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী হিরণ্য-গর্ভ পুরুষ, জীবের কল্যাণের জন্য অপর মার্গ বিস্তার করেন। সেই মার্গের

নাম দেবযান মার্গ। এবং অগ্নিকে দূত স্বরূপ করিয়া সেই মার্গ দ্বারা জীবকে ব্রহ্মলোকে আনয়ন করিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

পিতৃযান মার্গ অনুসরণ করিলে আমরা পূর্ব্ব জগতের মনুষ্যের ন্যায় সকামই থাকিয়া যাই। দেবযান মার্গ অনুসরণ করিলেই আমরা এই জগতে জন্মগ্রহণ সার্থক করি এবং এই জগতের নির্দ্দিষ্ট নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করি।

আপনাকে আপনার কেন্দ্র করিয়া কায করিলেই লোক সকাম হয়। বিশ্বের কেন্দ্র হইয়া কায করিলেই নিষ্কাম হয়। আমার জন্য আমি নই। বিশ্বযজ্ঞের জন্য আমি।

দেবযান মার্গ কঠোপনিষদের "শ্রেয়" এবং পিতৃযান মার্গ "প্রেয"।

প্রশ্ন উপনিষৎ

"আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা।
রয়িবা এতৎ সর্ব্বং যৎ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ।
তস্মাৎ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ।"

আদিত্য প্রাণ এবং চন্দ্রমা রয়ি। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত আমরা চতুর্দ্দিকে যাহা দেখি, এসকলই 'রয়ি'। এই জন্য রয়ি মূর্ত্তিরই নাম মাত্র। প্রাণ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। কিন্তু মূর্ত্তি দ্বারা চিরআবদ্ধ থাকিতে চাহেনা। কারণ "আত্মন এষ প্রাণো জায়তে।" প্রাণ আত্মারই প্রকাশ মাত্র। ঈশা শ্রুতি বলেন "যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।" আদিত্য মণ্ডলবর্ত্তী পুরুষ যিনি, আমিও সেই পুরুষ। অতএব আমাদের একই প্রাণ এবং আদিত্য আমাদের প্রাণ স্বরূপ।

"প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ"

প্রজাদিগের প্রাণরূপ সূর্য্য উদিত হন। "সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ।" প্রজাপতি সূর্য্য সংবৎসর রূপী। "তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ।" তাঁহার দুই অয়ন—দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ। "তৎ যে হবৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃত মিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমসমেব লোক মভিজয়ন্তে।"

যাঁহারা কামনা পুরঃসর যাগাদি ইষ্ট কর্ম্ম এবং বাপী কূপ খননাদি পূর্ত্ত কর্ম্ম করেন তাঁহারা চান্দ্রমস লোক জয় করেন।

"অতএব পুনরাবর্ত্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষঃ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ।"

যাঁহারা এইরূপ ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর পুনরাবর্ত্তন করেন। সেই জন্য যে সকল ঋষি প্রজাকাম, তাহারা দক্ষিণ মার্গে গমন করেন। এই রয়ির মার্গকে পিতৃযান বলে।

"অথ উত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্য আদিত্য-মভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তন মেতদমৃত মভয় মেতৎ পরায়ণ মেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ।"

যাঁহারা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা উত্তরায়ণ মার্গ দ্বারা আদিত্যকে জয় করেন। এই মার্গে প্রাণ সকল আপনার আয়তন পায়। এই মার্গ দ্বারাই অমৃত ও অভয় লাভ হয়। এই মার্গই শ্রেষ্ঠ অয়ণ। এই মার্গে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

"তেষামেব এষ ব্রহ্মলোকো যেষং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্" এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদের যাঁহারা তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন এবং যাঁহারা সত্যের অন্বেষণ করেন এবং সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

"তেষা মসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্ম মনৃতং মায়া চেতি"

এই রজঃ শূন্য ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই, যাহাদের মধ্যে কুটিলতা নাই, মিথ্যা নাই, মায়া নাই।

প্রশ্নশ্রুতি আলোচনা করিলে জানা যায় যে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা, ও বিদ্যা অবলম্বন করিয়া আত্মাকে অন্বেষণ করিলে দেবযান মার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারা যাও।

প্রশ্ন উপনিষদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য, কঠ উপনিষদের মনঃ সংযম।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥

যিনি সর্ব্বদা বিচার দ্বারা মনকে সমাহিত রাখেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সারথি চালিত অশ্বেরন্যায় বশীভূত থাকে।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥

যিনি বিবেক শূন্য, যাঁহার মন অসমাহিত, এবং রাগ দ্বেষাদি দ্বারা সর্ব্বদা অপবিত্র, তিনি সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন্ না। সংসারেই গমনাগমন করেন।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়ো ন জায়তে॥

যিনি বিবেকশীল, যাহার মন সমাহিত ও রাগদ্বেষাদি শূন্য, তিনি সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন্। তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা মনঃ সংযম নিজের পুরুষার্থ সাপেক্ষ। শ্রদ্ধা মনের ভাব সাপেক্ষ। বিদ্যার জন্য গুরু আশ্রয় করিতে হয়।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎ পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায়
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥"

মুণ্ডক উপনিষৎ।

সমিৎপাণি শিষ্য বিদ্যালাভার্থ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন। সম্যক্ প্রশান্ত চিত্ত শমান্বিত সেই শিষ্যকে গুরুদেব যথার্থ রূপে সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন, যাহা দ্বারা শিষ্য সেই সত্য, অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারেন।

বাকি থাকিল আত্মার অন্বেষণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উপনিষদের শিক্ষা মতে সাধনের জন্য হৃদয় মধ্যে সেই আত্মার অন্বেষণ করিতে হয়।

হৃদয় মধ্যে আত্মার অন্বেষণ।

হৃদয় মধ্যে আত্মার অন্বেষণ করিবার একমাত্র অস্ত্র প্রণব। কেবল মাত্র অন্বেষণ করিলে হয় না। নিষ্কাম মন দ্বারা মনোময় ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হয়। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, পরিচ্ছিন্ন মন বৃহৎ মনে লীন করিতে হয়। মন জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। জাগ্রত অবস্থার শেষ এই পৃথিবী মধ্যে। স্বপ্ন অবস্থার শেষ পিতৃলোকের উপরিবর্ত্তী সোম লোকে। সুষুপ্তি অবস্থা

সোমলোকের উপরিবর্ত্তী বিজ্ঞানাত্মার আবাসস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোকে পর্য্যবসিত হয়। প্রণবের "অ" আমাদিগকে পৃথিবীর সমুদয় লীলা খেলা দেখাইতে পারেন। "উ" আমাদিগকে সোমলোক পর্য্যন্ত উঠাইতে পারেন। "ম" ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সাধককে লইয়া যাইতে পারেন। প্রণবের অনুধ্যান দ্বারা আমরা ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে যাইতে পারি। সেখানে অপর ব্রহ্মের অভিধ্যান দ্বারা সাধক অপর ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইতে পারেন এবং অবশেষে সাধকের অপর ব্রহ্মের সহিত তত্ত্বভাব হয়।

একদিকে আমাদের জাগরিত মন, অন্যদিকে বিশ্বের জাগরিত মন "অ"। দুয়ে মেশামেশি, দুয়ে বেঁধাবেঁধি এইরূপে একদিকে আমাদের স্বপ্নমন অন্যদিকে বিশ্বের স্বপ্নমন "উ"। আবার আমাদের সুষুপ্ত মন একদিকে, এবং হিরণ্যগর্ভের সুষুপ্ত মন "ম" অন্যদিকে।

শ্রীকৃষ্ণ! এ মনের বেঁধাবেঁধি কি? এ যে মনের কল্পনা, মন কলা খাওয়া! এত খালি চিৎশক্তির খেলা। এখানে আনন্দ কোথা? হে কৃষ্ণ! আমরা যে আনন্দের ভিখারী। বেদের কথায় আমাদের হাঁসি পায়।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণ স্তদুবাঙ্ মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥

মুণ্ডক।

হে সোম্য, এই অক্ষর, অমৃত ব্রহ্ম বেদ্ধব্য। তুমি তাহাকে বিদ্ধ কর।

সোম্য, তুমি কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু কাল-কর্ম্ম স্বভাব্যতীত গোপী যখন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবেন, মূর্খ জগৎ যেন তখন পরিহাস করে।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধীয়ত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥

মুণ্ডক।

উপনিষদ্বিহিত প্রণবরূপ মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনানিশিত শর সন্ধান কর। তদ্ভাবগত চিত্ত দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য সেই অক্ষরকে বিদ্ধ কর।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

মুণ্ডক।

প্রণব ধনু, আত্মা (মনোময় জীবাত্মা) শর। ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। অপ্রমত্তভাবে শরের ন্যায় তন্ময় হইয়া ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিবে। হায়! শরের তন্ময়তার কি তুলনা। শর লক্ষ্যে যেরূপ মগ্ন হয়, তাহার শতগুণ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন হইয়াছিলেন। অপ্রমত্তভাবে মন প্রণবের সাহায্যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিবে।

প্রণবের সাহায্য কিরূপ। প্রণবকে ধনু করার তাৎপর্য্য কি?

"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং"

আত্মাকে ওঁ বলিয়া ধ্যান করিবে। আত্মার সঙ্গে আর ওঙ্কারের সঙ্গে মিলাইয়া দিবে। পাবে কাকে? অক্ষর ব্রহ্মকে। প্রণবের সহিত আত্মা বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে। ফল কি? ব্রহ্মলাভ হইবে। কেন? প্রণব যে ব্রহ্মে গিয়া পড়িয়াছে। তুমিও প্রণবের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে ব্রহ্মে গিয়া পড়িবে। অমাত্রস্পর্শী ত্রিমাত্র প্রণব ব্রহ্মলাভের মহাস্ত্র। প্রণব কাল, কর্ম্ম, স্বভাব ভেদ করিয়া এই তিনের অধিষ্ঠান পরম পুরুষে মিলিত হইয়াছে।

শ্রুতিদেবি। ইহার আর বাহাদুরি কি? প্রণব লইয়া এত জাঁক কিসের? চল একবার আমাদের বৃন্দাবনে। সেখানে প্রতি গোপ বালককে আমাদের কৃষ্ণ জীবিত, জলন্ত, সাক্ষাৎ প্রণব করিয়াছেন। কেন দেবি, তুমি কি জাননা কিরূপে কালিয়া দমন করিয়া কৃষ্ণ গোপসখাদিগকে কালকবলের অতীত করিয়াছেন। জাননা কি তুমি, কিরূপে তিনি অঘমর্ষণ দ্বারা অঘনাশ করিয়া গোপবালকদিগকে কর্ম্মের অতীত করিয়াছিলেন। আবার "আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ"—ব্রহ্মাকে ছলনা করিয়া, আপনার সখাদিগকে সেই ত্রিগুণময়ী মায়া, সেই স্বভাবের সীমার বহির্ভূত করিয়া দিলেন। প্রণব অক্ষর পুরুষকে কি স্পর্শ করিবে? গোপগণ ততোধিক শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। হাঁ, গোপের সহিত গোপী মিলিত হইয়াছিলেন, গোপকে গোপী বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূর্খ পরিহাসক, সে মিলনের

ফল কি? কৃষ্ণলাভ। গোপ প্রণবের ন্যায় কৃষ্ণ মিলনের পথ মাত্র। প্রণব যেমন ধনু, গোপবালকও তেমনি ধনু। গোপীদিগের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে এই ধনু রচনা করিয়াছিলেন। শ্রুতিদেবী তাঁহারই ত দাসী। তাই বৃন্দাবনে প্রণব রচনা করিয়া তিনি শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা করিয়াছিলেন।

যাক্, এখন বৃন্দাবনের কথা। আগে বেদের কথা দেখি।

বেদেও কি প্রণবরূপী গুরু নাই? গুরুদেব কি প্রণবের ন্যায় ব্রহ্মস্পর্শী নহেন?

"স যো হবৈ তৎ পরম্ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—মুণ্ডক।

"যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্বেতাশ্বতর।

গুরু ব্যতিরেকে প্রণবেরও প্রকাশ নাই। গুরুর অনুগ্রহ হইলেই প্রণবে গা ঢালা যাইতে পারে। নতুবা নহে।

অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। আবার চল বৈদিক প্রণবকে আশ্রয় করি।

স যদি একমাত্রমভিধ্যায়ীত সতেনৈব সংবেদিত স্তূর্ণমেব জগত্যামভি সম্পদ্যতে। তমৃচোমনুষ্যলোক মুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ইত্যাদি—প্রশ্ন উপনিষৎ। অকারের ধ্যান দ্বারা মনুষ্য পৃথিবী লোকে জন্মগ্রহণ করে। উকারের ধ্যান দ্বারা অন্তরীক্ষে সোম-লোক পর্য্যন্ত উন্নীত হইতে পারে। সোমলোকে বিভূতির অনুভব করিয়া আবার পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। তৃতীয় মাত্রা দ্বারা যিনি পরম পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যলোকে উপনীত হইয়া—'যথা পাদোদরস্ত্বচাবিনির্মুচ্যতে এবং হবৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্'—যেমন সর্প ত্বক্ হইতে বিনির্মুক্ত হয়, সেইরূপ তিনি পাপদেহ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া সাম শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন্।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে প্রণব ধ্যানের প্রক্রিয়া দেওয়া আছে।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও ত্রিকালাতীত যাহা কিছু আছে, সকলই ওঁকার রূপ ব্রহ্ম। এই আত্মাও ব্রহ্ম। সেই আত্মা চতুষ্পাৎ। জাগরিত স্থান বহিঃ

প্রজ্ঞ প্রথম পাদ। স্বপ্নস্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ দ্বিতীয় পাদ। সুষুপ্ত স্থান প্রজ্ঞাঘন তৃতীয় পাদ। যিনি না অন্তঃপ্রজ্ঞ, না বহিঃ প্রজ্ঞ, না উভয়তঃ প্রজ্ঞ, না প্রজ্ঞান ঘন, না প্রজ্ঞ, না অপ্রজ্ঞ, তিনি চতুর্থপাদ।

এই শরীরের মধ্যে জাগরিত স্থান, স্বপ্নস্থান, ও সুষুপ্তিস্থান কোথায়? কোন স্থানের সহিত সংঘর্ষে চতুষ্পাৎ আত্মাকে বিদ্ধ করিতে পারা যায়? এ রহস্যের উদ্ভেদ কি শ্রুতিদেবী গুরুদেবের উপর ছাড়িয়া দিলেন।

"বহ্নে র্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গ নাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধন যোনি গৃহ্য
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥"

শ্বেতাশ্বতর।

ইন্ধন কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, সেইরূপ দেহমধ্যে আত্মা অবস্থিত আছে। অগ্নিকে কেহ দেখিতে পায়না। আত্মাকেও কেহ দেখিতে পায়না। কিন্তু দুই ইন্ধন কাষ্ঠের ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রকাশিত হয়। সেইরূপ প্রণবের সহিত দেহের ঘর্ষণ দ্বারা আত্মার প্রকাশ হয়।

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যন্নিগূঢ়বৎ॥"

শ্বেতাশ্বতর।

আপনার দেহকে অরণি করিয়া এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যান দ্বারা মথন করিবে। এইরূপ মথন করিতে করিতে সেই নিগূঢ় আত্মাকে দেখিতে পাইবে।

সমস্ত দেহ অরণি করিতে হয় না। দেহের স্থান বিশেষকে অরণি করিতে হয়। সে জাগরিত স্বপ্ন সুষুপ্তি স্থান। সেই সকল স্থানে তন্ময় হইয়া প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়। প্রণব উচ্চারণ দ্বারা সেই সকল স্থান বিদ্ধ করিতে হয়। স্বপ্নস্থান সকল এইরূপে বিদ্ধ করিলে, সূক্ষ্মদেহ (Astral body এবং Mental body) পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর সুষুপ্তি স্থান বিদ্ধ করিতে পারিলে আত্মার সাক্ষাৎকার।

যে সকল স্থানে প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে, সে সকল স্থান কি?

"সঙ্গীক্ষত কথংন্বিদং মদৃতে স্যাৎ—ইতি সঙ্গীক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি।…… … … এতমেব সীমানং বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতি র্নামদ্বা স্তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথা স্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয় মাবসথ ইতি।"

ঈশ্বর আলোচনা করিলেন, আমা বিনা মনুষ্য কিরূপে থাকিবে ? কোন দ্বার দিয়া আমি প্রবেশ করি ? · এই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া আমি প্রবেশ করি। এইজন্য ব্রহ্মরন্ধ্রের নাম "বিদৃতি" ও "নান্দন"। সেই ব্রহ্ম তিন স্থানে আবাস করিলেন। তিন স্বপ্ন স্থান। এই তাঁহার আবাস, এই তাঁহার আবাস, এই তাঁহার আবাস।"

ঐতরেয়।

শ্রুতি দেবী কথাটি চাপিয়া গেলেন। দেহ মধ্যে ঈশ্বরের আবাস স্থান গুলি বলিয়া দিলেন না।

ব্রহ্মোপনিষৎ বলেন,—"নেত্রে জাগরিতং
বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং সমাদিশেৎ। সুষুপ্তং হৃদয়স্তু।"

এখানে কণ্ঠ কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ মাত্র।

অতি প্রাচীন কৃষ্ণ যজু র্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে দুটি স্থানের কথা আছে—এক হৃদয়, দ্বিতীয় ইন্দ্রযোনি বা Pituitory Body.

"অন্তরেণ তালুকে য এষ স্তন ইব আগশ্যতে সেন্দ্রযোনিঃ"

তালুকার মধ্যভাগে যাহা স্তনের ন্যায় ঝুলিতে থাকে তাহা ইন্দ্র রূপ ব্রহ্মের মার্গ।

যাক্, এসকল স্থানের উপদেশ গুরু সাপেক্ষ। কল্পনা করা বৃথা। একান্ত মনে তন্ময় হইয়া সূক্ষ্ম শরীরের পূর্ণতা দ্বারা আনন্দময়কোষে আত্মার উপলব্ধি করা যোগের মার্গ। এই প্রণব সহায় যোগ মার্গ অবলম্বন করিতে হইলে, চিত্ত বৃত্তির নিরোধ করিতে হয় এবং সম্পূর্ণরূপে কামের দমন করিতে হয়। এই মার্গে মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষের ক্রম বিকাশ হয়।

পরে সাধক "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্" উপলব্ধি করেন।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

ব্রহ্ম ও মায়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মাণ্ডুক্যোপনিষদে ব্রহ্মের চারিটি পাদ বা অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১ম জাগ্রদবস্থা বা বৈশ্বানর পুরুষ, ২য় স্বপ্নাবস্থা বা তৈজস পুরুষ, ৩য় সুষুপ্তাবস্থা বা প্রাজ্ঞ পুরুষ, এবং ৪র্থ তুরীয় বা স্বরূপাবস্থা। গৌড়পাদ ও শঙ্কর উভয়েই বলেন এই তুরীয় ব্রহ্মই একমাত্র সৎ ও নিত্য, অপর তিনটি ভাব কেবল মায়াবিজৃম্ভিত। তুরীয় ব্রহ্ম স্বরূপাবস্থায় থাকিয়া শিব (মঙ্গলময়) শান্ত ও অদ্বৈত এবং স্বেচ্ছাক্রমে মায়োপাধি ধারণ করিয়া ইনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বৈশ্বানর রূপে বিরাজিত। মায়াদ্বারা উপহিত হইবা মাত্র প্রথম যে অবস্থা বা ভাবটি আইসে তাহাই প্রাজ্ঞ ইহা কিরূপ? গৌড়পাদ বলেন,—"বীজ-নিদ্রাযুতো প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে" ১।১৩ কারিকা। ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—"তত্ত্বাপ্রতিবোধ নিদ্রা। সৈব চ বিশেষ প্রতিবোধ প্রসবস্য বীজং। সা বীজ নিদ্রা। তয়া যুক্তঃ প্রাজ্ঞঃ ইত্যাদি।" অর্থাৎ, স্বরূপাবস্থার অজ্ঞানই নিদ্রা। এই নিদ্রাই জগদাদিস্বপ্নের বীজ বা মূলকারণ, তাই ইহাকে বীজ নিদ্রা বলা হইয়াছে। প্রাজ্ঞ এই বীজনিদ্রাচ্ছন্ন। তাহা হইলে কেবল স্বরূপজ্ঞানের অভাবই সুষুপ্তাবস্থা। এখনও কিন্তু অসংখ্য দ্বৈতের (প্রপঞ্চের) চিন্তা বা স্বপ্ন উদিত হয় নাই,—কেবল স্বরূপাবস্থার অজ্ঞান বর্ত্তমান, যেন ঘোর নৈশ অন্ধকারে সূর্য্য সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহার পরের অবস্থা দুইটি কি? স্বপ্ন ও জাগ্রৎ। ইহারা কিরূপ?

"স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া"। কারিকা ১।১৪

"স্বপ্নোঽন্যথাগ্রহণং সর্প ইব রজ্জ্বাং। নিদ্রোক্তা তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণং তম ইতি। তাভ্যাং স্বপ্ননিদ্রাভ্যাং যুক্তৌ বিশ্বতৈজসৌ। প্রাজ্ঞস্তু স্বপ্নবর্জ্জিতঃ কেবলয়ৈব নিদ্রয়া যুত ইতি।.." শঙ্কর ভাষ্য। অর্থাৎ, বিশ্বে ও তৈজসে স্বরূপাবস্থার অজ্ঞান তো আছেই, অধিকন্তু নানাবিধ দ্বৈতের মিথ্যা কল্পনা বর্ত্তমান। মনে করুন সম্মুখে একগাছি রজ্জু রহিয়াছে, কিন্তু ভীষণ অন্ধকারে সমস্তই আবৃত থাকায় কিছুই দেখা যায়না, সুতরাং রজ্জুও দেখা যাইতেছেনা। ইহাই সুষুপ্তাবস্থা। ক্রমশঃ মনে হইল ইহা একটি সর্প, উহা শীর্ষ উত্তোলন

করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে ইত্যাদি। এই সকল অলীক কল্পনা লইয়াই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা। ইহাতে রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান তো নাইই, অধিকন্তু 'অন্যথা গ্রহণ' বিদ্যমান।

ইহা হইতে আমরা মায়ার দুইটি কার্য্য বা ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছি, ১ম আবরণ শক্তি, ২য় বিক্ষেপ শক্তি। প্রথমোক্তশক্তিদ্বারা মায়া ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং দ্বিতীয় শক্তিদ্বারা তিনি জগদাদিস্বপ্নের সৃষ্টি করিতেছেন। মায়ার এই দ্বিবিধ শক্তি বুঝাইবার জন্য শঙ্করাচার্য্য এক অদ্ভুত ইন্দ্রজালের উল্লেখ করেন,—আকাশে সূত্রনিক্ষেপ। ঐন্দ্রজালিক আকাশে সূত্রনিক্ষেপ করিলেন। উহা শূন্যে স্থির হইয়া রহিল। ঐ সূত্র ধরিয়া তিনি ক্রমাগত উঠিয়া অবশেষে অদৃশ্য হইলেন। অতঃপর যুদ্ধের ভয়ানক কোলাহল শোনা গেল এবং ছিন্ন রুধিরাক্ত হস্তপদ প্রভৃতি ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। পরিশেষে এই ছিন্ন হস্তপদাদি সংযুক্ত হইল এবং ঐন্দ্রজালিক অক্ষত দেহে সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহা উল্লেখ করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন,—

তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সূত্রপ্রসারণসমঃ সুষুপ্তস্বপ্নাদিবিকাসঃ
তদারূঢমায়াবিসমশ্চ তৎস্থপ্রাজ্ঞতৈজসাদিঃ সূত্রতদারূঢাভ্যাম্
অন্যঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোঽদৃশ্যমান

এব স্থিতো যথা তথা তুরীয়াখ্যঃ পরমার্থতত্ত্বং।" ১।৭ কারিকার ভাষ্য। অর্থাৎ, সুষুপ্তস্বপ্নাদি অবস্থা ঐন্দ্রজালিকের সূত্রনিক্ষেপবৎ অলীক, প্রাজ্ঞ তৈজসাদি পুরুষ সূত্রারোহী ব্যক্তির ন্যায় মিথ্যা এবং পরম মায়াবী এই সূত্র ও সূত্রারূঢ ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র ইনি যেমন ভূমিতেই অবস্থিত, মায়াবৃত, এবং অদৃশ্য রহিয়াছেন, তুরীয় ব্রহ্ম ও সেইরূপ স্বরূপাবস্থায় বর্ত্তমান। এই দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ব্রহ্ম যেমন তেমনি আছেন,—তাঁহার কোন বিকার বা পরিণাম হয় নাই, তিনি প্রাজ্ঞতৈজসাদিরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন মাত্র এবং যে শক্তি তাঁহার স্বরূপকে আচ্ছাদন করিয়া তৎস্থানে নানাবিধ অলীক সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাই মায়া।

মায়া ত্রিগুণাত্মিকা,—সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী অর্থাৎ তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরমেশ্বর যুগপৎ প্রকৃতিকে

স্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। তিনি যে মুহূর্ত্তে প্রকৃতির। জগদাদির) বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে "অনহং" বা "অসৎ বলিয়াও জানিতেছেন। এখানে একসঙ্গে (Simultaneously) তিনটি কার্য্য ঘটিতেছে,—চিন্তাকরা (চিন্তা আরম্ভ করা), চিন্তা করিতে থাকা (চিন্তাটি ধরিয়া রাখা) এবং অসৎ বলিয়া জানা। এই তিনটিই তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য। ইচ্ছাই চিন্তা করিতেছে, ইচ্ছাই চিন্তাটি রাখিতেছে এবং ইচ্ছাই চিন্তাটি ত্যাগ করিতেছে। অর্থাৎ মায়াই তাঁহাতে যুগপৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন। কিন্তু জীবে (যেহেতু সে সসীম) এই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতেছে। যখন সৃষ্টি ও পালন কার্য্যে নিযুক্তা, তখন মায়ার নাম প্রবৃত্তি বা অবিদ্যা, যখন সংহার-রূপিনী তখন তিনি নিবৃত্তি বা বিদ্যা এবং সমগ্রা শক্তি বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই মহাবিদ্যা।

ইনিই বিশ্বের আদি ও অন্ত। ইনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-শক্তি। ইঁহার শক্তিতেই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, রুদ্র সংহার করেন এবং ইঁহার দ্বারাই তাঁহারা মোহনিদ্রাভিভূত হন। জগতে যেখানে যত শক্তি আছে (এবং শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই) ইনিই সকল শক্তির মূল ও আদি,—তাই আদ্যা-শক্তি। ব্রহ্মা চণ্ডিকা দেবীর স্তবে বলিতেছেন,—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণ মহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥" চণ্ডী।

অর্থাৎ, হে সর্ব্বময়ি, জগতের সৎ ও অসৎ যাবতীয় বস্তুর মধ্যে যে শক্তি আছে, তাহা, মা, তুমিই। তোমার দ্বারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশান নিদ্রাবিষ্ট হন্ এবং তুমিই তাঁহাদিগকে শরীরদান (সৃষ্টি) কর। তোমার স্তব করিতে কে সমর্থ? তিনি অসুরদিগের শক্তি এবং দেবতাদিগেরও শক্তি, কারণ তিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই। তিনি কাম এবং তিনিই ধৃতি, তিনি ক্রোধ এবং তিনিই ক্ষমা, তিনি লোভ এবং তিনিই ত্যাগ, তিনি মোহ এবং তিনিই জ্ঞান,

তিনি মন্দ এবং তিনিই বিনয়, তিনি দ্বেষ এবং তিনিই প্রেম। দয়া নিষ্ঠুরতা, সাহস ভয়, নৈরাশ্য উৎসাহ, বিশ্বাস সংশয়, নাস্তিকতা ভক্তি, চাঞ্চল্য শান্তি, আসক্তি বৈরাগ্য, বুভুক্ষা মুমুক্ষা—সমস্তই তিনি। চণ্ডীতে আছে,—

"ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীঃ বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে॥"

অর্থাৎ, সম্পদে তিনি লক্ষ্মীরূপে আমাদের উন্নতি সাধন করেন, এবং বিপদ্‌কালে অলক্ষ্মীরূপে তিনিই সর্ব্বনাশ সাধন করেন। একদা দেবগণ অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় বল বীর্য্যের গর্ব্ব করিতেছিলেন। তখন ইনিই হৈমবতী উমা রূপে আবির্ভূতা হইয়া অগ্নিকে বলিলেন "অগ্নে, শুনিতেছি তুমি সমগ্র জগৎ ভস্মীভূত করিতে পার তোমার এরূপ শক্তি আছে; ভাল, এই তৃণ খণ্ডটি দগ্ধ কর।" এই বলিয়া এক খণ্ড তৃণ ধরিলেন। অগ্নি যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া লজ্জাবনতমস্তকে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণও ঠিক ঐরূপ শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শক্তি, তাঁহার শক্তিতেই সকলে শক্তিমান্।

আমরা যদি ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি উচ্চতর লোকের কথা ত্যাগ করিয়া কেবল এই ভূলোকের (Physical Plane এর) দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলেও সর্ব্বত্র সেই অনন্ত শক্তির বিচিত্র লীলা দেখিতে পাই,—দেখিতে পাই আর কিছুই নাই, সর্ব্বত্র সেই শক্তি, সেই শক্তির বিকাশ। সেই শক্তিতেই সূর্য্য উত্তাপ ও আলোক দেন, গ্রহ উপগ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ বর্ষণ করে, অগ্নি দহন করে, জড়বস্তুগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পরমাণুগণ স্পন্দিত হয় সেই শক্তিদ্বারা সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া ধরিত্রী প্লাবিত করে, অভ্রভেদী গিরিরাজি ভূতলশায়ী হয়, এবং অতলস্পর্শ সাগরবক্ষ ভেদ করিয়া গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা সমুত্থিত হয়। তিনিই বৃক্ষলতাকে ফল পুষ্পে সুশোভিত করেন এবং কীট-পতঙ্গ পশু পক্ষী মানবাদির জীবনীশক্তিরূপে বিরাজিতা হইয়া তাহাদিগকে গতিশীল ও ক্রিয়ান্বিত করেন। তাঁহার দ্বারাই চক্ষু দর্শন করে, কর্ণ শ্রবণ করে, নাসিকা আঘ্রাণ করে, রসনা আস্বাদ গ্রহণে সমর্থা এবং মন চিন্তা করে। তিনিই

সেই "বরেণ্যং ভর্গো" (শ্রেষ্ঠ তেজ) যিনি আমাদিগের ধীশক্তিকে প্রচোদিত করেন। দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"ময়া সোন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি যং শৃণোত্যুক্তম্"—দেবীসূক্ত। অর্থাৎ, আমার দ্বারাই জীব ভক্ষণ করে, দর্শন করে, জীবন ধারণ করে ও শ্রবণ করে।

কোন্ শক্তি প্রভাবে এক কুসুমকোমলা স্কচ্ রমণী বজ্রসদৃশ কঠিন হইয়া ভীষণ শত্রুহস্ত হইতে স্বীয় রাজার প্রাণরক্ষার জন্ম অর্গলশূন্য দ্বারে নিজ হস্তকে অর্গলস্বরূপ করিয়া দণ্ডায়মানা হন এবং যদবধি না হস্তের অস্থি চূর্ণ হয় তদবধি দ্বারত্যাগ করেন নাই? কোন্ শক্তিপ্রভাবে অসংখ্য সেনাদল এক বীরপুরুষের ইঙ্গিতমাত্র প্রচণ্ড শীতে তুষার-ধবল আল্পস্ গিরি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন? কাঁহার শক্তিতে গ্রীস্‌দেশীয় সেই বিখ্যাত পণ্ডিত স্বীয় ধর্ম্মমত প্রত্যাহার করার পরিবর্ত্তে প্রিয় শিষ্যগণের সহিত সদালাপ করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যমুখে হেমলক্-বিষপানে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন? আবার যে শক্তিপ্রভাবে দৃঢ়ব্রত শাক্যকেশরী বোধিদ্রুমমূলে সমাসীন হইয়া বলিয়াছিলেন "আজ যদি গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হয়, হিমালয় স্থানভ্রষ্ট হয় এবং পবনেরও গতিরোধ হয়, আমি টলিবনা," সেই শক্তিই বা কোথা হইতে আসিয়াছিল? কোন্ শক্তিতে সেই প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুৎ বীর প্রবলপরাক্রমশালী মোগল বাদসাহের নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্ত্তে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অনাহারে, অনিদ্রায় দিনপাত করিয়াছিলেন? আবার যে অসাধারণ ভক্ত-বীর শত্রুকর্ত্তৃক ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে ও শত্রুদিগের জন্য কাঁদিয়া জগৎপিতাকে বলিয়াছিলেন "পিতঃ তোমার এই অবোধ সন্তানগুলির অপরাধ মার্জ্জনা করিও, কারণ তাহারা যে অন্যায় করিতেছে এ জ্ঞান তাহাদের নাই," তাঁহার সেই দেবদুর্লভ ক্ষমা ও প্রেম কোথা হইতে আসিয়াছিল? যে প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া প্রসিদ্ধ গজ্‌নি-অধিপতি ষোড়শ বার ভারত আক্রমণ করেন এবং সহস্রাধিক দেবমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অপরিমিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই লোভ ও ধর্ম্মদ্বেষিতা প্রবৃত্তিরই বা জনয়িত্রী কে? কাঁহার শক্তিতেই বা সেই নৃশংস রোমক্ সম্রাট অদহায় প্রজাবৃন্দের

গৃহে অগ্নিপ্রদান করাইয়া স্বীয় প্রাসাদ হইতে দগ্ধদেহ মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণের আর্ত্তস্বর ও গগনভেদী বিলাপধ্বনি শুনিতে ভাল বাসিতেন? আবার যে উচ্চাভিলাষী দুরন্ত মোগল সম্রাট নিজ ভ্রাতৃগণকে হত্যা করিয়া স্বীয় সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বলবতী সাম্রাজ্যভোগেচ্ছাই বা কোথা হইতে আসিল? যে শক্তি বশে দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণতনয় এক ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে ভীষণ ঝটিকাবৃষ্টির মধ্যে শবরূপ ভেলার আশ্রয়ে ভয়ানকতরঙ্গসঙ্কুল নদী উত্তীর্ণ হন এবং কালসর্পরূপ রজ্জু অবলম্বনে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহার এই দুর্জ্জয় কাম প্রবৃত্তির আদি কারণ কে? আর আমাদের এই বঙ্গদেশের মধ্যেই বীরসিংহনিবাসী যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার পথিমধ্যে পতিত বিসূচিকারোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে তুলিয়া লইয়া নিজশয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন এবং নিজহস্তে বিষ্ঠামুত্রাদি মার্জ্জন করিয়া চিকিৎসা দ্বারা রোগমুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার সেই মনুষ্য-দুর্লভ দয়া ও প্রেমই বা কে দিয়াছিল? আজ যে শক্তিবন্যা সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া ছুটিয়াছে, যে শক্তিদ্বারা সহস্র সহস্র বৃদ্ধ বালক যুবা নির্ব্বাসন, কারাবাস, কঠোর বেত্রাঘাত, এমন্ কি মৃত্যুকেও হাস্যমুখে উপেক্ষা করিয়া প্রাণভরা গালভরা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে দেশকে মাতাইয়া তুলিতেছে, জিজ্ঞাসা করি, এ শক্তিই বা কোথা হইতে আসিল?

সমস্তই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাশক্তি, কারণ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি নাই। যতক্ষণ তিনি ক্রিয়ান্বিতা ততক্ষণই জগৎ, তিনি ব্রহ্মে লীনা হইলে এই জগৎরূপ কল্পনারও নিবৃত্তি—অবসান হয়। জীব ব্রহ্মে প্রভেদ কি? ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে এই সমগ্রা মহাশক্তিকে জানিতেছেন, দেখিতেছেন ও পূর্ণভাবে স্বাধিকারে রাখিয়াছেন এবং জীবরূপে তিনি এই মহাশক্তির একটি অংশমাত্র জানিতেছেন ও স্বাধিকারে রাখিয়াছেন। সেইজন্য ঈশ্বর "জ্ঞ" (সর্ব্বজ্ঞ), জীব "অজ্ঞ", ঈশ্বর "ঈশ" (সর্ব্বশক্তিমান্) জীব "অনীশ" অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ নহে, কিন্তু উভয়েই "অজ" (জন্ম-রহিত), কারণ উভয়েই এক ব্রহ্ম। ("জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ"। শ্বেতাশ্বতর ১।৯)। অতএব যে জীব এই শক্তিকে যতই জানেন, যতই লাভ করিয়াছেন, তিনি ততই উন্নত, ততই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদবধি তিনি সমগ্র শক্তিকে জানিতে না পারেন,

(যদবধি মা নিজমূর্ত্তিতে দেখা না দেন), তদবধি তাঁহার স্বরূপাবস্থাপ্রাপ্তি (মুক্তি) অসম্ভব। তিনি মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব, দেবত্ব হইতে ক্রমে এক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরত্ব, অতঃপর তদপেক্ষা বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরত্ব ইত্যাদি লাভ করিতে করিতে অনন্তকাল ধরিয়া ক্রমোন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াও যদবধি তিনি এই মহামায়াকে পূর্ণভাবে জানিতে ও নিজস্ব করিতে না পারিবেন, তদবধি তিনি জীব, মুক্তনহেন, বদ্ধ, তদবধি তাঁহার এই জগৎভ্রমের আত্যন্তিক নাশ হইবেনা। অতএব দেখা যাইতেছে এই মাহামায়া আদ্যাশক্তিই জীবের এক-মাত্র গতি—একমাত্র উপায়, কারণ ইনি দেখা না দিলে জীবের মুক্তি নাই।

আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত যত জীব বর্ত্তমান সকলেই কোন না কোন প্রকারে এই মহামায়ার উপাসক, এই আদ্যা শক্তির পূজা করিতেছেন। ভোগী যোগী, গৃহী সন্ন্যাসী, রাজা ফকির, তস্কর সাধু, নাস্তিক ভক্ত, বিষয়াসক্ত মুমুক্ষু এবং কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, দেবাসুর ব্রহ্মা প্রজাপতি—সকলেই শক্তির উপাসক। পবন বৃক্ষপত্ররূপ চামর দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতেছে, চন্দ্রসূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী দীপালোকে তাঁহার আরতি করিতেছে, বৃক্ষলতা ফলপুষ্পের বিরাট্ ডালি ধরিয়া তাঁহার চরণে উপহার দিতেছে এবং অসংখ্য জীব নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ্যপেয় পানভোজন করিয়া তাহারই তৃপ্তিসাধন করিতেছে। লম্পট কামানলে ইন্ধন দিয়া প্রবৃত্তি-রূপিণী যে শক্তির সেবা করিতেছেন, সন্ন্যাসী বিজন অরণ্যে বসিয়া নিবৃত্তি-রূপিণী সেই মহাশক্তিরই পূজা করিতেছেন। পরলোকে বিশ্বাস-হীন বৈজ্ঞানিক যে জড়শক্তিলাভের জন্য সমগ্র জীবন অতিপাত করিতেছেন, তাহাও যে শক্তি, সূক্ষ্মদর্শী যোগীর ঈপ্সিত আধ্যাত্মিক শক্তি ও সেই মহাশক্তি। সকলেই সেই আদ্যাশক্তিকে লাভ করিবার জন্য ছুটিয়াছে, সকলেই মহামায়াকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, যেন ভক্তের এই গীতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেন সকলেই সমস্বরে গাহিতেছেন,

"আর কবে দেখা দিবি মা, হর রমা ?"

সৌর, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, দেব, দানব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু—সকলেই শক্তির উপাসক—শাক্ত। শক্তির উপাসনাই

ব্রহ্মের উপাসনা। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নাই, হইতে পারেনা; যখন তিনি উপাস্য হন, তখন তিনি শক্তি। তাই মহাকাল জলদ গম্ভীরস্বরে জগদম্বাকে বলিতেছেন,

"ন বালা ন চত্বং বয়স্থা ন বৃদ্ধা
ন চ স্ত্রী ন ষণ্ডা পুমান্নৈব চ ত্বং।
সুরো নাসুরো নো নরো বা ন নারী
ত্বমেকা পরং ব্রহ্মরূপেন সিদ্ধা॥
জলে শীতলত্বং শুচৌ দাহকত্বং
বিধৌ নির্ম্মলত্বং রবৌ তাপকত্বং।
ন তে চাম্বিকে যস্য কস্যাপি শক্তিঃ
ত্বমেকা পরং ব্রহ্মরূপেন সিদ্ধা॥
পপৌ খেডমুগ্রং পুরা যন্মহেশঃ
পুনঃ সংহরত্যন্তকালে জগচ্চ।
তবৈব প্রসাদাৎ ন চ স্বস্য শক্ত্যা
ত্বমেকা পরংব্রহ্মরূপেন সিদ্ধা॥
নরাঃ মাং বিনিন্দন্তু বিন্দন্তু নাম
ত্যজেৎ বান্ধবো জ্ঞাতয়ো সংত্যজন্তু।
যমীয়াঃ ভটাঃ নারকে পাতয়ন্তু
ত্বমেকা গতির্ম্মে ত্বমেকা গতির্ম্মে॥" মহাকাল সংহিতা।

অর্থাৎ, তুমি বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধা নহ, তুমি স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীব নহ, তুমি দেবতা বা অসুর নহ, তুমি নর কিম্বা নারী নহ, তুমি একমাত্র পরব্রহ্ম। জলের শীতলতা, অগ্নির দাহকতা, চন্দ্রের নির্ম্মলতা, সূর্য্যের উত্তাপ শক্তি,—অম্বিকে! এগুলি যাহার তাহার শক্তি নয়, তোমারই শক্তি। তুমিই একমাত্র পরব্রহ্ম। শিব পূর্ব্বে যে উগ্র বিষপান করিয়াছিলেন এবং প্রলয় কালে যে জগৎ সংহার করেন, ইহা তাঁহার নিজ শক্তিতে নহে, তোমারই কৃপায়। তুমিই একমাত্র পরব্রহ্ম। মনুষ্যগণ আমাকে নিন্দা করুক অথবা আমার নিকট আসুক, জ্ঞাতি বন্ধুগণ আমাকে পরিত্যাগ করুক, যমদূতেরা আমাকে নরকে নিক্ষেপ করুক, তুমিই আমার একমাত্র গতি, তুমিই একমাত্র গতি

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী বি, এ,।

রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

পরমেশ্বরের এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া দুরত্যয়া। যাহারা আমার শরণাগত হয়, তাহারাই ইহাকে অতিক্রম করিয়া থাকে।

মায়ামুগ্ধ জীবের আপনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারেনা। পারেনা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি করুণা করিয়া বেদও তদর্থনির্ণায়ক পুরাণ শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্ররূপে, আচার্য্যরূপে ও অন্তর্য্যামিরূপে আপনাকে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্র ও গুরু হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু ও ত্রাণ কর্ত্তা বলিয়া বিদিত হয়েন।

বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী বিষয় উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে গ্রন্থ প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্য বস্তু এবং তদ্বিষয়ক ভজনই তাঁহার প্রাপক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তির প্রাপ্যপ্রাপকতা লক্ষণ সম্বন্ধ ঐ ভক্তি আবার সাধ্য ও সাধন ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন হয়েন না, কিন্তু সাধ্যভক্তিরূপ প্রেম দ্বারা পরম্পরায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন হয়েন। এই নিমিত্তই শ্রবণাদি সাধন ভক্তিকে অভিধেয় এবং প্রেমরূপ সাধ্য ভক্তিকে প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলা হয়। প্রেম মহাজন পুরুষার্থের শিরোমণি; প্রেম ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ পঞ্চম পুরুষার্থ। প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ দ্বারায়ই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসেবা সমুথ আনন্দের লাভ হইয়া থাকে। প্রেমের দুইটী কার্য্য। মধুর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করানই প্রেমের প্রথম কার্য্য, এবং সেবা করাইয়া শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদন করানই, প্রেমের দ্বিতীয় কার্য্য। প্রেমের উক্ত কার্য্যদ্বয় আবার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ কারণ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অনুভবের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ রসাস্বাদন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দ লাভের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবা।

মায়ামুগ্ধ জীবের যেরূপ দুঃখের বিমোচন হয়, তদ্বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। একদা এক দরিদ্রের গৃহে একজন সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এত দুঃখী কেন? তোমার ঈদৃশ দুঃখভোগ করা উচিত হয় না। তোমার পিতা তোমার নিমিত্ত প্রচুর ধন রাখিয়াই জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। ঐ ধন তোমার গৃহ মধ্যেই প্রোথিত আছে। দক্ষিণ-দিগ খনন করিলে, ধন পাইবে না, অনেক ভীমরুল ও বোল্‌তা উঠিবে। পশ্চিমদিগ খনন করিলে ধন পাইবেনা, কারণ ঐদিগে এক যক্ষ আছে, সে ধন প্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। উত্তর দিক্ খনন করিলেও পাইবেনা, কারণ, ঐ দিগে এক অজগর সর্প আছে, সে তোমাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু ঐ তিন দিক্ খনন না করিয়া যদি কেবল পূর্ব্বদিক অল্পমাত্র খনন কর তাহা হইলেই ধনপ্রাপ্ত হইতে পারিবে।

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যানুসারে দরিদ্র ব্যক্তি যেমন পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রবাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া মায়ামুগ্ধ জীব সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্র সকল মায়ামুগ্ধ জীবকে যাহা উপদেশ করেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কর্ম্ম মার্গই সংসারের দক্ষিণ দিক। কর্ম্মমার্গকে আপাততঃ সংসার-দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়াই বোধ হয় বটে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মদ্বারা সংসারদুঃখ নিবারিত হইতে পারেনা। কর্ম্ম সকাম, সকাম কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল নরকাদি দুঃখ। বিহিত কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি সুখ। বিহিত কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি সুখ হইলেও, ঐ সুখ চিরস্থায়ী নহে, উহার ও নাশ আছে। অতএব বিহিত কর্ম্ম দ্বারাও দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি অসম্ভব।

নিত্য কর্ম্ম ও চিত্ত শুদ্ধি ও প্রত্যবায়ের পরিহারের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে. এবং উহার অনুষ্ঠানেও শুদ্ধাদির অপেক্ষা আছে। অতএব নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালেও দুঃখ অপরিহার্য্য। কর্ম্মের ফল সকল ভীমরুল ও বোল্‌তার ন্যায় উত্থিত হইয়া কর্ম্মীকে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। জ্ঞানমার্গ মাত্রই সংসারের উত্তর দিক্। ঐ জ্ঞানমার্গ ফলকামনারহিত হইলেও ঐ মার্গ সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ রূপ অজগরের বাস। জ্ঞানী সিদ্ধ হইলেই সাযুজ্য

রূপ অজগর কর্ত্তৃক গ্রস্ত জীব নিজের সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। অতএব সাধন কালে তিনি সমাধিতে যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন তাহাও তাঁহার সিদ্ধিকালে থাকে না। অষ্টাঙ্গ যোগই পশ্চিম মার্গ। ঐ মার্গে সিদ্ধিরূপ এক যক্ষ বাস করে। সে ধাবনার সময়ই উত্থিত হইয়া সাধককে অভিভূত করিয়া ফেলে, আর অগ্রসর হইতে দেয়না। অতএব ঐ সিদ্ধিরূপ যক্ষের উপদ্রবে যোগ সাধক ব্রহ্মানন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। এই সকল কারণে কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব মার্গ রূপ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ভক্তি ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামনা বর্জ্জিত। ভক্ত কর্ম্মের ফল ভুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি ও যোগের ফল সিদ্ধি প্রভৃতি কোন কামনাই করেন না। ভক্তি নিষ্কাম--ভক্তি মাত্র কাম। ভক্তিদ্বারায় শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এক মাত্র ভক্তিরই বশ শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তোবিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসিভস্মসাৎ।
তথামদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধ বৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
ন সাধয়তি মাংযোগো ন সাংখ্যংধর্ম্মউদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম।
ভক্তি পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥
ধর্ম্ম সত্য দয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যা পেতমাত্মানং নচ সম্যক পুনাতিহি॥

হে উদ্ধব, উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, কনিষ্ঠ ভক্ত যদি ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারিয়া বিষয় ভোগে আকৃষ্ট হয়েন, তথাপি বলবতী ভক্তির প্রভাবে সেই বিষয় ভোগ তাঁহাকে আবির্ভূত করিতে পারেনা। যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ ভক্তি প্রারব্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মকেই নাশ করিয়া থাকে। অষ্টাঙ্গ যোগ, জ্ঞান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও ত্যাগ আমাকে বলবতী ভক্তির ন্যায় বশীভূত করিতে পারেনা।

আমি একমাত্র শ্রদ্ধা পূর্ব্বিকা ভক্তির গ্রাহ্য। আমি ভক্তের প্রিয় আত্মার মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। সত্যদয়াদি যুক্ত ধর্ম্ম ও তপস্যান্বিত জ্ঞান ভক্তিহীন পুরুষকে সম্যক পবিত্র করিতে পারেনা।

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইবদ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
ময়ি নির্বদ্ধহৃদযা সাধবঃ সমদর্শিন।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যাসৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

আমি ভক্তাধীন, ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা থাকে না। আমি ভক্ত জন প্রিয়, ভক্ত সকল আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকেন। সাধবী স্ত্রী যেমন সাধুপতিকে বশীভূত করে, তেমনি আমাতে বদ্ধহৃদয় মমদর্শী বদ্ধ সকল আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

ভক্তি রেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।”

ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ধামে লইয়া যান, ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করান। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরই বশ ভক্তিই সর্ব্ব সাধক শ্রেষ্ঠা। বিজ্ঞান রূপা ও অনন্দ রূপা শ্রীকৃষ্ণমুক্তি একমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারাই দর্শনীয়া। ভক্তিই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বেদে ভক্তিকেই অবিধেয় বলিয়াছেন, অর্থাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন ধনের লাভে সুখভোগরূপ ফলের লাভ ও তাহার সঙ্গেই দুঃখের নিবৃত্তি হয় তেমনি ভক্তির লাভে প্রেমরূপ ফলের লাভ ও তল্লাভে কৃষ্ণরসাস্বাদের সহিত সংসারদুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়। প্রেমসুখই ভক্তির মুখ্যফল এবং দুঃখ নিবৃত্তি উহার আনুসঙ্গিক ফল। অতএব দুঃখ নিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন নহে, প্রেমই প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

সেবা ও প্রেম।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে এই জগৎ সেবাময়, সর্ব্বত্রই সেবা। বস্তুতঃ সেবার উপরেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সচ্চিদানন্দময় ভগবান অসীম কারুণ্যবশতঃ অসংখ্য জীবকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় স্বীয় বিশাল ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নিয়ত পোষণ ও রক্ষা করিতেছেন—ইহাই আদি ও বিরাট সেবা। সমগ্রে যাহা আছে প্রত্যেক অংশে তাহা (ক্ষুদ্রভাবে) থাকিবেই থাকিবে। সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে (ভগবানে) যাহা বর্ত্তমান, ব্যাষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের (জীবে তাহার আভাস অবশ্যম্ভাবী। তাই ব্রহ্মা, প্রজাপতি, মনু ঋষি, দেবতা, অসুর, পিতৃগণ, যক্ষ গন্ধর্ব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি প্রত্যেক জীবই পরস্পরের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত। সমগ্র মহাসমুদ্র যে দিকে প্রধাবিত হয়, প্রত্যেক তরঙ্গ, বুদ্বুদ, জলকণা এবং পরমাণুর গতি ও ঠিক সেই দিকেই হইয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য।

সেবার মূল প্রেম। এই প্রেম আবার ভগবানের আনন্দাংশ হইতে উৎপন্ন। সচ্চিদানন্দের আনন্দ ভাবটি সূক্ষ্মোপাধি দ্বারা উপহিত হইলে তাহার নাম প্রেম, তদপেক্ষা স্থূলোপাধি ধারণ করিলে তাহাই জীবের বাসনা এবং স্থূলতম উপাধিতে আবৃত হইলে তাহাই মাধ্যাকর্ষণ (gravitation)। সে যাহা হউক, প্রেম জীবের মধ্যে তিনটি আকারে প্রকাশ পায়—দয়া, প্রীতি ভক্তি। নিম্নগামী প্রেমই দয়া, সমগামী প্রেম প্রীতি এবং উচ্চগামী প্রেম ভক্তি। অর্থাৎ নিম্নস্থ জীবকে ভালবাসার নাম দয়া, তুল্যাবস্থকে ভালবাসার নাম প্রীতি এবং শ্রেষ্ঠের প্রতি যে ভালবাসা তাহাই ভক্তি।

ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন জীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, দেখিতে পাই সকলেই কোন না কোন প্রকারে সেবা করিতেছে। একটি নবজাত বিড়াল শিশু "মিউ মিউ" শব্দ করিবা মাত্রই কোথা হইতে তাহার মাতা ছুটিয়া আসিল এবং সস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যদানে তাহার সেবা করিতে লাগিল। বায়স শাবক এখনও ভালরূপ উড়িতে শিখে নাই এবং স্বয়ং আহার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ। সে এক স্থানে বসিয়া কেবল "কাকা" শব্দ করিতেছে এবং তাহার জনক জননী নানা স্থান হইতে

চঞ্চুপুটে আহার আনিয়া তাহার মুখমধ্যে ফেলিয়া দিতেছে। একটি সুস্থ ও সবল মূষিক তাহার এক অন্ধ ও স্থবিব ভ্রাতার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কিরূপ সেবা করিতেছে দেখিলে বিস্ময় জন্মে। অন্ধ সুস্থের লাঙ্গুলটি মুখদিয়া ধরিয়া আছে এবং সুস্থ আগে আগে গিয়া তাহাকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইতেছে। কুকুরের প্রভুসেবা জগদ্বিখ্যাত। কত কুকুর প্রভুর গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষার জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে তথাপি ঐ দ্রব্য ত্যাগ করে নাই, প্রভুর গৃহরক্ষা করিতে দস্যুহস্তে প্রাণ দিয়াছে, জলমগ্ন প্রভুকে বাঁচাইয়া ভীষণ কুম্ভীর কর্তৃক কবলিত হইয়াছে, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিদ্বারা ভয়ানক অপরাধীদিগকে বাহির করিয়া দিয়া সমাজের উপকার সাধন করিতেছে এবং তুষারমণ্ডিত দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে অসহায় ও শীতে মৃতপ্রায় পথিকদিগকে খাদ্যাদি দিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কবি কাউপার তাঁহার প্রিয় কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া একদিন নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একটি প্রস্ফুটিত কমলের প্রতি তাঁহার লোভ জন্মিল। তিনি যষ্ঠি দ্বারা উহাকে তীরের নিকট আনিতে বারংবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হইলেন। কুকুরটি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিল এবং তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিয়া নদীতে পড়িল এবং পুষ্পটি আনিয়া প্রভুর চরণে উপহার দিল। ঘটনাটি সামান্য হইলেও ইহা কবির হৃদয়ে আঘাত করিল। তাঁহার আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ধন্য প্রভুভক্তি! ধন্য সেবা!! ভগবানের কিরূপে সেবা করিতে হয় তাহা যেন আমরা তোমার নিকট হইতে শিক্ষা করি!!!"

জীব যতই ক্রমোন্নত হয় তাহার প্রেম (সুতরাং সেবাধর্ম্ম) ততই পরিপুষ্ট, বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাই পশু অপেক্ষা মানবে এবং মানবাপেক্ষা দেবতাতে সেবাব্রত সমধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শায়িত। কেবল একটি গৃহে মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে "বাবা, একটু জল খাও," "কি অসুখ করিতেছে, বাবা" ইত্যাদি শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। একটি মাতৃমূর্ত্তি, পীড়িত সন্তানের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সাত দিন সাত রাত্রি এই কার্য্যে নিযুক্তা, ক্লান্তি

নাই শ্রম নাই, মল মূত্রাদি ধারণে ঘৃণা নাই, রুগ্ন পুত্রের নানাবিধ অসঙ্গত ও অন্যায় আব্দারে বিরক্তি নাই, ক্রোধ নাই, যেন তাঁহার জীবনের সকল সুখ, সকল বাসনা একটা প্রবল স্নেহের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে।

কোন পল্লিগ্রামে এক অপ্রশস্ত পথের ধারে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ স্থানে বিষম কোলাহল ও হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে বহুলোকের সমাগম হইল। সকলের মুখেই এক কথা "হায় হায় কি হইল।" ঘটনাক্রমে এক যুবক সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে।" উত্তর হইল "আহা একটি বালক এইমাত্র জলমগ্ন হইয়াছে, কেহই তাহাকে তুলিতে পারিল না।" শুনিবামাত্র যুবকের করুণাতন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তিনি গন্তব্য স্থানের কথা ভুলিলেন, নিজের বিপদ আপদের কথা ভুলিলেন, বোধ হয় সমগ্র জগৎকেই ভুলিলেন। ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া (পাদুকা ও বস্ত্রাদি খুলিবারও সময় লইলেন না) কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় ডুবিয়াছে?" তখন শত শত অঙ্গুলি তাঁহাকে স্থানটি নির্দ্দেশ করিয়া দিল এবং তিনি এক লম্ফে ঐ স্থানে নিমগ্ন হইলেন। বহু ক্লেশ ও পরিশ্রমে তিনি বালকটিকে তীরে উঠাইলেন এবং সে যাত্রা বাঁচাইয়া দিলেন। বোধ হয় আর অর্দ্ধ মিনিট বিলম্ব হইলে তাহার জীবন রক্ষা হইত না। কয়েক মাস পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরের এক প্রধান রাজপথে কতকগুলি কুলি একটি বৃহৎ ঝাঁঝরি খুলিয়া ভিতরের ময়লা সাফ্ করিবার জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু যে প্রবেশ করে সে আর ফিরে না। ইহা দেখিয়া এক ভদ্রলোক জনৈক কুলিকে বলিলেন "দেখতো, উহারা কি করিতেছে" কুলি একটু নামিয়া যেমন উঁকি মারিয়া দেখিতে গেল, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া তন্মধ্যে পতিত হইতে লাগিল, তখন ভদ্রলোকটি 'হায় কি হইল' বলিয়া কুলিকে বাঁচাইবার জন্য তাড়াতাড়ি ভিতরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু ড্রেনের বিষাক্ত গ্যাসে তিনিও রক্ষা পাইলেন না—সকলেই ইহধাম ত্যাগ করিল।

মানব যে কত প্রকারে পরস্পরের সেবা করিতেছেন, ভগবানের অনন্ত প্রেমের উৎস কত রকমে যে ফুটিয়া বাহির হইতেছে তাহার সংখ্যা করা

যায় না। একদা প্যারিস নগরের কোন রাজপথে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছিল, অনেকগুলি মিস্ত্রি ও মজুর একটি উচ্চ কাষ্ঠমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। হঠাৎ অট্টালিকার এক অংশ ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠমঞ্চের উপর পতিত হওয়াতে মঞ্চটি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইল। দুর্ভাগা শ্রমজীবীদিগের প্রায় সকলেই প্রাণ হারাইল। কেবল দুইটি ব্যক্তি ত্রিতলের এক কার্ণিস ধরিয়া ঝুলিতেছিল। কার্ণিসটি তাহাদের উভয়ের ভারে কাঁপিতেছিল, যেন পড়ে পড়ে। এই ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একটি যুবা-পুরুষ অনূঢ়, ও অপরটির স্ত্রীপুত্র ছিল। প্রবীণ যুবককে বলিল "দেখ পিয়র, (যুবকের নাম পিয়র) আমি মরিলে আমার স্ত্রীপুত্র অনাহারে মরিবে; কিন্তু তোমার মৃত্যুতে একটি জীবন নষ্ট হইবে মাত্র। কার্ণিসটি দুজনের ভার বহন করিতে অক্ষম, অতএব ছাড়িয়া দাও।" যুবক উত্তর করিল "ঠিক বলিয়াছ" এবং তৎক্ষণাৎ সানন্দে কার্ণিস ত্যাগ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল। প্রবীণ বাঁচিয়া গেল।

সকল দেশে সকল শ্রেণীর মধ্যে কোন না কোন প্রকারে অতিথি সেবা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা হিন্দুদিগের যেরূপ অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীর কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। মহাভারতে একটি আখ্যায়িকা আছে; উহাই বোধ করি অতিথিসেবার চরম আদর্শ। এক গ্রামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত একটি কুটীরে বাস করিতেন। মুষ্টিভিক্ষাই তাঁহাদের উপজীবিকা ছিল। একদা তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে অনাবৃষ্টি হওয়ায় ঐ দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ধনীগণ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। মধ্যবিৎ ও গৃহস্থগণ বহুব্যয়ে অপর দেশ হইতে যাহা কিছু তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিলেন তদ্দ্বারা নিজ পরিবারবর্গেরই সম্যক্ ভরণ পোষণ চলেনা, সুতরাং ভিক্ষা দিবেন কিরূপে? মুষ্টিভিক্ষা বন্ধ হইল। ব্রাহ্মণ গৃহে কোন আহার্য্য নাই দেখিয়া একদিন প্রাতে বাটী হইতে বাহির হইলেন এবং বহুদূরস্থ একটি শস্যক্ষেত্র হইতে অতিক্লেশে কয়েক মুষ্টি যব সংগ্রহ করিয়া পঞ্চম (বা ষষ্ঠ) দিবসে সন্ধ্যাকালে বাটী আসিলেন। বলা বাহুল্য এই পাঁচ ছয় দিন তিনি এবং পরিবারগণ একেবারেই উপবাসী ছিলেন। সে যাহা হউক, সন্ধ্যার

পর গৃহিণী যবগুলি সিদ্ধ করিয়া ৪টী মণ্ড প্রস্তুত করিলেন এবং অনশনে মৃতপ্রায় পুত্র, বধূ ও স্বামীকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। অকস্মাৎ দ্বারে করাঘাত শোনা গেল, কে যেন ক্ষীণস্বরে বলিল "দরজা খোল।" শশব্যস্তে ব্রাহ্মণ দ্বার উন্মুক্ত করিবা মাত্র একটি শীর্ণকায় ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "আমি বড়ই ক্ষুধিত কয়েক দিন আহার হয় নাই। আমায় কিছু খাইতে দাও।" তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া ব্রাহ্মণ পাদ্যার্ঘ দ্বারা অতিথি সেবা করিলেন এবং স্বীয় অন্নভাগ প্রদান করিলেন। দুই গ্রাসেই অতিথি উহা উদরসাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার ক্ষুধা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, অতএব যাহা কিছু থাকে দাও।" ইহাতে গৃহিণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন "স্বামীসেবাই পত্নীর ধর্ম্ম। অতএব আমার ভাগও উঁহাকে দিন।" মুহূর্ত্তমধ্যে অতিথি উহাও ভক্ষণ করিয়া আরও যাচ্ঞা করিলেন। তখন পুত্র ও পুত্রবধূ সানন্দে ব্রাহ্মণকে বলিলেন "পিতঃ, জনক জননী ধর্ম্মভ্রষ্ট না হয়েন ইহাই সন্তানের লক্ষ্য। অতএব আমাদের ভাগ দ্বারাও অতিথিকে পরিতৃপ্ত করুন।" তাহাই করা হইল। ইহাতে অতিথির উদরপূর্ত্তি হওয়াতে তিনি পরমানন্দে ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারবর্গের অনাহারে মৃত্যু ঘটিল। কোন সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে পরের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু যেখানে কোন বিশেষ আবেগের তীব্র তাড়না নাই, যেখানে স্বাভাবিক দয়া বা ধার কর্ত্তব্য বুদ্ধিই একমাত্র পরিচালক, সেখানে যিনি অকাতরে নিজের ও পরিবারের প্রাণ দিয়া পর সেবা করিতে পারেন, তাঁহার প্রেম ও ধর্ম্মজ্ঞান কতই গভীর, কতই শক্তিশালী পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন।

বন্ধুসেবা প্রীতির ফল এই প্রীতি নিবন্ধন ভগবান শ্রীদাম, সুদামের মুখে ক্ষীর ননী তুলিয়া দিতেন ও অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন, কর্ণ আজীবন দুর্য্যোধনের সেবা করিয়াছিলেন। বিনিস্‌-নিবাসী-আণ্টোনিও ও ব্যাসানিওর বন্ধুপ্রেম অমর কবি সেক্ষপীয়র স্বর্ণাক্ষরে চিত্রিত করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশেরই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। যৎকালে চৈতন্য-

দেব "নিমাই পণ্ডিত" নামে খ্যাত ছিলেন, যখন তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অগাধ পাণ্ডিত্যের যশঃসৌরভ দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখন রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। রঘুনাথ ন্যায়ের একখানি টীকা লিখিতেছিলেন এবং লোকমুখে জানিতে পারেন নিমাইও একখানি টীকা লিখিয়াছেন। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তিনি নিমাইয়ের টীকাখানি একব্যর দেখিতে চান। ইহার পর একদিন উভয়েই নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইতেছিলেন এবং নিমাই ও টীকাটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন সুতরাং রঘুনাথকে দেখিতে দিলেন। কিয়দংশ পাঠ করিয়াই রঘুনাথ এরূপ বিচলিত হইলেন যে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল—তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাতে নিমাই বড়ই ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রঘুনাথ, কি হইয়াছে? কাঁদিতেছ কেন?" রঘুনাথ মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "তোমার টীকা প্রকাশিত হইলে আমার টীকা কেহ পড়িবেনা, আমার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইবে।" নিমাই বলিলেন "এই জন্য তুমি কাতর? আচ্ছা, ভাই, আমার টীকা বিসর্জ্জন দিলাম" এই বলিয়া তিনি ঐ অমূল্য পুঁথি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। রঘুনাথ আশ্বস্ত হইলেন এবং "দীধীতি" নামে তাঁহার নিজ টীকা প্রকাশ করিয়া দর্শন জগতে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

পিতৃ মাতৃ সেবা, গুরুসেবা ও রাজসেবা ভক্তি হইতে উৎপন্ন। রাজা, গুরু ও পিতা মাতা হিন্দুদিগের নিকট নরাকারে ভগবান্। কারণ, ভগবানের অসীম করুণার যদি কিছু প্রত্যক্ষ ও মূর্ত্তিমান পরিচয় (Visible and concrete manifestation) থাকে, তাহা পিতামাতা, গুরু ও রাজা। পিতামাতার কৃপাবারিতে সকলেই বর্দ্ধিত ও পুষ্ট, সুতরাং ইহার দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই জানেন শিষ্যের প্রতি তাঁহাদের কি নিরবচ্ছিন্ন ও গভীর প্রেম, শিষ্যের কল্যাণার্থ তাঁহারা অহর্নিশি কিরূপ যত্নপর। আর রাজা? প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজাকে ভগবানের অবতার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ভাবেন তিনি ভগবানের ভৃত্য, প্রজাদিগের কল্যাণ বিধানার্থ তৎকর্তৃক নিয়োজিত। রাজ্য, অর্থ, সম্পত্তি - এ সকলে তাঁহার কিছু মাত্র ব্যক্তিগত অধিকার নাই, এ সমস্তই প্রজাদিগের হিতসাধনের জন্য ভগবান তাঁহার হস্তে

সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও, তিনি ফকির। কারণ এই সকল ধন, ঐশ্বর্য্য, বিভবাদি তাঁহার হস্তে গচ্ছিত আছে মাত্র—এ সমস্তই ভগবানের বস্তু, সমস্তই প্রজাদিগের জন্য। এই জন্যই রাজা জনক বলিয়াছিলেন ঃ—

অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন॥

'আমার অনন্ত বিত্ত আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার কিছুই নাই। মিথিলা নগরী দগ্ধ হইয়া গেলেও, আমার কিছুই দগ্ধ হইবে না।" রাজা রামচন্দ্র হিন্দুমাত্রেরই পরিচিত। প্রজার সুখেই তাঁহার সুখ, প্রজার দুঃখেই তাঁহার দুঃখ। কোন্ প্রজার কি দুঃখ জানিবার নিমিত্ত তিনি রাজ্যের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সর্ব্বদা গুপ্তচর প্রেরণ করিতেন। একদিন একটি দূত সংবাদ দিল যে দীর্ঘকাল রাবণগৃহে বাস করিয়া সীতা ভ্রষ্টা হইয়াছেন এই-রূপ সন্দেহ করিয়া লোকেরা "রাজা অসতীকে ঘরে রাখিয়াছেন" বলিয়া তৎপ্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। এই সংবাদে রামচন্দ্র চিন্তিত—ব্যথিত -ম্রিয়মাণ হইলেন তিনি জানিতেন সীতা পবিত্রা, নিষ্কলঙ্কা, পতিগতপ্রাণা, তিনি জানিতেন সীতা তাঁহার বড় আদরের ধন—বড়ই প্রিয়বস্তু, সুতরাং সীতাকে ত্যাগ করিতে হইলে তাঁহার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইবে কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে তিনি রাজা, প্রজাগণের পিতা, তাহাদের সুখ বিধানার্থই ভগবৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও নিযুক্ত, সুতরাং ব্যক্তিগত সুখের জন্য প্রজাকে কষ্ট দিলে তাঁহার যে রতর অধর্ম্ম হইবে। তাই ক্ষুদ্র স্বার্থ গুরুতর কর্ত্তব্যের নিকট পরাজিত হইল, পত্নীসেবা প্রজাসেবার মুখে ভাসিয়া গেল, তাই লক্ষ্মণের তীব্র প্রতিবাদ, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ ও আর্ত্তনাদ—কিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারিলনা। তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন। এরূপ নিঃস্বার্থ উপকারীর প্রতি প্রজার ভক্তি না হইয়া থাকিতে পারেনা; এরূপ রাজাকে তাহারা যে প্রাণপণে সেবা করিবে তাহা আর বিচিত্র কি?

অনন্ত প্রেমের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিকাশ—স্বদেশসেবা। একদা ফ্রান্সে বিষমকরভারগ্রস্ত অনশনক্লিষ্ট দুর্ব্বল অসহায় ভ্রাতৃবৃন্দের দুঃখে ও দারিদ্র্যে রুসো, বল্‌টেয়ার প্রভৃতির করুণাতন্ত্রী বাজিয়াছিল, এবং তাঁহারা

অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন ; কিন্তু হায়, তাঁহারা জানিতেন না করুণার নির্ম্মল স্রোত ভীষণ রক্তগঙ্গায় পরিণত হইবে, প্রেমের স্থানে প্রতিহিংসা রাক্ষসী তাণ্ডব নৃত্য করিবে। আবার স্কটলাণ্ড যৎকালে বিদেশীয় রাজার অধীনে নিপীড়িত হইতেছিল, অত্যাচারে ও অবিচারে প্রজাকুল হাহাকার করিতেছিল, দয়ার সাগর রবার্ট ব্রুস আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিলেন, জাগিলেন, জাগাইলেন। আবার ইটালিতে ম্যাটশিনি ও গ্যারিবল্ডি ! ভারতবর্ষেই বা স্বদেশ সেবকের অভাব কি। প্রতাপ, শিবজি, ও সহস্র সহস্র রাজপুত বীর ! ইহাঁরা সকলেই মহাপ্রাণ,—ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহভাজন যাঁহাদের হৃদয়ে করুণাময়ের প্রেমের বন্যা ছুটিয়াছে, যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মানবের জন্য কাঁদিতে পারেন ও জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত তাঁহারা কি কম সৌভাগ্যবান্

প্রেম ও দ্বেষ নিত্যবৈরী। যেখানে দয়া ভক্তি প্রীতি, সেখানে ক্রোধ, প্রতিহিংসা জিঘাংসাদি স্থান পাইতে পারেনা। অতএব যিনি প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক তিনি কখনও বিদেশ বিদ্বেষী হইতে পারেন না। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পদে একটী কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় সে বড় কষ্ট পাইতেছে। ইহা দেখিয়া আমার করুণার উদ্রেক হইল। আমি সযত্নে কণ্টকটি উদ্ধার করিয়া দিলাম। কেন ? ভ্রাতার প্রতি কৃপাবশতঃ। কণ্টকের প্রতি হিংসাবশতঃ নহে। কতক গুলি বন্য বরাহ আপনার গ্রামে প্রবেশ করিয়া নিয়ত অত্যাচার করিতেছে, গ্রামবাসিগণ বড়ই কাতর ও ক্ষতিগ্রস্ত। তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আপনি বরাহগুলিকে তাড়াইয়া দিলেন এবং প্রয়োজন হওয়াতে দুএকটীকে বধও করিলেন। ভাল, বধের সময় আপনি পশুগুলিকে কি ভাবে দেখিয়াছিলেন ? যদি তিলমাত্র ক্রোধ বা প্রতিহিংসার উদ্রেক হইয়া থাকে, নিশ্চয় জানিবেন আপনার পবিত্র স্বজনসেবা কলুষিত ও কলঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু যদি করুণাশ্রু নয়নে ভাবিয়া থাকেন "অবোধ প্রাণিগণ না বুঝিয়া কি বিষম অনিষ্টই করিতেছে। হায় হায়, কর্ত্তব্যানুরোধে ইহাদিগকে বধ করিতে হইল" তবেই আপনার সেবা যথার্থ নির্ম্মল সেবা। রাজা চোর দস্যু প্রভৃতি অপরাধী-দিগকে দণ্ড দেন কেন ? অসহায় দুর্ব্বল প্রজাগণের রক্ষার্থই কৃপালু রাজার দণ্ডবিধির ব্যবস্থা, অপরাধীর প্রতি ক্রোধ বা হিংসাবশতঃ নহে। এক বিচা-

রক একটি নরঘাতীকে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, বলিলেন "এই কঠোর আদেশ দিতে আমি মর্ম্মাহত! কিন্তু উপায় নাই, লক্ষ লক্ষ প্রজার হিতার্থ আইন্ বিধিবদ্ধ হইয়াছে।" স্বদেশ প্রেমিকের অবস্থাও কতকটা এইরূপ। তিনি অত্যাচারীকে বলেন "আমার লক্ষ লক্ষ ভায়েরা আজ নিরন্ন—দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ইহাদের দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতেছে! অতএব প্রাণ থাকিতে তোমাকে আর অত্যাচার করিতে দিব না। তোমার প্রতি কিছু মাত্র ক্রোধ বা হিংসা নাই, বরং বাধ্য হইয়া যে অস্ত্র গ্রহণ করিতে হইতেছে তজ্জন্য দুঃখিত" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে উৎপীড়িতের রক্ষাই (defence) স্বদেশ-প্রেমিকের লক্ষ্য, উৎপীড়কের অনিষ্টবিধান (offence) নহে। তবে তাঁহার পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু অনিষ্ট অনিবার্য্য হয়, কেবল ততটুকুই অনিচ্ছার সহিত করেন, তাহার অতিরিক্ত এক তিলও করেন না।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশে অনেক স্বদেশসেবকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহাদের জীবনী পাঠে আমরা বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারি। নিঃস্বার্থতা ধৈর্য্য, বাক্যসংযম, উৎসাহ, অধ্যবসায়, প্রচলিত বিধিব্যবস্থার মর্য্যাদারক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ পিট্, বার্ক্, গ্লাডষ্টোন, ব্রাডলাফ্ আদির জীবনে দেদীপ্যমান। আমরা রামচন্দ্রের জীবন হইতে স্বদেশসেবার একটি নিদর্শন দিব। সীতার নির্ব্বাসন ব্যাপারেই তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও প্রজা-পরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। আর একটি ঘটনা এই :—একদা এক ব্রাহ্মণের একটি শিশু পুত্র মারা পড়ে। ইহাতে রাজ্যে ভয়ানক গোলমাল উঠিল, কারণ তৎকালে এরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ছিল। পিতা মাতা বর্ত্তমানে সন্তান মরিত না, যদি মরিত, বুঝিতে হইত রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে করিতে জানা গেল যে এক শূদ্র গোপনে তপস্যা করিতেছে এবং এই পাপেই ব্রাহ্মণতনয় মরিয়াছে। শূদ্রের শিরশ্ছেদ না করিলে রাজ্যের বিষম ভাবী অমঙ্গল। কোমলহৃদয় রামচন্দ্র শূদ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া করুণরসে বিগলিত হইলেন, বলিলেন "আহা, নৃশংসের ন্যায় এই বালককে বধ করিতে হইবে।" কিন্তু না করিলে উপায় নাই, তাই অশ্রুপূর্ণলোচনে কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিলেন। ইহাই

স্বদেশসেবার আদর্শ। যাহারা দেশের অমঙ্গলের কারণ তাহাদিগকে বিনাশ না করিয়া যদি দেশরক্ষা করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। কিন্তু তাহা যদি সম্ভব না হয়,—যদি বিনাশেরই একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সকরুণ হৃদয়ে উক্ত কার্য্যটি করিতে হইবে, প্রতিহিংসা প্রণোদিত হইয়া নহে।

যখন স্বদেশ-প্রেম ঘনীভূত ও প্রসারিত হইয়া পড়ে, যখন কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি বা নির্দ্দিষ্ট দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া উহা সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করে, তখনই উহা বিশ্বপ্রেম। ইহার দুইটি উদাহরণ দিব- শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব। উভয়েই ভগবানের অবতার, সুতরাং তাঁহাদের মহত্ত্ব ও বিশালতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে আমরা অক্ষম। শ্রীকৃষ্ণের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সমগ্র মানবজাতির সর্ব্বোচ্চ কল্যাণই তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য। যখন কৌরবগণ মদোন্মত্ত, বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও পাপাসক্ত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে লাগিল, যখন তাহাদের ও জগতের হিতের জন্য তাহাদের বিনাশের প্রয়োজন হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তাঁহার এই পবিত্র কার্য্য সম্পাদন করিলেন। আবার তাঁহার অন্ত্যলীলায় যখন যাদবগণ উদ্ধত ও অবিনয়ী হইয়া শাস্ত্র ও ঋষির অবমাননা করিতে লাগিল, যখন ভগবান দেখিলেন ইহারা ক্রমোন্নতির কণ্টকস্বরূপ হইয়াছে, সুতরাং ইহাদের নিধন ব্যতীত জীবের কল্যাণ নাই, তখন সেই পরম কারুণিক স্বহস্তে মুষল ধারণ করিয়া স্বীয় জ্ঞাতি কুটুম্বের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র গৌতম সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অঙ্কে লালিত,—সুখ, সম্ভোগ বিভব, ঐশ্বর্য্য, স্নেহময়ী জননী, পতিপ্রাণা ভার্য্যা—কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু বিশ্বগ্রাসী প্রেম কি ক্ষুদ্র পরিবারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে? নায়াগারার জলপ্রপাতকে সামান্য বালুকা-বাঁধ দ্বারা রোধ করা যায় কি? তাই গৃহ, গ্রাম, দেশ ভাসাইয়া প্রেমের বন্যা ছুটিল, জগৎ প্লাবিত হইয়া গেল। জীবের রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুতে যুবকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, বলিলেন "যদি ইহার প্রতীকার করিতে পারি, যদি জীবকে চিরসুখী ও অমর হইবার পথ দেখাইতে পারি, তবেই জীবনের সার্থকতা।" এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধন্য প্রেম! ধন্য জীব-

সেবা॥ ধন্য দৃঢ়তা!!! তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, জীবন সার্থক হইল, লক্ষ লক্ষ জীবের উদ্ধার হইয়া গেল।

যখন ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন এই সেবাকার্য্যটি সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণ অপরা ও পরা বিদ্যা দান করিয়া, ক্ষত্রিয় শত্রুহস্ত হইতে দেশরক্ষা করিয়া, বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধনধান্য বৃদ্ধি করিয়া এবং শূদ্র কায়িক শ্রম করিয়া অন্য তিন বর্ণের সেবা করিতেন। তখন যে যাহা করিতেন সমস্তই পরের জন্য, কেবল নিজের জন্য নহে; অন্ততঃ ইহাই তাৎকালিক আদর্শ ছিল। এমন কি যে গৃহস্থ কেবল নিজের জন্য অন্ন পাক করিতেন তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতেন। জ্ঞানলাভজনিত আনন্দ উপভোগ করা ব্রাহ্মণের গৌণ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অপরকে জ্ঞানী করা। সেইরূপ, নিজে রাজ্যসুখ ভোগ করিব এই অভিপ্রায়ে ক্ষত্রিয় রাজা হইতেন না, দেশ ও ধর্ম্মরক্ষা দ্বারা সমাজের সেবা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিত। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! আজ আমরা সেবার আদর্শ হারাইয়াছি। এখন যাহা কিছু করি, সব নিজের জন্য। উকীল, মোক্তার, ডাক্তারগণ কেবল "ফি"র কথাই ভাবেন; শিক্ষক, কেরাণী প্রভৃতি বেতনভুক্ কর্ম্মচারিগণ কবে মাসান্তে বেতন পাইয়া নিজের ও পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবে কেবল সেই চিন্তাতেই মগ্ন! "ভগবান্ আমাকে অপরের সহিত সংযোজিত করিয়া সেবা করিবার একটি অবসর দিয়াছেন মাত্র" ইহা আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই। উকীল যদি ভাবেন অন্যায় ও অবিচার হইতে একটি ভ্রাতাকে রক্ষা করিতেছি, চিকিৎসক যদি ভাবেন একটি পীড়িত ভ্রাতাকে যন্ত্রণামুক্ত করিতেছি, শিক্ষক যদি মনে করেন বালকগণের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া জগতের ভাবী কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত করিতেছি, প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে যদি আমাদের মনে অর্থের ও নিজ সুখের চিন্তা উদিত না হইয়া এই সেবার কথাই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে অর্থ গ্রহণ করিলেও (যিনি অর্থ লন না তিনি তো মহাত্মা) আমরা অল্পে অল্পে পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারি।

অবশ্য, সকল ব্যক্তিই যে আজকাল অর্থলোলুপ ও হৃদয়হীন তাহা আমি বলিতেছি না, মধ্যে মধ্যে মহাত্মাও দৃষ্ট হয়। এই কলিকাতা সহরেই একটি

খ্যাতনামা ও বিচক্ষণ কবিরাজকে জানি যাঁহার সহৃদয়তা, নিঃস্বার্থ পরোপকার এবং অকপট ব্যবহার দেখিয়া আমি অনেক সময় বিমোহিত হইয়াছি। শত শত দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধাদি দান করিয়া থাকেন। প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে ইনি ভাগলপুরে গিয়া ২।১ মাস অবস্থান করেন। সেই সময় তথায় এক ভদ্রলোকের একটি শিশু পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছিল। তথাপি ভদ্রলোকটি কবিরাজমহাশয়কে স্বীয় পুত্রটি একবার দেখিতে অনুরোধ করেন। সদয় চিকিৎসক সানন্দে সম্মত হইলেন এবং যতদিন পুত্রটি জীবিত ছিল (প্রায় ১৫।১৬ দিন) প্রত্যহ দুবেলা (অনেক সময় নিজব্যয়ে গাড়ীভাড়া করিয়া) পুত্রটিকে দেখিতে যাইতেন। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। তদবধি উক্ত ভদ্রলোকটির পরিবারস্থ যাবতীয় ব্যক্তিকে সযত্নে ও সাদরে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন! এই অহৈতুকী করুণা দেখিয়া ভগবান্‌কে মনে পড়ে না কি? যাহারা সাধন ভজন করে তাহাদের প্রতি তো কৃপা হইবারই কথা, কিন্তু যাহারা কিছু না করিয়াই তাঁহাকে পায়, তাহাদের নিকটেই "করুণা সিন্ধু" নামটি সার্থক!!।

আমরা দেখিলাম জীবমাত্রই অপরের সেবা করিতে প্রস্তুত। সেবার মূল প্রেম। সকল জীবেই প্রেম অল্পাধিক বর্ত্তমান, কারণ সে সচ্চিদানন্দের একটি অংশ। এই প্রেম ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধির সীমা নাই, কারণ প্রেম অগাধ--অনন্ত। জীবে ইহা প্রথমে স্বদেহপ্রীতিরূপে প্রকাশ পায়, দেহপ্রীতি দাম্পত্যপ্রেমে, দাম্পত্যপ্রেম পরিবারপ্রেমে, পরিবারপ্রেম স্বজনপ্রেমে, স্বজনপ্রেমে স্বদেশপ্রেমে এবং স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে স্বদেশপ্রেমিক হইতে হইলে নিজ পরিবারকে বা স্বজনকে ভুলিতে হইবে। বরং ঠিক বিপরীত। যখন প্রকৃত স্বদেশপ্রেম জন্মিবে তখন স্বজনপ্রেম বা পরিবারপ্রেম শতগুণে বাড়িয়া যাইবে এবং বিশ্বপ্রেম জন্মিলে স্বদেশপ্রেম শতগুণে এবং পরিবার-প্রেম সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হইবে। ইহাই প্রেমের ধারা।

"আত্মা ভিন্ন কিছুই নাই," "সবই আত্মা," "আমিই সেই আত্মা"—এই সকল মহাবাক্যের অর্থ স্থূলদেহধারী মানব (জীবন্মুক্ত মানবের কথা স্বতন্ত্র)

হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম ; তবে প্রেমের দ্বারা সে ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাইতে পারে। যখন তাহার প্রেম জগৎময় প্রসারিত হয়, যখন সে সকল জীবকে নিজতুল্য ভালবাসে, যখন তাহাদের সুখেই নিজের সুখ ও তাহাদের দুঃখেই নিজের দুঃখ বোধ করে,—তখন তাহার নিকট "অপর" শব্দটির কোন অর্থ থাকে না, তখন তাহার বোধ হয় সবই আমি (বা আমার), তখন সে "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" এই বাক্যের অর্থ কতক বুঝিতে পারে, তখন ভগবানের বিরাট দেহে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত ভূত বর্ত্তমান রহিয়াছে—এই বিশ্বমূর্ত্তির রহস্য কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এক অনন্ত প্রেমই নানা রূপে ও নানা নামে প্রকাশ পাইতেছে এবং এই প্রেমই আত্মা বা ভগবান।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

বিশ্রব্ধং ভুজগীব জীবিততনুং ব্যাহন্তি যা দেহিনাং
যা সৌহার্দ্দমপাকরোতি শুচিতাং স্পর্শোঽশুচীনামিব।
যা কৌটিল্যকলাং কলামিব বিধোঃ পুষ্ণাতি পক্ষঃ সিত
স্তাং নির্ম্মোকমিবোরগঃ ক্ষতগতিং মায়াং কো ন মুঞ্চতি। ৪৩।

যা (মায়া) ভুজগী (সর্প স্ত্রী) ইব দেহিনাং (শরীরিণাং) জীবিততনুং (জীবিত শরীরং) বিশ্রব্ধং (বিশ্বাসম উৎপাদ্য ইতি শেষঃ) ব্যাহন্তি (বিনাশয়তি) যা (মায়া) অশুচীনাং (অপবিত্রাণাং) স্পর্শঃ ইব (শুচিতাং) (পবিত্রতাং) ইব সৌহার্দ্দং অপাকরোতি (দূরী করোতি)। যা (মায়া) সিতঃ (শুক্লঃ) পক্ষঃ বিধোঃ (চন্দ্রস্য) কলাং ইব কৌটিল্যকলাং (কাপট্যকলাং) পুষ্ণাতি (বর্দ্ধয়তি) তাং ক্ষতগতিং (ক্ষয়হেতুং) মায়াং উরগঃ (সর্পঃ) নির্ম্মোকং (জীর্ণত্বচং) ইব কঃ (বুদ্ধিমান্ জনঃ ইতি শেষঃ) ন মুঞ্চতি (ন ত্যজতি) সর্ব্বথা পরিত্যক্তুমুচিতমিতি ভাবঃ। ৪৩।

যে মায়া ভুজঙ্গীর ন্যায় জীবন নষ্ট করে, অশুচির স্পর্শে যেমন পবিত্রতা দূর হয় সেইরূপ যে মায়ার স্পর্শে সৌহার্দ্দ দূরীভূত হয় এবং যে মায়ার সম্পর্কে কুটিলতা শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলায় ন্যায় বর্দ্ধিত হয় সেই ক্ষয় কারণ মায়াকে সর্প যেমন জীর্ণ চর্ম্ম পরিত্যাগ করে সেইরূপ কোন্ বুদ্ধিমান্ পরিত্যাগ করেন না ? অর্থাৎ সকলেরই মায়া ত্যাগ করা উচিত। ৪৩।

যে কৌটিল্য কলা কলাপ কুশলা স্তে সন্ত্যনেকে ক্ষিতৌ
যে হার্য্যার্জ্জব বর্য্যবীর্য্য সদনং তে কেচিদেব ধ্রুবম্।
লভ্যান্তে হি পদে পদে ফলভবৈর্ণম্রা দরিদ্র দ্রুমাঃ
সংপ্রীণন্ ভুবনানি পেশল ফলৈবল্পোহি কল্পদ্রুমঃ। ৪৮।

যে (জনা ইতি শেষঃ) কৌটিল্য কলাকলাপ কুশলাঃ (কাপট্যবিদ্যা সমূহেষু কুশলাঃ পণ্ডিতাঃ) তে তাদৃশাঃ অনেকে (বহবঃ) ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাং) সন্তি (বর্ত্তন্তে) যে জনাঃ হারি (মনোহারি) আর্জ্জব বর্য্য-বীর্য্য সদনং (ঋজুত্বরূপ শ্রেষ্ঠ শক্তি নিলয়ঃ) তে কেচিদেব (বিরলাঃ) ফলভবৈঃ নম্রাঃ দরিদ্রদ্রুমাঃ (পেশলফলাভাবাদ্দরিদ্রতা ইতিভাবঃ) পদে পদে (স্থানে স্থানে) লভ্যান্তে (প্রাপ্যন্তে) কিন্তু পেশলফলৈঃ (উত্তম ফলৈঃ) ভুবনানি (জগন্তি) সংপ্রীণন্ (তর্পয়ণ্) কল্পদ্রুমঃ (কল্পবৃক্ষঃ) অল্পঃ হি অস্তীতি শেষঃ॥ ৪৪।

এ জগতে কাপট্য পারদর্শী লোক অনেক আছে কিন্তু মনোহর সরলতা-পূর্ণ মানব খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলভরে নত হইলেও উত্তম ফলের অভাব হেতু দরিদ্র বৃক্ষ পদে পদেই পাওয়া যায় কিন্তু উত্তম ফল দ্বারা জগৎ পরিতৃপ্ত করে এরূপ কল্প বৃক্ষ কোথায় ? ৪৪

উমায়া ইব মায়ায়াঃ সম্পর্কং মুঞ্চ মুঞ্চ রে।
ঈশ্বরোঽপি নরো নূনং যৎ সঙ্গাৎ ভীমতাং ভজেৎ। ৪৫।

রে (সম্বোধন সূচকমব্যয়মেতৎ) মানব! উমায়াঃ (পার্ব্বত্যাঃ ইব মায়ায়াঃ) সম্পর্কং মুঞ্চ মুঞ্চ (ত্যেজ ত্যজ) যৎ সঙ্গাৎ (যস্যাঃ মায়ায়াঃ পক্ষে পার্ব্বত্যাঃ সঙ্গাৎ সম্পর্কাৎ) ঈশ্বরঃ (ঐশ্বর্য্যশালী নরঃ ইত্যস্য বিশেষণং পক্ষে মহাদেবঃ) অপি (অপরস্যতু কা কথা ইত্যপেরর্থঃ) ভীমতাং (ভয়ঙ্করত্বং) নূনং (নিশ্চয়মেব) ভজেৎ (লভেত)। ৪৫।

হে মানব উমার সদৃশ মায়ায় সম্পর্ক পরিত্যাগ কর; যাহার সম্পর্কে ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষও ভয়ঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয় (পক্ষে মহাদেবও ভীমত্ব লাভ করেন)। ৪৫।

অথ লোভ প্রক্রমং

নাশং যো যশসাং করোতি রজসাং ব্রাতোঽনিলানামিব
ত্রাসং যো মহসাং তনোতি বয়সাং পাতঃ শরাণামিব।
শোভাং যো বচসাং হিনস্তি পয়সাং বৃষ্টির্ঘনানামিব
ত্যক্ত্বা কৃত্য করীন্দ্রকুম্ভ শরভং লোভং শুভং যুর্ভব॥ ৪৬।

যঃ (লোভঃ) অনিলানাং (বায়ুনাং) ব্রাতঃ (সমূহঃ) কর্ত্তা, রজসাং (পরাগাণাং) ইব যশসাং (কীর্ত্তীনাং) নাশং করোতি, যঃ শরাণাং (বাণানাং) পাতঃ (পতনং কর্ত্তা) বয়সাং (পক্ষিণাং) ইব মহসাং (তেজসাং) ত্রাসং তনোতি (বিস্তারয়তি) ঘনানাং (মেঘানাং) বৃষ্টিঃ (কর্ত্রী) পয়সাং (জলানাং) ইব বচসাং (বাক্যানাং) শোভাং (সৌন্দর্যং) হিনস্তি (বিনাশয়তি) তং কৃত্য করীন্দ্রকুম্ভ শরভং (কার্য্যরূপ গজেন্দ্রকুম্ভ স্থল মারকং সিংহমিতি যাবৎ) লোভং ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) শুভং যুং (কল্যাণ ভাগী) ভব। ৪৬।

বায়ু যেমন পুষ্পপরাগধ্বংশ করে, সেইরূপ যে লোভ যশোরাশি বিনষ্ট করে, শরপতনে যেমন পক্ষিসমূহ ত্রাসযুক্ত হয়, সেইরূপ যে লোভ তেজের ত্রাস জন্মায় এবং বৃষ্টি যেমন জলের শোভা নষ্ট করে, সেইরূপ যে লোভ বাক্যের শোভা নষ্ট করে সেই কার্য্যরূপ হস্তিকুম্ভ বিনাশকারী সিংহতুল্য লোভ পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণভাগী হও। ৪৬।

কিংধ্যানৈ র্মুখপদ্মমুদ্রন চনৈঃ কিঞ্চেন্দ্রিয়ানাং জয়ৈ
রুদ্ধৈচ্ছ্বৈ স্তপসাং পুনঃ প্রতপনৈঃ কিং মেদসাং শোষণৈঃ।
কিং বাচাং জনিতশ্রমৈঃ পরিচয়ৈঃ কিং ক্লেশযুক্তৈর্ব্রতৈ
শ্চেল্লোভোঽখিল দোষ পোষণ পটুর্জাগর্ত্তি চিত্তার্ত্তিভূঃ॥ ৪৭।

চেৎ (যদি) অখিল দোষ পোষণ পটুঃ (সর্ব্বদোষ বর্দ্ধকঃ) অর্ত্তিভূঃ (দুঃখজনকঃ) লোভঃ চিত্তে (মনসি), জাগর্ত্তি, তর্হি মুখপদ্ম মুদ্রণচনৈঃ (মুখকমল মৌনসম্পাদন পটুভিঃ) ধ্যানৈঃ (আত্ম চিন্তনৈঃ) কিং (ন কিমপি

প্রয়োজনমিতিভাবঃ) তথা, ইন্দ্রিয়ানাং (চক্ষুরাদীনাং জয়ৈঃ কিং (ন কিমপীত্যর্থঃ , তথা, রুদ্ধেচ্ছৈঃ (ইচ্ছানিরোধকৈঃ) মেদসাং (মজ্জানাং) শোষণৈঃ (শোষকারিভিঃ) তপসাং প্রতপনৈঃ (তপোভিঃ) পুনঃ কিং (ন কিমপি), তথা বাচাং (বাক্যানাং জনিতশ্রমৈঃ পরিচয়ৈঃ কিং (ন কিমপি) তথা ক্লেশযুক্তৈঃ (সক্লেশৈঃ) ব্রতৈঃ কিং। লোভবিরহাভাবশ্চেৎ ধ্যানাদিকং বিফলমিতি ভাবঃ। ৪৭।

যদি সর্ব্বদোষের আকর দুঃখনিদান লোভ চিত্তে জাগরূক থাকে তবে মুখকমল মুদ্রণকারী মৌনাবলম্বনের উপদেষ্টা ধ্যান ইন্দ্রিয়জয়, ইচ্ছারোধক এবং মজ্জাবিনাশক তপঃ, শ্রমদায়ক বাক্যপরিচয় এবং ক্লেশকর ব্রত সবই বৃথা। ৪৭ ॥

স স্থৈর্য্যৈক নিকেতনং, স সুভট শ্রেণিষু চূড়ামণিঃ
সপ্রাগল্‌ভ্য পরানুভাব সুভগঃ স ধ্যানধূর্ব্বহঃ।
স শ্রেষ্ঠঃ স চ পুণ্যবান্ স চ শুচিঃ স শ্লাঘনীয়ঃ সতাং
যেনা গণ্য গুণালিবল্লী কলভোঃ লোভো ভৃশং স্তম্ভিতঃ ॥ ৪৮ ।

যেন (জনেন) অগণ্য গুণালিবল্লী কলভঃ (অসংখ্যগুণ শ্রেণিরূপ লতায়াঃ, কলভঃ করিশাবকঃ বিনাশকঃ ইত্যর্থঃ লোভঃ ভৃশং । অত্যর্থং) স্তম্ভিতঃ, স জনঃ স্থৈর্য্যৈক নিকেতনং (স্থিরতায়াঃ মুখ্যং স্থানং) স, সুভট শ্রেণিষু (যোদ্ধৃপঙ্‌ক্তিষু) চূড়ামণিঃ (শ্রেষ্ঠঃ) সঃ প্রাগল্‌ভ্য পরানুভাব সুভগঃ (প্রাগল্‌ভ্যং প্রগল্‌ভতা, তস্য পরানুভাবেন সুভগঃ মনোহরঃ) সঃ ধ্যানধূর্ব্বহঃ (ধ্যানভারস্য ভারবাহী) সঃ শ্রেষ্ঠঃ স চ পুণ্যবান্ সচ শুচিঃ (পবিত্রঃ , সঃ সতাং (সাধুজনানাং) শ্লাঘনীয়ঃ (প্রশংসনীয়ঃ) ভবতি। ৪৮।

যে ব্যক্তি গুণ শ্রেণিরূপ লতার বিনাশক—করিশাবকতুল্য লোভকে যথেষ্টরূপে স্তম্ভিত রাখিতে পারে সেইব্যক্তি স্থিরতার আধার যোদ্ধৃসমূহের শ্রেষ্ঠ, ধ্যান ভারের ভারবাহী স্বরূপ, সমর্থ, শ্রেষ্ঠ, পুণ্যবান্, পবিত্র এবং সাধুদিগের প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। ৪৮।

মৈত্রীং বিমুঞ্চতি সুহৃদ্ বিনয়ং বিনেয়ঃ
সেবাঞ্চ চ সেবকজনঃ প্রণয়ঞ্চ পুত্রঃ।
নীতিং নৃপো ব্রতমৃষিশ্চ তপস্তপস্বী
লোভাভিভূত হৃদয়ঃ কুলজাপি লজ্জাং। ৪৯।

লোভাভিভূত হৃদয়ঃ (লোভাক্রান্ত চেতাঃ) সুহৃদ্ (মিত্রং) অপি মৈত্রীং (বন্ধুতাং) বিমুঞ্চতি (ত্যজতি) তথা বিনেয়ঃ (শিক্ষনীয়ঃ) অপি বিনয়ং বিমুঞ্চতি। তথা সেবকজনঃ সেবাং বিমুঞ্চতি, তথা রাজা (নৃপঃ) নীতিং বিমুঞ্চতি। ঋষিঃ ব্রতং বিমুঞ্চতি, তপস্বী তপঃ বিমুঞ্চতি (কিং বহুনা) কুলজাপি (সৎকুলোদ্ভবা মহিলা) অপি লজ্জাং (এপাং) বিমুঞ্চতি (অধিক পুংলিঙ্গ বিশেষ্যভাজি পদানাং বিশেষণ ভাজিত্বাৎ "লোভাভিভূত হৃদয়ঃ" ইতি পুংসি নির্দ্দেশঃ) ৪৯।

লোভাভিভূত হইলে সুহৃদও সৌহার্দ্দত্যাগ করে, বিনয়ীরও বিনয় থাকে না, সেবকও সেবা ত্যাগ করে, পুত্রও পিতৃভক্তি ত্যাগে বিরত হয় না, রাজারও নীতি ঠিক থাকে না, ঋষিরাও ব্রত পরিত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হন না, তপস্বীরও তপ পরিত্যক্ত হয় এবং সৎকুল সম্ভূতা নারীও নির্লজ্জ হইয়া পড়ে। ৪৯।

ক্রমশঃ

অলৌকিক ঘটনা।

বহু দিবস অতীত হইল নদীয়া জেলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গা মহাকুমায় ভোলানাথ সামন্ত নামক এক সঙ্গতিপন্ন কৃষক বাস করিত। পল্লীগ্রামস্থ কৃষকদিগের ন্যায় ইহারও কয়েকখানি উলুখড়ে ছাওয়া ঘর ছিল—প্রায় দশ কাঠা ভূমি ব্যাপিয়া ঘরের চারিদিকে ছেচা বাঁশের বেড়া ছিল। অন্দরের উঠানে তিনটী ধান্যের মরাই ছিল, ধান সিদ্ধ ও শীতকালে মধ্যে মধ্যে রন্ধন কার্য্যের জন্য উঠানের একপার্শ্বে দুইটী উনন ছিল। সদরে বাহিরের লোক-দিগের বসিবার উপযোগী ছোট চণ্ডীমণ্ডপের মত একখানি ঘর ছিল, আত্মীয় কুটুম্ব আসিলে সেইখানে বসিত। তাহার এক পার্শ্বে একখানি গোয়ালঘর—গোয়ালঘরে দুই তিনটী পয়স্বিনী গাভী ও ভূমি চষিবার জন্য দুই জোড়া বলদ থাকিত। অপর পার্শ্বে অনাবৃত ভূমি খণ্ডের উপর কোথাও লাউ গাছ পুঁই গাছ, কোথাও বা দুই চারিটা বেগুন গাছ প্রভৃতি সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় শাকসবজী উঠানের শোভা বর্দ্ধন করিত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে ভোলানাথের সংসারে তাহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও একটী বালিকা কন্যা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। বেশ সুখ-

স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা এক প্রকার নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। এ পৃথিবীতে কাহাকেও চিরসুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। ভোলানাথের সুখের সংসারে দুঃখ প্রবেশ করিল। তাহার স্নেহময়ী জননী ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া ভোলানাথ গ্রামস্থ সকল জাতির বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।

কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত জন্তু অতি বিরল। অনেক স্থলে প্রভুর আজ্ঞাপালনার্থ কুক্কুরকে প্রাণদান করিতে দেখা গিয়াছে। ভোলানাথের একটী অতি বিশ্বস্ত কুক্কুর ছিল মাতার মৃত্যুর পর কোন কার্য্য উপলক্ষে ভোলানাথকে স্থানান্তরে যাইতে হইলে এই কুক্কুরটী তাহার বাটীর প্রহরীর কার্য্য করিত। স্ত্রী একমাত্র বালিকা কন্যাকে লইয়া একাকিনী নির্ভয়ে সেই বাটীতে বাস করিত, কুক্কুর আছে ভাবিয়া তাহার মনে কোন বিপদের আশঙ্কা উদয় হইত না।

নদীস্রোতের ন্যায় সময়স্রোত বহিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বালিকা নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। আজকাল আমাদিগের সভ্য সমাজে কন্যা যোড়শী না হইলে প্রায় পরিণয় কার্য্য সমাধা হয় না পূর্ব্বে আমাদিগের সকল সমাজেই বাল্য বিবাহের অধিক প্রচলন ছিল। কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ভোলানাথ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পরে বহু চেষ্টার পর একটী সুপাত্র পাইয়া কন্যাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিল। উদ্বাহের পর কন্যা স্বামীগৃহেই বাস করিতে লাগিল। কখন কখন সে পিতৃগৃহে আসিত। এখন ভোলানাথের সংসারে সে স্বয়ং ও গৃহিণী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

মাতৃশোক ভুলিতে না ভুলিতে আর একটী দারুণ শোক উপস্থিত হইয়া ভোলানাথের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। কন্যার বিবাহের অল্পদিন পরেই তাহার গৃহিণী গৃহ শূন্য করিয়া পরলোক যাত্রা করিল। কার্য্য হইতে প্রত্যাগত তৃষ্ণায় শুষ্কতালু ভোলানাথকে এক বিন্দু জল দান করে, পীড়াগ্রস্ত হইলে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষার দ্বারা কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব করে, সময়ে এক মুষ্টি অন্ন রন্ধন করিয়া দেয়, এমন আর কেহ রহিল না। ভোলানাথ ভাবিল আবার বিবাহ করিবে। সে নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের একটী কন্যাকে মনোনীত করিয়াছিল।

একদিন কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসিতে—শূন্য গৃহে সত্বর ফিরিতে তাহার আর ইচ্ছা হইত না—অধিক রাত্রি হইল। সে রাত্রে আর রন্ধনের কোন আয়োজন না করিয়া যাহা কিছু জলযোগ করিয়া ভোলানাথ শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শীঘ্রই সে নিদ্রাভিভূত হইল। পরে গভীর রাত্রে কুকুরের উচ্চ চীৎকারে অকস্মাৎ তাহর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাটীর মধ্যে চোর প্রবেশ করিয়াছে ভাবিয়া সে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিল। কুকুর তাহাকে দেখিয়া আরও অধিক উচ্চরবে চীৎকার করিতে করিতে একবার তাহার দিকে আসিতে ও আবার বেড়ার দিকে যাইতে লাগিল। ভোলানাথ নিশ্চয়ই চোর মন করিয়া গৃহ হইতে একটী বন্দুক লইয়া কুকুর প্রদর্শিত বেড়ার দিকে চলিল। যাইতে যাইতে সে দেখিল—শুভ্রবস্ত্রাবৃতা এক রমণীমূর্ত্তি সেই বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে উত্থিত হইতেছে। ভোলানাথ ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিল সে রমণী তাহার মৃতা পত্নী। ভোলানাথকে তদবস্থ দেখিয়া রমণীমূর্ত্তি বলিল —তোমার কিছু ভয় নাই, বোধ হয় তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার আবার বিবাহের কথা জানিতে পারিয়া তোমাকে একটী কথা বলিতে আসিয়াছি, শোন—অমুক গ্রামের যে মেয়েকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছ, আমি তাহাকে বিবাহ করিতে দিবনা। আমার সাজান ঘরে আমিই রহিলাম, আর কাহাকেও আসিতে দিবনা। তুমি ও সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, নতুবা মহা বিপদ ঘটিবে। এই বলিয়া রমণীমূর্ত্তি অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

বোধ হয় উপস্থিত ভয়ে ও ভাবী বিপদের অশঙ্কায় সেই দিন হইতে ভোলানাথের জ্বর হইল। দুই এক দিনের মধ্যে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। নানাবিধ চিকিৎসা হইতে লাগিল। কন্যা ও কন্যার শ্বশুরালয় হইতে আত্মীয় স্বজন আসিয়া বিশেষ যত্নের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হইল না অষ্টম দিবসে ভোলানাথের মৃত্যু হইল। বোধ হয় স্বামীর প্রতি ভালবাসা ভুলিতে না পারিয়া তাহার মৃতা পত্নী তাহাকে ডাকিয়া লইল।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ } ভাদ্র, ১৩১৫ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

রাস তত্ত্ব।

৪

হৃদয়নিহিত পুরুষ ও অব্যক্তাতীত পুরুষ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রণবাস্ত্র দ্বারা হৃদয়ে আত্মার অন্বেষণ করিয়া আমরা হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে উপলব্ধি করিতে পারি। অব্যক্তাতীত পুরুষকে উপলব্ধি করিতে পারি না। সে কেবল ক্রমের কথা। অর্থাৎ একবারেই সেই পরম পুরুষের উপলব্ধি করিতে পারি না। ক্রম দ্বারা পারি। সে ক্রম কি?

সাধক মৃত্যুর পর দেবযান মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। সেখানে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত হইয়া সেই অমাত্র পরম পুরুষের ধ্যান করেন। এবং দ্বিপরার্দ্ধ কালের অন্তে যখন হিরণ্যগর্ভ লোকের লয় হয়, তখন তিনি সেই লোক হইতে মুক্ত হইয়া অমাত্র পরম পুরুষের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন।

সাধক একবারে কাল কর্ম্ম স্বভাবের অতীত হইতে পারেন না। তিনি দেবযান মার্গে ক্রমশঃ দিনের সীমা, পক্ষের সামা, ষণ্মাসের সীমা অতিক্রম করেন। মৃত্যুর পর দেবযান মার্গে দেবতা হইলে প্রথমে সেই দেবরূপী সাধকের আমাদের এক দিনেই দিন হয়। পরে পিতৃদেবদিগের ন্যায় এক পক্ষে তাঁহার দিন হয়। পরে ত্রিদিববাসী দেবতাদিগের ন্যায় এক ষণ্মাসে তাঁহার দিন হয়। এইরূপে কালের সীমা অতিক্রম করিতে করিতে হিরণ্য গর্ভের কালের সীমা তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না। যে ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার জন্ম সে ব্রহ্মাণ্ডপুরুষের কাল, কর্ম্ম, ও স্বভাব অতিক্রম করা প্রণব সাধকের পক্ষে দুর্ঘট। কারণ প্রণব যোগের মার্গ। সেই মার্গ দ্বারা ক্রম বিকাশ হয়। সেই ক্রম ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্গত ক্রম এবং সেই ক্রমের অব ান ব্রহ্মাণ্ডপুরুষে।

"তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভি-সম্ভবন্তি। অর্চ্চিষোঽহঃ। অহ্ন আপূর্য্যমানপক্ষম্। আপূর্য্যমান পক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্॥ মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাৎ আদিত্যং আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষঃ অমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থাঃ॥ ছান্দোগ্য।

যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যার তত্ত্ব উক্তরূপে বিদিত হয়েন এবং যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাসহকারে তপোনুষ্ঠান করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন্। তাহার পর ক্রমান্বয়ে দিবাভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, উত্তরায়ণ অভিমানিনী দেবতা, সম্বৎসর অভিমানিনী দেবতা, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎলোক প্রাপ্ত হন্। পরে বিদ্যুৎলোকে অর্থাৎ মহর্লোকে অমানব পুরুষ আসিয়া ইহাঁদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান্।"

সাধক কামনা রহিত হইলে তাঁহার আর নিজের কর্ম্ম থাকে না। তবে ব্রহ্মার কর্ম্ম অনুসারে তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে থাকিতে হয়। এবং সেই ব্রহ্ম-লোকে ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবের জন্ত তাঁহাকে ক্লেশ অনুভব করিতে হয়।

সাধক ত্রিগুণময়ী মায়ারূপে স্বভাবের সীমাও অতিক্রম করিতে পারেন না।

যখন ব্রহ্মা নিজে মুক্ত হন্, যখন ব্রহ্মলোকের নাশ হয়, তখন সাধক কাল (Time), কর্ম্ম (Causality) ও স্বভাবের (Space) সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন্।

মুণ্ডক শ্রুতি অনুশীলন করিলে এই ক্রমোৎক্রমণের কথা ভালরূপে জানা যায়।

এই দেহমধ্যে জীবও আছেন আর আত্মারূপী ঈশ্বরও আছেন। জীব প্রথমে সেই আত্মাকেই অনুভব করিতে পারে।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

যখন জীব হৃদয় মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করে, তখন তাঁহার মহিমা জানিয়া বিগতশোক হয়।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ॥

সত্যের অনুসরণ দ্বারা, তপোঽনুষ্ঠান দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এবং নিত্য অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায়। যখন যতির সকল দোষ ক্ষীণ হয়, তখন তিনি হৃদয় মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র পুরুষকে দেখিতে পান্।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥

সত্যেরই জয়, মিথ্যার কখন জয় হইতে পারে না। সাধক সত্য অনুসরণ করেন বলিয়া সেই সত্য দ্বারা তিনি মৃত্যুর পর দেবযান মার্গ দ্বারা নীত হন্। ঐ মার্গ দ্বারা আপ্তকাম ঋষিরা সত্যের পরম নিধান ব্রহ্মলোকে উপনীত হন্।

সেই ব্রহ্মলোকে মৃত্যুর পর সাধক উপাসনা দ্বারা যে পুরুষকে দেখেন,

মৃত্যুর পূর্ব্বে কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেখেন। তিনি সেই পরম পুরুষ। ব্রহ্মলোকে তাঁহার পরোক্ষ দর্শন হয়।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥

সেই পরম পুরুষ বৃহৎ, দিব্য, অচিন্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম দূর হইতেও দূর। আবার এই দেহ মধ্যে তিনি নিকটে হৃদয় গহ্বরে নিহিত।

বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাস যোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধ সত্ত্বাঃ।
ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।

বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা সুনিশ্চিতরূপে ব্রহ্মকে অবধারণ করিয়াছেন, সন্ন্যাস যোগ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব, সেই সকল যতিগণ দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে ব্রহ্মলোক হইতে মুক্ত হইয়া পরম অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন্ তখন তাঁহারা পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করেন।

ত্রিপুটী—

এই প্রণব মার্গের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আর একটি কথা জানা আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা রাসতত্ত্ব বুঝিতে পারিব।

ত্রিপুটী ভেদ না হইলে আমরা পরম, অক্ষর, অমৃত লাভ করিতে পারি না।

প্রণব মার্গ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জ্ঞান ত্রিপুটীর সীমায় আবদ্ধ। অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব এই তিন ত্রিপুটী। প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয় আছে। সেই বিষয় অধিভূত। সেই বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য নিজের ইন্দ্রিয় চাই। সেই বহির্বিন্দ্রিয় কি অন্তরিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম। সেই ইন্দ্রিয়ের সহকারী দেবতা অধিদৈব। আমরা যাহা করি, তাহাও এই ত্রিপুটীর সীমায় আবদ্ধ। করিবার জন্য আমাদের নিজের কর্ম্মেন্দ্রিয় চাই।

তাহাই অধ্যাত্ম। যাহা করি তাহাই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বা অধিভূত। আমাদের কর্ম্মের সহকারী দেবতাগণ অধিদৈব। আমরা এই সৌর জগতে যাহা কিছু করি, ও যাহা কিছু জানি, তাহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বল সাপেক্ষ ও দেবতার সাহায্য সাপেক্ষ।

স্থূল চক্ষু যতটুকু আলোকের বেগ ধারণ করিতে পারে, ততটুকুই আমরা স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই। আবার দেবতারা আমাদের চক্ষুতে যেমন বল দেন, সেইমত আমরা বল পাই। তাহার বেশী নহে। হয়ত আমরা চক্ষুগোলক থাকিতেও দেবতার নিগ্রহে একবারে অন্ধ কিম্বা দেবতার অনুগ্রহে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশালী হই। দেবতার নিগ্রহ কি অনুগ্রহ আবার আমাদেরই কর্ম্ম সাপেক্ষ।

আমরা যে লোকের উপযোগী, সেই লোকের দেবতারাই আমাদের উপর অধিকার স্থাপন করেন। আমরা যতদিন সকাম থাকি ততদিন ত্রিলোকীর দেবতারা ত্রিলোকের মধ্যে আমাদিগকে যথাযথ স্থানে কর্ম্মানুযায়ী অধিকার দেন। সকাম থাকিয়া আমরা সে অধিকার কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিনা। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা, কামনার পরিত্যাগ দ্বারা, আমরা একে একে ত্রিলোকীর বন্ধন অতিক্রম করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোকীর দেবতার শাসনও অতিক্রম করিতে পারি। কিন্তু ত্রিলোকী মধ্যে যেমন ইন্দ্রের শাসন, ঊর্দ্ধতন লোকে সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ পুরুষের শাসন। সেখানেও অধিদেবতা আছে, সেখানেও অধ্যাত্ম আছে, সেখানেও অধিভূত আছে।

ত্রিলোকীর মধ্যে জীব বিজ্ঞানাত্মা। ত্রিলোকীর উপরে তিনি মহান্ আত্মা।

ত্রিপুটীর নাশ হইলেই তিনি শান্ত আত্মা

"যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তৎ যচ্ছেৎ সান্ত আত্মনি॥" কঠ।

ব্রহ্মাণ্ডের নাস না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে মহান্ আত্মাই থাকিতে হয়।

যতদিন জীব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে থাকে ততদিন তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডের অধিকার ভুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে হয়। সে ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিপুটী দ্বারা বাধ্য। সে ব্রহ্মাণ্ডের কাল কর্ম্ম ও স্বভাবের বশীভূত। ব্রহ্মার অধিক

সত্তা, ব্রহ্মার অধিক জ্ঞান, ব্রহ্মার অধিক আনন্দ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া জীবের হইতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড ধর্ম্মের অপর নাম বৈদিক ধর্ম্ম।

বৈদিক ধর্ম্ম বা যোগ মার্গ—

ব্রহ্মা যে ধর্ম্ম দিতে পাবেন, তাহা বৈদিক ধর্ম্ম। তিনি অব্যক্তাতীত পুরুষকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের ভাষায় তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারেন না, এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন না। বেদে পরব্রহ্মকে "নেতি নেতি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের আপেক্ষিক সত্য, আপেক্ষিক জ্ঞান, ও আপেক্ষিক আনন্দ লইয়া বেদে বলিতে পারে তিনি নিরপেক্ষ সত্য, নিরপেক্ষ জ্ঞান বা নিরপেক্ষ আনন্দ। অথবা তাঁহার স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এও কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ মাত্র যাহা হউক ব্রহ্মার অধিকার ভুক্ত ঋষিদিগের ও ব্রহ্মার শিক্ষায় যাহা জানা যায় বেদে সেই শিক্ষার চরম আছে।

ব্রহ্মা মনোময় এই জন্য বেদের শিক্ষাও মনোময় চিন্ময়। শিক্ষার শেষ ফল আনন্দময় কোষের স্ফূর্ত্তি এবং সেই আনন্দময় কোষে আত্মার সাক্ষাৎকার। তাহার পর দেহনাশান্তে বৃহৎ আনন্দময় কোষে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার এই ফল লাভের জন্য জীব অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষের ক্রম বিকাশ করিবে এই ক্রম বিকাশের জন্য বেদ প্রদত্ত প্রণব মহামন্ত্র। আমাদের দেহ মধ্যে প্রত্যেক কোষের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষের স্থান গুলি গুরুর নিকট জানিতে হয়। বৈরাগ্য, বিবেক, মনঃসংযম, শ্রদ্ধা ও বিশ্বা দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিয়া জীব প্রণবের সাহায্যে কোষসকলের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া এবং পরিপুষ্ট কোষ ও প্রণবের সাহায্যে জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এবং জগতের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দময় কোষে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

প্রণবের সাহায্যে আত্মাকে দেহের কেন্দ্র না করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র করিতে হয়। দেহ মধ্যে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির স্থান বিকাশিত হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের

সহিত যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন হয়। তাহার পর নিজের আত্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মার সহিত এক ভাবিতে হয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই এইরূপ ভাবিতে হয়। ইহাতেও প্রণব সহকারী। মাণ্ডুক্য উপনিষদে এই প্রণব উপাসনার ইঙ্গিত মাত্র আছে। ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ে তাহার দিগ্দর্শন মাত্র আছে। সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহার পঞ্চীকরণ গ্রন্থে এই উপাসনা দশনাম সন্ন্যাসীদিগের উপকারার্থ বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছেন। নিশ্চয় দাস তাঁহার বিচারসাগর নামক হিন্দি গ্রন্থে পঞ্চীকরণের অনুবাদ করিয়াছেন। পশ্চাৎ ঐ বিচারসাগরের বাঙ্গলা অনুবাদ হইয়াছে।

বৈদিক এবং যোগ মার্গকে ইংরাজীতে Path of occultism বলা চলে। এই বৈদিক ধর্ম্ম ভাগবত ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ বৈদিক, কেহ কেহ ভাগবত ধর্ম্মের অনুসরণ করেন। কেহ কেহ আত্মবল উপেক্ষা করিতে চাহেন না। তাঁহারা পদে পদে ধৈর্য্যশালী হইয়া আপনার বিকাশ সাধন করেন। এই বিস্তীর্ণ মার্গের কণ্টক দেখিয়া তাঁহারা ভয় করেন না। যে সকল ঋষিরা এই পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, অবিচলিত চিত্তে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করেন। যিনি অগ্রে চলেন তিনি নীচে হাত বাড়াইয়া দেন। এইরূপে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া মনুষ্য আত্মবলে ঈশ্বর হইতে চায়। তাহারা এজন্য ঈশ্বরকে কষ্ট দিতে চায় না। তাহারা নিজের ভার নিজেই বহন করে। একমাত্র ভগবৎ প্রণোদিত নিয়মই তাহাদের সহায়ক। প্রণব সেই নিয়ম বা বিধি (law)। এই বিধির মূলমন্ত্র শ্বেতাশ্বতর কথিত অনুধ্যান, যোজন ও তত্ত্বভাব। মনুষ্য যাহার অনুধ্যান করিবে, তাহারই সহিত যুক্ত হইবে এবং অবশেষে তাহার সহিত তত্ত্বভাব হইবে। বৈদিক ধর্ম্ম ও ভাগবত ধর্ম্ম দুই ধর্ম্মেরই ইহা মূলমন্ত্র।

এই অনুধ্যান দ্বারা জীব হিরণ্যগর্ভের সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করে। এই ব্রহ্মাণ্ডে তাহাই পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

মানসিক ইতিবৃত্ত।

১ মন অর্থাৎ বোধশক্তি।

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, জীব কিরূপে তাহার সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ ব্যাপারে বাহির হইয়া দেবগণের সাহায্যে গ্রহমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে অধ্যাত্ম রাজ্য হইতে ক্রমে নীচের দিগে নামিয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের দেবগণ বাহ্য বস্তুকে গড়িয়া পিটিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন, এবং কথিত অধোগামী সহায়হীন জীবগণের বসতির জন্য তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক দেহ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে বাহ্যবস্তু স্থূলত্ব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া উদ্ধোত্থিত হইল। জীব উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছে, বস্তু উপরে উঠিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে, অথচ তাহাদের সম্মিলন হইতেছে না, যেহেতু উভয়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র আছে; তাহা উত্তীর্ণ হইয়া উভয়ে সংযুক্ত হওয়ার জন্য কোন সেতু নাই। উপরে জীব, নীচে স্থূল দেহ। একে অন্যে চেনা শুনা নাই। জীব আর নীচে নামিতে পারে না, কারণ এই কর্কশ ও কঠিন পদার্থের সংস্পর্শ এবং সহবাস তাহার পক্ষে অসহ্য। পদার্থ আরো উন্নত এবং সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক, নতুবা জীবের বাসের পক্ষে অসুবিধা হয়। আবার সেই নিরাশ্রয়, সংজ্ঞাহীন, ক্ষমতাশূন্য, দুর্ব্বল, স্থূল, কম্পিত দেহ আর উপরে উঠিতে পারে না। ইহা ভূত বা ছায়া, সাহায্য ব্যতীত উন্নীত হইতে পারে না। এতদুভয়ের সংযোজক একটী সেতুর দরকার।

দেবগণের সৃজন প্রণালী পণ্ড হইতে পারে না। পূর্ণমানুষ প্রস্তুত করিতে হইবে। আত্মা ও দেহ সংযুক্ত করার জন্য মন বা বোধশক্তির প্রয়োজন। আত্মা এবং দেহের ব্যবধান অবস্থাটীই সমুদ্র। মন সেই সমুদ্রের সেতুস্বরূপ। এই সেতু তৈয়ার করে কে? যে সকল দেবগণ ব্রহ্মার সান্ধ্যদেহ হইতে

উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা মানবকে বোধশক্তি দিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা নিজে মনের ক্রিয়া অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যিনি যাহা স্ববশে আনিতে পারেন নাই, তিনি তাহা দান করিতে অক্ষম। যাঁহারা মনের ক্রিয়া ও প্রভাব অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারাই মানবকে বোধশক্তি অর্থাৎ মন দিতে পারেন। যাহার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব মিশাইয়া এক করিয়া ফেলি, তাহা আমরা অপরকে দিতে পারি না। এই জন্য কথিত দেবগণ এত ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া মানবজাতিকে সৃষ্টি করিলেন, নিজে বোধশক্তির অধিকারী হইলেন, তবুও তাঁহারা এই শক্তি মানবকে দিতে পারিলেন না। এ কাজ তাঁহাদের ক্ষমতার বাহিরে। ["রাম বুদ্ধিমান্", "শ্যাম বড় নির্ব্বোধ", এখানে "বুদ্ধি" বা বোধশক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এই অধ্যায়ে "মন" শব্দকেও সেই অর্থে ব্যবহার করা গেল।] অতএব যাঁহারা মনকে বশীভূত করিয়া মনের রাজা হইয়াছেন, তাঁহারা মানবকে বোধশক্তি দান করিবেন। এক কোটী আশীলক্ষ বৎসর গত হইল, অগ্নিদেবগণ মানবজাতিকে বোধশক্তি প্রদানের জন্য অবতরণ করেন। তদর্থে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এই দেবগণ রাজা এবং আচার্য্যরূপে মানবসমাজে জন্মধারণ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিন শ্রেণীর দেবগণ অবতরণ করিলেন। মানবদেহে তাঁহাদের ক্রিয়ার বিবরণ ও তাঁহাদের অন্যান্য কার্য্যকলাপের বিষয় বুঝিতে পারিলেই বিভিন্ন মানবজাতি-মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধির এত বিসদৃশ তারতম্য কেন লক্ষিত হয়, তাহা জানিতে পারা যাইবে।

এক দিকে সিংহল দ্বীপের ভেদ্দানামক আদিম বন্য অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যাহাকে প্রকৃত মনুষ্যভাষা বলে, তাহাদের এমন কোন ভাষা নাই। বন্য পশুর ন্যায় অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত এবং বিনিময় করে। বোর্ণিয় দ্বীপের অসভ্যজাতির প্রতি দৃক্‌পাত কর। প্রকাণ্ডকায় বনমানুষ বা বৃহৎ মর্কট হইতে তাহাদের কোন ইতর বিশেষ নাই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অসভ্য অধিবাসীদের পানে তাকাও। তাহাদের বোধশক্তির কিছুই স্ফুরণ হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা পূর্ব্বের দিন হইতে পরের দিনের কমিবেশী টের পায় না। এক, দুইয়ের

অধিক গণনা করিতে পারে না। এত অসভ্য এবং নির্ব্বোধ হইলেও তাহারা মানুষ। এখন তাহাদের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ নিউটনের তুলনা কর, সুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ দার্শনিক ডেকার্টের তুলনা কর, অথবা অতুল ধীশক্তি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অক্ষয়কীর্ত্তি মহর্ষি বেদব্যাসের তুলনা কর। এই উভয় শ্রেণীতে বু'দ্ধ বিবেচনাব এত আকাশ পাতাল প্রভেদ যে এই দুই শ্রেণী যে এক জাতীয়, তাহাই মনে ধারণা হয় না। তাহারা উভয় শ্রেণী যেন "মানুষ" এই সাধারণ নামেরই যোগ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত বন্য অসভ্য জাতিকে মানুষ বলিলে, শেষোক্ত মনীষী মহাত্মাগণকে স্বর্গীয় দেবতা বলিলেও যেন তাঁহাদেব প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। কেবল যে ক্রমোন্নতির নিয়মেই পরস্পরে এত দূর পার্থক্য হইয়াছে, তাহা যেন ধারণাতেই আইসে না। এই মানসিক ইতিবৃত্তির এবং মানসপুত্রগণের রহস্য বুঝিতে পারিলেই আমরা এই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিব।

২। প্রথম শ্রেণীর মানসপুত্র (অসুর)গণ।

"মানসপুত্র" শব্দের প্রকৃত অর্থ, যাহার মন বা বোধশক্তি আছে। ইহাদ্বারা নানা শ্রেণীর দেবগণকে বুঝায়। ব্রহ্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানসপুত্রগণ হইতে সামান্য দেবগণও এই সাধারণ নামের অন্তর্গত। প্রথম তিন শ্রেণীব মানসপুত্রগণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন, তখন তাঁহারা মানব জাতি হইতে অতিশয় উন্নত ও মহান্ ছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীর মানসপুত্রগণকে সৌম্যপিতৃগণ কহে। তাঁহারা চন্দ্রলোক হইতে আসিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর মানসপুত্রগণকে নৈশসন্তান, তামসপুত্র বা তমোজ্ঞানের অধীশ্বর কহে। "নৈশ" বা "তামস" এই দুই শব্দ প্রথম শ্রেণীর পিতৃগণে প্রয়োগ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অগ্নিষ্বাত্তি পিতৃগণ "অগ্নির অধিপতি" "জ্ঞানী সন্তান" এই সব নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণী ব্রহ্মার প্রথম দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাহাদিগকে সাধারণতঃ অসুর কহে। তিনি সেই দেহ ত্যাগ করাতে তমো-রূপে ইহা রজনীব দেহ হইল।

(ক) সুরাসুর।

পুরাণে অসুরদিগের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সৃষ্টিকালে দেবাসুরের নানারূপ লোমহর্ষকর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিগ্রহ বহুকাল ব্যাপিয়া

চলিয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে এই শ্রেণীতে আরও অনেক জাতি ভুক্ত হইয়াছে। কালক্রমে এই "অসুর" শব্দের বড়ই অধোগতি হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই শব্দটী নিতান্ত কদর্থে ও অবজ্ঞার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন ইহা গালি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শব্দে এখন অসভ্য, বর্ব্বর, নির্দ্দয় প্রকৃতির দৈত্যদানবকে বুঝায়। ইংরেজিতে ডেভিল (Devil শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই অসুর শব্দ ও বাংলা প্রভৃতি ভাষায় এখন সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডেভিল অর্থে সয়তান। ফলতঃ এই অসুর শব্দ "অসু" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অসু অর্থে শ্বাস বা প্রাণ। অসুমৎ অর্থে কেবল প্রাণধারা জীবকে বুঝায়। বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণকে ঋগ্বেদে "অসুর" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ জীবন্ত অধ্যাত্ম দেবগণ। বস্তুতঃ পরবর্ত্তী সময়ে "অসুর" এবং "সুর" এই দুইটী শব্দ পরস্পর বিপরীতার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ বিশ্বব্যাপারে এবং ক্রমবিকাশে তাহাদের কার্য্য প্রণালী পরস্পর বিভিন্ন। এক পক্ষে সুরগণ মোটের উপর অপেক্ষাকৃত স্থির-ধীর স্বভাব বিশিষ্ট, পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ, সাধারণ হিতকর কার্য্যের পক্ষপাতী। কাজেই তাঁহারা স্বভাবের অলঙ্ঘ্য নিয়মের বিরুদ্ধাচারী না হইয়া তাহার অধীনে থাকিয়া শান্তভাবে কার্য্য করিতে ভাল বাসেন। তাঁহারা পরিবর্ত্তনের বিরোধী এবং রক্ষণশীল। অপর পক্ষে, অসুরগণ অত্যন্ত উগ্র ও উশৃঙ্খল প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাহারা একত্রে সমবেত ভাবে কাজ করিতে নারাজ; সকলেই স্বাধীন এবং স্ব স্ব প্রধান। সর্ব্বদাই স্বায় স্বীয় অবস্থায় অসন্তুষ্ট এবং পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। সুরগণ শান্তি এবং সুশৃঙ্খলা প্রিয়। অসুরগণ উন্নতি প্রিয়। কাজেই সুরগণের সঙ্গে তাহাদের অনবরত ঘোর সংঘর্ষণ ও বিরোধ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই বিশ্বরাজ্যে উভয়েরই সমান দরকার।

পুরাকালে সমুদ্র মন্থনের সময় দেখা যায়, শেষনাগের এক দিকে দেবগণ ও অপর দিকে অসুরগণ, অর্থাৎ মাথার দিকে দেবগণ এবং লেজের দিকে অসুরগণ ধরিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অমৃত উত্থিত হইল; ইহা লইয়া উভয় পক্ষমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। দেবগণ অসুর-দিগকে এই অমৃতের ভাগ কখনই দিবেন না। অমৃত পানে অমর হওয়া যায়।

অসুরদের অহংজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই জ্ঞানটী তাহাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। ইহা তাহাদের চরিত্রের এক বিশেষ লক্ষণ, তদ্দ্বারা সহজেই তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহারা সর্ব্বদাই বিদ্রোহী। যুদ্ধ বিগ্রহ যথায়, তাহারাও তথায়। বিবাদ বিসম্বাদ, পৃথকত্ব-জ্ঞান এবং বিদ্রোহাচরণ দ্বারা এই অহংকার বৃত্তি বৃদ্ধি পায়। কালসহকারে এই "আমি" জানিতে পারে যে ভগবানের একমাত্র ইচ্ছাই সকল আমিত্বের মূল। ইহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমিত্ব। যখন অসুরগণ জানিতে পারে যে একমাত্র ভগবানই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং সকল রকম আমিত্বের নিধান, অর্থাৎ তিনি ও তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন এই জগতের কোন বস্তুরই মূলতঃ কোন পৃথক সত্ত্বা নাই, তখন তাহাদের অবিদ্যার নাশ হয়, তাহারা দুরত্যয়া মায়ার দৃঢবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জানিতে পারে যে তাহারা যে ঈশ্বরের সঙ্গে এতকাল অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়াছে সেই ঈশ্বরে এবং তাহাদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, তখন তাহারা সমস্বরে বলিতে থাকে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

তখনই স্বর্গীয় সুধা পান করিয়া তাহারা অমর হইতে পারে। সর্ব্বভূতে ভগবান, এবং সর্ব্বভূত ভগবানে বিরাজমান, এই যে সার্ব্বভৌমিক, বিশ্বজনীন একত্বভাব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই অমৃতপানের অধিকার জন্মে। পৃথকত্ব ও আমিত্ব ভাবের সম্যক বর্জ্জন করিতে না পারিলে কখনই অমর হওয়া যায় না।

এই অসুরগণই প্রথম শ্রেণীর মানসপুত্র। অত্যধিক পরিমাণে তাহাদের বোধ এবং ধীশক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। প্রথম মণ্ডলের প্রারম্ভে তাহারা মনুষ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে কোটী কোটী বৎসর কাল ব্যাপিয়া তাহারা সূক্ষ্ম জগতে উন্নতিলাভ করিতেছিল।

দ্বিতীয় মণ্ডলে তাঁহারা বর্হিষদ এবং তৃতীয় মণ্ডলে অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃ হইলেন। পরে তামসিক বিদ্যার সন্তান রূপে তাঁহারা আমাদের এই চতুর্থ মণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন এই মণ্ডলের চতুর্থ চক্র চলিয়াছে; ঠিক্ মধ্যাহ্ন সময়। এখন প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ! তাই অহঙ্কার বৃত্তি,

বিকাশের এবং পূর্ণতার চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের এই ঘোর সংগ্রামের সময় তাঁহারা তমোজ্ঞানের অধিকারী হইয়া মূর্ত্তিমান অহঙ্কাররূপে ধরাধামে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের অনুরূপ প্রজাবৃদ্ধি করিবার জন্য ব্রহ্মা তাঁহার এই মানসপুত্রগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে এক তৃতীয়াংশ এই আদেশ পালন না করিয়া পিতার বিদ্রোহাচরণ করিলেন। তাঁহারা সন্তানোৎপাদনে সম্মত হইলেন না। পুত্রগণের এইরূপ গর্হিতাচরণে ও অশিষ্ট ব্যবহারে ব্রহ্মার মনে দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হইল, তাই তিনি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন, "যাও তোমরা চতুর্থ জাতিতে গিয়া জন্মলাভ কর, করিয়া তোমরা নিজেরাও কষ্ট ভোগ কর এবং অপরেরও কষ্টের কারণ হও।" যেমন পাপ, তেমন শাস্তি। পুরাণের লিখিত দৈত্যগণই এই চতুর্থ জাতি। তাহারা দেবগণের সঙ্গে সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া শেষে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিল। তাহার পর হইতে তাহারা আমিত্ব ও পৃথকত্ব জ্ঞান ত্যাগ করিয়া একত্ব ও আত্মজ্ঞান লাভে তৎপর হইল। স্থলবিশেষে অসুরগণ "মকর" নামে অভিহিত। তাহাদের চরিত্র এবং কার্য্যপ্রণালী বস্তুতঃই বড় রহস্যপূর্ণ। এই পিতৃদ্রোহী অসুরগণই খৃষ্টানধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের "সয়তান" এবং তাহার অনুচরবৃন্দ।

ক্রমশঃ

যুগল সেবক।

জীবের কল্যাণ।

জগৎ জীবময়, সর্ব্বত্রই জীব। জল, স্থল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ—কোন স্থানই জীবশূন্য নহে। প্রত্যেক অণু পরমাণুতে জীব, আবার বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেও জীব। প্রত্যেক পদার্থে ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে জীব বর্ত্তমান। বায়ুর পরমাণুতে বা পরমাণুপুঞ্জে এক একটি স্বতন্ত্র জীব, আবার সমগ্র বায়ুমণ্ডল-রূপ উপাধি ধারণ করিয়া একটি বৃহৎ জীব আছেন, আমার দেহের পরমাণুতে এক একটি জীব, কতকগুলি পরমাণুর সহযোগে যে কোষ (cell) উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আশ্রয় করিয়া এক একটি বৃহত্তর জীব,

বহুতর কোষের দ্বারা যে সমগ্র দেহটি নির্ম্মিত তদভিমানী জীব আমি এবং আমার ন্যায় অসংখ্য জীবের দেহসমষ্টি ধারণ করিয়া এক বৃহত্তর জীব বর্ত্তমান—এইরূপ শৃঙ্খল ক্রমাগত চলিয়াছে, ইহার অন্ত নাই। এই সমগ্র পৃথিবীটী যাঁহার দেহ এরূপ এক বিশাল জীব আছেন। ঠিক সেইরূপে বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণেরও এক একটি অধীশ্বর বর্ত্তমান। এই সকল গ্রহগণের সঙ্ঘাতে সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডরূপ যে বিরাট দেহ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া যে বিরাট পুরুষ বর্ত্তমান, তিনিই আমাদের ঈশ্বর। আবার কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগে এক একটি বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড, কতিপয় বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড লইয়া আরও বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড—এইরূপ ক্রমাগত চলিয়াছে। একটি মানবদেহের অসংখ্য পরমাণু কোষ প্রভৃতিতে যে অসংখ্য জীব বর্ত্তমান তাহারা যেরূপ ঐ দেহের মধ্যেই রহিয়াছে, সেইরূপ অসংখ্য কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী নর বানর দেবতা অসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব মনু প্রজাপতি প্রভৃতি জীবগণ আমাদের ব্রহ্মাণ্ডপতি বা ঈশ্বরের বিরাট দেহের মধ্যেই বসবাস, গমনাগমন, ও প্রাণধারণ করিতেছে (live, move and have their being)। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন ইহা একটি রূপক বা কবি-কল্পনা নহে। সে যাহা হউক, ঈশ্বরের তুলনায় মানব যেমন একটি পরমাণু (বা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র), সেইরূপ বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ঈশ্বরও একটি পরমাণু স্বরূপ এবং এই বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিও তদপেক্ষা উচ্চ ব্রহ্মাণ্ডে একটি পরমাণু—এই ক্রম অব্যাহত ভাবে চলিয়া অসীমে মিশিয়া গিয়াছে। অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় যে মহাসমুদ্রে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, তাহাই ব্রহ্ম।

আমরা দেখিতেছি সর্ব্বত্রই জীব বর্ত্তমান। এই সকল জীবের কল্যাণ কি—ইহাই এখন আলোচ্য। প্রথমে দেখা যাউক জীবের উদ্দেশ্য কি—কি অভিপ্রায়ে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন ক্রমোন্নতিই জীবের উদ্দেশ্য। আজ যে ক্ষুদ্র জীব মানব দেহের একটি পরমাণু আশ্রয় করিয়া আছে, কালে তাহা ক্রমোন্নত হইয়া একটি মানব হইতেছে। মানব ক্রমশঃ ঋষি, দেবতা, মনু, প্রজাপতি প্রভৃতির পদ লাভ করিয়া একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইতেছেন এবং ব্রহ্মাণ্ডপতি তদপেক্ষা উচ্চতর

ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিতেছেন। ক্ষুদ্র ও উচ্চ জীবের মধ্যে প্রভেদ এই যে ক্ষুদ্রে যাহা অস্ফুট ও অব্যক্ত—যাহা কেবল বীজভাবে (potentially) রহিয়াছে, উচ্চে তাহাই অপেক্ষাকৃত সুব্যক্ত, বিকাশপ্রাপ্ত ও ক্রিয়ারূপে (actually বর্ত্তমান। একই ব্রহ্মে সকল জীব ভাসিতেছে—একই আত্মা সর্ব্বজীবে বিরাজিত। তবে ঈশ্বর (বা উচ্চ জীব) একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, ক্ষুদ্র জীব তাহারই এক স্ফুলিঙ্গ,—উচ্চ জীব একটি সমুদ্র, ক্ষুদ্র জীব তাহারই এক জলবিন্দু। এই স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করা এই বিন্দুকে সিন্ধু করা—ইহাই ক্রমোন্নতি, ইহাই জীবের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন।

তত্ত্বদর্শিগণ বলেন ক্রমোন্নতির নিয়ম সর্ব্বত্র ও সর্ব্বজীবে একরূপ, সুতরাং একটি জীবকে (microcosm) বুঝিলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (microcosm) বুঝা যাইবে। জীব অতি ক্ষুদ্রই হউক বা বিশালই হউক, তাহার ক্রমোন্নতির সাতটি অবস্থা। প্রথম তিনটি অবস্থাকে তাহার অবরোহণ মার্গ (descending path) বলে। এই সময় তিনি প্রকৃতির সহিত ক্রমশঃ অধিকতর জড়িত হইতে থাকেন (becomes more and more involved in matter)। প্রকৃতিতে নানারূপ শক্তি ও গুণ উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রকারে তিনি প্রকৃতির সহিত নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এক দিকে প্রকৃতি অসংখ্য মোহন মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে টানিতে থাকে, অপর দিকে তাঁহার নিজ রাজ্য তাঁহাকে আকর্ষণ করে,—তিনি কখনও হয়ত প্রকৃতির মনোহর বৈচিত্র্যে ডুবিয়া যান, কখনও বা একটু আত্মস্মৃতি জাগিয়া উঠে—প্রকৃতি পুরুষের এই সংগ্রামই ক্রমোন্নতির চতুর্থাবস্থা; এই সংগ্রামে পুরুষই জয়লাভ করেন। তখন তিনি প্রকৃতির উপর ক্রমশঃ আধিপত্য স্থাপন করিতে করিতে স্বরাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। ইহাই তাঁহার আরোহণ মার্গ (ascending path) এবং শেষের তিনটি অবস্থা ইহাতেই অতিবাহিত হয়। জীবের এই সাতটি অবস্থার জন্য বিশ্বের সর্ব্বত্র সাত সাতটি ক্রমোন্নতি ক্ষেত্র (field of evolution) সৃষ্ট হইয়াছে, যথা আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সাতটি গ্রহমণ্ডল (Planetary chain) পর্য্যায় ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়, এক একটি মণ্ডলে সাতটি করিয়া গ্রহ থাকে,

জীবাত্মা প্রত্যেক মণ্ডলকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন এবং প্রত্যেক প্রদক্ষিণের সময় প্রত্যেক গ্রহে তাঁহাকে সাতটি মূল জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ইত্যাদি।* সে যাহা হউক, উচ্চ জীবগণ নিম্নজীবের ক্রমোন্নতি কার্য্যে সাহায্য করেন ইহাই বিশ্বের নিয়ম। মনু, প্রজাপতি, দেবতা, অসুর, পিতৃপুরুষ প্রভৃতি উন্নত জীবগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র ভ্রাতৃবৃন্দের অবরোহণ ও আরোহণ মার্গে নিয়ত কিরূপ বিপুল কল্যাণ সাধন করিতেছেন তাহা চিন্তা করিলে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আপ্লুত হয় এবং ভগবানের এই অনুশাসনটি স্বতঃই মনে পড়ে :-

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবাঃ দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ৩। ১২ ॥

অর্থাৎ, দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য বস্তু দান করিবেন। যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে না দিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তুগুলি উপভোগ করে, সে চোর

আমরা কেবল মানবজাতির কল্যাণ সম্বন্ধে একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। মানবের কল্যাণ কি এবং কিরূপেই বা উহা সাধিত হইতেছে? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সাংখ্যাচার্য্যগণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন— দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই কল্যাণ। দুঃখ ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক পীড়াই আধ্যাত্মিক দুঃখ, অন্যান্য প্রাণী হইতে আমরা যে ক্লেশ পাই তাহাই আধিভৌতিক এবং শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, ঝড় বজ্রপাত প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহার নাম আধিদৈবিক। যিনি জীবের এই সকল দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি করিতে পারেন, তিনিই পরম কল্যাণ সাধক।

এই নিবৃত্তির তারতম্য আছে,—নিবৃত্তি আংশিক বা পূর্ণ হইতে পারে, ক্ষণিক বা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হইতে পারে। নিবৃত্তি যতই দীর্ঘকালব্যাপী

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কৌতূহলী পাঠক Esoteric Buddhism, Pedigree of man, Evolution of life and form প্রভৃতি থিওসফি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন।

হয়, কল্যাণের পরিমাণ ততই অধিক। একটি দারিদ্র্যপীড়িত অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিকে আমি একদিন উত্তমরূপে ভোজন করাইলাম। ইহাতে তাঁহার দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু পরদিবস তিনি আবার ক্ষুধায় কাতর হইবেন। আমি যদি তাঁহাকে এক বৎসরোপযোগী ভক্ষ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি দান করি, তাহা হইলে তাঁহার সমধিক উপকার হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ভোজ্যাদি নিঃশেষ হইলে তিনি পুনরায় অনাহারে ক্লেশ পাইবেন। উক্তরূপে দান না করিয়া, মনে করুন তাহার একটি চাকুরি করিয়া দিলাম—তাঁহাকে এরূপ একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করাইলাম যদ্দ্বারা তিনি অর্থোপার্জ্জন করিয়া দীর্ঘকাল গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। দান অপেক্ষা ইহাতে তাঁহার অধিক কল্যাণ করা হইল। আবার চাকুরির পরিবর্ত্তে যদি তাঁহাকে উত্তম-রূপে শিক্ষিত করিয়া দেওয়া হয়,—যদি তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির এরূপ উন্মেষ ও উন্নতিসাধন করিয়া দিতে পারি যে তিনি যে কোন স্বাধীন বৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের ও অপরের প্রভূত উপকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আরও অধিক কল্যাণ করা হইবে।

এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে। ইহা দেখিয়া আপনার দয়ার উদ্রেক হইল। আপনি ভাল চিকিৎসক আনাইয়া এবং ঔষধাদি ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়া তাহাকে জ্বরের সেই আক্রমণটি হইতে রক্ষা করিলেন। ইহাতে তাহার যথেষ্ট উপকার হইল বটে কিন্তু ম্যালেরিয়া বিষ যাহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ জ্বরভোগ অনিবার্য্য এবং ঐ ব্যক্তি যে স্থানে বাস করিতেছে তাহা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর ইহা চিন্তা করিয়া আপনি উক্ত ব্যক্তিকে এক স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়া দিলেন। ইহা দ্বারা তাহার অধিক উপকার করা হইল। কিন্তু ইহাতেও আপনি সন্তুষ্ট না হইয়া তদ্দেশবাসী ও তদবস্থ সকলের দুঃখেই কাতর হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন "আহা, ইহাঁরা কিরূপ শীর্ণদেহ, মলিনকান্তি, উদ্যমহীন ও অল্পায়ুঃ হইয়া যাইতেছেন। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ইহাঁদিগকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া এবং দেশের দুঃখ ও দারিদ্র্য বাড়াইয়া কি ভয়ানক অনিষ্টই করিতেছে! হায়, হায়! কবে ইহাঁরা সুস্থ, সবল, উদ্যোগী ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিবেন!" এইরূপে ইহাঁদের দুঃখ

মোচনে কৃতসংকল্প হইয়া আপনি দেশের গণ্য, মান্য, ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণের নিকট আপনার মনোবেদনা জানাইয়া সমগ্র জীবন বহু ক্লেশ ও পরিশ্রম সহকারে যে অর্থ সংগ্রহ করিলেন তদ্দ্বারা উক্ত দেশে উত্তম পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করিয়া ঐ স্থানটি ম্যালেরিয়া মুক্ত করিলেন। বলা বাহুল্য এই কল্যাণটি প্রথম দুই কল্যাণ অপেক্ষা অনেক অধিক ও উচ্চ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে কল্যাণটি যতই স্থায়ী হয় এবং যতই অধিক সংখ্যকের উপর প্রসারিত হয়, তাহা ততই শ্রেষ্ঠ—ততই উচ্চ। ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ অপেক্ষা গ্রামের কল্যাণ শ্রেষ্ঠ, গ্রামের কল্যাণ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ এবং দেশের কল্যাণ অপেক্ষা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ শ্রেষ্ঠ। এই লোকহিতকর কার্য্যে কত মহামনাঃ পুরুষ সমগ্র জীবন অতিপাত করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই কেহ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার (Relief fund) খুলিয়াছেন, কেহ কেহ কৃষি বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা প্রভৃতি বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং কেহ বা অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির উপদ্রব নিবারণের জন্য জলসেক ও জল নির্গমনের যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিতেছেন। অসহায়, আতুর ও পীড়িতদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয়দিগের কল্যাণার্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠা, মূক ও বধিরদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা, গমনাগমনের সুবিধার জন্য বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যানাদির সৃষ্টি, ঝড় বৃষ্টি হইতে সহস্র সহস্র জলযাত্রীর জীবন রক্ষার্থ বায়ুমান যন্ত্রের আবিষ্কার, রোগের উপশম ও শান্তির জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের (প্রধানতঃ পাশ্চাত্য অস্ত্র চিকিৎসার) সবিশেষ উন্নতি, রাজার অত্যাচার ও অবিচার নিবারণের জন্য প্রজাসমিতি গঠন, অঙ্গার খনির দুর্ভাগ্য শ্রমজীবীদিগের প্রাণরক্ষার্থে নিরাপদ্ আলোকের (Safety Lamp এর) আবিষ্কার, গৃহাদিতে বজ্রপাত নিবারণের জন্য তড়িদ্দণ্ডের (Lightning rod এর) সৃষ্টি, এবং সর্ব্বোপরি অসংখ্য নরনারীকে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ করিয়া জগতের হিতসাধনে সক্ষম করিবার জন্য দেশে দেশে—গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন—এই সমস্তই মানবের স্বাভাবিক দয়া ও উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তির জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন।

এ গুলি জীবের কল্যাণ বটে, কিন্তু পরম কল্যাণ নহে। ইহাদের উপর আর এক কল্যাণ আছে যাহার কাছে ইহারা খাট হইয়া যায়,—দিবালোকে খদ্যোতের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রতীচ্য জড়বাদীদিগের নিকট এই গুলিই কল্যাণের চরম আদর্শ। যাঁহারা আত্মা, পরলোক বা জন্মান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না অথবা অজ্ঞেয় বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা স্থূল দেহের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বিধানই মানবের চরম লক্ষ্য বলিবেন বই আর কি? ভাল, তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারই করা যায় যে জন্মান্তর প্রভৃতি নাই এবং ইহজীবনই মানবের চরম, জিজ্ঞাসা করি তাঁহাদের তথা কথিত সভ্যতা দ্বারা মানবের ইহজীবনেরই দুঃখসমষ্টি কমিতেছে কি? যখন যানাদি ছিলনা তখন মানব পদব্রজে গতায়াত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অতঃপর গোযান, অশ্বযান, বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক যান, চক্রযান (cycle), ব্রুহাম, ফিটন, মোটর প্রভৃতি নানাবিধ ও নানা জাতীয় যানের আবির্ভাব হইতে লাগিল; ক্রমশঃ যানারোহণ করা বা এক খানি যান রাখা ("Keeping a Gig") সমাজে একটি ফ্যাসন্ হইয়া উঠিল। প্রয়োজন না থাকিলেও যিনি একখানি যান রাখিতে অথবা যানারোহণ করিতে না পারিতেন, তিনি আপনাকে দুর্ভাগ্য মনে করিতে লাগিলেন। এই ব্যাধি প্রথমে ধনীদিগকে আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ মধ্যবিৎ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সংক্রামিত হইতে লাগিল। আবার, যাঁহার পাল্কী গাড়ী হইল, তিনি একখানি ফিটনের লালসা করিতে লাগিলেন, যাঁহার ফিটন হইল, তাঁহার "একখানি মোটর না হইলে আর চলে না।" কেবল যান সম্বন্ধে যে এই কথা, তাহা নহে। তাঁহাদের সভ্যতা'সুমোদিত পোষাক, পরিচ্ছদ, আহার, আসবাব প্রভৃতি অধিকাংশ বস্তুরই এই দশা। একটি অভাব মোচন করিতে গিয়া সেই স্থানে রক্তবীজের ঝাড়ের ন্যায় সহস্র নূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে,—যেখানে সন্তোষ ছিল আজ সেখানে অসন্তোষ-বহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে।। অবশ্য, ইহাঁদের দ্বারা মানবের যে আদৌ উপকার হইতেছে না এ কথা আমি বলিতেছি না, বরং ইহাঁদের উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তিকে আমি অন্তরের সহিত নমস্কার করি। তবে আমার বক্তব্য এই যে ইহাঁরা যে উপায়ে মানবের দুঃখবিমোচনে সচেষ্ট, সে উপায়ে দুঃখ-নিবৃত্তি অসম্ভব। দুঃখরূপ বৃক্ষ বিনাশ করিতে হইলে তাহার মূলে

কুঠারাঘাত করা চাই, ইহাঁরা কেবল দু একটি শাখা ছেদন করিতেছেন মাত্র।

দুঃখের মূল কি? প্রতীচ্য ভূভাগে ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচ্যদেশে (বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে) ঋষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে এই প্রশ্ন সমাধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন অজ্ঞানই দুঃখের মূল। এই অজ্ঞান বশতঃ মানব আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি মনে করিয়া ফলে আসক্ত হয়। এই আসক্তিই তাহার ভব-বন্ধনের কারণ। এই বিষয়-তৃষ্ণা বশতঃই তাহার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক ক্লেশভোগ (রোগ, শোক, জরা, মরণাদি) ঘটিয়া থাকে। অতএব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিতে হইলে তাহার অজ্ঞানটি নাশ করিতে হইবে, তাহার আসক্তিকে উন্মূলিত করিতে হইবে। "আমি অজর, অমর, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, মনন প্রভৃতি যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক কর্ম্ম আমি করি না, প্রকৃতিই সব করিতেছে"—এই জ্ঞান যখন তাঁহার দৃঢ়, অটল ও নিত্য অনুভূতির বিষয় হইবে, তখন তিনি সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম, জন্মমৃত্যু ও পাপপুণ্যের অতীত হইবেন, তখন তিনি

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, সদানন্দ ও স্বাবলম্বী (আত্মস্থ) হইবেন, তখন তিনি যাবতীয় কর্ম্ম করিলেও কিছুই করিতেছেন না, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, শোকের পর পারে গিয়াছেন।

অতএব এই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উন্মেষ সাধনই মানবের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ কল্যাণ। কারণ, কোন ব্যক্তির রক্ত দূষিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষত রোগ জন্মিলে ক্ষত স্থানে প্রলেপাদি দ্বারা সাময়িক উপকার হইলেও, যেমন রক্তশোধক ঔষধ ভিন্ন রোগের মূল বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের উপায়ে মানবের কোন কোন দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইলেও তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। যতদিন বাসনা বিষ অন্তরে থাকিবে, ততদিন অভাব বিস্ফোটক দেখা দিবেই

দিবে ; আপনি বৈজ্ঞানিক মলমে একটি আরাম করিবেন, কিন্তু অন্যান্য স্থানে শতটি স্ফীত হইয়া মাথা তুলিবে, কারণ ভিতরে যে গলদ রহিয়াছে।

পার্থিব ধন রত্ন বিভব ঐশ্বর্য্য যশঃ মান প্রভাব প্রতিপত্তি অথবা লক্ষগুণে তীব্র স্বর্গীয় সুখ আপাত-মধুর এবং স্বভাবতঃ রমণীয় বটে, কিন্তু অনিত্য ও নশ্বর, ভোগাবসানে দুঃখ অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান দুর্লভ ও কষ্টসাধ্য হইলেও, একবার লাভ করিতে পারিলে দুঃখ-রজনীর চির-অবসান হয়। এই জন্যই উপনিষদ্ প্রথমোক্ত গুলিকে প্রেয়ঃ এবং শেষোক্তটিকে শ্রেয়ঃ নামে অভিহিত করিয়াছেন। নচিকেতা নামে এক ব্রাহ্মণকুমার পিতার আদেশে যমভবনে গিয়া ত্রিরাত্রি উপবাসী থাকেন। যমরাজ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন "কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ বলেন থাকে না। এই সম্বন্ধে উপদেশ দিন।" যম বলিলেন "ইহা বড় কঠিন বিষয়, অনেক দেবতাও ইহা সম্যক্ জানেন না। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। তোমাকে সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ, দাস দাসী, অতুল ঐশ্বর্য্য, বিস্তৃত সাম্রাজ্য এমন কি চিরজীবন এবং স্বর্গের যাবতীয় ভোগ্য-বস্তুও দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি অন্য যা চাহিবে তাহাই পাইবে, কেবল মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।" নচিকেতা টলিলেন না,—ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥

অর্থাৎ, "অন্তক, তোমার প্রস্তাবিত বস্তুগুলি অনিত্য (কল্য থাকিবে কি না সন্দেহ) এবং উহারা ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট করে। আর আমাদের সমগ্র জীবনও অতি অল্প। অতএব তোমার রথ, অপ্সরাঃ, নৃত্যগীতাদি তোমারই থাক (ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই)।" নচিকেতা প্রেয়ঃ ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ আশ্রয় করিলেন। নচিকেতার অবস্থায় পড়িয়া আমাদের মধ্যে কয়জন ঐরূপ বলিতে পারি ? সে যাহা হউক, প্রতীচ্য জগৎ আমাদিগকে এই প্রেয়ঃ লাভে সহায়তা করিতেছেন মাত্র এবং প্রাচ্য ঋষিগণ শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইতেছেন। একজন তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিতেছেন, অন্যজন ভবিষ্যতে আর তৃষ্ণার উদ্রেক না হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন ; একজন যুদ্ধে আহত ব্যক্তির

ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতেছেন, আর এক জন যুযুৎসুর প্রেম ও করুণাকে জাগাইয়া যুদ্ধ প্রবৃত্তিই নির্মূল করিতেছেন। উভয়েই মানবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন সত্য, কিন্তু একটি কল্যাণ ক্ষণিক, তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর, অপরটি মহান্ চিরস্থায়ী- অসীম।।

জীবের এই পরম কল্যাণদাতৃগণ কোথায় ও কিরূপ? এই করুণা সাগর ত্রিকালজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ (যাঁহাদের বর্ণনা পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়) প্রকৃত আছেন কি না, কবির কল্পনা মাত্র? ইহাঁরা প্রকৃতই আছেন। তুমি আমি যেরূপ প্রকৃত (real), ইহাঁরা সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক প্রকৃত। ইহা আমার মনঃকল্পিত কথা নহে, যে সকল সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি আজও (এই বিংশ শতাব্দীতে) মহাপুরুষগণের দর্শন, স্পর্শ ও আলাপে কৃতার্থ হইতেছেন ইহা তাঁহাদেরই কথা। সে যাহা হউক, পূর্ব্বকল্পে বা মন্বন্তরে ইহাঁরা আমাদিগের ন্যায় জরামরণশীল ক্ষুদ্র জীবই ছিলেন, ক্রমোন্নতি দ্বারা অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের এই দুঃখ সন্তপ্ত অসহায় ক্ষুদ্র ভ্রাতৃবৃন্দকে সংসারসাগরে নিমজ্জিত রাখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে স্বীয় উচ্চধামে চিরশান্তি ভোগ করিবেন কি? না, তাহা পাবেন না, তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে—তাঁহাদের করুণা সাগর উদ্বেলিত হয়। তাই তাঁহারা নামিয়া আসেন, জগতের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ভূলোকে (অথবা ইহার সন্নিকটস্থ ভুবঃ বা স্বর্গলোকে সূক্ষ্মদেহে) বিরাজ করেন। পাঠক। কি অসীম করুণা, কি বিপুল স্বার্থত্যাগ একবার ভাবিয়া দেখুন। স্বার্থ ত্যাগই বা বলি কেন? আমাদের চক্ষে ত্যাগ বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহা না করিয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন না। জগতের যেখানে যত আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়, সমস্তই ইহাঁদিগের দ্বারা। ইহাঁরাই সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও শক্তি সঞ্চারক। ইহাঁরাই থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রকৃত স্থাপয়িতা ও রক্ষক। যবনিকার অন্তরাল হইতে ইহাঁরাই সোসাইটিকে মোটামুটি পরিচালিত করেন; অল্‌কট, ব্লাভাটস্কি, বেসান্ত প্রভৃতি ইহাঁদেরই নিদেশ বা সম্মতি অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন।* থিওসফিক্যাল সোসাইটি জগতে এক

* বিশেষ বিবরণ Old Diary leaves এবং সোসাইটির Report প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাপ্তব্য।

অভিনব বস্তু নহে, ইহা চিরপ্রবহমান অন্তঃসলিল আধ্যাত্মিক স্রোতের একটি সাময়িক উৎসমাত্র। যদি (ভগবান্ না করুন) মেম্বরগণের অযোগ্যতাহেতু এই উৎসটি কোন কালে রুদ্ধ হইয়া যায়, অন্তঃস্রোতের বেগ রুদ্ধ হইবার নহে ; উহা অন্য স্থানে (যোগ্যতর ক্ষেত্রে) ফুটিয়া বাহির হইবে এবং শীতল বারিদানে সন্তপ্ত ও তৃষ্ণাতুর ভব পথিকের শান্তি বিধান করিতে থাকিবে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন (প্রকৃতই এইরূপ আপত্তি শুনিয়াছি) "ভাল, মহাত্মারা আছেন যেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু তোমরা বলিতেছ তাঁহারা প্রায়ই সূক্ষ্মদেহে থাকেন, অথবা স্থূলদেহে থাকিলেও বিজন অরণ্যে বা দুর্গম গিরিশৃঙ্গে বাস করেন, অথচ তাঁহারাই জগতের কল্যাণকারক। ইহা কিরূপে সম্ভব ? যাঁহারা মানবসমাজে কখনও আসেন না, মানবের কোন সংবাদই রাখেন না, তাঁহারা মানবের উপকার করিতেছেন কিরূপ ?" ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে মহাপুরুষগণ স্বভাবতঃ প্রচ্ছন্ন থাকিলেও জনসমাজে যে কখনও আসেন না তাহা নহে। প্রয়োজন হইলেই আসিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণ মানব তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন না। আর না আসিলেও তাঁহারা যে জগতের কোন সংবাদ রাখেন না বা উপকার করিবার ভিন্ন প্রণালী নাই ইহা মনে করা আমাদের অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। সূক্ষ্মদেহে থাকিয়া অথবা অজ্ঞাত পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়াও কিরূপে জগতের হিতসাধন করা যায়, অধুনা আমরা সংক্ষেপে তাহারই একটু আভাস দিব। ইহা বুঝিতে হইলে, অগ্রে সূক্ষ্মজগৎ ও সূক্ষ্মদেহের দুএকটি কথা বুঝা প্রয়োজন।

আমরা সাধারণতঃ তিনটি পদার্থ বা পদার্থের তিনটি অবস্থা দেখিতে পাই—কঠিন, তরল, বায়বীয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ইথার (Ether) নামে আর এক প্রকার পদার্থ আছে। উহা বায়ু অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে সূক্ষ্ম ও লঘু—এরূপ সূক্ষ্ম যে প্রস্তর, জল প্রভৃতি যাবতীয় কঠিন, তরল, ও বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়া উহা অবাধে যাতায়াত করে। ইহাই জড়বিজ্ঞানের সীমা। কিন্তু যেখানে জড়বিজ্ঞানের শেষ, সেই খানে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের (occult science এর) আরম্ভ। এই সূক্ষ্মদর্শিগণ বলেন বৈজ্ঞানিকদিগের ইথারটি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ইথার। ইহা ব্যতীত আরও তিনটি ক্রমসূক্ষ্ম ইথার আছে। এই সাতটি পদার্থ (বা একই পদার্থের সাতটি অবস্থা)—কঠিন, তরল, বায়ু এবং চারিটি

ইথার—ভূলোকের বা physical planeএর অন্তর্গত—এই সাতের সংযোগেই স্থূল জগৎ উৎপন্ন। এই সাতটির নাম ক্ষিতিতত্ত্ব। কিন্তু ইহাই যে জগতের বা পদার্থের শেষ, তাহা নহে। সূক্ষ্মতম ইথার অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে সূক্ষ্ম এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহাই অপ্‌তত্ত্ব। যেমন ইথার যাবতীয় স্থূল পদার্থের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ এই অপ্‌তত্ত্ব ইথারের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ক্ষিতিতত্ত্বের ন্যায় অপ্‌তত্ত্বেরও ক্রমসূক্ষ্মতানুসারে সাতটি শ্রেণী বা বিভাগ আছে। এই সাতটি অপ্‌তত্ত্বের সংযোগে যে লোক বা ভুবন নির্ম্মিত তাহার নাম ভুবঃ লোক (Astral plane)। ইথার যেমন পৃথিবীর মধ্যেও আছে এবং চতুর্দ্দিকেও আছে সেইরূপ এই ভুবর্লোক ভূলোকের ভিতরেও আছে, বাহিরেও আছে। আবার অপ্‌তত্ত্ব অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সূক্ষ্ম যে পদার্থ তাহার নাম তেজস্তত্ত্ব। এই তেজস্তত্ত্বের ও সাতটি বিভাগ এবং তদ্দ্বারা যে ভুবন নির্ম্মিত তাহাই স্বর্লোক বা স্বর্গ (Mental plane) এই স্বর্গলোক ভুবর্লোকের ভিতরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঠিক এইরূপে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই লোকচতুষ্টয় ক্রমসূক্ষ্মতানুসারে একটির মধ্যে অপরটি বিদ্যমান আছে। ভূ, ভুব, স্ব, মহঃ জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি লোক লইয়াই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড।

ভূলোকের ন্যায় এই উচ্চতর লোকগুলিও জীবপূর্ণ। কোনটিই জীবশূন্য নহে। তবে ভূলোকস্থ জীবের দেহ যেমন ক্ষিতিতত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত, সেইরূপ ভুবর্লোকের জীবের দেহ অপ্‌তত্ত্বে এবং স্বর্লোকের দেহ তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত। ভুবর্লোকের ও স্বর্গের অধিবাসীগণ হয়ত আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অথবা আমাদের দেহের মধ্য দিয়া নিয়ত গতায়াত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। যক্ষ, কিন্নর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীস্থ দেবগণ এবং পিতৃগণ ভুবর্লোকে বাস করেন এবং বসু রুদ্রাদি উচ্চ দেবতাগণ স্বর্গের অধিবাসী। প্রেতগণ (মৃত মানব) প্রথমে ভুবর্লোকে বাস করেন। এখানকার ভোগ শেষ হইলে স্বর্গে যান এবং পুণ্যের তারতম্যানুসারে অল্পাধিক কাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চতর লোকগুলিতেও উচ্চতর জীব বাস করেন। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ইহাঁদের নামোল্লেখ আছে যথা, ঋভু,

প্রতর্দ্দন, অগ্নিষাত্ত আদি মহর্লোকে বাস করেন, ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক এবং অমরগণ জনলোকে, আভাস্বর, মহাভাস্বর প্রভৃতি তপঃলোকে এবং অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস ও সত্যাভাসগণ সত্যলোকে বিরাজ করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক জীবের অনেকগুলি দেহ আছে। উদাহরণস্বরূপ একটি মানবকে গ্রহণ করা যাউক। প্রথমতঃ তাঁহার স্থূল দেহ। ইহা ক্ষিতিতত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত। এই দেহের মধ্যে (এবং ইহার চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত) আর একটি দেহ রহিয়াছে। ইহার নাম বাসনা দেহ (Desire-body)। ইহা ডিম্বাকৃতি এবং অপ্‌তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত। আবার এই বাসনা-দেহের মধ্যে আর একটি সূক্ষ্মতর দেহ আছে। ইহাকে তাঁহার ভাবনা-দেহ (Thought-body) বলা যাইতে পারে। এটি তেজস্তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত। এইরূপ ক্রমাগত চলিয়াছে। মানব যতই উন্নত (developed) হয়, তাঁহার এই সূক্ষ্মতর বা উচ্চতর দেহগুলি ততই সুগঠিত ও কার্য্যক্ষম হইতে থাকে। মানবের বর্ত্তমান অবস্থায় বাসনা-দেহ সকলেরই সুগঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেবল খুব চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেরই ভাবনা-দেহটি সুনির্ম্মিত ও কর্ম্মক্ষম। বেদান্তে এই দেহগুলিকে কোষ বলা হইয়াছে যথা অন্নময় কোষ, মনোময় কোষ ইত্যাদি। সে যাহাহউক, যে দেহটি যে তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত তাহা তত্তৎ লোকের জ্ঞান লাভের পক্ষেই উপযোগী, অর্থাৎ ভূলোকের জ্ঞান লাভ করিতে স্থূলদেহ আশ্রয় করিতে হয়, ভুবর্লোকের অভিজ্ঞতার জন্য বাসনা-দেহের প্রয়োজন ইত্যাদি। এক্ষণে মানব কিরূপে এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহাই দেখিব।

প্রথমতঃ স্থূল জগতের কথা। আমি বসিয়া আছি ; গৃহপতনের এক ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিরূপে শব্দজ্ঞান জন্মিল ? পতিত গৃহের ইষ্টকাদির ঘাত প্রতিঘাতে যে প্রবল কম্পন বা স্পন্দন উদ্ভূত হইল উহাদ্বারা সংস্পৃষ্ট বায়ু কম্পিত হইল এবং এই কম্পন বায়ুর স্তর হইতে স্তরান্তরে পরিচালিত হইয়া আমার কর্ণপটাহে আঘাত করিল। পটাহ-সংলগ্ন স্নায়ু অনুরূপ কম্পিত হইয়া উক্ত কম্পনকে আমার মস্তিষ্কে আনিলে আমার শব্দ জ্ঞান হইল। শব্দ সম্বন্ধে যে নিয়ম, দর্শন, স্পর্শ, আঘ্রাণ ও আস্বাদ সম্বন্ধেও ঠিক তাই,—অর্থাৎ বাহ্যজগতের স্পন্দন আমাদের দেহে অনুরূপ

স্পন্দন উৎপাদন করিলে আমাদের জ্ঞান জন্মে। অবশ্য, স্পন্দন গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা চাই। আমাদের চতুর্দ্দিকে নিয়তই অসংখ্য স্পন্দন বর্ত্তমান রহিয়াছে; যিনি যত অধিক গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার তত অধিক জ্ঞান হয়। সূক্ষ্ম জগতেও ঠিক এই নিয়ম। স্থূল দেহ যেরূপে ক্ষিতিতত্ত্বের স্পন্দন গ্রহণ করে, সেইরূপে বাসনা-দেহ অপ্‌তত্ত্বের এবং ভাবনা—দেহ তেজস্তত্ত্বের স্পন্দন গ্রহণ করিয়া থাকে। তবে একটি প্রভেদ এই যে স্থূলদেহের কম্পন কেবল রূপ রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দরূপে অনুভূত হয়, কিন্তু বাসনা-দেহের স্পন্দন এক একটি বাসনা বা কামনা রূপে এবং ভাবনা দেহের স্পন্দন এক একটি চিন্তারূপে অনুভূত হয়। অর্থাৎ বাসনা দেহের এক একটি স্পন্দনই এক একটি স্বতন্ত্র কামনা। যেমন আমার নেত্র পটাহের (Retina) একপ্রকার স্পন্দনের নাম লাল বর্ণ, আর এক প্রকার স্পন্দনের নাম পীতবর্ণ ইত্যাদি, সেইরূপ আমার বাসনা-দেহের এক রকম স্পন্দনের নাম কাম, অন্যপ্রকার স্পন্দনের নাম ক্রোধ ইত্যাদি। এইরূপ ভাবনা-দেহের এক একটি পৃথক্ স্পন্দনই আমাদের এক একটি পৃথক্ চিন্তা।

আবার মনে করুন আমি উচ্চস্বরে একটি কথা বলিলাম। আমার চতুঃপার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গ উহা শুনিতে পাইলেন। কিরূপে শুনিলেন? আমার জিহ্বা, কণ্ঠ, ওষ্ঠাদির সঞ্চালন তৎসংলগ্ন বায়ুকে কম্পিত করিল এবং এই কম্পন বায়ুর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাদের কর্ণপটাহে অনুরূপ স্পন্দন উৎপাদন করাতে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। আচ্ছা, আমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইলে কি হয় দেখা যাউক। ক্রোধের উদয় মাত্রই আমার বাসনা-দেহ একটি বিশেষ ভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই স্পন্দন অপ্‌তত্ত্বের স্তর হইতে স্তরান্তরে পরিচালিত হইয়া ক্রমশঃ আমার চতুঃপার্শ্বস্থ ভুবর্লোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং অপরের বাসনা-দেহে আঘাত করিয়া ঠিক অনুরূপ স্পন্দন উৎপাদন করিল। ইহার ফল কি? তাঁহাদের মনেও ক্রোধের উদ্রেক। ক্রোধের পক্ষে যে নিয়ম, আমাদের যাবতীয় বাসনা ও চিন্তার পক্ষেও ঠিক তাই। আমাদের মনে লোভের উদ্রেক করিয়া আমরা অন্যের লোভপ্রবৃত্তিকে জাগাইয়া দিতেছি, নিজে হিংসা করিয়া জগতের হিংসা বাড়াইতেছি, অথবা হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেম আনিয়া অপরের সূক্ষ্মদেহে

ভক্তি ও প্রেমের স্পন্দন উৎপাদন করিতেছি। অতএব "যিনি একটি কুচিন্তা অন্তরে পোষণ করেন, তদ্দ্বারা কেবল তাঁহারই অনিষ্ট এবং (যদবধি উহা প্রকাশ না করেন) জগতের কোন অনিষ্ট হয় না" -এই ধারণাটি বিষম ভ্রমপূর্ণ। আমরা প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্ত্তে অপবিত্র ও মন্দচিন্তার দ্বারা জগতের যে কত অনিষ্টসাধন করিতেছি (অথবা সুচিন্তাদ্বারা কল্যাণ বিধান করিতেছি) তাহার ইয়ত্তা নাই। সুচিন্তাদ্বারা প্রত্যেক মানব অজ্ঞাতসারে ও ক্ষীণভাবে স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে যাহা করিতেছেন, মহাপুরুষগণ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং প্রবলভাবে সমগ্র জগতের উপর তাহাই সাধন করিতেছেন।

এই সূক্ষ্মদেহগুলির স্পন্দন মানবের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়মিত হয়। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি যতই প্রবল হয়, তিনি যতই একাগ্রভাবে ও অধিককাল একটি বিষয় চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহার সূক্ষ্মদেহের স্পন্দন ততই প্রবল, স্থায়ী ও প্রসারিত হয়। যদি তীব্র ইচ্ছার সহিত তিনি দূরস্থ কোন বন্ধুকে কোন চিন্তা পাঠাইতে সঙ্কল্প করেন, তাঁহার ভাবনা-দেহের স্পন্দন অন্তর্বর্ত্তী তেজস্তত্ত্ব ভেদ করিয়া সেই দিকেই ছুটিবে এবং বন্ধুর ভাবনা-দেহে অনুরূপ স্পন্দন উৎপাদন করিয়া তচ্চিত্তে ঐ চিন্তাটির উদ্রেক করিয়া দিবে। ইহাই Thought-transference বা চিন্তাচালনার রহস্য। সে যাহাহউক, মহাত্মাগণ বিশাল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। সুতরাং জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, শান্তি, ক্ষমা, সন্তোষ, দয়া প্রভৃতি ভাব ও চিন্তা অন্তরে নিয়ত পোষণ করিয়া, তাঁহারা সূক্ষ্মজগতে যে বিরাট স্পন্দন উৎপাদন করিতেছেন, তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে যে সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইতেছে ও হইবে ইহা কি বিচিত্র? অতএব নিভৃত শৈলশিখরেই বাস করুন বা পৃথিবীর কোন স্থানে বাস নাই করুন, তাঁহারা জীবের জন্য যাহা করিতেছেন আমরা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও আমাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা তাহার সহস্রাংশের একাংশও করিতে পারি না।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন "আচ্ছা, মহাপুরুষগণ যদি নিয়তই আধ্যাত্মিক, স্পন্দন উৎপাদন করিতেছেন, তবে জগতে এখনও এত হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রহিয়াছে কেন?" ইহার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, "প্রস্তরের সমীপে যদি আপনি একটি সুমিষ্ট গান করেন, অথবা বৃক্ষের

সম্মুখে যদি একখানি সুন্দর ছবি ধরেন, প্রস্তর উহা শুনিতে এবং বৃক্ষ দেখিতে পায় কি ?" বায়ুর এবং ইথারের উক্ত স্পন্দন উহারা গ্রহণ করিতে অক্ষম। কেন ? কারণ, উহাদের গ্রহণোপযোগী যন্ত্র (Receiving instiu-ment) এখনও জন্মে নাই—বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। ঠিক সেইরূপে অনেক মানবেরই সূক্ষ্মতর দেহগুলি (বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ) এখনও সুগঠিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা এই সকল আধ্যাত্মিক স্পন্দন হয়ত আদৌ গ্রহণ করিতে পারেন না, অথবা অল্প পরিমাণেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জীবের কল্যাণ সাধন করিবার মহাপুরুষগণের অসংখ্য প্রণালী আছে। আমরা কেবল একটি প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম মাত্র। সে যাহাহউক, উপসংহারে "থিওসফিষ্ট" কাহাকে বলে তাহারই একটু আভাস দিব। অনেক পাঠক হয়ত "থিওসফি" –এই বৈদেশিক শব্দটি শুনিবামাত্র কিছু না জানিয়াই তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হন্। তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত বলা প্রয়োজন যে যিনি জীবের যত অধিক কল্যাণ করেন, তিনি ততই অধিক থিওসফিষ্ট। যিনি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম যতই বুঝিয়াছেন, যিনি জগতের রহস্য যত অধিক উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি জীবের ক্রমোন্নতি তত্ত্ব যতই সুস্পষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং (এই সকল বুঝিয়া ও জানিয়া) যিনি যত অধিক পরিমাণে ক্ষুদ্র স্বার্থটিকে বলি দিতে পারেন,—যতই অধিক পরিমাণে জীবের কল্যাণোদ্দেশে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনি (যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন, যে দেশেই থাকুন, অথবা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন) ততই অধিক থিওসফিষ্ট। এই অর্থে, জীবন্মুক্ত ঋষিগণ সর্ব্বোচ্চ ও আদর্শ থিওসফিষ্ট। কারণ তাঁহাদের ন্যায় ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন কে ? এবং কেই বা তাঁহাদের ন্যায় জগৎ-রহস্য বুঝিতে ও জীবের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম ? জীবের কল্যাণই বা বলি কেন ; তাঁহাদের চক্ষে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র জীব নাই, সবই "আমি"। তাঁহাদের "আমিত্ব" ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, উহা প্রসারিত হইয়া সমগ্র জগৎকে স্বীয় বিশাল ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছে। সুতরাং জগতের কল্যাণই তাঁহাদের নিজের কল্যাণ, জগতের দুঃখই তাঁহাদের নিজের দুঃখ ! অতএব জীবের জন্য যে তাঁহারা জীবকে ভাল বাসেন তাহা নহে, "আত্মন স্তু কামায় সর্ব্বে

প্রিয়া ভবন্তি।" সাধারণ মানব "আমার" বলিতে নিজদেহটুকু অথবা জোর নিজ পরিবারটিকেই বুঝেন, কিন্তু এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিরাট ব্রহ্মাণ্ডই মহাপুরুষদিগের "আমার"। এই জ্ঞান—এই প্রেমই সকল ধর্ম্মের আদর্শ এবং ইহারই নাম থিওসফি।

যদি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া একটি মানবেরও মন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও মহাপুরুষদিগের পদপ্রান্তে আকৃষ্ট হয়, তবেই ইহার সার্থকতা। পরম মঙ্গল দাতৃগণের চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

কস্তুরী প্রকরণ।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লোভাম্ভোজালি শীতদ্যুতিরহিমরুচিঃ পুণ্যপাথোজ পুঞ্জে শুদ্ধ ধ্যানৈক সৌধঃ প্রগুণগুণমণিশ্রেণি মাণিক্যখন্যঃ। শ্রেয়ো বল্যাল বালঃ কলিমল কমলারাম সংহার হস্তী তৃষ্ণা কৃষ্ণাহি মন্ত্রো বিশতু হৃদি সতা মেষ সন্তোষ পোষঃ॥ ৫০॥

লোভাম্ভোজালি শীতদ্যুতিঃ লোভা এব অম্ভোজানি পদ্মানি তেষাং আলিঃ শ্রেণী, তস্যাঃ শীতদ্যুতিঃ চন্দ্রঃ লোভ বিনাশক ইত্যর্থঃ। পুণ্য পাথোজ পুঞ্জে (পুণ্য পদ্মসমূহে) অহিমরুচি (সূর্য্যঃ) পুণ্য বিকাশক ইত্যর্থঃ শুদ্ধ ধ্যানৈক সৌধঃ (শুদ্ধধ্যানস্য একঃ মুখ্যং সৌধঃ হর্ম্ম্যং ধ্যান নিধান ইত্যর্থঃ) প্রগুণগুণমণি শ্রেণি মাণিক্যখন্যঃ (প্রগুণাঃ বিবিধাগুণা এব মণয়ঃ তেষাং শ্রেণ্যস্তাষাং মাণিক্য খন্যঃ রত্নাকরাঃ সমুদ্রা ইতি শেষঃ) খনী—খনী লিমেত্যাদি নৈষধীয় চরিত দর্শনাৎ দীর্ঘ ঈকারান্ত খনী শব্দোরপি বর্ত্ততে। শ্রেয়ো বল্যালবালঃ (শ্রেয়োবল্যাঃ কল্যাণ লতায়াঃ, আলবালঃ-আবালঃ "স্যাদালবাল আবাল" ইত্যমরঃ—কল্যাণবর্দ্ধকঃ ইত্যর্থঃ) কলিমল-কমলারাম সংহার হস্তী। কলেঃ কলিযুগস্য যানি মলানি পাপানি তান্যেব কমলানি পদ্মানি তেষাং আরামঃ উপবনং তস্য সংহার হস্তী বিনাশকগজঃ—

* শ্রাবণের সংখ্যায় "পূর্ব্বানুবৃত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধটী "কস্তুরী প্রকরণ" হইবে।

কলিমল বিনাশক ইত্যর্থঃ) কৃষ্ণা কৃষ্ণাহিমন্ত্রঃ (তৃষ্ণা লালসা এব কৃষ্ণাহিঃ কৃষ্ণ সর্পঃ তস্য মন্ত্রঃ, তৃষ্ণানিবারক ইত্যর্থঃ) এষঃ সন্তোষ পোষঃ (সন্তোষাণাং পোষঃ বৃদ্ধিরিত্যর্থঃ) সতাং (সজ্জনানাং) হৃদি (হৃদয়ে) বিশতু (প্রবিশতু) । ৫০।

লোভরূপী পদ্মের বিনাশক চন্দ্রতুল্য, পুণ্যকমল বর্দ্ধক সূর্য্য সদৃশ, পবিত্র ধ্যানের সৌধ স্বরূপ, গুণরত্নশ্রেণীর রত্নাকর সন্নিভ, কল্যাণ লতার আলবালতুল্য, কলিযুগোত্থ পাপাম্ভোজের উপবন বিনাশক হস্তী সদৃশ এবং তৃষ্ণারূপ কালসর্পের নিবারক গরুড়মন্ত্র তুল্য সন্তোষের উদয় সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক। ৫০॥

তেনাবাদি যশঃ প্রসিদ্ধি পটহঃ প্রাকারি যাত্রোৎসব
স্তীর্থানাং চ সতামমোদি হৃদয়ং প্রাণোদি পাপপ্রথা।
শ্রেয়ঃ শ্রেণির বাপি বংশ সদনে চারোপি ধর্ম্মধ্বজো
যেনাপূজি পদদ্বয়ী হিতবতী পিত্রোঃ পবিত্রাত্মনোঃ॥ ৫১।

যেন (অনেন) হিতবতী (মঙ্গলকারী) পবিত্রাত্মনোঃ (পুণ্যাত্মনোঃ) পিত্রোঃ (মাতা পিত্রোঃ) পদদ্বয়ী (চরণ দ্বয়ং) অপূজি (পূজিতা) তেন যশঃ প্রসিদ্ধি পটহঃ (কীর্ত্তিবিস্তারক ঢক্কা) অবাদি (বাদিতঃ) তথা তীর্থানাং যাত্রোৎসবঃ (যাত্রামহঃ) প্রাকাবি (প্রকৃষ্টং কৃতঃ) তথা সতাং (সজ্জনানাং) হৃদয়ং (চিত্তং) অমোদি (মোদিতং) তথা পাপ প্রথা (অঘবিস্তৃতিঃ) প্রাণোদি (আচ্ছাদি) তথা শ্রেয়ঃ শ্রেণিঃ (কল্যাণ পরম্পরা) অবাপি (প্রাপ্তা) তথা বংশ সদনে (কুলে) ধর্ম্মধ্বজঃ (ধর্ম্মকেতুঃ) আরোপি (আরোপিতঃ)। ৫১॥

যে ব্যক্তি কল্যাণকর পিতামাতার চরণদ্বয় পূজা করিয়াছে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক যশঃ পটহ নিনাদিত হইয়াছে, তীর্থযাত্রা মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। সজ্জনের হৃদয়ানন্দ অর্জ্জিত হইয়াছে এবং স্বীয়কুলে ধর্ম্মধ্বজা আরোপিত হইয়াছে॥ ৫১॥

লক্ষ্মীস্তত্র পয়োনিধাবিব সরিচ্ছ্রেণিঃ সমেতি স্বয়ং
ভোগাস্তত্র বসন্তি শাখি শিখরা বাসে বিহঙ্গা ইব।
পুণ্যাম্ফাতি মুপৈতি তত্র সলিলে বীথীব পাথোরুহাং
ভক্তির্যত্র পবিত্র পুণ্যপরয়োঃ পিত্রোরমুষ্টীয় তে। ৫২।

যত্র (জনে) পবিত্র পুণ্য পরয়োঃ পিত্রোঃ ভক্তিঃ অনুষ্ঠীয়তে তত্র (জনে) পয়োনিধৌ (সমুদ্রে) সরিচ্ছ্রেণিঃ (নদীসমূহঃ) ইব লক্ষ্মীঃ (শ্রীঃ) স্বয়ং (আত্মনা) সমেতি (গচ্ছতি) শাখি শিখরাবাসে (বৃক্ষাগ্রস্থিতনীড়ে) বিহগাঃ (পক্ষিণঃ) ইব ভোগাঃ তত্র বসন্তি (অবতিষ্ঠন্তে) সলিলে জলে পাথোরুহাং (পদ্মানাং) বীথী (শ্রেণী) ইব তত্র জনে পূজা (অর্হনা) স্ফাতিং (বিস্তৃতিং) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)।

যাহা কর্ত্তৃক পবিত্র পুণ্য পরায়ণ পিতামাতার প্রতি ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়; লক্ষ্মী সমুদ্রগামিনী নদীর ন্যায় তাহাকে আশ্রয় করেন; বৃক্ষাগ্রস্থিত নীড়ে পক্ষী যেমন বাস করে সেইরূপ সুখ ভোগ তাহাতে অবস্থান করে; জলে যেমন পদ্মশ্রেণী বৃদ্ধিপায় সেইরূপ সেই ব্যক্তির সম্মাননা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।৫২।

ন স্নানৈরপিতীর্থ পূত পয়সাং শুদ্ধেশ্চ সিদ্ধাত্মনো
নো জাপৈরপি নাপি চারু চরিতৈর্নাপি শ্রুতানাংশ্রমৈঃ
ন ত্যাগৈরপি সম্পদাং ভবতি সা নাপি ব্রতানাং ব্রজৈ
র্যা পিত্রোঃ পদ পূজনৈঃ সুভগয়োঃ শুদ্ধি র্ভৃশংজৃম্ভতে। ৫৩।

সুভগয়োঃ পিত্রোঃ পদপূজনৈঃ সিদ্ধাত্মনঃ (শুদ্ধহৃদয়স্য জনস্য) যা শুদ্ধিঃ (পবিত্রতা) ভৃশং (অত্যর্থং) জৃম্ভতে (প্রকাশতে) সা শুদ্ধিঃ তীর্থ পূত পয়সাং (পবিত্র তীর্থ জলানাং) স্নানৈঃ অপি ন তথা শুদ্ধেঃ জাপৈঃ অপিন, তথা চারু চরিতৈঃ অপি ন, তথা শ্রুতানাং (শাস্ত্রানাং) শ্রমৈঃ অপি ন তথা সম্পদাং (ধনানাং) ত্যাগৈঃ (দানৈঃ) অপি ন তথা ব্রতানাং (চান্দ্রায়নাদীনাং) ব্রজৈঃ (সমূহৈঃ) অপি ন ভবতি ইত্যনেন সর্ব্বত্রৈবান্বয়ঃ। ৫৩।

কল্যাণপ্রদ পিতামাতার চরণ সেবা দ্বারা সিদ্ধাত্মা ব্যক্তি যেরূপ পবিত্রতা লাভ করে, পুণ্যতীর্থে স্নান দ্বারা অথবা জপতপস্যাদ্বারা কিম্বা চারুচরিত্র দ্বারা অথবা শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা কিংবা ধন বিতরণদ্বারা এমন কি ব্রতাদির দ্বারাও সে পবিত্রতা লাভ করা যায় না। ৫৩।

বিদ্যঃ স্বর্গতরঙ্গিণী প্রকটিতা তজ্জাঙ্গাল মণ্ডলে
দুঃস্বস্তু প্রবিবেশ বেশ্মনি মনঃ কামপ্রদাস্বর্গবী।
প্রাদুর্ভাব মুপেয়িবান্ মরুভুবি ক্ষৌণিরুহঃ স্বর্গিণাং
যৎ পিত্রোঃ প্রবিধীয়তে প্রতিদিনং ভক্তিঃ শুভাস্মিন্ যুগে। ৫৪।

অস্মিন্ যুগে (কলিযুগে) প্রতিদিনং (অহরহনি) পিত্রোঃ (মাতুঃ পিতুশ্চ) শুভা (কল্যাণকরী) ভক্তিঃ প্রবিধীয়তে (ক্রিয়তে) ইতি যৎ তৎ জাঙ্গালমণ্ডলে (অরণ্যমধ্যে) স্বর্গতরঙ্গিণী (মন্দাকিনী) প্রকটিতা (কৃতা) ইতি বিদ্মঃ (জানীমঃ) তথা দুঃস্থস্য (দুর্দ্দশাস্থিতস্য) বেশ্মনি (গৃহে) মনস্কাম-প্রদা স্বর্গবী (কামধেনুঃ) প্রবিবেশ (প্রাবিশৎ) তথা মরুভুবি (মরুভূমৌ স্বর্গিনাং (দেবানাং) ক্ষৌণীরুহঃ (বৃক্ষঃ কল্পবৃক্ষ ইত্যর্থঃ) প্রাদুর্ভাবং (উৎপত্তিং) উপেয়িবান্ (প্রাপ) ইতি বিদ্মঃ। ৫৪।

কলিযুগে পিতামাতার প্রতি প্রতিদিন যদি ভক্তি অনুষ্ঠিত হয় তবে অরণ্য মধ্যে মন্দাকিনী প্রকটিত হইল মনে করিব, দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তির গৃহে কামধেনু প্রবেশ করিল মনে করিব এবং মরুভূমিতে কল্পবৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হইল মনে করিব। ৫৪।

যৎ প্রসাদ বশতঃ করিলীলাং পুতর প্রতিমিতোঽপ্যুপযাতি
পাদয়োঃ প্রবিদধীত ন পিত্রোঃ কিং তয়োঃ সতনয়ঃ সমুপাস্তিং। ৫৫।

যঃ জন্মকালে পুতর প্রতিমিতঃ (মক্ষিকা পরিমিতঃ) তনয় ইতি শেষঃ যৎ প্রসাদবশতঃ (যয়োঃ পিত্রোঃ প্রসাদাৎ) (যৌবন সময়ে) করিলীলাং (গজলীলাং) অপি উপযাতি (উপগচ্ছতি)। যৌবনদশাং প্রাপ্য গজবৎ সামর্থ্যশালী স্বাধীনচেতাশ্চ ভবতীতি ভাবঃ) স তনয়ঃ পুত্রঃ কিং তয়োঃ পিত্রোঃ পাদয়োঃ (চরণয়োঃ) সমুপাস্তিং (সমুপাসনাং) ন প্রবিধীয়তে (ন করোতি) প্রবিধেয় এব ইত্যাশয়ঃ। ৫৫।

যে পিতামাতার অনুগ্রহে (জন্মকালে) মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র পুত্রও যৌবন দশায় গজলীলা প্রাপ্ত হয়, সেই পুত্র কি পিতা মাতায় চরণোপাসনা করিবে না। অবশ্যই করা উচিত। ৫৫।

ক্রমশঃ

সম্বন্ধ তত্ত্ব।

প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণই বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়; কর্ত্তব্য শ্রবণাদি সাধনভক্তি অভিধেয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়; আর ভক্তি ফলরূপ প্রেমই প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ। শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপ্রাপ্তির গৌণ সাধন শ্রবণাদিভক্তি ও মুখ্য সাধন প্রেমই বেদাদি শাস্ত্রের প্রধান সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন। ঐ তিনের জ্ঞান হইলে মায়া বন্ধন আপনা হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বেদের মুখ্য সম্বন্ধ পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে;—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম
ব্যাপারেষু বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥"

চরাচর জগতের মোহনার্থ বিবিধ পুরাণ ও আগম বিরচিত হইয়াছে, তত্তন্নিরূপিত দেবতাসকলও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন, কল্পকাল পর্য্যন্ত এইরূপই হউক, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যায় না; কারণ নিখিল শাস্ত্রের বিচারপ্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে একমাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া নিশ্চিত হয়েন।

বেদ শব্দ সকল গৌণবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তি দ্বারা এবং বেদ বাক্য সকল অন্বয় সম্বন্ধ ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ দ্বারা এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বেদের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যবসায়িনী। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"কিং বিধত্তে কি মাচষ্টে কি মনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদকশ্চন॥
মাং বিধত্তে ঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্
মায়ামাত্র মনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥"

শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডে বিধি বাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা কাহার অভিধান করেন, এবং জ্ঞান কাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন, এই সকল অভিপ্রায় আমি ভিন্ন অন্য

কেহই জানে না। শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই দেবতারূপে অভিধান করেন, এবং আমাকেই তর্ক করিয়া নিরাকরণ করিয়া থাকেন। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, প্রথমতঃ মায়ামাত্র জগতের নিষেধ পূর্ব্বক, মধ্যে আমার অবতারাদি রূপ ভেদের অনুবাদ করণান্তর, অন্তে, অঙ্কুরগত রস যেমন কাণ্ড শাখাদিতে প্রসৃত হয়, তেমনই প্রণবার্থভূত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কাণ্ড শাখাদিতে অনুস্যূত বলিয়া, নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত অর্থাৎ কালিক পরিচ্ছেদ রহিত বা বিভু, দৈশিক পরিচ্ছেদ রহিত বা নিত্য এবং বস্তু পরিচ্ছেদ রহিত বা পূর্ণ। তাঁহার বৈভবও অনন্ত। সৎ চিৎ ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। শক্তি ও শক্তিকার্য্যসকলই তাঁহার বৈভব। তাঁহার শক্তি সকল প্রধানতঃ ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়া থাকেন। উক্ত ভাগত্রয় যথা,—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি তাঁহার স্বরূপেরই অন্তর্গত অর্থাৎ বাচক বলিয়া চিচ্ছক্তিকে স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তিও বলা যায়। মায়াশক্তি তাঁহার স্বরূপে না থাকিয়া তাঁহার স্বরূপের বাহিরে অর্থাৎ স্বরূপ বহিশ্চর জীবশক্তিতেই থাকিয়া তাহার স্বরূপের লক্ষক হয়েন বলিয়া মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলা যায়। আর, জীবশক্তি তাঁহার স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপশক্তির এবং মায়াশক্তির সঙ্গে থাকিয়া স্বরূপের লক্ষক হয়েন বলিয়া জীবশক্তিকে তটাস্থাশক্তিও বলা যায়। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড সকল তাঁহার শক্তিকার্য্য। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বরূপশক্তির কার্য্য এবং ব্রহ্মাণ্ড সকল তাঁহার জীবশক্তি ও মায়াশক্তির কার্য্য। স্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্য্য এই তিনের তিনিই একমাত্র আশ্রয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীধর স্বামি পাদ বলিয়াছেন,—

"দশমেদশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম্।
ক্রীড়দ্যদুকুলাবোধো পরানন্দ মুদীর্য্যতে॥"

দশম স্কন্ধে শক্তি রূপভক্তগণের আশ্রয় স্বরূপ বিগ্রহধারী পরমানন্দময় যদুকুল সাগরে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দশম লক্ষ্য বস্তু বর্ণিত হইতেছেন।

অতঃপর, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, তিনি সকলের আদি, সকলের অংশী। তিনি কিশোর শেখর। তিনি চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বেশ্বর।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি পরিপূর্ণ; সুন্দর-সপ্রকাশ সুখমূর্ত্তি, গোপালনশীল, যাদবদিগের অগ্রাহ্য অর্থাৎ দেবতা, ব্রজবাসীদিগের গ্রাহ্য অর্থাৎ নিজ জন এবং কারণ সকলের ও কারণ।

"এতে চাংশ কলা, পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

ইতি পূর্ব্বে যে সকল অবতারের নাম কীর্ত্তিত হইল, এবং পরেও যে সকল অবতারের নাম কীর্ত্তিত হইবে, তাঁহাদিগের কেহবা পুরুষের অংশ, কেহবা পুরুষের কলা; কিন্তু বিংশতিতম অবতারে যাঁহার নামোল্লেখ হইল, সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, পুরুষের অংশ বা কলা নহেন, অংশী। নারায়ণও ভগবান্ অতএব পুরুষের অংশী, ইহা সত্য, কিন্তু নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অর্থাৎ নারায়ণের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা হইতে সিদ্ধ বলিয়া গৌণ এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া মুখ্য জানিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত অবতার সকল যুগে যুগে অসুরগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত লোকসকলকে সুখী করিয়া থাকেন

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানীর সম্বন্ধে জীবাতিরিক্ত-বিশেষণ-প্রকাশ-রহিত শুদ্ধ বিশেষ্যরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপে, যোগীর সম্বন্ধে অন্তর্যামিত্বাদি-মায়িক-বিশেষণ-প্রকাশ-যুক্ত পরমাত্ম স্বরূপে ও ভক্তের-সম্বন্ধে-বিশেষণ-প্রকাশ-যুক্ত পরমাত্ম স্বরূপে ও ভক্তের সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তি সমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞান মদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

তত্ত্ববিদগণ অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। ঐ অদ্বয় জ্ঞানরূপ তত্ত্ব নির্বিশেষ-

রূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগীগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, আর সর্ব্বশক্তিসমন্বিতরূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলেন। নির্ব্বিশেষ-প্রকাশ-রূপব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কান্তি। সূর্য্য যেমন লোক দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময়রূপেই দৃষ্ট হয়েন, মূর্ত্তরূপে দৃষ্ট হয়েন না।

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ শেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কল মনন্ত মশেষভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥"

যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম যে প্রভুর অঙ্গকান্তি, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মার ও আত্মা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহী বাভাতি মায়য়া॥"

এই কৃষ্ণকে তুমি আত্মার আত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও, জগতের হিতার্থ যোগমায়া দ্বারা দেহধারী জীবের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

অথবা, হে অর্জ্জুন তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি একাংশ দ্বারা অর্থাৎ আমার একাংশরূপ পরমাত্মা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

জ্ঞান যোগাদি দ্বারা শ্রীভগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তি সমন্বিত আবির্ভাবের অনুভব হয়, কিন্তু ভক্তি দ্বারা তাঁহার পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে। তাঁহার একই বিগ্রহে অনন্তরূপের প্রকাশ হয়। ঐ অনন্তরূপ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। উক্ত তিন ভাগ যথা,—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ। স্বয়ংরূপের আবার স্বয়ং ও প্রকাশ এই দুইরূপে স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপের লক্ষণ যথা,—

"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।"

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (আদর্শাবলী)।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যিনি চিরজীবন "কর্ত্তব্যের" সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ ছিলেন, সেই ভীষ্মদেবের কাহিনী হইতে উক্ত বিষয়ের একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত পওয়া যাইতে পারে যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাকুন তিনি ঐ অবস্থায় কর্ত্তব্যাদি সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে প্রয়াস পাইতেন, এবং অপরের তাঁহার প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে তাহা প্রার্থনা করিবার আকাঙ্খার কোনও চিহ্ন তাঁহাতে লক্ষিত হয়ন.। ভীষ্ম প্রাপ্তব্যবহার হইলে তদীয় পিতা শান্তনুর মুখমণ্ডলে দুঃখের কালিমা অবলোকন করিলেন, পিতা পুত্রকে ঐ দুঃখের কারণ বিদিত করিতে প্রত্যয় না করিয়া এবং পুত্রের ভালবাসা হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্তির চেষ্টা না পাইয়া বরং সকলেরই নিকট হইতে ঐ কষ্ট গোপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বরিতোপজাত ভালবাসা বশতঃ পুত্র এ অব্যক্ত কষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এবং ঐ কষ্টের লাঘবতা সম্পাদন পূর্ব্বক পিতাকে প্রফুল্লিত করিতে ব্যগ্র হইয়া ঐ কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করাতে অবশেষে জানিতে পারিলেন যে একটী অনূঢ়া ধীবরকন্যা দর্শনে তাঁহার পিতার তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পিতা ঐ সুন্দরী কুমারীর গর্ভে যে পুত্র জন্মাইতে পারেন তাহাকে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিতে অঙ্গীকার না করাতে, ঐ ধীবর রাজার ঐ কুমারীর পাণিগ্রহণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। পুত্র ভীষ্মের প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে শান্তনু উক্তরূপ গর্হিত অঙ্গীকার করিতে অস্বীকার করিয়া ক্ষুব্ধান্তঃকরণে রাজবাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শান্তনু তাঁহার পুত্রের আত্মদান গ্রহণ করিবেন না ইহা সবিশেষ জানিয়া ভীষ্ম পিতাকে কোন কথাই বলিলেন না; কিন্তু ঐ ধীবরের সমীপে গমন করিয়া তাহার কন্যা সত্যবতীকে শান্তনুর নববধূ স্বরূপ যাচ্ঞা করিলেন। ঐ ধীবর উত্তর করিল "আপনি স্বয়ংই উহাকে গ্রহণ করুন, তাহা হইলে উহার পুত্র আপনার পরে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারিবে।" ভীষ্ম বলিলেন "আমি উহাকে মাতৃভাবে দেখিয়াছি, এবং সেই নিমিত্ত কদাপি আমি পতির অনুরাগের সহিত উহার

সমীপবর্ত্তী হইতে পারি না।" অবাধ্যভাবে ঐ ধীবর বলিল "উহার পুত্র অবশ্য রাজত্ব করিবে, এবং তুমিই শান্তনুর উত্তরাধিকারী"। পুত্রকর্ত্তব্য পালনে কৃতসংকল্প ভীষ্ম কালবিলম্ব ব্যতিরেকে প্রত্যুত্তর করিলেন;—"আমি রাজসিংহাসনে আমার অধিকার পরিত্যাগ করিলাম এই কুমারীর সন্তানই আমাদিগের রাজা স্বরূপ রাজ্যশাসন করিবে" "ইহা উত্তম, কিন্তু যখন আপনার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন, তখন তিনি রাজত্ব লইয়া সত্যবতীর সন্তানের সহিত বিরোধ উপস্থিত করাইবেন"। "না, তাহা কদাপি হইবে না; কারণ, এই স্থানে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি কখনও কোন কুমারীর পাণিগ্রহণ করিব না, আমি অপুত্রক হইয়াই জীবন যাপন ও প্রাণত্যাগ করিব, এবং তাহা হইলেই মদীয় এই মাতার পুত্র উত্তরাধিকার-সূত্রে ঐ রাজকীয় পৈতৃক সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে প্রাপ্ত হইতে পারিবে।" এই রূপে ভীষ্ম কর্ত্তব্যপ্রেমের অনুরোধে মনুষ্যের প্রিয়তম পদার্থ সমূহ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, আসন্ন রাজ্যপদ তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সমর্থ ও সম্যক্‌পরিণত বয়সের পূর্ণ তেজস্বীতায় তিনি পতিত্ব ও পিতৃত্বের সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, "এ প্রকার আত্মোৎসর্গে আমার পিতার কি কোনও অধিকার আছে?" ইহা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই, পরন্তু, পূর্ণ কর্ত্তব্য পরায়ণ ও কর্ত্তব্যাচরণে সর্ব্বোচ্চ আনন্দানুভবকারী পুত্র স্বরূপ জীবনের উৎকৃষ্ট সুখ গুলি উক্ত হস্তে গ্রহণ করিয়া পিতৃচরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন।

অধুনা কোন কোন পাশ্চাত্য জনপদবাসী এই বৃত্তান্ত পাঠে রুষ্ট ভাব অবলম্বন করেন এবং বলেন যে রাজ্যপদ ও দাম্পত্য সুখে অধিককার পরিত্যাগ করা ভীষ্মের উচিত হয় নাই। তাহারা আরও বলেন যে পুত্রের আত্মদান গ্রহণে শান্তনুর কোনও অধিকার ছিল না। এই বিষয়ের সহিত শান্তনুর সম্বন্ধ ধরিতে গেলে, তিনি ইহাতে কোন কথাই কহেন নাই। ভীষ্ম কি করিতেছিলেন তাহা তিনি অবগত হইবার পুর্ব্বেই ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা বারেক কৃত প্রতিজ্ঞা কদাপি ভঙ্গ হইতে পারে নাই। কিন্তু ভীষ্মের কার্য্য পাশ্চাত্যচিত্তস্থ স্বত্বাদর্শের পক্ষে বীভৎস-জনক এবং পাশ্চাত্যচিত্ত পিতৃপরায়ণতার এইরূপ পরাকাষ্ঠায় ও পুত্রকর্ত্তব্যের এইরূপ উৎকর্ষতার সৌন্দর্য্যগ্রাহী নহে। কর্ত্তব্যাদর্শাধিকৃত-

চিত্ত ভারতবাসী ভীষ্মকে আদর্শভূত বলিয়া অবলোকন করেন, এবং তাঁহার আত্মোৎসর্গকে স্বপ্ন ক্রমেও দোষনীয় বলিয়া কখন বিবেচনা করিবেন না।

ক্রমশঃ

অলৌকিক ঘটনা।

পরলোকের পত্র।

আমার তিন কন্যা। তন্মধ্যে দ্বিতীয় কন্যাকে আমি বড়ই ভাল বাসিতাম। দ্বিতীয় কন্যার নাম ভানুমতী। দেখিতে দেখিতে ভানুমতী বড় হইয়া উঠিল এবং আমি হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে একটী সৎপাত্রে কন্যা দান করিলাম। আমার বৈবাহিক একজন বিখ্যাত কবিরাজ। কবিরাজের বাটীতে কন্যা দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মনে করিলাম যে বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে নিস্কৃতি পাইলাম এবং সেই সঙ্গে কন্যার পীড়ার দায় হইতেও নিশ্চিন্ত হইলাম কন্যার কখন পীড় হইলে আর আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ডাক্তার বা কবিরাজের সাহায্য লইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। কিন্তু বিধাতার বিহিত কার্য্য অখণ্ডনীয়। ভানুমতী শ্বশুরালয়ে প্রথম যাইয়াই ভয়ানক অম্লসূচক জ্বর রোগে আক্রান্ত হইল। বৈবাহিক মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিরুপায় বিবেচনা করিয়া তাহার চিকিৎসার জন্য আমার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অগত্যা আমি ভানুমতীকে জেলা সাহাবাদের অন্তর্গত নাসিরিগঞ্জ নামক স্থানে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলাম।

নাসিরিগঞ্জ আমার চাকরী স্থান। সেখানাকার জলবায়ু তখন অতি উৎকৃষ্ট ছিল। আমি বাঁকীপুর হইতে একজন সুচিকিৎসক আনাইয়া তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম কিন্তু কোন উপকার হইল না, বরং দিন দিন ভানুমতীর পীড়া বৃদ্ধি হইল।

সেই সময়ে আমার ৺পিতামহীর আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমাকে ১০ দিবসের ছুটী লইয়া সপরিবারে বাটী আসিতে বাধ্য হইতে হইল। সুতরাং

ভানুমতীকেও বাটী লইয়া আসিলাম। আস্ত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপ্তির পরে, বাটী হইতে পুনরায় চাকরী স্থানে যাইবার পূর্ব্বে আমি ভানুমতীকে দেখিতে গেলাম। তাহাকে দেখিয়া তাহার বেশী দিন আর জীবনের আশা নাই এই মনে উদয় হইল ভানুমতী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে বলল, "বাবা আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি ভাল হইয়া আপনাকে পত্র লিখিব।" আমি নাসিরিগঞ্জে প্রস্থান করিলাম এবং প্রতিদিন পত্রে তাহার সংবাদ পাইতে লাগিলাম। ২।৪ দিবস পত্র আসার পরে, একদিন পত্র পাই লাম না। নানা প্রকার চিন্তার পর গভীর রাত্রে নিদ্রিত হইলাম নিদ্রা দেবীর সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেবী আমার দেহ অধিকার করিলেন।

স্বপ্নে আমি এক খানি পত্র পাইলাম। পাইয়া সমুৎসুকচিত্তে পত্রখানি খুলিলাম, পড়িয়া দেখিলাম, পত্রখানি লাল কালীতে ভানুর হাতে লেখা। ভানুর হাতের লেখা ও স্বাক্ষর দেখিয়া পরম পুলকে পরিপূর্ণ হইলাম। সেরূপ সুখ বোধ করি, ইহ জন্মে আমার আর কখনও ভোগ হইবে না। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল।

"শ্রীচরণকমলেষু

বাবা। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার আর জ্বর বা অরুচি কিছুই নাই। আমার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সুশ্রী ও সবল হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার সহিত পৃথিবীতে আর আমার দেখা হইবে না। আমি এক্ষণে পরলোকে আসিয়াছি।"

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী—

শ্রীমতী ভানুমতী দেবী।

আমি পত্রখানি পড়িয়া বালিসের নিম্নে রাখিয়া পুনরায় নিদ্রা গেলাম। প্রত্যূষে উঠিয়া পত্রখানি আর দেখিতে পাইলাম না। মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। তদবস্থায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া আপনার পোষাক পরিয়া বাহিরে গেলাম। বাহিরে যাইবামাত্র পোষ্ট পিয়ন এক খানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া পড়িয়া দেখি ভানুমতী তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনে ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে গিয়াছে।

শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, রায় সাহেব।

সূচীপত্র।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১২শ ভাগ | আশ্বিন, ১৩১৫ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

উপনিষদ্ শব্দের নিরুক্ত।

উপ+নি+সদ্ ধাতু হইতে উপনিষদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপনিষদ্ শব্দের উৎপত্তি-লভ্য অর্থ কি?

উপ+নি+সদ্ হইতে যেমন উপনিষদ্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ উপ+সদ্ হইতে উপসদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।* উপসদ্ অর্থে যজ্ঞাঙ্গ বিশেষ। এ অর্থে বৈদিক সাহিত্যে এ শব্দের প্রভূত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বাদশাহং উপসদ্‌ব্রতী ভূত্ব'।

[বৃহদারণ্যক, ৬৷৩৷১]

যদ্ রমতে তদ্ উপসদঃ।

{ মহানারায়ণ, ২৫৷১]

উপসন্ন শব্দের কিন্তু ভিন্ন অর্থ। গুরুর নিকট শিষ্য "উপসন্ন" হন।

আঙ্গিরসং বিধিবৎ উপসন্নঃ।

[মুণ্ডক, ১৷১৷৩]

---

* এইরূপ পরি+সদ্=পরিষদ্, সং+সদ্=সংসদ্।

ভগবন্তং পিপ্পলাদম্ উপসন্নাঃ।

[প্রশ্ন ১।১]

উপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ।

[ছান্দোগ্য ৭।১।১]

এ সকল স্থলে উপ+সদ্ ধাতুর অর্থ বিনীত ভাবে গুরুর সমীপস্থ হওয়া। "উপ"র উপর নি উপসর্গ যোগ করিলে ধাতুর অর্থ পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত নহে। বরং "নি" যোগে শিষ্যের বিনীত ভাবেরই বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অতএব উপনিষদ্ শব্দের নিরুক্ত etymological meaning) বিশেষ বিনীত ভাবে শিষ্য কর্তৃক গুরুর সমীপাবস্থান। এইরূপে 'উপসন্ন' শিষ্যকে প্রাচীনকালে গুরু ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতেন।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

[মুণ্ডক, ১।২।১৩]

'সেইরূপে "উপসন্ন" শিষ্যকে (যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন এবং যিনি শমান্বিত) গুরু যথাযথ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন, যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়।'

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-কালে প্রাচীনেরা অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গের ভেদ করিতেন। অর্থাৎ, অধিকারী ভিন্ন এ বিদ্যা যাহার তাহার গোচর করিতেন না।

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্‌যৈস্তু চীর্ণম্॥

[মুণ্ডক, ৩।২।১০]

'যাঁহারা ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে "একর্ষি" অগ্নিতে হোম করেন এবং যাঁহারা যথাবিধি "শিরোব্রত" (তপস্যা বিশেষ) অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবে।'

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
না প্রশান্তায় দাতব্যং না পুত্রায় শিষ্যায় বা পুনঃ॥

[শ্বেতাশ্বতর, ৬।২২]

'পূর্ব্বকল্পে উপদিষ্ট পরম গুহ্য বেদান্ত রহস্য প্রশান্তচিত্ত পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অপরকে উপদেশ দিবেনা।'

এ সম্বন্ধে স্পষ্ট নিষেধেরও অভাব নাই।

ইদং বাব তৎ জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণাষ্যায় বাহন্তে বাসিনে।

নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপি অস্মা ইমাং অদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাৎ। এতদেব ততো ভূয় ইতি। [ছান্দোগ্য, ৩।১১।৫-৬]

'এই ব্রহ্ম (জ্ঞান) পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কিম্বা উপযুক্ত শিষ্যকে বলিতে পারেন—অন্য কাহাকেও নহে। যদি সে এই সসাগরা বিত্তপূর্ণা বসুন্ধরা দান করে, তথাপি নহে। কারণ ইহা তদপেক্ষাও মহৎ।'

এতমুহৈব সত্যকামো জাবালঃ অন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচ * * তমেতং না পুত্রায় বাহনন্তেবাসিনে বা ব্রূয়াৎ।* [বৃহদারণ্যক, ৬।৩।১২]

'সত্যকাম জাবাল শিষ্যদিগকে ইহা উপদেশ দিয়া বলিলেন—পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অপরকে ইহা বলিবে না।'

এরূপ সতর্কতার কারণ এই যে, অনধিকারীর নিকট তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না।

বানরের গলায় মুক্তাহার শোভিত হইলে, তাহার দুর্দ্দশা সুনিশ্চিত।

সেইজন্য দেখাযায়, বিশেষ পরীক্ষা না করিলে গুরু শিষ্যকে এই বিদ্যা প্রদান করিতেন না। কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে নচিকেতা জিজ্ঞাসু হইয়া যমের সমীপস্থ হইলে যম বহুবিধ পরীক্ষান্তে তবে তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রা নৃণীষ বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ স্বয়ঞ্চ জীব শরদোযাবদিচ্ছসি॥
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি॥

---

* এই প্রসঙ্গে ঐতরেয় আরণ্যক ৩।২।৬।৯, মৈত্রউপনিষদ্ ৬।২৯, নৃসিংহ তাপনীয় উপনিষদ্ ১।৩ ও রামতাপনীয়উপনিষদ্ ৮৪ দ্রষ্টব্য।

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥

[কঠ, ১।২৩-২৫]

'শতায়ু পুত্রপৌত্র, বহু পশু, হস্তি, সুবর্ণ, অশ্ব যাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর; পৃথিবীর মহৎ আয়তন গ্রহণ কর; নিজেও শতবর্ষ আয়ুলাভ কর। ইহার অনুরূপ অন্য কোন অভিলষিত বর, বিত্ত, দীর্ঘজীবন যাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর। আরত পৃথিবীর অধিশ্বর হও। নচিকেতা! যাহা তোমার কামনা তাহাই পূরণ করিব। পৃথিবীতে যে যে কাম্যবস্তু দুর্লভ, সমস্ত ইচ্ছামত বাছিয়া লও। এই রমণী, রথ, বাদ্য, মানুষে এরূপ কখন পায় না; ইহারা তোমার সেবা করুক। মরণের রহস্য জানিতে চাহিও না।'

কিন্তু নচিকেতা ইহাতে প্রলুব্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন

ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যো
বরস্তুমে বরণীয়ঃ স এব।

[কঠ, ১।২৭]

'বিত্তের দ্বারা মনুষ্যের কখন তৃপ্তি হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের বরই আমি বরণ করি।'

যস্মিন্নিদম্ বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎসাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তম্।
যোঽয়ংবরো গূঢমনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃনীতে॥

[কঠ, ১।২৯]

'হে যম! যে বিষয়ে সকলের সন্দেহ, যাহা মরণের পরপারের সহিত সংযুক্ত, সেই প্রশ্নেরই উত্তর আমার বরণীয়। নচিকেতা অন্য বর চাহে না।'

যম দেখিলেন, নচিকেতা প্রকৃতই বিদ্যার্থী। বহু কামনার লোভেও সে লুব্ধ হইল না। তখন তিনি তাহার দৃঢ়তায় প্রীত হইয়া তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন। এই ভাবে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে (কৌষিতকী, ৩।১), রৈক্য জানশ্রুতিকে (ছান্দোগ্য, ৪।২) সত্যকাম উপকোশলকে (ছান্দোগ্য, ৪।১০),

প্রবাহন আরুণিকে (বৃহদারণ্যক, ৬।২।৬ ও ছান্দোগ্য, ৫।৩।৭), জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১) ও শাকায়ন্য বৃহদ্রথকে (মৈত্র, ১।২) পরীক্ষা করিয়া তবে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রশ্ন উপনিষদের আরম্ভ এইরূপ,—

সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্যায়ণিশ্চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে এতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎসর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ' সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপ সন্নাঃ ॥

তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং
সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত
যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম
ইতি।　　　　　[প্রশ্ন, ১।২]

ভরদ্বাজ পুত্র, সুকেশা, শিবির পুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যায়নি গার্গ্য, অশ্বলের পুত্র কৌসল্য, বিদর্ভের পুত্র ভার্গব, কত্যের পুত্র কবন্ধি, ইঁহারা ব্রহ্মনিষ্ট, ব্রহ্মপরায়ণ; পরব্রহ্মের জিজ্ঞাসু হইয়া, "ইনি আমাদের সমস্ত উপদেশ করিবেন" এই আশয়ে সমিৎ হস্তে ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপস্থ হইলেন। ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে পূর্ণ এক বৎসর তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান করিয়া বাস কর; পরে ইচ্ছামত প্রশ্ন করিও, যদি আমার অবিজ্ঞাত না হয়, সমস্তই ব্যাখ্যা করিব।'

এইরূপ ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশের আশায় ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রোহৈব দেবানাং অভিপ্রবব্রাজ
বিরোচনোঽসুরাণাং তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী
প্রজাপতি সকাশম্ আজগ্মতুঃ ॥
তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্য মুষতুঃ।

[ছান্দোগ্য, ৮।৭।২-৩]

'দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরদিগের মধ্যে বিরোচন বহির্গত হইলেন এবং পরস্পরের অজ্ঞাতে সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির সমীপস্থ

হইলেন। তাঁহারা ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবার পর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন।'

প্রজাপতি প্রথমতঃ তাহাদিগকে দেহাত্মবাদ উপদেশ দেন। বিরোচন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু ইন্দ্র ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় প্রজাপতির নিকট উচ্চতর উপদেশের প্রার্থনা করেন। তাহাতে প্রজাপতি তাঁহাকে বলেন যে, পুনরায় ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর; পরে আবার উপদেশ করিব। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের পর প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় উপদেশ করেন।

স সমিৎ পাণিঃ পুনরেয়ায়। * * মঘবন্নিতি
হোবাচ এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি
বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি।
সহাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস তস্মৈ হোবাচ।

[ছান্দোগ্য, ৮।৮।৩]

'তিনি সমিৎ হস্তে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি বলিলেন 'ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বাস কর।' ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর বাস করিলে প্রজাপতি তাঁহাকে উপদেশ করিলেন।'

এ উপদেশেও তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্র আরও উচ্চতর উপদেশের প্রার্থী হইলে, প্রজাপতি পুনরায় তাঁহাকে ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে বলেন। ইন্দ্র ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্য করিবার পর, প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় উপদেশ করেন।

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় * *
মঘবন্নি হোবাচ এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি।
বস অপরাণি দ্বাত্রিংশৎ বর্ষাণীতি,
সহাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস। তস্মৈ হোবাচ।

এ উপদেশেও তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্র আরও উচ্চতর উপদেশের প্রার্থী হইলে প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় ৫ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে বলিলেন।

বসাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি।

এইরূপে ইন্দ্র একাদিক্রমে ১০৫ বৎসর ব্রহ্মচারী ভাবে যাপন করিলে পর, তবে প্রজাপতি তাঁহাকে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বিবৃত করেন।

এই ভাবে গুরু শিষ্যকে যে উপদেশ দিতেন, তাহা গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইত। উপনিষৎ-সাহিত্যে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,

য ইদং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েৎ ব্রহ্মসংসদি। [কঠ, ৩।১৭]

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতং। [শ্বেতাশ্বতর, ৬।২২]

তে বা এতে গুহ্যা আদেশাঃ। [ছান্দোগ্য, ৩।৫।২]

বেদ গুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্। [শ্বেতাশ্বতর, ৫।৬]

এতদ্ বৈ মহোপনিষদং দেবানাং গুহ্যং। [নারায়ণোপনিষদ্]

গীতাতে ভগবান্ এই জ্ঞানকে 'রাজগুহ্য' (গুহ্যতম) বলিয়াছেন। মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬।২৯) ইহা 'গুহ্যতম' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে, দেখা যায়।

'উপসন্ন' শিষ্যকে গুরু যে উপদেশ করিতেন, তাহা প্রাচীন কালে গোপনীয় রহস্য বলিয়া সযত্নে রক্ষিত হইত বলিয়া, গুরু-শিষ্যের এইরূপ রহস্য অবস্থানকে 'উপনিষদ্' আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নহে। *

ক্রমশঃ এই রহস্য উপদেশ 'উপনিষদ্' নামে অভিহিত হইতে লাগিল। এই অর্থে 'উপনিষদ্' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি য এতাং এবং সাম্নাং উপনিষদং বেদ।—

[ছান্দোগ্য, ১ ১৩।৪]

যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।—

[ছান্দোগ্য, ১।১।১০]

তেভ্যো হৈতাং উপনিষদং প্রোবাচ। [ছান্দোগ্য, ৮।৮।৪]

য এবং বেদ তস্যোপনিষন্ন যাচেদিতি। [কৌষিতকী, ২।১]

সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। [তৈত্তিরীয়, ১।৩।১]

---

* *Upanisad* derived as a substantive from the root sad, to sit, can only denote a "sitting"; and as the preposition *upa* (near by) indicates, in contrast to *parishad, samsad* (assembly), a "confidential secret sitting"

[Paul Deussen's Philosopły of the Upanishads, p. 13]

Upanisad means a forest gathering—disciples sitting near their teacher engaged in religious converse.

[Hoornitz's Indian Literature. p. 41]

'যিনি সামদিগের "উপনিষদ্" অবগত হন, তিনি অন্নযুক্ত অন্নাদ (অন্ন ভোক্তা) হয়েন।'

'যাহা বিদ্যার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, "উপনিষদের" সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার শক্তি অধিকতর হয়।'

'তাহাদিগকে এই "উপনিষদ" বলিলেন।'

'যিনি ইহা জানেন, তাঁহার "উপনিষদ্" 'এই, যাচ্ঞা করিও না।'

'সংহিতার "উপনিষদ্" ব্যাখ্যা করিব।'

এই সকল রহস্য উপদেশ (গুহ্যা আদেশাঃ প্রাচীন কালে সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে রক্ষিত হইত। উপনিষদে এইরূপ কয়েকটি সূত্রের (formula) আমরা সাক্ষাৎ পাই। ইহাদিগের সাধারণ নাম উপনিষদ্। *

তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যং।

[বৃহদারণ্যক, ২।১।২১]

অথাত আদেশো নেতি নেতি।

[বৃহদারণ্যক, ২ ৩।৬]

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং।

[কেন, ৩।৬]

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্।

[ছান্দোগ্য ৩।১৪।১]

এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি সর্ব্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি য এবং বেদ ॥ ২

এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি য এবং বেদ ॥ ৩

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥ ৪ [ছান্দোগ্য, ৪।১৫।২-৪]

---

* Certain mysterious words, expressions, and formulas, which are only intelligible to the initiated, are described as *Upanishad*

[Paul Deussen's Philosoply of the Upanishads, p. 16]

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং
সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ।

[ঐতরেয় ৩।১৪]

'তাঁহার উপনিষদ্ "সত্যস্য সত্যং"।'

'অতঃপর আদেশ (রহস্য উপদেশ) ——"নেতি নেতি"।

'তাঁহার নাম "তদ্বনং"। তদ্বন এই বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে।'

'এই সমস্তই ব্রহ্ম। তিনি "তজ্জলান্"।' 'ইঁহাকে "সংযদ্বাম" বলা হয়। সমস্ত বাম তাঁহাতে সংযত হয়; যিনি ইহা জানেন, সমস্ত বাম (কল্যাণ) তাঁহাতে সঙ্গত হয়।' 'তিনি "বামনী"। সমস্ত বাম (কল্যাণ) তাঁহাতে নীত হয়; যিনি ইহা জানেন, তাঁহাতে সমস্ত বাম নীত হয়।' 'তিনিই ভামনী"। সমস্ত লোকে তাঁহার ভাতি, যিনি ইহা জানেন, সমস্ত লোকে তিনি প্রভান্বিত হন।'

'সেই জন্য তাঁহার নাম "ইদন্দ্র" ইদন্দ্র নামা তাঁহাকে লোকে পরোক্ষ-ভাবে ইন্দ্র বলে'

পরবর্ত্তী কালে যে গ্রন্থে এই সকল উপনিষদ্ রহস্য (উপদেশ) গ্রথিত হইত, তাহার নাম উপনিষদ্ হইল। সেই জন্য দেখা যায় তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক এক বল্লীর শেষে এইরূপ ভনিতা আছে;—

ইত্যুপনিষৎ।

এইরূপে ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি নানা গ্রন্থের নাম উপনিষদ্ হইল। এই সকল গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রধানতঃ অবিদ্যার বারণ, সংসারের শাতন, ব্রহ্মের প্রতিপাদন। অতএব উপনিষদ্ শব্দের অর্থের সহিত এই সকল অর্থ ক্রমশঃ অবান্তর ভাবে জড়িত হইল। সেই জন্য দেখা যায়, শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই ভাবেই উপনিষদ্ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহা উপনিষদের মৌলিক অর্থ নহে।

সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ শব্দ বাচ্যা তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসাদনাৎ। উপনি পূর্ব্বস্য সদে স্তদর্থত্বাৎ।

[বৃহদারণ্যক—ভাষ্য, ১।১]

য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যাং উপযন্তি আত্মভাবেন শ্রদ্ধা ভক্তি পুরঃ সরাঃ সন্তঃ তেষাং গর্ভ-জন্ম-জরা রোগাদ্যনর্থ পুগং নিশাতয়তি, পরং বা ব্রহ্ম গময়তি,অবিদ্যাদি-সংসার কারণঞ্চ অত্যন্তম্ অবসাদয়তি বিনাশয়তি ইতি উপনিষৎ। উপনি পুর্ব্ব সদেঃ এবমর্থ স্মরণাৎ। * [মুণ্ডক, ১।১]

'এই ব্রহ্ম বিদ্যা উপনিষদ্ শব্দের বাচ্য। কারণ ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তি-দিগের পক্ষে সকারণ সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সাধিত হয়। উপ—নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর এইরূপই অর্থ।'

'যাঁহারা শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আত্মীয়ভাবে আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের গর্ভ, জন্ম, জরা রোগ প্রভৃতি অনর্থ সমূহের শাতন হয়; পর-ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়; অবিদ্যাদি সংসার কারণের একান্ত বিনাশ হয়। সেই জন্য এই বিদ্যার নাম উপনিষদ্। উপ নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতু এইরূপ অর্থেই প্রসিদ্ধ।'

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানস পুত্র (অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃ) গণ।

অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ এবং শুক্রসন্তানগণ, এই উভয়ে মিলিয়া ব্রহ্মার অপর দুই তৃতীয়াংশ মানসপুত্র। তাঁহারা পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিতে ব্রতী হইলেন।

এই অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানসপুত্র। তাঁহারা দ্বিতীয় মণ্ডলের সুপক্ক ফল স্বরূপ। ব্রহ্মার জ্যোতিঃ বা দিব্য দেহ হইতে তাঁহারা উৎপন্ন। তাঁহাদের দেহ জ্যোতির্ময় এবং অনুপম রূপলাবণ্যযুক্ত। তাঁহারা দেবগণের পিতৃপুরুষ। এই পিতৃগণ আমিত্ব এবং পৃথকত্ব জ্ঞানে প্রণোদিত না হইয়া দেবগণের ন্যায় একত্বভাবে পূর্ণ। তাঁহাদের মধ্যে নানা শ্রেণী-বিভাগ

---

* কঠ-উপনিষদের ভাষ্যের ভূমিকায় এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য এই ভাবে উপনিষদ্ শব্দের বিবৃতি করিয়াছেন।

আছে। এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণী অপেক্ষাকৃত উন্নত। প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলে কর্ম্মপুরুষদের ষষ্ঠ বিভাগের অন্তর্গত। তাঁহারা নানা নামে অভিহিত। দ্বিভুজ নামেও তাঁহারা খ্যাত; যেহেতু আত্মা-বুদ্ধি-মনঃ, এই তিনটী তাহাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা পঞ্চভুজ নামে খ্যাত হইলেন, কারণ, মনঃ দুই ভাগে বিভক্ত; আবার কামে বুদ্ধি প্রতিফলিত হওয়াতে তাঁহারা এই পঞ্চগুণ বিশিষ্ট। কিন্তু তাঁহারা মানুষকে আত্মা দিতে পারেন না, ইহা বড় কঠিন কাজ! গুপ্তবিদ্যায় তাঁহারা প্রণিধাননাথ বলিয়া অভিহিত। প্রণিধাননাথ অর্থে প্রণিধানের কর্ত্তা বা যোগাধীশ্বর। তাঁহারাই ঊর্দ্ধরেতা কুমারগণ। *

বসুন্ধরা মনুষ্যবাসের উপযুক্ত হইলে, প্রজা সৃষ্টিকরার জন্য ব্রহ্মা তাঁহার মানসপুত্রগণকে আদেশ করিলেন, কিন্তু এই যোগীশ্বর ঋষিগণ তাহাতে অসম্মত হইলেন, কারণ তাহারা পবিত্র † এবং সূক্ষ্ম হওয়ায় তখন এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। পরে তৃতীয় মণ্ডলে পঞ্চভূতাত্মক বস্তু অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হওয়ায় তখন তাঁহারা সেই মণ্ডলের প্রজা সৃষ্টি করিলেন। ধরাধামে তাঁহাদের কর্ত্তব্যকার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহারা পুনরায় মরীচির পুত্ররূপে (কাহারো কাহারো মতে পুলস্ত্যের পুত্ররূপে) জন্মলাভ করিয়া দেবগণের পিতৃস্বরূপ হইলেন। তাঁহারা বৈরাজনামেও খ্যাত; তাঁহাদের স্বীয় স্বর্গীয় ধাম বিরাজলোক। তাঁহারা নানা সময়ে নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এই জন্যে পুরাণে তাঁহারা নানা নামে প্রসিদ্ধ। অজিত, সত্য, হরি, বৈকুণ্ঠ, সাধ্য, রাজস্ ইত্যাদি নামে তাহারা বিখ্যাত।

৪। তৃতীয় শ্রেণীর মানসপুত্রগণ।

(ক) শুক্রাচার্য্য।

শুক্রের পুত্রগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধাশ্রমের মূলই তাঁহারা। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর মানসপুত্রগণ যেমন আমাদের মণ্ডলেই উন্নতি

---

* ঊর্দ্ধরেতা কুমার সাতজন; তন্মধ্যে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার, এই চারজন বাহ্য। সন, সনৎসুজাত এবং কপিল, এই তিন জন গুহ্য।

লাভ করিয়াছিলেন, এই তৃতীয় শ্রেণীর মানসপুত্রগণ সেইরূপ নহেন। যে মণ্ডলে শুক্রগ্রহ আমাদের মণ্ডলের পৃথিবীর ন্যায় চতুর্থ (ঘ) গ্রহের স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাঁহারা সেই মণ্ডল হইতে আগত। পৃথিবী ও শুক্রের মধ্যে সম্বন্ধ থাকার বিবরণ পুরাণে পাওয়া যায়। শুক্র পৃথিবীকে স্বীয় তনয়া স্বরূপ গ্রহণ করেন। শুক্রাচার্য্য অসুরগণের এবং দৈত্যদানবগণের গুরু ছিলেন। তিনি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া উশনস্ কবি নামে প্রসিদ্ধ হন। * এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি? শুক্রগ্রহ পৃথিবী হইতে প্রাচীন এবং উন্নত। ক্রমোন্নতি পথে শুক্রের অধিবাসীগণের সপ্তম চক্র চলিয়াছে; আমরা মাত্র চতুর্থ চক্রে। শুক্র পৃথিবী হইতে এতদূর উন্নত হওয়াতেই এই গ্রহ পৃথিবীর জননী-স্বরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম; এই জন্যই বলা হইয়াছে যে শুক্র পৃথিবীকে দত্তকতনয়ারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধরণীকে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীও সময় সময় বলা হয়। ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, শুক্র তাহার সপ্তমচক্রের মহাজ্ঞানী এবং প্রবলপ্রতাপ ও প্রভূত বলবীর্য্যশালী কতকগুলি উৎকৃষ্ট সন্তানকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধরণীতে আসিয়া অজ্ঞ মানবগণের শিক্ষাগুরুরূপে কার্য্য করেন। তখন শুক্রাচার্য্য দানবকুলের নিয়ন্তাস্বরূপ ছিলেন। এই কৃতী সন্তানগণ অলৌকিক স্বর্গীয় আভায় উদ্দীপ্ত এবং উজ্জ্বলবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া ধরণীতলে অবতরণ করিলেন। তন্মধ্যে যিনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ও তাঁহাদের নেতা ছিলেন, তিনি পুরাতন গ্রন্থাদিতে নানা নামে অভিহিত। মেডামব্লেভেট্স্কীর মতে, "তিনি গুপ্ত বিদ্যার ভিত্তি স্বরূপ"। তিনি প্রসারিত বহুতর শাখা প্রশাখা সমন্বিত প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ স্বরূপ। যে হেতু তিনিই ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে এবং যোগবলে যোগসন্তান-দিগকে সৃষ্টি করাতে তাঁহারা শাম্ভবী বিদ্যার অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীরূপ মহীরুহে সুপক্ক ফলরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং পরিশ্রান্ত ও পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, সংসারক্লিষ্ট নরনারীগণ তাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতে লাগিল। তিনি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ দীক্ষাগুরুরূপেও উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ তাঁহা হইতেই প্রকৃত দীক্ষা

* কবীনামুশনাঃকবিঃ।

লোকসমাজে অবতরণ করিয়াছে। কুমার, মহাদেব, দেবাদিদেব ইত্যাদি নামে তিনি প্রসিদ্ধ।

(খ) সিদ্ধাশ্রম।

এই চতুর্থ চক্রের মানবজাতি অনুন্নত। শিক্ষকের স্থান অধিকার করিতে পারে, এমন উপযুক্ত লোক তাহাদের মধ্যে না থাকায় তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিবার জন্ত কথিত দেবাদিদেবের অল্প সংখ্যক অনুচর তাঁহার অনুগমন করিলেন। জীবন্মুক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সংসার বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল এবং সুগন্ধি ও মনোহর কুসুম স্বরূপ। শুক্রসন্তানগণ কথিত ফলপুষ্পের উদ্যান স্বরূপ। এই উদ্যানই সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধাশ্রমের প্রথম কেন্দ্র। এক কোটী আশী লক্ষ বৎসর গত হইল এই কেন্দ্র ধরাতলে স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সসীম, ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এই সময়কে অসীম, অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সুদূর অতীতের সময় হইতে এখন এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পুণ্য প্রেমের আধার এই সিদ্ধাশ্রম অভ্রান্ত এবং অক্ষুন্নভাবে অনন্তকাল বক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। জনসমাজের আবশ্যকতানুসারে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে শিক্ষাগুরু রূপে মহাত্মাগণ অবতরণ করিয়া থাকেন। এই করুণানিধান মহাপুরুষগণের আবির্ভাব না হইলে মানবসমাজ চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকিত, লোকে ধর্ম্মপথ খুঁজিয়া পাইত না। পুণ্যপ্রেমের আধার, পূজ্যপাদ মুনিঋষি-দিগের আবাস, সুপ্রসিদ্ধ এবং অতি প্রাচীন কলাপগ্রামে এই সিদ্ধাশ্রম অবস্থিত।

(গ) পৌরাণিক গল্পের রহস্য ভেদ।

পুরাণে নৈসর্গিক সত্য এবং গূঢ় তত্ত্বগুলি গল্পের আবরণে আবৃত আছে। এই আবরণ উন্মোচন না করিলে রহস্য ভেদ করা যায় না। মণ্ডল, চক্র, কল্প, জাতি, গ্রহ, দ্বীপ ইত্যাদির উল্লেখ পুরাণাদি গ্রন্থের নানা স্থানে পাওয়া যায়। এমনই কৌশলে এই সকলের উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোনও স্থানে চক্র মণ্ডল অর্থে, মণ্ডল চক্র অর্থে, আবার গ্রহ দ্বীপ অর্থে, এবং দ্বীপ গ্রহ অর্থে, এবং কখনও বা মহাদেশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা কোন্‌টী কোন্‌

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে একেবারে উহ্য আছে। আপাত দৃষ্টিতে তাহা অর্থহীন বা বিপরীতার্থ বোধক বলিয়া মনে হয়, বা কোন কোন-টীর অর্থ বোধ আদৌ হয় না, যেন তাহা একটা রহস্যময় আবরণে আবৃত। ইংরেজিতে এই আবরণকে ব্লাইণ্ড (Blind) কহে। এইগুলি যে অসত্য তাহা নহে, তবে রহস্যের আবরণটী উন্মোচন করিলে তবে প্রকৃত অর্থ মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হয়। আপামর সাধারণের নিকট চিরকাল তাহা প্রহেলিকাবৎ বোধ হইবে। সময় সময় পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে নিতান্ত অসার, অসম্বদ্ধ এবং অর্থশূন্য খোসগল্প বোধে লোকে উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অন্যায়, কারণ কুকার্য্যান্বিত, স্বার্থান্ধ এবং কলুষিত লোক সমাজের হাতে পড়িয়া পাছে পবিত্র অধ্যাত্মজ্ঞানের অবমাননা, গ্লানি এবং অপব্যবহার হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই শাস্ত্র প্রণেতা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ শাস্ত্রগ্রন্থের কোন কোন আবশ্যকীয় স্থান এইরূপ রহস্যের আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যেন পাপিষ্ঠ, ক্রূরকর্ম্মা জনসাধারণ তাহার অর্থবোধ করিতে না পারে। যে তালাব যে চাবি, তাহা প্রয়োগ না করিলে যেমন সেই তালা খুলা যায় না, সেইরূপ তাহাদের অর্থবোধ করিতে হইলে, প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং টীকাটিপ্পনী না হইলে তাহার বোধ-সৌকর্য্য হয় না। এই আবরণ উন্মোচন করা, প্রকৃত চাবি খুঁজিয়া পাওয়া, প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং টীকাটিপ্পনির অনুসন্ধান করাই বর্ত্তমান পরাবিদ্যার্থী সভার (থিওসফিকেল সোসাইটির) প্রধান কার্য্য। যাঁহারা শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ বুঝিতে উৎসুক তাঁহারা থিওসফিকেল সোসাইটির আশ্রয় গ্রহণ করুন।

(ঘ) জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণ।

প্রলয়স্যাপি হুঙ্কারৈর্ম্মহাচলবিচালকৈঃ।
বিক্ষোভং নৈতি যস্যাত্মা স মহাত্মেতিকথ্যতে॥

তৃতীয় জাতি বড়ই কদাকার। দেখিতে যেন পশু বা মর্কটের ন্যায়। অতি বিশ্রী নরনারীগণ এই জাতিতে জন্মলাভ করিল। তন্মধ্যে শুক্রের পুত্রগণের বসবাসের উপযোগী অতি সুন্দর, অতিশয় বলবীর্য্যশালী, আকাশ-

ভেদী প্রকাণ্ড দেহসমূহের সৃষ্টি হইল। সেই সেই দেহ ধারণ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিলেন। আবার এই তৃতীয় জাতির মধ্য সময়ে ডিম্বের মধ্যে যে মানবজাতির অঙ্কুরের সৃষ্টি হইয়াছিল অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া সেই দেহগুলির উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। পরে স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিলেন। কালক্রমে তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা-পদবাচ্য হইলেন। শুক্রপুত্রগণ সমধিক যোগবলসম্পন্ন এবং জ্ঞানী মহাপুরুষ-গণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা অজ্ঞ মানবজাতির শিক্ষকদিগের শিক্ষাগুরু হইলেন। তন্মধ্যে এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী মধ্য এশিয়ায় বর্ত্তমান গবি মরুভূমির স্থানে তাঁহারা পরম পবিত্র শম্ভল নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বোত্তরে মেরুপ্রদেশ (শ্বেতদ্বীপ) হইতে তাঁহারা আগমন করিয়াছিলেন। সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ শম্ভলনগরে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই নগরকে পৃথিবীর হৃদয় বলা হয়। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। মানবজাতির বক্ষঃ ও হৃদয় স্বরূপ সেই মহাজ্ঞানী এবং মহাযোগীগণ তথায় বসতি করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই পরমার্থতত্ত্ব এবং অধ্যাত্মজ্ঞান জনসমাজে আসিয়া প্রচারিত হয়, এবং সময়ে তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতিগমন করিয়া তাঁহাদের মধ্যেই লীন হয়। তাঁহারা অধ্যাত্মজ্ঞানের কেন্দ্র স্বরূপ।

আহার্য্য বস্তু শারীরিক যন্ত্রাদির প্রক্রিয়া দ্বারা শোণিতরূপে পরিণত হইয়া যেমন সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি সাধন করে; আবার ইন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে আসিয়া কলুষিত হইয়া যেমন পুনরায় হৃদয়ে প্রত্যাগমন করে, এবং তথায় সংশোধিত হইয়া পুনঃ শরীরের নানা স্থানে প্রবাহিত হইয়া যেমন দেহবল রক্ষা করে, সেইরূপ জ্ঞানধারা সেই মহাত্মা-গণের নিকট হইতে জনসমাজে প্রবাহিত হইয়া সময়ে তাহা আবিল ও কলুষিত হয়; পরে সেই উৎপত্তিস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া সংশোধিত হয় এবং আবার তাহা লোকসমাজে প্রবাহিত হইয়া জীবের কল্যাণ সাধন করে। এই-রূপে, পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত, পরে দূষিত, তৎপরে সংস্কৃত হইয়া পুনরায় প্রচারিত হওতঃ আবহমানকাল হইতে কৃপাসিন্ধু মহাত্মাগণের এই মহাজ্ঞানযজ্ঞ চলিয়া আসিতেছে। তদ্দ্বারা জনসমাজ দৃঢ়তররূপে সংবদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

পৃথিবীতে আগমনকালে তাঁহারা শুকগ্রহ হইতে নানাবিধ জীবজন্তুর এবং উদ্‌বিদের বীজ তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া এই পৃথিবীতে আনয়ন করেন। পুরাণাদি পাঠে দেখা যায়, মন্বন্তরের প্রারম্ভে অপরাপর ঋষিগণের সাহায্যে ভগবান মনু নানাজাতীয় প্রাণীবীজ নৌকাযোগে তাঁহার সঙ্গে আনয়ন করেন। খৃষ্টিয়ান বাইবেল গ্রন্থে পাওয়া যায়, প্রলয়কালে নওয়া তাহার আর্কে (Ark এ) অর্থাৎ জলযানে করিয়া সকল প্রকার উদ্‌বিদ, প্রাণী ও অপরাপর জীব জন্তুর বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই নওয়াই আমাদের মনু এবং প্রলয়ই আমাদের মন্বন্তর।

গম এই পৃথিবীর জিনিষ নহে, তাহা কথিতরূপে শুক্র হইতে আনা হইয়াছিল। এই গমে এবং পৃথিবীর নানাজাতীয় ঘাসের সঙ্গমে এবং সংমিশ্রণে আমাদের নানাজাতীয় ব্রীহির উৎপত্তি হইয়াছে। মধুমক্ষিকা এবং পিপীলিকাকেও শুক্র হইতে আনয়ন করা হইয়াছে। এই দুই জাতীয় শিল্পী-প্রাণী শুক্রেই তাহাদের অত্যাশ্চর্য্য সামাজিক রীতি পদ্ধতি এবং অবিশ্রান্ত শ্রম-কৌশল শিক্ষা করিয়া পরে পৃথিবীতে আসিয়াছে। শুক্রগ্রহে মানুষের ন্যায় উদ্‌বিদ এবং প্রাণীজগৎ উন্নতিপথে অধিকতর অগ্রসর।

তৃতীয় জাতির বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বসমূহ এই মহাত্মাগণ হইতে জাত। চতুর্থ (দৈত্য) জাতিতে অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ মহাত্মারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে চব্বিশ জন পঞ্চম জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। জৈনধর্ম্মে তাঁহারা চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর (জিন) নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ।

তৃতীয় জাতির মধ্য সময়ে স্বর্গীয় উভলিঙ্গ মহাত্মাগণ ইচ্ছাশক্তি এবং যোগশক্তি বলে সন্তান উৎপাদন করিতেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ তাঁহাদের মধ্যে জন্মলাভ করিলেন। তাঁহারাই বর্ত্তমান অর্হৎ (Arhat) ও মহাত্মাগণের প্রকৃত গুরু। তাঁহারা আইন কানুন, নানারূপ ভোজ বিদ্যার ও যাদুমন্ত্রের আবিষ্কারক। আদিম ও অনভিজ্ঞ মানবজাতিকে শিল্পবিজ্ঞান এবং সামাজিক রীতি নীতি তাঁহারাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। নানারূপ বর্ণমালার তাঁহারাই আবিষ্কারক এবং প্রচারক। তাঁহারা উদ্‌বিদ হইতে ঔষধ প্রস্তুতের কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মিশর, কেল্‌ডিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে তাঁহাদিগকে অসামান্য বলবীর্য্যশালী

কবিরি এবং কোন কোন স্থানে টিটান (Titan) বলা হইয়াছে। গুপ্ত-বিদ্যায় তাঁহাদিগকে মানুষী বলা হইয়াছে। তাঁহারা পবিত্র "সেনজার" (Senzar) ভাষার আবিষ্কারক। এই ভাষা তাঁহারা অতি প্রাচীনকালে দানব ও দৈত্যকুলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সেনজার ভাষা নাকি বৈদিক ভাষার এবং বেদেরও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

(ক্রমশঃ)

যুগল সেবক।

শিব ও শক্তি।

এক অনন্ত ও অতলস্পর্শ বিশাল সমুদ্র—স্থির, ধীর, গম্ভীর। তাহা এরূপ নিশ্চল ও প্রশান্ত যে তাহা আছে কি নাই অনুভূতই হয় না। তাহাকে "অসৎ" বা "শূন্য" বলিয়াই ভ্রম হয়,—মনে হয় যেন কিছুই নাই। ইহাই শিব। কোন অজ্ঞেয় কারণে ইহা সচল হইল,—অসীম জলরাশি আন্দোলিত ও গতিশীল হইল। এখন আর সে শান্তি নাই, সে নিস্তব্ধতা নাই, ভীষণ চাঞ্চল্য ও নির্ঘোষ। দিগন্তব্যাপী পর্ব্বত সদৃশ প্রকাণ্ড উর্ম্মিমালা নিয়ত উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অসংখ্য কল্লোল, বীচি, তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্বুদ ক্রমাগতই আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। এই অবস্থাই শক্তি। আমরা মহাসমুদ্রের দুইটি ভাব দেখিলাম—১ম, শান্ত ও নিষ্ক্রিয়ভাব, ২য়, চঞ্চল ও ক্রিয়ান্বিত ভাব। পরমাত্মা বা শিবকে ১ম ভাবটির সহিত এবং মায়া বা শক্তিকে ২য় ভাবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রকাণ্ড উর্ম্মিগুলি এক একটী ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অসংখ্য তরঙ্গ উন্নত ও অবনত অসংখ্য জীব। ইহাঁরা সকলেই এক অনন্ত ব্রহ্মে উদ্ভূত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছেন এবং এই উত্থান ও পতন শক্তিসাপেক্ষ, অর্থাৎ শক্তিই সৃষ্টি ও লয়ের একমাত্র হেতু। যে অজ্ঞেয় কারণ নিশ্চল সমুদ্রকে সচল করে তাহাই শক্তি এবং ভীষণ গর্জ্জনময় অসংখ্য তরঙ্গযুক্ত যে চঞ্চল অবস্থা তাহাই শক্তির ক্রিয়া (manifestation)। শক্তি হইতেই স্পন্দন ও গতি, শক্তি প্রকাশিত বা

হইলে নিশ্চল ও নিস্পন্দভাব, যেন কিছুই নাই। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং।
নচেৎ এবং দেবঃ ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥

অর্থাৎ, শিব যদি শক্তির সহিত মিলিত হন তবেই প্রভাববান্, নচেৎ তাঁহার স্পন্দনেরও ক্ষমতা থাকে না। যতক্ষণ শক্তি ক্রিয়ান্বিতা ততক্ষণই জগৎ, তাই ইহাঁর নাম জগদম্বা।

শিব নির্গুণ। তাঁহার কোন বিশেষ বর্ণ (গুণ) নাই। অথচ তাঁহাতে সকল বর্ণের (গুণের) সমন্বয় বা একত্র সমাবেশ হইয়াছে, তাই তিনি শুভ্র। যেখানে দ্বন্দ্ব (relatives) বা বিপরীত (opposites) বর্ত্তমান, সেই খানেই গতি ও স্পন্দন। তাঁহাতে সকল দ্বন্দ্ব ও বিপরীত পরস্পরকে খণ্ডন করিয়া সাম্যভাবাপন্ন হইয়া আছে। তাই তিনি স্থির, নিশ্চল, মৃতবৎ পতিত। তাঁহার বক্ষের উপর নৃত্য করিতেছেন ইনি কে? ইনিই সেই মহাশক্তি। বক্ষের উপর কেন? ইহাঁর দাঁড়াইবার কি অন্য স্থান নাই? শক্তিমানের হৃদয়ে ভিন্ন শক্তি আর থাকিবেন কোথায়? ভাল, ইনি কৃষ্ণা কেন? শুভ্রের বিপরীত কৃষ্ণ। ব্রহ্ম নির্গুণ, ইনি গুণময়ী; ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, ইনি ক্রিয়াবতী; ব্রহ্ম নিশ্চল ও নিস্পন্দ, ইনি মূর্ত্তিমতী চঞ্চলতা ও গতি; তাই শিব শুভ্র, ইনি কৃষ্ণাঙ্গী। ইনি এরূপ বিকট বদনা ঘোর দংষ্ট্রা ভীষণ মূর্ত্তি কেন? ভাবুক, একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখুন দেখি, ইনি কি কেবলই ভয়ঙ্করী? ইহাঁতে কি দয়া কঠোরতা, পালন বিনাশ, মাধুর্য্য পারুষ্য ও সৃষ্টি সংহারের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন, এক অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যাইতেছেনা? এক হস্তে দান (জগদাদিসৃষ্টি) করিতেছেন, এক হস্তে "মাভৈঃ" রবে পালন করিতেছেন, এবং দুই হস্তে সব সংহার করিতেছেন। আবার তিনি উলঙ্গী! উলঙ্গী না হইলে তাঁহার তিনটি গুণ বা তিনটি যুগপৎকার্য্য জীব দেখিবে কিরূপে? জীব, ঐ দেখ তাঁহার যোনি। ঐ দেখ তাঁহার স্তনদ্বয়। ঐ দেখ তাঁহার রুধিরাক্ত লোল জিহ্বা! বুঝিলে তো? ঐ দেখ যোনিদেশ হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিসৃত হইতেছে, ঐ দেখ অসংখ্য জীব তাঁহার স্তনদ্বয়পীযূষপানে প্রাণ ধারণ করিতেছে, এবং ঐ দেখ শেষে সমস্তই তাঁহার

করাল কবলে কবলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিতেছে !! এখন্ "কুতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে কেন জাতানি জীবন্তি কিং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি" তাহা বুঝিলে কি? অজ্ঞান জীব আমরা। আমাদের বোধের জন্যই "ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।" এই যে মূর্ত্তি—ইহাতে সমুদয় জগদ্রহস্য উদ্ঘাটিত, স্পষ্টীকৃত। কঠিন দুর্জ্ঞের্য় তত্ত্বটী এত সহজে ও এত সংক্ষেপে বুঝাইবার অন্য উপায় আছে মনে হয় না। নির্গুণের বক্ষে গুণময়ীর নিত্য ক্রীড়া ইহাই জগৎ, ইহাই সব। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থে এই শিব ও শক্তির একত্র সমাবেশ, এই নিশ্চল ও সচল ভাবের অপূর্ব্ব মিলন!

আত্মা, পুরুষ ও শিব—এই তিনে এবং পক্ষান্তরে মায়া, প্রকৃতি ও শক্তি—এই তিনে যেরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহাতে মনে হয় যে বেদান্তে যাহা আত্মা ও মায়া, সাংখ্যে তাহা পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তন্ত্রে তাহাই শিব ও শক্তি। আমরা প্রথমে সাদৃশ্যগুলির একটু আলোচনা করিয়া, তৎপরে যদি কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে তাহাই দেখিব। প্রথমতঃ দেখা যাক আত্মা ও মায়ার মোটামুটি লক্ষণগুলি কি। কঠ উপনিষদে নিম্নলিখিত উপমাটি দৃষ্ট হয়,—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ, আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি এবং মন প্রগ্রহ (লাগাম)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে রথী যেরূপ নিষ্ক্রিয় ও সাক্ষী, আত্মাও সেইরূপ। গীতাতেও কতকগুলি লক্ষণ পাওয়া যায়,—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলোঽয়ং সনাতনঃ।"
"অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥"

অর্থাৎ, আত্মা নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, অনাদি, নিশ্চল, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত। আচ্ছা, মায়ার লক্ষণ কি?

শঙ্কর ইহাকে অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি বলিয়াছেন। পঞ্চদশীও বলেন,—

"শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তু নিয়ামিকা।

অর্থাৎ, ইনি ব্রহ্মের শক্তি এবং ইঁহা দ্বারাই সব নিয়মিত ও পরিচালিত হইতেছে। বেদান্তসারে ইনি "ত্রিগুণাত্মকং ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ" অর্থাৎ, সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা ভাবরূপিণী কিছু বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। গীতাতেও ভগবান তিন গুণের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। ৭।১৩—১৪।

অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের দ্বারাই সমস্ত জগৎ মোহিত। এই ত্রিগুণাত্মক ভাবই আমার মায়া ইত্যাদি। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়করী, ভাবরূপিণী ব্রহ্মশক্তি।

এখন পুরুষ ও প্রকৃতি কিরূপ দেখা যাউক। সাংখ্যকারিকা বলিতেছেন -

" সিদ্ধং সাক্ষিত্বং অস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বম্ অকর্ত্তৃভাবশ্চ॥" ১৯।

" সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রয়োগুণাঃ কর্ম্মকর্ত্তৃভাবেন প্রবর্ত্তন্তে ন পুরুষ এবং ..." গৌড়পাদ ভাষ্য।

অর্থাৎ, পুরুষ সাক্ষী, কেবল, মধ্যস্থ (উদাসীন), দ্রষ্টা এবং অকর্ত্তা। সত্ত্বরজঃ তমঃ গুণত্রয়ই যাবতীয় ক্রিয়া (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি) করিতেছে, পুরুষ নিষ্ক্রিয়। পুনশ্চ, -

ত্রিগুণং···প্রসবধর্ম্মি প্রধানং··· তদ্বিপরীতঃ···পুমান।" ১১

সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রয়োগুণাঃ যস্য ত্রিগুণং অব্যক্তং চাগুণঃ পুরুষ · একং প্রধানং তথা পুমানপ্যেকঃ · নিত্যমব্যক্তং তথাচ নিত্যঃ পুমান্...ইত্যাদি।" গৌড়পাদ ভাষ্য।

অর্থাৎ, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ও প্রসবধর্ম্মিণী (স্বভাবতঃ জগদাদি উৎপাদন করিতেছেন), কিন্তু পুরুষও তদ্বিপরীত, অর্থাৎ, নির্গুণ ইত্যাদি। তবে কোন কোন বিষয়ে প্রকৃতির সহিত পুরুষের ঐক্য আছে, যথা—প্রকৃতি এক পুরুষও এক, প্রকৃতি নিত্য পুরুষও নিত্য ইত্যাদি। ভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানিগুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। ৩।২৭।
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। ১৩।২৯।

অর্থাৎ, প্রকৃতিই সব করিতেছেন, পুরুষ নিষ্ক্রিয়।

এখন শিব ও শক্তির লক্ষণগুলি দেখিব। কুলার্ণবতন্ত্রে শিব সম্বন্ধে এই রূপ উক্তি পাওয়া যায়,—

অস্তি দেবি পরংব্রহ্ম স্বরূপী নিষ্কলঃ শিবঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তাচ সর্ব্বেশো নির্ম্মলোদয়ঃ॥
অয়ং জ্যোতিরনাস্তস্তো নির্ব্বিকারঃ পরাৎপরঃ।
নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দঃ তদংশাজ্জীব সংজ্ঞকাঃ॥ ১ম উল্লাস।

অর্থাৎ, শিব পরব্রহ্মস্বরূপ, অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ইত্যাদি। শিব পরম ব্রহ্ম স্বরূপ। এই পরমব্রহ্ম কিং বিধ?

মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলিতেছেন,—

সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ব বস্তুষু
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
* * * *
তস্যেচ্ছা মাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোমি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরং॥ ৪র্থ উল্লাস।

অর্থাৎ, ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, সর্ব্বদাই একরূপ (নির্ব্বিকার) এবং তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই তুমি (শক্তি) সৃষ্টিপালন ও সংহার কর। গন্ধর্ব্বতন্ত্র শক্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

যা শক্তি সর্ব্বভূতানাং জগচ্চৈতন্যরূপিণী।
সা এব হি জগৎ সর্ব্বং সা এব পরমাকলা।
তস্যাঃ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিঃ জায়তে লীয়তে সদা।

অর্থাৎ, চৈতন্যরূপিণী সর্ব্বভূতের যে শক্তি, তিনিই জগৎ, তিনিই পরাবিদ্যা। তাঁহা হইতেই জগদাদির পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও লয় হইতেছে।

পুরাণেও শক্তির উল্লেখ আছে,—

আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
করোমি চ যয়া সৃষ্টিং যয়া ব্রহ্মাদি দেবতা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

ভগবান্ বলিতেছেন আমার শক্তিই আদ্যা। ইহা দ্বারাই আমি সৃষ্টি, পালন ও সংহার করি, ইহা দ্বারাই ব্রহ্মাদি দেবতার উৎপত্তি।

অতএব আমরা দেখিতেছি আদ্যা, পুরুষ ও শিব—এই তিনই অনাদি,

নিত্য, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত ; এবং মায়া, প্রকৃতি ও শক্তি—এই তিনই অনাদি, গুণময়ী, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী ও নানারূপধারিণী। এখন ইহাদের মধ্যে কি বৈসাদৃশ্য আছে তাহাই আলোচ্য। আত্মা ও শিবে কোন প্রভেদ নাই। কারণ, উভয়েই এক ও অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ সেরূপ নহেন, তিনি বহু। গৌড়পাদ সম্ভবতঃ এই মতাবলম্বী ছিলেন না, কারণ, ১১ কারিকার ভাষ্যে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "একমব্যক্তং তথা পুমানপ্যেক:" অর্থাৎ, প্রকৃতিও এক, পুরুষও এক, বহু নহেন।

মায়া, প্রকৃতি এবং শক্তির মধ্যেও কিছু বৈষম্য আছে। মায়া "সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়া"—সৎ নহেন অসৎও নহেন। কিন্তু প্রকৃতি ও শক্তি সৎ ও নিত্য। বেদান্ত বলেন মায়া ব্রহ্মের শক্তি ; ব্রহ্ম হইতে ইহার স্বতন্ত্র বা স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম কখনো বা এই শক্তির ব্যবহার করেন এবং কখনো বা ইহা তন্মধ্যে বিলীনা থাকে। তিনি শক্তিযুক্ত হইয়া যে সকল অলীক পদার্থ বা স্বপ্নের সৃষ্টি করেন তাহাই এই জগদাদি। এবং শক্তির প্রত্যাহার করিলে, এই স্বপ্নেরও অবসান হয়। অতএব শক্তিটি একবার আসিতেছে ও একবার যাইতেছে,--পর্য্যায়ক্রমে সক্রিয়ও নিষ্ক্রিয় (active and latent) ভাব ধারণ করিতেছে,—অর্থাৎ, বরাবর একরূপে থাকে না, সুতরাং ইহাকে সৎ বলা যায় না। আবার ইহা অনাদি ও অনন্ত, সুতরাং অসৎও বলা যায় না। সাংখ্য ব্রহ্ম বা পরমেশ্বররূপ একটী চরম পদার্থ স্বীকার করেন না। পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটিই তাঁহাদের চরম। দুইটিই পরস্পর স্বাধীন এবং দুইই নিত্য। তন্ত্রের শক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী, অতএব নিত্য। বেদান্তর্গত দেবীসূক্তে ও কেনোপনিষদে, পুরাণে এবং তন্ত্রে যে যে স্থানে দেবীর উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানেই ইনি ব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বচন উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল দেব্যুপনিষদের নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি ইহার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে,—

"সর্ব্বে বৈদেবাঃ দেবীং উপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবি ? সাব্রবীৎ অহং ব্রহ্ম-স্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতি পুরুষাত্মকং জগৎশূন্যাঞ্চাশূন্যঞ্চ অহম্ আনন্দানানন্দাঃ অহংবিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্ম ব্রহ্মাণী বেদিতব্যে

ইত্যাহাথর্ব্বশ্রুতিঃ ....এষাত্মশক্তিং এষা বিশ্ববিমোহিনী।" অর্থাৎ, সকল দেবতা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে"? তিনি বলিলেন "আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমা হইতেই এই প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ, শূন্য ও অশূন্য উৎপন্ন হইয়াছে। আমিই আনন্দ অনানন্দ, জ্ঞান অজ্ঞান, ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা।" অথর্ব্ববেদ ইহা বলিয়াছেন · ইনিই আত্মার শক্তি, ইনিই বিশ্ববিমোহিনী।

একই চরমতত্ত্ব বিভিন্নভাবে গ্রহণ করাতে মতের বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম সাংখ্য মতটি চিন্তা করিলে দেখা যায় যে সাংখ্য যদি ব্রহ্ম বা সর্ব্বনিয়ন্তা এক পুরুষের স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে অনেক কুটিল যুক্তি ও অসার তর্কের অবতারণা করিয়া স্বমত পোষণের জন্য তাঁহাকে বৃথা প্রয়াস পাইতে হইত না। তাঁহার পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, উদাসীন, কিন্তু তিনিই একমাত্র চিৎ বা জ্ঞাতা। প্রকৃতি জড়। প্রকৃতির উপর পুরুষের কোন শক্তি বা প্রভাব নাই, অথচ জড় প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবার অন্য কোন নিয়ন্তাও নাই। তবে প্রকৃতির বিকার বা পরিণাম কিরূপে হয়? কে তাহাকে পরিণামিত করিয়া এই বৈচিত্রময় জগদাদি উৎপাদন করে? সাংখ্য উত্তর করেন প্রকৃতি স্বতঃই পরিণাম প্রাপ্ত হয়; যেমন অচেতন দুগ্ধ বৎস পোষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় এবং পোষণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পুরুষের ভোগও মোক্ষ সাধনের জন্য অচেতন প্রকৃতি মনোহর জগদাদির বিস্তার করে এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজন, পুরুষ দ্রষ্টৃরূপে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত না হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় না। কেন? যদি কোন দর্শক না থাকে তবে কি নর্ত্তকীর নাচিবার প্রবৃত্তি হয়, তাহার মনোমুগ্ধকর বিচিত্র কৌশল দেখাইবে কাহাকে? কিন্তু সাংখ্য এ সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা হইতে পুরুষ যে কেবল দ্রষ্টা ও উদাসীন তাহা প্রমাণিত হয় না, বরং প্রকৃতির উপর যে তাঁহার আধিপত্য (Control) আছে ইহাই সিদ্ধ হয়। মনে করুন চৌম্বক ও লৌহের দৃষ্টান্ত। সাংখ্য বলেন চৌম্বকের সান্নিধ্য বশতঃ যেমন লৌহ ক্রিয়াশীল, সেইরূপ পুরুষের সান্নিধ্যেই প্রকৃতি ক্রিয়াযুক্ত। জিজ্ঞাস্য এই লৌহের ক্রিয়াশীলতা কি চৌম্বকের শক্তির উপরই নির্ভর করিতেছেনা? চৌম্বকের শক্তি বশতঃই লৌহের এই গুণ জন্মে, কেবল

সান্নিধ্যবশতঃ নহে। চৌম্বক যদি কোন শক্তি বিস্তার না করিয়া কেবল লৌহের নিকটে থাকিত, তাহা হইলে লৌহের ঐ গুণ জন্মিত কি? আবার ধরুন পঙ্গু ও অন্ধের দৃষ্টান্ত। পুরুষ চক্ষুষ্মান্ কিন্তু পঙ্গু, প্রকৃতি অন্ধ কিন্তু হস্তপদবিশিষ্ট। দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি কেবল অন্ধের স্কন্ধে চাপিয়াই থাকেন, কোন্ পথে যাইতে হইবে ইত্যাদি বলিয়া না দেন, তাহা হইলে অন্ধ ঠিক পথে চলিতে পারে কি? কিন্তু প্রকৃতি যেখানে যেটি দরকার সেখানে সেইটি সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ ঠিক পথে চলিয়াছেন তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এই দৃষ্টান্ত হইতেও প্রমাণিত হয় যে, পুরুষ প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। গৌড়পাদ ২১ কারিকার ভাষ্যে আর একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন "যেমন স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে সন্তানোৎপত্তি, সেইরূপ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে সকল পদার্থের উৎপত্তি।" ভাল, জিজ্ঞাসা করি স্ত্রীর রজঃই কি কেবল সন্তানোৎপত্তির কারণ, তাহা কি পুরুষের শুক্রের অপেক্ষা করে না? তবে পুরুষের কোনও প্রভাব (influence) নাই, কিরূপে বলিব? পুরুষের বহুত্বও সাংখ্য এবম্বিধ যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুরুষ বহু, কারণ পুরুষ এক হইলে, একটী জীবের জন্ম, মৃত্যু বা সুখ দুঃখে সকল জীবেরই জন্ম মৃত্যু বা সুখ দুঃখ হইত। এরূপ যুক্তির মূল্য আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা দেখিতেছি সকল ঘটেই এক আকাশ (Ether) বা একই বায়ু বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কই, আমার ঘরের কলসীটি ভাঙ্গিয়া গেলে, পৃথিবীর যেখানে যত কলসী আছে সব ভাঙ্গিয়া যায় কি? একই সূর্য্যালোক নানা দর্পণে, গৃহে, পটে, প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি একখানি দর্পণের বিকারে যাবতীয় দর্পণ, পট প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়? পুরুষ বা আত্মা নিঃসঙ্গ ও নির্ব্বিকার, সুতরাং—উপাধির বিকারে তাঁহার বিকার হইবে এরূপ অনুমান করা কি যুক্তি সিদ্ধ? এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে সাংখ্য "পুরুষ" শব্দে আত্মাকে লক্ষ্য করেন নাই, আত্মার আভাস বা জীবই তাঁহার লক্ষ্য।

ব্রহ্ম এক। তাঁহার দুইটি ভাব আছে। একটী নিশ্চল, নির্গুণ, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, বা শিবভাব। অপরটি সচল, সগুণ, সক্রিয় বা শক্তি ভাব। এই দুই ভাবই সব,—সর্ব্বত্র এই দুইটি বিরাজিত। ইহাই চরম তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি

সাংখ্য কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। এখন বেদান্ত ও তন্ত্রের কথা। বেদান্ত প্রথমোক্ত বা নির্গুণ ভাবটিকেই একমাত্র সৎ বা সত্য বলিয়াছেন এবং দ্বিতীয় ভাবটিকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্র এই দুই ভাবই একত্র এক সঙ্গে দেখিতে চান। তাই তাঁহার শক্তি, "ব্রহ্মস্বরূপিণী" এবং তাঁহার কল্পিত মূর্ত্তি শিবযুক্ত শক্তি বা শক্তিযুক্ত শিব। তিনি যে কুণ্ডলিনী রূপিণী শক্তির ধ্যান করেন, তাহাও সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন। তাঁহার শক্তি বিদ্যাও অবিদ্যা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সাকার ও নিরাকার উভয়ই। তিনি ভুক্তি—মুক্তি প্রদায়িনী, ভোগও মোক্ষ দুইই তাঁহার করায়ত্ত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের চতুর্থোল্লাসের চতুর্থ শ্লোকের টিপ্পনীতে আগম রহস্যবেত্তা শ্রদ্ধেয় ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন"—আদ্যাশক্তি শব্দে তুরীয় ব্রহ্মযুক্ত মূল প্রকৃতি। ইনিই মায়া, মহামায়া, কালী, মহাকালী, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি নামে উপাসিতা হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও মায়া পরস্পর পৃথক নহেন। যদি উভয়কে পৃথক্ করা যাইত, তাহা হইলে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকাতে তিনি জড়পদার্থ মধ্যে এবং শক্তির চৈতন্য না থাকাতে তিনিও জড় পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতেন। শক্তি ও ব্রহ্ম উভয়ের অ-বিনা-ভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ শক্তি-বিরহিত-ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-বিরহিত শক্তি থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মের উপাসনা করিবার সময় শক্তিযুক্ত ব্রহ্ম লক্ষিত হয়েন, এবং শক্তির উপাসনা করিবার সময় ব্রহ্মযুক্ত শক্তি লক্ষিত হয়েন। সুতরাং ব্রহ্মের উপাসনা বা শক্তির উপাসনা ভিন্ন নহে: কারণ, ব্রহ্মসমবেত শক্তি ও শক্তিসমবেত ব্রহ্ম একই কথা।"

আমরা যাহা দেখিলাম তাহা হইতে মোটামুটি এইরূপ বলা যাইতে পারে;—সাংখ্য প্রধানতঃ ব্রহ্মের সক্রিয় ভাবটিই দেখেন, বেদান্তের নিষ্ক্রিয় ভাবটির প্রতি দৃষ্টি এবং তন্ত্র এই দুই ভাবই যুগপৎ দেখিয়া থাকেন। এই বিভিন্নতা হেতু ইঁহাদের সাধন প্রণালীর ও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অবশ্য জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা মুক্তি সাধন—তিনেরই লক্ষ্য, কিন্তু যে উপায়ে এই মুক্তি লাভ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাংখ্য বলেন প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানেই মুক্তি। এই ভেদ জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? যত দিন না

পুরুষ সমগ্রা প্রকৃতিকে জানিতে পারেন ততদিন তিনি প্রকৃতি হইতে যে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ এ জ্ঞান তাঁহার জন্মিতে পারে না। অতএব চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব (প্রকৃতি এবং ইহার ত্রয়োবিংশতি বিকার) জানিতে পারিলেই, পুরুষ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৈবল্য লাভ করিতে পারেন। নর্ত্তকীর সকল কৌশল, সকল হাব ভাব যখন দেখা হইয়া গিয়াছে, তখন "পুরুষ আর কি দেখিব" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লন, এবং প্রকৃতিও "আমার তো সবই দেখিয়াছে" এই ভাবিয়া নিবৃত্তা হন। তাহা হইলে সাংখ্যের মতে প্রকৃতি এবং ইহার যাবতীয় বিকৃতির জ্ঞানই মুক্তির উপায়। এই "জ্ঞান" শব্দের অর্থ কি? পুস্তক পাঠ বা যুক্তি বিচার দ্বারা ক্ষিত্যপ্তেজ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় না। অপরোক্ষানুভূতিই (direct experience) প্রকৃত জ্ঞান। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার ও মহৎ—এই সকল তত্ত্বর দ্বারা নির্ম্মিত, বিভিন্ন ও ক্রম সূক্ষ্ম কতকগুলি লোক (planes) আছে যথা ভূলোক (Physical plane), ভুবর্লোক (Astral plane), স্বর্লোক ও মহর্লোক (Devachanic plane), জন ও তপঃ লোক (Buddhic plane) সত্যলোক (Nirvanicplane), বৈকুণ্ঠ ও গোলক (Para-nirvanic and Mahaparanirvanic planes)। প্রকৃতি এবং ইহার যাবতীয় বিকারের দ্বারাই এই লোকগুলি নির্ম্মিত। অতএব এই সকল বিভিন্ন ভুবন বা Planes এর সম্পূর্ণ জ্ঞান না হইলে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান হইয়াছে বলা যায় না। অর্থাৎ, যখন পুরুষের ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাতব্য থাকিবে না—যখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইবেন, যখন নর্ত্তকীর সকল মূর্ত্তি ও ভাব তিনি দেখিয়া লইবেন, তখন তাঁহার কৈবল্য লাভ হইবে। বলা বাহুল্য সাংখ্যে ভক্তির কোন স্থান নাই, ভক্তির কথা উঠিতেই পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

বেদান্তাভাস।

গীতি—আত্মতত্ত্ব।

কেমনে চিনিব তোমায় ওহে দীন দয়াময়।
ভ'জে তোমায় লাভ কি আমার, আমি কি তুমি নিশ্চয়॥

না জানি কি লীলাচ্ছলে,
তুমি ব্রহ্ম বহু হলে,
তাই কি দেখাইয়ে দিলে,
"আমি" আত্ম-পরিচয়॥ ১॥

কোটি কল্প কাল হইতে,
(আমি) ভ্রামামান চৌরাশিতে *
বদ্ধ নিদারুণ যেমন,
রাশিচক্রে গ্রহচয়॥ ২॥

মায়াবশে অভিমানে,
আমি এই দেহ জ্ঞানে,
ভুলে গেছি তুমি—"আমি,"
(এখন) মিটে না মনে সংশয়॥ ৩॥

"দুর্ম্মতির" কি সে দিন হবে,
ভেদ বুদ্ধি নাহি র'ব,
সেই "আমি" এই স্মৃতি,
পুনরায় হবে উদয়॥ ৪॥

শ্রীমতিলাল রায়।

---

* চৌরাশিতে অর্থাৎ চৌরাশি লক্ষ যোনিতে।

রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী।

সম্বন্ধ তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণই বেদ শাস্ত্রের সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়; কর্ত্তব্য শ্রবণাদি সাধন ভক্তি অভিধেয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়; আর ভক্তিফলরূপ প্রেমই প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ। শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপ্রাপ্তির গৌণ সাধন শ্রবণাদিভক্তি ও মুখ্য সাধন প্রেমই বেদাদি শাস্ত্রের প্রধান সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন। ঐ তিনের জ্ঞান হইলে, মায়াবন্ধন আপনা হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বেদের মুখ্য সম্বন্ধ পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে;—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচন ব্যাত করং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥"

চরাচর জগতের মোহনার্থ বিবিধ পুরাণ ও আগম বিরচিত হইয়াছে, তত্তন্নিরূপিত দেবতা সকলও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন; কল্পকাল পর্য্যন্ত এই রূপই হউক, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যায় না; কারণ নিখিল শাস্ত্রের বিচার প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে এক মাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া নিশ্চিত হয়েন।

বেদশব্দসকল গৌণবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তি দ্বারা এবং বেদবাক্যসকল অন্বয় সম্বন্ধ ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ দ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বেদের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যবসায়িনী। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্‌বেদ কশ্চন॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্
মায়া মাত্র মনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥"

শ্রুতি কর্ম্ম কাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্র বাক্য দ্বারা কাহার অভিধান করেন, এবং জ্ঞান কাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন, এই সকল অভিপ্রায় আমি ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই দেবতারূপে অভিধান করেন, এবং আমাকেই তর্ক করিয়া নিরাকরণ করিয়া থাকেন। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, প্রথমতঃ মায়ামাত্র জগতের নিষেধ পূর্ব্বক, মধ্যে আমার অবতারাদিরূপ ভেদের অনুবাদ করণান্তর, অন্তে, অঙ্কুরগত রস যেমন কাণ্ড শাখাদিতে প্রসৃত হয়, তেমনি, প্রণাবার্থভূত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কাণ্ড শাখাদিতে অনুসৃত বলিয়া, নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত অর্থাৎ কালিক পরিচ্ছেদরহিত বা বিভু, দৈশিক পরিচ্ছেদ রহিত বা নিত্য এবং বস্তু পরিচ্ছেদ রহিত বা পূর্ণ। তাঁহার বৈভবও অনন্ত। সৎ চিৎ ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। শক্তি ও শক্তিকার্য্য সকলই তাঁহার বৈভব। তাঁহার শক্তিসকল প্রধানতঃ ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়া থাকেন। উক্ত ভাগত্রয় যথা,—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি তাঁহার স্বরূপেরই অন্তর্গত অর্থাৎ বাচক বলিয়া চিচ্ছক্তিকে স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা-শক্তিও বলা যায়। মায়াশক্তি তাঁহার স্বরূপে না থাকিয়া তাঁহার স্বরূপের বাহিরে অর্থাৎ স্বরূপ বহিশ্চর জীবশক্তিতেই থাকিয়া তাঁহার স্বরূপের লক্ষক হয়েন বলিয়া মায়া শক্তিকে বহিরঙ্গাশক্তিও বলা যায়। আর জীবশক্তি তাঁহার স্বরূপ শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপশক্তির এবং মায়াশক্তির সঙ্গে থাকিয়া স্বরূপের লক্ষক হয়েন বলিয়া জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তিও বলা যায়। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড সকল তাঁহার শক্তি কার্য্য। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বরূপশক্তির কার্য্য এবং ব্রহ্মাণ্ডসকল তাঁহার জীবশক্তি ও মায়াশক্তির কার্য্য। স্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্য্য এই তিনের তিনিই এক মাত্র আশ্রয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
ক্রীড়দ্ যদুকুলাম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে॥"

দশম স্কন্ধে শক্তিরূপ ভক্তগণের আশ্রয়-স্বরূপ-বিগ্রহ-ধারী পরমানন্দময় যদু-কুলসাগরে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দশম লক্ষ্য বস্তু বর্ণিত হইতেছেন। অতঃপর, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব। তিনি সকলের আদি, সকলের অংশী। তিনি কিশোর শেখর। তিনি চিদানন্দ বিগ্রহ সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বেশ্বর।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি পরিপূর্ণ, সুন্দর-স্বপ্রকাশ —সুখমূর্ত্তি, গোপালনলীন, যাদবদিগের অগ্রাহ্য অর্থাৎ দেবতা, ব্রজবাসীদিগের গ্রাহ্য অর্থাৎ নিজ জন এবং কারণ সকলেরও কারণ।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলাং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

ইতি পূর্ব্বে যে সকল অবতারের নাম কীর্ত্তিত হইল, এবং পরেও যে সকল অবতারের নাম কীর্ত্তিত হইবে, তাঁহাদিগের কেহ বা পুরুষের অংশ, কেহ বা পুরুষের কলা; কিন্তু বিংশতিতম অবতারে যাঁহার নামোল্লেখ হইল, সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, পুরুষের অংশ বা কলা নহেন, অংশী। নারায়ণ ও ভগবান্, অতএব পুরুষের অংশী, ইহা সত্য কিন্তু নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অর্থাৎ নারায়ণের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা হইতে সিদ্ধ বলিয়া গৌণ এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া মুখ্য জানিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত অবতারসকল যুগে যুগে অসুরগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত লোকসকলকে সুখী করিয়া থাকেন।

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানীর সম্বন্ধে জীবাতিরিক্ত বিশেষণ-প্রকাশ-রহিত শুদ্ধ বিশেষ্যরূপ ব্রহ্মস্বরূপে, যোগীর সম্বন্ধে অন্তর্যামিত্বাদি মায়িক বিশেষণ প্রকাশযুক্ত পরমাত্মস্বরূপে ও ভক্তের সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তি সমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। ঐ অদ্বয় জ্ঞানরূপ তত্ত্ব নির্বিশেষ-প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগিগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন; আর সর্বশক্তি সমন্বিতরূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলেন। নির্বিশেষ-প্রকাশ-রূপ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। সূর্য্য যেমন লোকদৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময় রূপেই দৃষ্ট হয়েন, মূর্ত্তরূপে দৃষ্ট হয়েন না।

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি।
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্॥
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং।
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥"

যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি বিভূতি ভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম যে প্রভুর অঙ্গকান্তি, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারও আত্মা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মন ম্।
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥"

এই কৃষ্ণকে তুমি আত্মার আত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও, জগতের হিতার্থ যোগমায়া দ্বারা দেহধারী জীবের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

"অথ বা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনস্থিতোজগৎ॥"

অথবা হে অর্জ্জুন, তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন নাই; আমি একাংশ দ্বারা অর্থাৎ আমার একাংশরূপ পরমাত্মা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

জ্ঞান যোগাদি দ্বারা শ্রীভগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তি সমন্বিত আবির্ভাবের অনুভব হয়, কিন্তু ভক্তি দ্বারা তাঁহার পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে। তাঁহার একই বিগ্রহে অনন্তরূপের প্রকাশ হয়। ঐ অনন্তরূপ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। উক্ত তিন ভাগ

যথা;—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ। স্বয়ংরূপের আবার স্বয়ং ও প্রকাশ এই দুই রূপে স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপের লক্ষণ যথা,—

"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।"

যে রূপ অনন্যাপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই স্বয়ংরূপ। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। ঐ স্বয়ংরূপ যদি যুগপৎ অনেকত্র প্রকট হইয়াও বহুত্ব প্রতীতি উৎপাদন না করিয়া একত্ব প্রতীতিই উৎপাদন করেন, তবে তাঁহাকে প্রকাশ বলা হয়। প্রকাশ স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক নহেন, স্বয়ংরূপই।

"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎ স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

এক রূপের যুগপৎ অনেক স্থানে সকল প্রকারে তৎস্বরূপে প্রাকট্য হইলে, ঐ রূপের ঐ প্রাকট্যকেই প্রকাশ বলা যায়। ঐ প্রকাশ কোন রূপ ভেদের মধ্যে গণ্য হয়েন না; কারণ, উহা কোন অংশেই স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্ নহেন। ঐ প্রকাশ আবার মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। তন্মধ্যে মুখ্য প্রকাশকেই প্রকাশ বলা যায় এবং গৌণ প্রকাশকে বিলাস বলা যায়। আর দেবকীবাসে ও মহিষীবিবাহে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ, তাঁহাকেই মুখ্য প্রকাশ বলা যায়। আর দেবকীনন্দনে, বলদেবে ও নারায়ণে তাঁহার যে প্রকাশ, তাঁহাকেই গৌণ প্রকাশ বলা যায়। যে প্রকাশে আকৃত্যাদির অভেদ হেতু স্বয়ংরূপের সহিত ঐক্য প্রতীতি উৎপাদিত হয়, তাঁহাকেই মুখ্য প্রকাশ বলা যায়। এ নিমিত্ত দ্বিভুজ দেবকীনন্দনকে মুখ্য প্রকাশই বলা উচিৎ। আর যে প্রকাশে আকৃত্যাদির ভেদ হেতু স্বয়ংরূপ হইতে পার্থক্য প্রতীতি উৎপাদিত হয়, তাঁহাকেই গৌণ প্রকাশ বলা যায়।

এই নিমিত্ত দেবকীনন্দন চতুর্ভুজ হইলে, তাঁহাকে গৌণ প্রকাশই বলা উচিত। এই গৌণপ্রকাশ বা বিলাস আবার বৈভব ও প্রাভব ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। যে গৌণপ্রকাশে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি প্রকটিত হয়, তাঁহাকে বৈভবপ্রকাশ এবং যে গৌণ প্রকাশে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি প্রকটিত হয়, তাঁহাকে প্রাভব প্রকাশ বলা যায়। দেবকীনন্দন ও বলদেব প্রভৃতি দ্বিভুজ মূর্ত্তিসকল বৈভব প্রকাশ এবং শ্রীনারায়ণাদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তিসকল প্রাভব প্রকাশ। উক্ত বৈভব ও প্রাভব সংজ্ঞক দ্বিবিধ গৌণ প্রকাশই তদেকাত্মরূপের অন্তর্ভুক্ত।

"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভি রন্যাদৃক্‌সতদেকাত্মরূপকঃ॥"

যে রূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়াও আকৃত্যাদি দ্বারা অন্যাদৃশ অর্থাৎ অন্যের ন্যায় প্রকাশ পান, তাঁহাকেই তদেকাত্মরূপ বলা যায়। এই তদেকাত্মরূপকে কায়ব্যূহ বলিলেও বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশকে কিন্তু কায়ব্যূহ বলা যায় না; কারণ, তাঁহার মুখ্য প্রকাশ কোন রূপেই ভেদ বুদ্ধি উৎপাদন করেন না। তদেকাত্মরূপ কায়ব্যূহের ন্যায় কোন না কোন অংশে ভেদপ্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ কায়ব্যূহ হইলে, তদ্দর্শনে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণকুশল নারদাদি ঋষিগণের বিস্ময় উৎপন্ন হইত না। শ্রীকৃষ্ণের গৌণপ্রকাশ বা বিলাসমূর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া নারদাদি ঋষিগণের বিস্ময় জন্মিতে দেখা যায় না।

তদেকাত্মরূপ আবার বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ, বিলাসের লক্ষণ যথা;—

"স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে।"

যে রূপ লীলা বিশেষ সম্পাদনার্থ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়াও শক্তিতে প্রায়ই মূলরূপের তুল্য, তাঁহাকেই বিলাস বলা যায়।

"একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥
যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥"

শ্রীকৃষ্ণ অনন্তরূপে প্রকাশ হইলেও, তাঁহার মূর্ত্তিভেদ স্বীকৃত হয় না। তাঁহার একই মূর্ত্তিতে অনন্ত মূর্ত্তির প্রকাশই স্বীকৃত হইয়া থাকে। তিনি অনন্তপ্রকাশে অনন্ত মূর্ত্তি হয়েন না, তাঁহার এক মূর্ত্তিই অনন্ত মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়েন। তাঁহার একই মূর্ত্তিতে বিবিধ আকার, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ অস্ত্র, বিবিধ বেশ ও বিবিধ ভাবাদি দৃষ্ট হয় এবং বিবিধ নাম শ্রুত হয়। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপে গোপবেশ ও গোপাভিমান এবং বিলাসাদিতে ক্ষত্রিয়াদিবেশ ও ক্ষত্রিয়াদি অভিমান হইয়া থাকে। স্বয়ংরূপে যাদৃশ সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও

বৈদগ্ধ্য অভিব্যক্ত হয়, বিলাসাদিতে তাদৃশ সৌন্দর্য্যাদি অভিব্যক্ত হয় না। স্বয়ংরূপের সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে বিলাসাদিরও ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের বিলাস গোলকে বলদেব, মথুরায় বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণের বিলাস বৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। গোলকে একমাত্র বলদেবরূপ ব্যূহের প্রকাশ। মথুরায় দুই ব্যূহের ও দ্বারকায় চারি ব্যূহের প্রথম এবং বৈকুণ্ঠে চারি ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশ হইয়া থাকে। উক্ত চারি ব্যূহ হইতে আবার অনেক ব্যূহের প্রকাশ শ্রবণ করা যায়। এই বিলাস উক্ত হইল। অতঃপর স্বাংশ বলা হইতেছে। স্বাংশের লক্ষণ যথা ;—

"তাদৃশো ন্যূন শক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।"

যিনি বিলাস সদৃশ হইয়াও বিলাসাপেক্ষা ন্যূন শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকেই স্বাংশ বলা হয়। সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার সকল এবং মৎস্যাদি লীলাবতার সকল স্বাংশের মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকেন।

অনন্তর আবেশ বলা হইতেছে। আবেশের লক্ষণ যথা,—

"জ্ঞান শক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টোজনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥"

শ্রীভগবান্ জ্ঞানশক্ত্যাদির অংশ দ্বারা যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগকেই আবেশ বলা যায়। পৃথু, ব্যাস ও সনকাদি আবেশ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। অনন্তর শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাবতার সকল উক্ত হইতেছেন। শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাবতার আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও, উহা অসম্ভব নহে; কারণ, অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হয় না। এই নিমিত্তই শ্রীভগবানের অবতার সকল সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সর্ব্বজনসমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। এই নিমিত্তই দর্শন ও বিজ্ঞান ঐ বদ্ধমূল অবতারের পোষকতা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই অবতারের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব অবতার যে কল্পনার সামগ্রী নহেন, উপেক্ষার বস্তু নহেন, উপহাসের বিষয় নহেন তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বিশেষতঃ বিশ্বের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ মঙ্গলই শ্রীভগবানেরই অবতারেই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

অতঃপর দেখা যাউক, শাস্ত্রসকল সেই সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মূলীভূত অবতার কাহাকে বলেন?—"বিশ্বকার্য্যার্থ শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার। ঐ অবতার কখন অলৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি নিরপেক্ষভাবে এবং কখন বা লৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি হইতেই হইয়া থাকে।" অংশাবতার, গুণাবতার ও আবেশাবতার ভেদে উক্ত অবতার ত্রিবিধ। অংশাবতার, পুরুষাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার ভেদে চতুর্ব্বিধ। গুণাবতার সত্বাদি গুণ ভেদে ত্রিবিধর্থ। আবেশাবতার শ্রীভগবদ: বিশ্ব ও তচ্ছক্ত্যাবেশ ভেদে দ্বিবিধ। উক্ত অংশাবতারাদি ত্রিবিধ অবতারের অধিকাংশই স্বাংশ বা আবেশ। যিনি স্বয়ংরূপ, তিনি কখন কখন ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার অবতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঐ স্বতন্ত্র স্বয়ংরূপের বিষয় পরে বলা হইবে। আপাততঃ দ্বারান্তর দ্বারা অবতরণই উক্ত হইতেছে। বিশ্ব কার্য্যার্থ ভগবান্ শেষশায়ী প্রভৃতি তদেকাত্মরূপ দ্বারা বা বসুদেবাদি ভক্ত দ্বারা অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। যে কার্য্যের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, ঐ কার্য্য কি কি শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন,—

"যদাযদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত:।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"
"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখন আমি আপনাকে প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়া থাকি। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

আদর্শাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভুক্ত অপর পক্ষের অনুপযুক্ততা যতই হউক না কেন, কর্ত্তব্যের সম্যক অনুষ্ঠান অবশ্যই হইতে হইবে; কারণ, অপর জন তাহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিল না বলিয়া আমি আমার নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কেন পরাঙ্মুখ হইব? সে বিধিভঙ্গের জন্ম কর্ম্মের নিকট জবাব দিবে, আমাদের পরস্পরের সাধারণ অবস্থাতে আরও ভঙ্গদোষ যোগ করিয়া উহাকে অধমতর করিবার আমার আবশ্যক নাই।

এই রূপে, হিন্দুর কর্ত্তব্যাদর্শ অনুসারে, সংরক্ষণ কার্য্যে রাজার কর্ত্তব্যাচরণের প্রত্যবায় হইলে ও তাঁহার প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন সম্বন্ধে কর্ত্তব্য প্রতিপালন হইতে প্রজাগণেরও অব্যাহতি নাই। ইহার কারণ এই যে, অন্যায় অন্যায়ের দ্বারা ব্যাহত না হইয়া ন্যায় দ্বারা ব্যাহত হইলে, উহা স্বল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে। বিশ্বের যাবতীয় নিয়ম কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির সহযোগীতা করে ও তাহাকে সুনিশ্চিত জয়লাভের পথে লইয়া যায়; অত্যাচারপ্রপীড়িত ব্যক্তির যাতনাসমূহ অত্যাচারকারীর বলবিক্রমের গুপ্তভাবে ক্ষয় সাধন করে, এবং যে নিয়ম দ্বারা দুর্জ্জন দণ্ডিত ও ধার্ম্মিকের পথ হইতে অপসারিত হয় সেই নিয়মের অব্যর্থ প্রতিক্রিয়া কেবল কর্ত্তব্যের অপ্রতিপালন হেতুই প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্ত্তব্য প্রতিপালন ঐশী কার্য্য প্রণালীর সহিত সমভাবাপন্ন, এবং যে ইচ্ছা হইতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, কে তাহা প্রতিরোধিত বা ব্যর্থ করিতে পারে?

স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের এই দুই প্রকার আদর্শের ইদানীন্তন অবস্থা কি রূপ, এবং উহাদের কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে?

পাশ্চাত্য প্রদেশে আধুনিক ব্যক্তিগণের মনোভাবের একটী গম্ভীর পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রভাবই এইরূপ পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। সার্ অলিভার্ লজ্ সম্প্রতি যেরূপ প্রমাণ করিয়াছেন তদনুসারে আধুনিক বিজ্ঞান একত্বের অভিমুখেই সম্যক গতি-প্রবণ। বিজ্ঞান উত্তরোত্তর প্রকৃতিরাজ্যের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ লাভ

করাতে বৈষম্যাবৃত সাম্যরশ্মির অস্ফুটাভাস উহার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। অধিকন্ত, পরিণতি প্রণালীর উপলব্ধি অনুসারে মানবজাতি একটী সাধারণ আদিপুরুষ-সম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন ও সমাজ একটী কৃত্রিম চুক্তির ফল না হইয়া একটী যান্ত্রিক পরিবর্দ্ধন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মনুষ্য যে অপর হইতে প্রাপ্ত আশ্রয় অবলম্বন করিয়াই জীবিত থাকে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে; "মনুষ্য আজন্ম স্বাধীন", কিন্তু এ কথার অর্থ কি? তিনি তাঁহার প্রাণটী পর্য্যন্ত রক্ষার জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিগণের উপকারাপেক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; জগতে দুগ্ধপোষ্য শিশু অন্যনিরপেক্ষ হইলে তাহার অবস্থা কেবল শোচনীয় হইত। যে সকল ব্যক্তি দ্বারা সামাজিক চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা ঐ চুক্তিবাদের উপযুক্ত হইবার জন্য অবশ্য প্রাপ্তবয়স হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞান দেখাইতেছে যে যাবতীয় ব্যক্তিই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা পরিবেষ্টিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হয় ঐ অবস্থাগুলির সহিত অবশ্য আপনার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে, না হয় অবশ্য উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে হইবে। প্রকৃতি স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না; তাঁহার বিধিসংহতি সকলের নিকট হইতেই বশ্যতা চাহিয়া থাকে, অথবা, তদপ্রাপ্তি হেতু, প্রতিরোধককে হনন করে। ঐ নিয়ম অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, এবং উহার প্রতিরোধ করিলেই প্রতিরোধকগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মানবজাতির সাধারণ আদিপুরুষের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে একটী সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রত্যভিজ্ঞা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং সাধারণ অধিকার বিশিষ্ট জনসমাজের জ্ঞান হইতে পরার্থে জীবনধাবণ ও কার্য্যকরণ জ্ঞানের সমুদ্ভব হইয়াছে। যখন সকল ব্যক্তিরই একটী সাধারণ উৎপত্তি স্থান আছে এবং যখন সকলেই একটী সাধারণ ভাগ্যসূত্রে আবদ্ধ, তখন পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করাই কর্ত্তব্য, এবং এই রূপে বিরোধ কার্য্যে সামর্থ্যের অপব্যয় না করিয়া পারস্পারিক অনুকূলাচরণ দ্বারা উন্নতিমার্গে অগ্রসর হওয়াই বিধেয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিদলিত করিতে বলাংশের ব্যয় না করিয়া, বলশালী ব্যক্তি যদি দুর্ব্বল ব্যক্তির ক্ষুদ্র বলে তাহার নিজ বল যোগ করে, তাহা হইলে সেই সংযোগ অধিকতর বলবৎ হইয়া থাকে। পরোপকারীতা ক্রমশঃ সম্প্রসারিত

হইয়া সর্ব্বসাধারণকে একবংশীয় পরিজনবর্গ স্বরূপ হৃদয়ে আলিঙ্গন করে, এবং পরহিতপরায়ণ বিশ্বপ্রেমিকের মহৎ নিদর্শনরূপী মানবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যিনি সকল বস্তুই সমভাবে দর্শন করেন এবং বলেন 'তুমি ও আমি একত্রে," আর "আমি একক" নহি।

ইহা হইতেই সমগ্র উপায়াদির বিধান; যদনুসারে সমাজ একটী মহাবংশ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং তত্রস্থ বালক ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের প্রতি কোনরূপ অন্যায়াচরণের চেষ্টা হইবার পরিবর্ত্তে উহারা আশ্রয়ভাজন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসাধুসেবক শর্ম্মা।

অলৌকিক ঘটনা।

দমদমা সবরেজেষ্টারী আফিস দমদমা ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনের সন্নিকট। বাবু গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সবরেজিষ্ট্রার। যে বাটীতে আফিস সেই বাটীতেই তিনি পরিবারবর্গের সহিত বাস করেন। দমদমা সবরেজিষ্ট্রারের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া যখন তিনি প্রথম এই বাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে বাটীর মধ্যে ইষ্টকখণ্ড প্রভৃতি পড়িতে আরম্ভ হয়। ইষ্টকখণ্ড সকল কোথা হইতে পড়ে—কে ফেলে—ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা হয়—কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হয়। নবাগত দেখিয়া ইহাঁদিগকে ভয়প্রদর্শন জন্য হয়ত কোন বদমায়েস লোক কোন স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া অদৃশ্যভাবে এইরূপে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করিয়া থাকে ভাবিয়া পুলিশে সংবাদ প্রেরিত হয়। সবরেজিষ্ট্রার গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী—তাঁহার বাটীতে উপদ্রব—সংবাদ পাইবামাত্র সসজ্জ পুলিশ আসিয়া উপস্থিত—চতুর্দ্দিকে পুলিশ প্রহরী—চতুর্দ্দিকে পল্লীস্থ লোকসমূহ আগ্রহসহকারে দণ্ডায়মান—দেখিবার জন্য, কে কোথা হইতে কি অভিপ্রায়ে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করে, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল—কেহ ধরা পড়িল না। পুলিশ আর কত পাহারা দিবে, পল্লীস্থ লোকদিগের আগ্রহই বা আর কত দিন থাকে। পুলিশ নিরাশ হইয়া

স্বস্থানে প্রস্থান করিল, লোকেরাও নিরস্ত হইল—কিন্তু ইষ্টকাদি পূর্ব্ববৎই পড়িতে লাগিল। এক রাত্রে রেজিষ্ট্রার বাবু গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন; বারান্দায় জনৈক ভৃত্য শুইয়াছে, সকল দরজা জানালা বন্ধ; গৃহমধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার কোন উপায় নাই। দরজার মৃদু আঘাতের শব্দে রেজিষ্ট্রার বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, চাহিয়া দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, ঘরের দরজা যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে; শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন তাঁহার মশারীর ভিতর একখানি এবং শয্যাতলে আর এক খানি চালের "খোলা" রহিয়াছে। সেই খোলা দুই খানি কে কিরূপে সেস্থানে রাখিল তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—চাকরকে নিদ্রা হইতে উঠাইলেন। সে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঘোর নিদ্রায় অচেতন ছিল, কিছুই বলিতে পারিল না, অধিকন্তু তাহার "ভূতের ভয়" আরও অধিক বাড়িল, সে আর নিদ্রা যাইতে পারিল না। রেজিষ্ট্রার বাবুও আর সে রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, নানারূপ চিন্তাতরঙ্গে তাঁহার মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে রজনী শেষ হইয়া আসিল।

আর এক দিন সন্ধ্যাকালে কতিপয় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন—এমন সময় অকস্মাৎ একটা বাঁশের আলনা,—যাহার উপর কয়েক খানি লেপ তুলিয়া রাখা হইয়াছিল,—ভয়ানক বেগে দুলিতে আরম্ভ হইল—বোধ হইতে লাগিল, প্রাচীর, ছাদ পর্য্যন্ত দুলিতেছে—যেন বা পড়িয়া যায়। সমাগত ব্যক্তি সকল দেখিয়া অবাক্—বিস্ময়াবিষ্ট।

উপর্য্যুপরি এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সকল দেখিয়া রেজিষ্ট্রার বাবু অতীব বিস্মিত ও প্রেতযোনী কর্ত্তৃক এই সকল অলৌকিক কার্য্য ঘটিতেছে ভাবিয়া বিলক্ষণ ভীত ও চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস "রাম নামে" ভূত পালায়। রেজিষ্ট্রার বাবু হিন্দু-ব্রাহ্মণ, জাতিধর্ম্ম অনুসারে বোধ হয় তিনি ভাবিয়া থাকিবেন যে দৈব অনুগ্রহ ব্যতীত এ উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভের অন্য আর সদুপায় নাই। তিনি স্বস্ত্যয়নাদি আরম্ভ করাইলেন। ক্রমে সকল উপদ্রব থামিয়া গেল। এখন তিনি নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত মনে সপরিবারে সুখে সেই বাটীতে বাস করিতে-

ছেন। এই ঘটনার বিষয় আমি তাঁহার নিজমুখ হইতে শুনিয়াছি এবং প্রতিবাসী অনেকেই দেখিয়াছেন, সুতরাং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়।

আর একটী ঘটনা। দমদমা ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে স্বর্গীয় মিঃ এ, এম্, বোসের "ফেয়ারীহল" নামক একটী বাগান বাটী আছে। এই বাগানকে দমদমার ছোট কুঠী বলে। এই বাগান অতি প্রাচীন। প্রথম ইংরাজ গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস এই বাগান বাটীতে বাস করিতেন। কোন কার্য্য বশতঃ আমি গত পূর্ব্ব সেপ্টেম্বর মাস হইতে কয়েক মাস ঐ বাগানে বাস করিয়াছিলাম। শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক আর এক ব্যক্তি আমার সহিত বাস করিতেন। ঐ বাগানের মধ্যে একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা আছে। সেই অট্টালিকার নিম্নতলস্থ একটী গৃহে আমরা উভয়ে শয়ন করিতাম। প্রায় প্রতি রাত্রেই আমরা শুনিতে পাইতাম যেন কোন লোক আসিয়া দ্বিতলস্থ একটী গৃহের দরজা খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশানন্তর চেয়ার টানিয়া বসিত এবং গৃহ মধ্যে ইতঃস্তত পাদচারণ করিতে থাকিত। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কিছুই দেখিতে বা মীমাংসা করিতে পারি নাই। মালীরা বলে এইরূপ বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। তাহারা কেহ ভয়প্রযুক্ত সে বাটীর মধ্যে শয়ন করে না। কিন্তু আমরা ভয়ের বিশেষ কোন কারণ দেখি নাই।

এই বাগানবাটীর তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, সাউথ দমদম মিউনিসিপালিটির ডাক্তার বাবুর উপর। সে ভার এখন তাঁহার উপর আছে কি না বলিতে পারি না। তিনি আমাদিগকে বিশেষ স্পষ্ট করিয়া কিছু না বলিয়া কেবল "সাবধানে" থাকিতে বলিয়াছিলেন। আমরা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিলাম কি জন্য তিনি আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ } কার্ত্তিক, ১৩১৫ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

মরণ ও মরণান্তে। *

আজ বহু শতাব্দির কথা। একদা ইংলণ্ডের জনৈক রাজা তদীয় অমত্যাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসিংহাসনোপরি বার দিয়া বসিয়া আছেন। ভগবান মরিচীমালী অস্তাচলেব চূড়াবলম্বন করাতে পশ্চিম গগন রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে! সুমন্দ সান্ধ্য সমীরণের মৃদুমধুর হিল্লোলে চতুর্দ্দিগস্থ বৃক্ষরাজি ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছে, অনতিদূরবর্ত্তী কুসুমিত উপবনের মনোহর কুসুমরাশির সুমধুর আঘ্রাণে রাজসভা আমোদিত হইয়াছে। এমন সময় একজন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক স্বীয় ধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে তথায় উপনীত হইলেন, এবং নানা কথোপকথনের পর যেই তিনি জীবের জন্ম, মৃত্যু ও আত্মার অমরত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের অবতারণা করিলেন, অমনি একটী পাখী উন্মুক্ত বাতায়ন পথে অকস্মাৎ সেই

* এই প্রবন্ধটী শ্রীমতী এনি বেসেণ্ট (Mrs. Annie Besant) প্রণীত "Death—and After ?" নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, করিয়া তাহার চতুর্দ্দিগে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া পরে তন্মুহূর্ত্তেই তথা হইতে বহির্গত হইয়া সেই অমানিশার গাঢ় ও গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল।

পাখীটী এইরূপে চলিয়া গেলে পর সেই খ্রীষ্টান পাদ্রী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! দেখলেনত, এইমাত্র পাখীটী গবাক্ষদ্বার দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, আবার নিমেষ মধ্যেই উড়িয়া উড়িয়া বাহিরে গিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল! মানবজীবনকেও এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া জানিবেন। আমাদের এই যে দেহ, ইহা একটী প্রকোষ্ঠ বিশেষ, তাহাতে জীবরূপ পাখী প্রবেশ করিয়া বাস করিতে থাকে, পরে সময়ে অচিরেই তাহা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যায়। তবে জীবপাখী অমানিশার তিমিরে না মিশিয়া দিবাকরকররাশির অত্যুজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ ও সুমধুর আভাযুক্ত সুমহান্ রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে।

জননীজঠররূপ ঘন তিমিরাচ্ছন্ন কক্ষ হইতে জন্মরূপ জানালাদ্বার দিয়া জীব ভূমিষ্ঠ হয়, হইয়া বৎসর কয়েক মাত্র এই ধরাধামে বিচরণ করে, পরে কাল পূর্ণ হইলে মৃত্যুরূপ মুক্ত বাতায়নপথে দৃষ্টিশক্তির বাহিরে চলিয়া যায়।

তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বী ও ধর্ম্মসম্প্রদায় ভুক্তই হওনা কেন, যখনই ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, তখনই সর্ব্বাগ্রে তোমার মনে স্বতঃ এই প্রশ্নগুলির উদয় হইবে;—"জীব কি?" "এই জীব কোথা হইতে আইসে?" ও "কোথায় চলিয়া যায়?"

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মজগতে ইত্যাকার প্রশ্নাবলির আন্দোলন আলোচনা বহুশতাব্দি যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। উক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত কেহ কেহ বলিতেছেন, মৃত্যুশঙ্কা তাঁহাদের মন হইতে অপনোদিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কোন আত্মীয় কুটুম্ব পরলোকগামী হইলে তাঁহারা শব সমাধির সময় যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাতে মৃত্যুজনিত আশঙ্কা যে তাঁহাদের মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে সেই মৃতদেহ কয়েক দিবস এক নিভৃত স্থানে রাখা হয়, এই স্থানটাকে এরূপ আবরণে আবৃত করা হইয়া থাকে যে দেখিলে মনে যুগপৎ ভয় ও বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়। পরে যে শব-যানে

মৃতদেহ সংস্কার ও সমাধিস্থ করার জন্ত সমাধিক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহা এইরূপ ভাবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আবরণে আচ্ছাদিত করা হয় যে দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। মৃতের রোরুদ্যমানা পত্নী শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আর্ত্তনাদ ও বিলাপ সহকারে উক্ত শববাহকের অনুগমন করেন। কৃত্রিম শোক প্রকাশের জন্ত ব্যবসাদার শোককারী লোকের সংগ্রহ করা হইয়া থাকে; তাহারা অস্বাভাবিক ও বিকৃতরূপে মুখব্যাদান করিয়া বাহ্যশোক প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সকল দৃশ্য বাস্তবিকই বিসদৃশ, হাস্যোদ্দীপক ও বিরক্তিজনক। অধুনাতন খ্রীষ্টানসমাজে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্ত্তন হওয়াতে এবং লোকের মনে মৃত্যু রহস্যের দ্বার কিয়ৎপরিমাণে উন্মুক্ত হওয়াতে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ সেই ভীতি উৎপাদক ও হাস্যোদ্দীপক পুরাতন শবসংস্কারের প্রথাগুলি ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে শব-শকট ভীতিপ্রদ কৃষ্ণবর্ণ মকমলের আবরণে আবৃত থাকিত, বর্ত্তমানে তাহার পরিবর্ত্তে এখন তাহা নয়নের প্রীতিপ্রদ সুগন্ধ কুসুমদামে সুসজ্জিত থাকে। যদিও সম্প্রতি তাঁহারা মৃত্যু-শোক পরিচায়ক শোক-বেশ ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর তজ্জন্য দেহকে কোনরূপ অস্বাভাবিক উপায়ে উৎপীড়িত ও ক্লিষ্ট করেন না। জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন হইতে ক্রমেই কুসংস্কারের বীজ উৎপাটিত হইয়া যাইতেছে। ইংরাজী সাহিত্যে ও ইংরাজী শিল্পে মৃত্যুর ছবি এইরূপ বিভীষিকাময় ভীষণাকারে চিত্রিত করা হইয়াছে যে, তাহাতে পাঠকের এবং দর্শকের ভয়ানক হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইংরাজ চিত্রকরগণের সূক্ষ্ম তুলিতে মৃত্যুর ছবি বড়ই ভয়ঙ্কর ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে—ঠিক যেন চামুণ্ড মূর্ত্তি! হস্তে করাল করবাল ঝিকিমিকি করিতেছে, বিস্তৃত মুখগহ্বরে নরকপাল ফেলিয়া তাহা ভীষণ দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিতেছে। কঙ্কালময় দেহ, ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল, উর্দ্ধদৃষ্টি! অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট শীর্ণহস্তস্থিত দণ্ডদ্বারা ঘোরার কাঁটা দোলাইতেছে!! যমের এই ভৈরবমূর্ত্তির প্রতি তাকাইলে ভয়ে শরীর শিহরিয়া উঠে।

ইংরাজ কবিগণ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে মৃত্যুর যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও কণ্টকিত

হয়!! আদর্শস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ কবি মিল্টনের গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"The other shape,
If shape it might be called, that shape had none
Distinguishable in member, joint, or limb,
Or substance might be called that shadow seemed,
For each seemed either, black it stood as night,
Fierce as ten Furies, terrible as hell,
And shook a dreadful dart what seemed his head
The likeness of a kingly crown had on.
Satan was now at hand, and from his seat
The monster moving onward came as fast,
With horrid strides; hell trembled as he stroke...
......So spoke the grisly terror; and in shape
So speaking, and so threatening, grew tenfold
More dreadful and deform
· · but he, my inbred enemy,
Forth issued, brandishing his fatal dart,
Made to destroy, I fled and cried out Death!
Hell trembled at the hideous name, and sighed
From all her caves, and back resounded Death." *

মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট জীর্ণশীর্ণ ও মুমূর্ষপ্রায় পাশ্চাত্য মানবসমাজে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অমৃতত্ব আনয়ন করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যমরাজের এরূপে ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিতে এ হেন মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত মতাবলম্বী-গণের যে এমন প্রবৃত্তি ও অভিরুচি হইয়াছে, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!

ন্যূনাধিক প্রায় উনিশ শত বৎসর হইল খ্রীষ্টানধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে মানবাত্মা যে অমর তাহার উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টানগণ বলেন, এই তত্ত্বটী প্রভু যীশুই সর্ব্বপ্রথমে মানব সমাজে আনয়ন ও প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি কি প্রকৃত? কখনই হইতে পারে না!

* Paradise Lost, Book II. from lines 666—789.

অতি প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের প্রচারিত সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দাও; তাহার বহু পরবর্ত্তী অথচ খ্রীষ্টধর্ম্মের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মিশর, পারস্য ও চীনদেশবাসীদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলেই খ্রীষ্টানদের পূর্ব্বোক্ত উক্তি যে একেবারে অসমীচীন ও অযৌক্তিক তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। মিশরদেশীয়দের "বুক অব্ দি ডেড্" (Book of the Dead) নামক পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থে মরণের পরে জীব পরলোকে কিরূপে প্রয়াণ করে, তাহার প্রসঙ্গ পাঠ কর, আত্মার অনবত্ব সম্বন্ধে জানিতে পারিবে। উক্ত গ্রন্থে লেখা আছে, মরণান্তে ধার্ম্মিক সাধুর জীবাত্মা এরূপ বলিয়া থাকে:—

ওহে ঈশ্বরের পার্ষদ সহচরগণ, আমার দিগে তোমাদের হস্ত প্রসারণ কর, যে হেতু আমিও তোমাদের সারূপ্য লাভ করিয়াছি।

হে ওসিরিস, আপনি জ্যোতিঃস্বামী অথচ নিরাময় ও নির্ব্বিশেষ তিমির হৃদয়ে মহদাশ্রমে আপনি বাস করিতেছেন, আপনাকে অভিবাদন করি। আপনার আত্মা পবিত্র হওয়াতে, আমি আপনার সম্মুখীন হইয়া হস্তদ্বয় আপনার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিতেছি।

আমি স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করি। মেম্পিসে আমি যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলাম তাহাই করিতেছি। আমি আমার হৃদয়ের জ্ঞান অবগত আছি। আমার ইচ্ছামাত্র আমার হৃদয়, আমার বাহুদ্বয় আমার জঙ্ঘাদ্বয় আমার বশে ও অধিকারে আসিয়াছে। এমেণ্টীর তোরণদ্বারে আমার আত্মা আমার দেহ-কারাগারে আবদ্ধ নহে।

মরণান্তে পরলোকে জীবাত্মার কার্য্যকলাপাদির বিস্তৃত বিবরণ এই

---

* O ye who make the escort of the God, stretch to me your arms, for I become one of you. (XVII 22)

, Hail to thee Osiris, Lord of light, dwelling in the mighty abode, in the bosom of the absolute darkness I come to thee, a purified soul ; my two hands are around thee. (XXI. 1)

I open heaven , I do what was commanded in Mamphis, I have knowledge of my heart , I am in possession of my heart, I am in possession of my arms, I am in possession of legs, at the will of myself My soul is not imprisoned in my body at the gates of Amenti (XXVI 5, 6) Book of the Dead.

গ্রন্থে বর্ণিত আছে ; তাহা হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিলে পাঠকের বিরক্তিকর হইবে আশঙ্কা করিয়া তাহাতে অন্তিমে পুণ্যাত্মার বিজয় ও মুক্তিলাভ সম্বন্ধে উপসংহারে যাহা লেখা আছে, কেবল মাত্র তাহারই উল্লেখ প্রচুর মনে করিলাম।

মৃতব্যক্তি দেবত্ব লাভ করিয়া নিম্নতর দেবলোকে দেবগণ সহ বাস করিবেন, ইনি কখনই পরিত্যক্ত হইবেন না। স্বর্গীয় মন্দাকিনীর স্রোতজল তিনি পান করিবেন। তাঁহার আত্মা কারাবদ্ধ হইবে না, কারণ যাহারা উক্ত আত্মার সংস্পর্শে আইসে, তাহারাই মুক্তিলাভ করে। কৃমিকীট তাহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না।

ধর্ম্মবীর যারাথুষ্ট্রা (Zarathuctra) যীশুখ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বে পারস্যদেশে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, এই ধর্ম্মকে যারাথুষ্ট্রীয়ান ধর্ম্ম কহে। এই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের নাম জেন্দাবেস্তা বা আবেস্তা (Avestra)। জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশদরূপে লেখা আছে।

সাধুগণের আত্মা প্রথম পদক্ষেপে হুমত নামক স্বর্গে উপস্থিত হয়, তৎপর দ্বিতীয় পদক্ষেপে হুখ্‌ত নামক স্বর্গে উপনীত হয়, তৃতীয় পদক্ষেপে হোরষ্ট নামক স্বর্গে উপনীত হয়। পরিশেষে কথিতাত্মা চতুর্থ পদক্ষেপে অক্ষয় জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইতঃপূর্ব্বে যে সাধু আত্মা পরলোকগামী হইয়াছেন, তিনি কথিত আত্মাকে এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, "হে মৃত সাধু আত্মা, তুমি শোণিতমাংসময় ভবন, পার্থিব বিষয় ও স্থূল জগৎ পরিত্যাগ করিয়া এখানে

---

* The defunct shall be deified among the Gods in the lower divine region, he shall never be rejected He shall drink from the current of the celestial river His soul shall not be imprisoned, since it is a soul that brings salvation to those near it The worms shall not devour it. (c XIV. 14-16) Book of the Dead

† The soul of the pure man goes the first step and arrives at (the Paradise) Humata . the soul of the one man takes the second step and arrives at (the Paradise) Hukhta ; it goes the third step and arrives at (the Paradise) Hoaist , the soul of the pure man takes the fourth step and arrives at the Eternal Lights.

সূক্ষ্ম অদৃশ্য জগতে উপনীত হইয়াছ, বিনশ্বর রাজ্য হইতে অবিনশ্বর রাজ্যে আসিয়াছ ; তুমি আছ কেমন ? তোমার মঙ্গল হউক !"

তচ্ছ্রবণে ভগবান অহুরা মজ্দ (ঈশ্বর) বলিলেন, "তাহাকে কোন কথা* জিজ্ঞাসা করিও না, কারণ দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদরূপ অতি ভীষণ ও দারুণ পথ অবলম্বনে এই জীব স্বর্গরাজ্যে আসিয়াছে। তাহাকে আবার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কি ?"

পারস্য ভাষায় ডেসাটির্ (Desatir) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ও সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবিগণের গ্রন্থে জীবাত্মার অমরত্ব ও অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ ও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রাণী মধ্যে মনুষ্যকেই আত্মার উপযুক্ত অধিকারী মনে করিয়া, সেই মুক্ত, মৌলিক, অপার্থিব এবং ক্ষুৎপিপাসাবর্জ্জিত সেই আত্মা প্রদান করিলেন, কালে ক্রমবিকাশে ও ক্রমোন্নতিতে মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও অপ্রমেয় বুদ্ধির সাহায্যে তিনি সেই আত্মাকে পার্থিব স্থূল দেহের সঙ্গে সংযোজিত করিলেন। যদি মানুষ তাহার পার্থিব দেহ ধারণ কালে সৎকার্য্য করে এবং ধর্ম্মপথের অনুসরণ করিয়া জ্ঞান লাভ করে তবে তাহাকে হার্টাস্প (Hartasp) কহে।

মানুষ স্থূল কলেবর পরিত্যাগ করা মাত্রই আমি (ঈশ্বর) তাহাকে দেবরাজ্য স্বর্গে লইয়া যাই, যাহাতে তথায় তাহার দেব সাক্ষাৎকার ও আমার দর্শন লাভ ঘটিতে পারে।

---

* To it speaks a pure one deceased before, asking it—How art thou O pure deceased, come away from the fleshy dwellings, from the earthly possessions, from the corporal world hither to the imperishable as it happened to thee—to whom hail.

Then speaks Ahura Mazda (God) · Ask not him whom thou asketh, (for) he is come on the fearful, terrible, trembling way, the separation of body and soul.

Zoroastrian and some other Ancient Systems XXVII. Translation by *Dhunjeebhoy Jamsetjee Medhora.*

কিন্তু মানুষ কথিতরূপে হার্টাস্প না হইয়া যদি জ্ঞানের অধিকারী হয় ও অধর্ম্ম এবং পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকে, তবে আমি (ঈশ্বর) তাহাকে দেবতাদের পদবীতে উন্নত করিয়া থাকি। প্রত্যেক মানুষ তাহার জ্ঞান ও পবিত্র ধর্ম্মভাবের অনুরূপ স্বর্গরাজ্যে ও নক্ষত্রমণ্ডলে জ্ঞানিগণের পদবী লাভ করিবেন এবং সেই আনন্দময় ধামে তিনি চিরকাল বাস করিবেন।

চীনদেশে পরলোকগত পিতৃপিতামহাদির আত্মার পূজা ও উপাসনা পদ্ধতি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে মৃত্যুর পরও যে জীবাত্মা অবিনশ্বর ও বর্ত্তমান থাকে এই বিশ্বাসও আবহমান কাল হইতে সেই দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সুকিং (Shuking) নামক গ্রন্থ চীন দেশের প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ জেম্‌স লেজ সাহেব (Mr. Jems Legge) বলেন, ইহাতে খ্রীঃ পূঃ ২৩৫৭ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৬২৭ বৎসর পর্য্যন্ত চীনদেশীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিবৃত আছে, তন্মধ্যে পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মা যে অবিনাশী ও তাঁহারা যে তাঁহাদের বংশধর[illegible] এবং চীন রাজ্যের হিতের জন্য সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ তাহাতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পান করঃ ১৪০১ হইতে ১৩৭৪ খ্রীঃ পূঃ পর্যান্ত চীনে রাজত্ব করেন তিনি তাহার প্রজাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

তোমাদিগকে প্রতিপালন ও পোষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার

---

* God selected man from animals to confer on him the soul, which is a substance free, simple, immaterial, *non compounded* and non-appetitive And that becomes an angel by improvement

By his profound wisdom and most sublime intelligence, he connected the soul with the material body

If he (man) does good in the material body, and has a good knowledge and religion he is *Hartasp*

As soon as he leaves this material body, I (God) take him up to the world of angels, that he may have an interview with the angels, and behold me. And if he is not Hartasp, but has wisdom and abstains from vice, I will promote him to the rank of angels Every person in proportion to his wisdom and piety will find a place in the rank of wise men, among the heavens and the stars. And in that region of happiness he will remain.

পূর্ব্বপুরুষগণ এখন অধ্যাত্মরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, আমি এখন তাঁহাদেরই বিষয় চিন্তা করিতেছি। যদি আমি এ মরজগতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বসবাস করত রাজ্যশাসনে ভ্রম প্রমাদ করি, তবে আমাদের বংশস্থাপয়িতা সেই মহা অধীশ্বর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কঠোর দণ্ড বিধান করিবেন, এবং বলিবেন, "কেন আমার প্রজাগণকে তুমি অযথা উৎপীড়ন করিতেছ?" তোমারা, অসংখ্য প্রজাবৃন্দ, যদি তোমাদের জীবন চিরস্মরণীয় করিতে যত্নবান না হও, যদি আমার সঙ্গে একমত না হও ও আমার রাজনীতি কুশলে অনুমোদন না কর, তবে পূর্ব্বতন ও পরলোকগত রাজাগণ তোমাদের এই পাপ কার্য্যের জন্য তোমাদের প্রতি কঠোর শাসনদণ্ড প্রেরণ করিবেন এবং বলিবেন "কেন তোমরা আমার নবীন বংশধরের সঙ্গে একমত না হইয়া পুণ্যলাভে বঞ্চিত হইতেছ?" যখন তাঁহারা স্বর্গলোক হইতে তোমাদের প্রতি দণ্ড বিধান করিবেন, তখন তাহা হইতে আর উদ্ধারের ও পলায়নের পথ থাকিবে না।

তোমাদের পরলোকগত পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ তোমাদিগকে এখন কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন ও তোমরা তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, এবং তাঁহারা তোমাদিগকে মৃত্যুমুখ* হইতে রক্ষা করিবেন না।

---

* Trans by Mirza Mohamed Hadi the Platonist, 306 "My object is to support and nourish you all. I think of my ancestors (who are now) the spiritual sovereigns. Were I to err in my Government, and remain long here, my high Sovereign (the founder of our dynasty) would send down on me great punishment for my crime and say, "Why do you oppress my people?" If you, the myriads of the people, do not attend to the perpetuation of your lives, and cherish one mind with me, the one man in one man, in my plans, the former kings will send down on you great punishment for your crime, and say, "why do you not agree with our younger grandson, but go on to forfeit your virtue?" When they punish you from above, you will have no way of escape . . your ancestors and fathers will now cut you off and abandon you, and not save you from death. The Sacred Books of the East III 109, 110 By Prof. Max Muller.

এই বিশ্বাস চীনদেশীয়দের মনে পুরুষানুক্রমে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া আসাতে মৃত্যুজনিত চিন্তা, ভয় ও বিভীষিকা তাহাদের মনে স্থান পায় না। মরণ সম্বন্ধে তাহারা বড় একটা ভ্রূক্ষেপ করে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ব্যগ্রং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতেহ্য মৃতং ততঃ॥

৮৫ শ্লো। ১২ শ অঃ। মনুসংহিতা।

ভৃগু বলিলেন:—এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহা সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান এবং ইহা হইতেই মোক্ষলাভ হয়।

খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বহু পূর্ব্বের অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে এইরূপ আরও শত সহস্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের ও বাইবেল প্রচারের বহু বহু শতাব্দি পূর্ব্বে পৃথিবীর নানা দেশে আত্মার অমরত্বের বিশ্বাস জনসমাজে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র।

আত্মার অমরত্বের বিশ্বাস খ্রীষ্টানধর্ম্ম বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত পোষণ করা সত্বেও কেন যে তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনে, সাহিত্য কাব্য গ্রন্থাদিতে এবং শিল্পাদি কার্য্যে মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ ভীষণ ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা এক বিষম রহস্য বলিতে হইবে। উক্ত ধর্ম্মে নরকে ও নরক-যন্ত্রনায় বিশ্বাস আছে বলিয়াই কি মৃত্যুর নামে তাহাদের এইরূপ আতঙ্কের কারণ! তাহা হইতে পারে না, কারণ চীনদেশীয় এবং প্রাচীন অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্মেও নরকে বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল ও আছে, কিন্তু কই? মৃত্যু সম্বন্ধে ত কথিত ধর্ম্মাদিতে এইরূপ কোন বিভীষিকার ভাব পরিলক্ষিত হয় না। এই ভাবকে ধর্ম্মগত না বলিয়া জাতিগত বলা যাইতে পারে। হইতে পারে আধুনিক য়ুরোপীয় পাশ্চাত্য জাতিসকল অপরিসীম শৌর্য্য ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হওয়াতে কাজেই মৃত্যুজনিত ক্লেশ ও শোক দুঃখাদি তাহাদের মনে ভীতি উৎপাদন করে এবং মরণের পর স্থূলদেহবিহীন অবস্থায় ধারণা করিতে ও তদ্দ্বারা যে কোনরূপ সুখানুভব হইতে পারে এরূপ ভাব আদৌ তাহাদের ধ্যান ধারণার অনভ্যস্ত মনে স্থান পাইতে পারে না; কাজেই মরণে তাহাদের এত আতঙ্ক! এত ভয়!!

অপর পক্ষে, প্রাচ্যজাতিসমূহ বাহ্য জগতের ক্রিয়াদিতে নিমীলিতনেত্র, অন্তর্জ্জগতের রহস্য ভেদে স্বতঃপ্রবৃত্ত, ধ্যানাদিতে চিরাভ্যস্ত এবং এই নশ্বর দেহের ইন্দ্রিয়াদি রিপুসমূহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট, কাজেই তাঁহারা মৃত্যু প্রসাদাৎ এই পার্থিব স্থূলদেহ হইতে বিমুক্ত ও উৎক্রান্ত হইয়া মুক্তিলাভ করত অবাধ চিন্তার অধিকারী হওয়াকে বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাই পাশ্চাত্য জাতি মৃত্যুকে এইরূপ শত্রুভাবে ও ভীতির চক্ষে এবং প্রাচ্যজাতি সুহৃদ্‌ভাবে ও প্রীতির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুদর্শন দাস।

শিব ও শক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বেদান্ত মতে ব্রহ্ম জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে সাধককে প্রথমতঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইতে হইবে। সাধন চতুষ্টয় কি? বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষা। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু এবং অপর সমস্তই অনিত্য—এই জ্ঞানই বিবেক। পার্থিব বা স্বর্গীয় যাবতীয় ভোগ্যবস্তু অনিত্য—এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে তত্তাবতের প্রতি যে অনাসক্তি আইসে তাহাই বৈরাগ্য। অতঃপর সাধককে ষট্ সম্পত্তি বা ছয়টি শক্তি লাভ করিতে হইবে—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। বিষয়ের চিন্তা হইতে মনের নিগ্রহ (Control of the mind) ইহাই শম। বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির সংযমের নাম দম। ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলেও তাহাদের পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মজ্ঞান বিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই প্রবৃত্তি দমনের নাম উপরতি। তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। গুরুবাক্যে বিশ্বাস-শ্রদ্ধা এবং চিত্তের একাগ্রতা—সমাধান। এই শক্তিগুলি কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত হইলে

শিষ্যের অন্তরে বলবতী মুমুক্ষা (মোক্ষেচ্ছা) জাগিয়া উঠে। তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। অগ্নিময় লৌহকটাহ মস্তকে স্থাপিত হইলে যেমন কোন ব্যক্তি সবেগে সলিলোদ্দেশে ধাবমান হয়, তিনিও সেইরূপ ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়া উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরু কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ দিয়া বলেন "বৎস, এই জগৎ প্রপঞ্চ সমস্তই মায়া—মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এবং "তত্ত্বমসি"—তুমিই সেই ব্রহ্ম।" তখন শিষ্য এইরূপে চিন্তা ও বিচার করিতে থাকেন :—

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ॥ ২।১।
অহো বিকল্পিতং বিশ্বং অজ্ঞানাৎ ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌবারি সূর্য্যকরে যথা॥ ২।৯।
মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা॥ ২।১০।
শরীরং স্বর্গ নরকৌ বন্ধ মোক্ষৌ ভয়ং তদা।
কল্পনা মাত্র মেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ॥ ২।২০।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্ত মায়াতু নমে বৃদ্ধির্ণমে ক্ষতিঃ॥ ৭।২।
ক ধর্ম্মঃ কচ বা কামঃ ক চার্থঃ ক বিবেকিতা।
ক দ্বৈতং কচ বা দ্বৈতং স্বমহিম্নি স্থিতস্যমে॥ ১৯ ২।
কোপদেশঃ কবা শাস্ত্রং ক শিষ্যঃ ক চবাগুরুঃ।
ক চাস্তি পুরুষার্থোবা নিরুপাধেঃ শিবস্যমে॥ ২০ ১০।

অষ্টাবক্র সংহিতা।

অর্থাৎ, আমি নিরঞ্জন, শান্ত, জ্ঞানস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত। এতকাল আমি মোহদ্বারা বিড়ম্বিত ছিলাম। যেমন শুক্তিতে রৌপ্য, রজ্জুতে সর্প এবং সূর্য্য কিরণে জল ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ আমাতেই এই বিশ্বের ভ্রম হইতেছে। যেমন কুম্ভ মৃত্তিকাতে, তরঙ্গ জলে এবং কটক (অলঙ্কার) স্বর্ণে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমাতেই লীন হইবে। শরীর, স্বর্গ, নরক, বন্ধন, মুক্তি, ভয়—এ সমস্তই

কল্পনা মাত্র। আমি চিৎ স্বরূপ। আমার এসকলে প্রয়োজন কি? আমি অনন্ত মহাসমুদ্র। জগৎরূপ তরঙ্গ স্বভাবতঃ আমাতে উত্থিত বা বিলীন হউক। ইহাতে আমার বৃদ্ধিও নাই, ক্ষয়ও নাই। আমি নিজ মহিমাতে (অর্থাৎ স্বরূপাবস্থায়) রহিয়াছি। অতএব আমার ধর্ম্মই বা কোথায়, অর্থই বা কোথায়, কামই বা কোথায় এবং দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি বিবেকিতা (ভেদ বুদ্ধিই) বা কোথায়? আমি নিরুপাধি শিব; অতএব আমার উপদেশ কোথায়, শাস্ত্র কোথায়, শিষ্য কোথায়, গুরুই বা কোথায়? এবং আমার পুরুষার্থই বা কি? এইরূপ চিন্তা ও বিচার করিতে করিতে জগৎরূপ কল্পনা তিরোহিত হয় এবং শিষ্য অদ্বৈত রসে নিমগ্ন হইয়া যান। অবশ্য এখানেও ভক্তির কোন অবসর নাই; কারণ উপাস্য নাই—আমিই সব। এই জন্যই পূর্ব্বোক্ত শিষ্য বলিতেছেন,—

অহো। অহং নমোমহ্যং বিনাশো নাস্তি যস্যমে।
ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মা হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদায় জগতের বিনাশ হইলেও আমার বিনাশ নাই, অতএব আমি আমাকেই নমস্কার করি।

তন্ত্র বলেন একই ব্রহ্মের দুইটি ভাব আছে—নির্গুণ বা শিবভাব এবং সগুণ বা শক্তিভাব। এই দুই ভাবই সত্য। কোনটিই মিথ্যা নহে। ইহারা পরস্পর পৃথক নহে—দুইটি লইয়াই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, দুইটিই জানিতে হইবে। কোনটিই উপেক্ষনীয় নহে। এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক শিব ও এক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইজন্য নির্ব্বাণ তন্ত্রে দেবী শিবকে বলিতেছেন,—

ত্বাং বিনা পুরুষো কোবা মাং বিনা কাপি মোহিনী। অর্থাৎ তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই এবং আমি ভিন্ন আর মোহিণীও নাই। এই দুই ভাব অবিচ্ছেদ্যরূপে মিলিত। শিবহীন শক্তি বা শক্তিহীন শিব কল্পনা করা যায় না। তাই তন্ত্রে শিব শব্দে যে ব্রহ্ম লক্ষিত হন, শক্তি শব্দে সেই ব্রহ্মই লক্ষিত হন। সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই ভাবকে পৃথক করিয়া দেখেন বলিয়া সাংখ্যের প্রকৃতি অচেতনা ও বেদান্তের মায়া মিথ্যা। কিন্তু তন্ত্রের শক্তি সেরূপ নহেন। তিনি চিৎ স্বরূপিনী অথচ গুণময়ী, নিষ্ক্রিয়া অথচ ক্রিয়াবতী। তবে "শিব" বলিতে

যেমন নিষ্ক্রিয় ভাবটিই প্রধানতঃ লক্ষ্য এবং সক্রিয় ভাবটি অনুদ্দিষ্ট হয়, সেইরূপ "শক্তি" শব্দে সচল, সক্রিয় ভাবটিই লক্ষিত হয়, নিশ্চল ভাবটি অস্ফুট ও অনুদ্দিষ্ট থাকে। তাই মোটামুটি নিশ্চল ভাবটিকে বুঝাইতে "শিব" এবং সচল ভাবটি ব্যক্ত করিতে "শক্তি" শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে একটি ভিন্ন অপরটি থাকিতে পারেন না।

ব্রহ্ম শিব ভাবে এক ও অখণ্ড শক্তি ভাবে বহুরূপী, শিব ভাবে শান্ত ও নির্ব্বিকার, শক্তিভাবে গুণময় ও ক্রিয়াশীল, শিব ভাবে অপ্রকট, শক্তি ভাবে প্রকট। এই প্রকট বিশ্বাদি তাঁহারই শক্তিভাব। এই জন্য তন্ত্র বলিয়াছেন "সর্ব্বং শক্তিরূপং পশ্যেৎ।" তিনি একভাবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, আর একভাবে নানারূপে ও নানা নামে প্রকাশিত হইয়াছেন। অতএব অণু পরামাণু হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগতের যাবতীয় পদার্থে, যাবতীয় জীবে এই দুই ভাব যুগপৎ বর্ত্তমান—শিব ভাব প্রচ্ছন্ন, শক্তিভাব প্রকট। জীবে এই দুই ভাব কিরূপে অবস্থিত ?

"চলচ্চিত্তে বসেৎ শক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেৎশিবঃ।"

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

অর্থাৎ, আমাদের চঞ্চল চিত্তে শক্তি এবং স্থির চিত্তে শিব বাস করেন। যে শক্তিরূপী ব্রহ্ম অসংখ্য সূর্য্যরূপে আলোক দান করিতেছেন, অসংখ্য ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি ও অসংখ্য বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন, যিনি অসংখ্য বদনে পান ভোজন, অসংখ্য পদে গমন ও অসংখ্য মনে চিন্তা করিতেছেন, সংক্ষেপে যিনি এই জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকটিত, সেই অনন্ত সমষ্টি শক্তিই তান্ত্রিক সাধকের আরাধ্যা জগদম্বা। ধ্যান ধারণার সৌকর্য্যার্থে সাধক এই নিরাকার শক্তির একটি মূর্ত্তি কল্পনা করেন (মূর্ত্তির অন্য গভীর রহস্য থাকাও অসম্ভব নহে) এবং যথা বিধানে ইহার পূজা করেন।* তিনি মাকে নিজ মূর্ত্তিতে দেখিতে চান অর্থাৎ, সগুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বাসনা করেন। নির্গুণ ভাবকে ত্যাগ করিয়া সগুণের উপাসনা কেন ? শিবকে ছাড়িয়া শক্তির ভজনা কেন ? শক্তিকে না

* "ব্রহ্ম ও মায়া" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষার্দ্ধে আমরা ইহাই দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; সুতরাং সে সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জানিলে—লাভ না করিলে, শিবকে জানা অসম্ভব। কুণ্ডলিনী রূপিণী (অর্থাৎ জ্ঞানরূপা) এই শক্তি অধিকাংশ জীবে প্রসুপ্তা রহিয়াছেন। সাধক সাধনা বলে ইঁহাকে জাগরিত করিলে, ইনিই প্রদীপ কলিকাকার জীবকে ষট্ চক্রের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া (অর্থাৎ different planes of Consciousness অতিক্রম করাইয়া) সহস্রারস্থিত পরম শিবে (অর্থাৎ Absolute Consciousnessএ) সংযোগ করিয়া দেন। অতএব দেখা যাইতেছে সাংখ্য, বেদান্ত ও তন্ত্র—তিনেরই উদ্দেশ্য এক —মুক্তি, কিন্তু প্রণালী স্বতন্ত্র। সাংখ্য ও বেদান্ত কেবল জ্ঞান, যুক্তি ও বিচারের পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তন্ত্র জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম ও ভক্তি মিলাইয়া পথটি অপেক্ষাকৃত সরস ও সুগম করিয়াছেন। ভক্তিগদ্গদ-চিত্তে সাধক সমস্তই জগদম্বাতে অর্পণ করেন। তিনি কিছুই করিতেছেন না, সব জগদম্বাই করিতেছেন। আহারের সময় ভাবেন জগদম্বা পরিতৃপ্তা হইতেছেন, দান করিয়া ভাবেন, জগদম্বাই দান করিলেন অন্যায় দেখিলে জগদম্বাই রুষ্টা হন। এইরূপে সাধক অহঙ্কারটি শীঘ্র জয় করিয়া ফেলেন।

তান্ত্রিক ক্রিয়াগুলি বড়ই রহস্যময় ও গভীর অর্থযুক্ত উপযুক্ত অধিকারীর নিকটেই গুরু এই সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেন, কারণ সাধারণের ইহা জানিয়া কোন লাভ নাই এবং অনিষ্টের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইহাদ্বারা সাধক অতি শীঘ্র ও সহজে সিদ্ধি (occult powers) লাভ করিতে পারেন। মুমুক্ষু সাধক মহাদেবের ন্যায় এই অষ্ট সিদ্ধি ঝুলির মধ্যে পুরিয়া রাখিবেন—অর্থাৎ, ব্যবহার করিবেন না—ইহাই তন্ত্রের আদেশ। কিন্তু অসংযতেন্দ্রিয় অপরিণামদর্শী অনধিকারীকে সিদ্ধিলাভের রহস্য বলিয়া দেওয়া এবং হিতাহিতবোধশূন্য শিশুর হস্তে শাণিত অস্ত্র দেওয়া তুল্য কথা, শক্তির অপব্যবহার অনিবার্য্য। এই জন্যই মহাপুরুষগণ তন্ত্র রহস্য এত সাবধানে ও সযত্নে গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে একটি বিষম ফল ফলিয়াছে। অনেকে ক্রিয়াগুলির সুগভীর ও প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কেবল বাহ্যিক ক্রিয়াগুলিতেই রত আছেন, সুতরাং জনসাধারণ বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়) তন্ত্রকে অন্তঃসারশূন্য ও অসভ্যোচিত জঘন্য ব্যাপার ভাবিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে থিওসফি (Theosophy) অধুনা কোন কোন তান্ত্রিক ক্রিয়ার রহস্য কিয়ৎপরিমাণে

উদ্‌ঘাটিত করিয়া জনসাধারণের এই কুসংস্কার বিদূরিত করিতেছেন। মানলয়-সমন্বিত (Rhythmical) বীজমন্ত্ররূপে কিরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে স্পন্দন উৎপাদিত হয়, এই স্পন্দন আমাদের সূক্ষ্মদেহকে কিরূপে সুগঠিত করে, এবং অনিষ্টকরী শক্তিগুলিকে নিকটে আসতে দেয় না, কিরূপে এই স্পন্দনের দ্বারা সূক্ষ্মজগতে সাধকের ইষ্টদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় ও দেবগণ এই মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া কিরূপে সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন—মন্ত্রের এই সকল রহস্য আমরা থিওসফি কৃপায় অবগত হইয়াছি।* মুদ্রার যবনিকাও কিঞ্চিৎ উত্তোলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই যে সমগ্র রহস্য কে বলিল? সেইরূপে শ্বাস, প্রাণায়াম, পূজা, হোম, পুরশ্চরণ, অভিষেক, যন্ত্র, চক্র, মালা, আসন প্রভৃতির মধ্যেও যে গভীর রহস্য প্রচ্ছন্ন নাই কে বলিতে পারে? এমন কি যে পঞ্চতত্ত্ব (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন) সাধারণের নিকট বর্ব্বরোচিত ও বীভৎস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার মধ্যেও এরূপ সত্য থাকিতে পারে যাহা আমরা কখনও কল্পনা করি নাই—স্বপ্নেও ভাবি নাই। কোন বস্তুর রহস্য না জানিয়া তৎপ্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

সাংখ্য, বেদান্ত ও তন্ত্রের সামান্য আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র; ইহাদের তারতম্য বিচার করিয়া কোন একটির প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা আমার অভিপ্রায় নহে এবং তাহা সম্ভব ও নয়। কারণ যিনি যেরূপ অধিকারী, যাঁহার যেরূপ মানসিক অবস্থা (temperament), তদুপযোগী পথই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত ও সহজ; সুতরাং ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ভালমন্দ বিচার চলে না, সবই ভাল, কেন না কোন না কোন শ্রেণীর মানবের উপযোগী। তবে তন্ত্র সম্বন্ধে লোকের কুসংস্কার অপনীত হয় এবং ইহাকেও মুক্তির অন্যতম পথ ভাবিয়া সমধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

---

* ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ পাঠক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত Philosophy of the Gods নামক পুস্তকে ও শ্রীমতী বেসান্তের Esoteric Christianityতে প্রাপ্ত হইবেন।

কর্ম্মতত্ত্ব

যাহা কিছু আমরা শরীরের দ্বারা সম্পন্ন, মনের দ্বারা সংকল্প, চিত্তের দ্বারা চিন্তা, বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় এবং বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করি, তাহাই এবং এই সমস্ত কার্য্যের পরিণামকে কর্ম্ম বলে। শারীরিক বা মানসিক চেষ্টা মাত্রই কর্ম্ম; কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফলের ছায়াতপের ন্যায় সম্বন্ধ; কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল উৎপাদিত হইবে।

যথা ছায়াতপৌনিত্যং সুসম্বদ্ধৌ নিরন্তরং।
তথা কর্ম্মচ কর্ত্তাচ সম্বদ্ধাবাত্ম কর্ম্মভিঃ॥ ৭৫

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, অঃ ১।

কর্ম্মরূপী অনন্ত রজ্জুখণ্ড অনন্ত হইতে আসিয়া, বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া, আবার অনন্তে মিশিয়াছে। এই রজ্জুর কর্ত্তন মানবের সাধ্যাতীত। আবার এই কর্ম্ম-রজ্জু অসংখ্য সূত্রের দ্বারা নির্ম্মিত; মানব এই সূত্র আপনিই প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছে ও প্রস্তুত করিতেছে। আমাদিগের কর্ম্মের কতখানি অতীতে বর্ত্তমান ছিল, কতখানি আবার বর্ত্তমানে চলিতেছে, আবার কতখানি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আমরা কর্ম্মতত্ত্বে কর্ম্মের এই তিন অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, যেরূপ কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফলও তদনুরূপ হয়; অর্থাৎ ভাল কর্ম্মের ভাল ফল, মধ্যম কর্ম্মের মধ্যম ফল ও নিকৃষ্ট কর্ম্মের শোচনীয় ফল হইয়া থাকে। মহাভারতে আছে;

শুভেন কর্ম্মণা সৌখ্যং দুঃখং পাপেন কর্ম্মণা।
কৃতং ফলতি সর্ব্বত্র নাকৃতং ভুজ্যতে কচিৎ॥ ১

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব—অধ্য ৬।

শুভকর্ম্মে সুখ উৎপাদন করে, পাপ কর্ম্মে সেইরূপ কষ্ট উৎপাদন করে; কর্ম্ম করিলে তাহার ভোগ হয়, কর্ম্ম না করিলে তাহার ভোগ হয় না।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যে, কায়, মনঃ ও বাক্যের দ্বারাই শুভ ও অশুভ কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, এবং সেই কার্য্যগতি অনুসারে মানবের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি প্রাপ্তি হয়।

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহ সংভবম্।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥ মনু, ১২ অঃ ৩ শ্লোক।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মানবের "মন"ই মনোবাক্কায়াশ্রিত উত্তম,মধ্যম ও অধম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; এই ত্রিবিধ কর্ম্ম বক্ষ্যমান দশ লক্ষণ যুক্ত।

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসম্॥
পারুষ্যমনৃতাং চৈব পৈশুন্যং চাপি সর্ব্বশঃ।
অসংবদ্ধ প্রলাপঞ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
অদত্তানা মুপাদানং হিংসা চৈবা বিধানতঃ।
পরদারোপসেবাচ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতং॥

পরের দ্রব্য অন্যায় রূপে কি প্রকারে লইব এই চিন্তা, মনদ্বারা অনিষ্ট চিন্তা, পরলোক নাই—দেহই আত্মা এইরূপ বিতথ অভিনিবেশ, অশুভদায়ক মানস কর্ম্ম এই ত্রিবিধ; পরুষবাক্য, পরোক্ষে পরের দোষ কথন, রাজার, দেশের বা পুরাদি সম্বন্ধিয় নিষ্প্রয়োজন অসম্বন্ধ প্রলাপ—অশুভকর বাচিক কর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ। অদত্ত ধন গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদার সেবা, শারীরিক অশুভ কর্ম্ম এই তিন প্রকার। কর্ম্মতত্ত্ব অতিশয় জটিল, এবং সূক্ষ্মদর্শী ঋষিদিগের সেই সম্বন্ধে আলোচনা স্থূলদর্শী আধুনিক মানবের দুর্বোধ্য বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন মহাত্মা দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগের বোধগম্য হইতে পারে এরূপ সরলভাবে সেই অতিদুরূহ তত্ত্ব জগতে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া তাহারি আলোকে আমরা কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

"মানবের মানসে উদিতভাব সূক্ষ্মলোকে প্রবেশ করিয়া কোন না কোন "এলিমেণ্ট্যালের" (Elemental) সহিত মিলিত হইয়া ক্রিয়াশক্তিশালী একটী প্রাণীরূপে পরিণত হয়। এই প্রাণীগণের জীবন কাল তাহাদিগের স্রষ্টার চিন্তার তীব্রতার উপর নির্ভর করে, এবং চিন্তা সৎ হইলে তচ্ছৃষ্ট মুর্ত্তি সৎক্রিয়াশালী শক্তিমান বন্ধুরূপে এবং অসৎচিন্তায় প্রসূত হইলে মানবের অনিষ্টকারী শত্রু-রূপে বিচরণ করে। এই মহাশূন্যে আমরা অহরহঃ প্রতি মুহূর্ত্তে এইরূপ কতশত প্রাণীর সৃজন করিতেছি, আমাদিগের প্রত্যেক অভিপ্রায়, প্রত্যেক বাসনা, প্রত্যেক আবেগ এবং প্রত্যেক আশক্তি হইতে এক একটী মূর্ত্তি প্রসূত হইতে থাকে। মহাশূন্যে এইরূপে কি মহান প্রাণীস্রোত চলিতেছে; এবং তাহা কিরূপ চৈতন্য বিশিষ্ট আয়ুবান অপর প্রাণীর উপর প্রতিক্ষণে কার্য্য করিতেছে।

হিন্দুর "কর্ম্ম" ও বৌদ্ধের "স্কন্ধ" ইহারই প্রতিবাক্য। যোগী ইহাদিগকে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় প্রসব করেন, অপর লোকের অগোচরে ইহা প্রসূত হয়।"

গীতায় কর্ম্মশব্দের অর্থ এইরূপ দেওয়া আছে ;—

"ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ।"

(ভূতানাং ভাব উৎপত্তিঃ, উদ্ভবশ্চ বৃদ্ধিঃ, তৌ করতি ইতি যঃ সঃ) বিসর্গঃ (দেবোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপঃ) কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ (কর্ম্ম শব্দবাচ্য) ; সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধিকারক যজ্ঞিয় আহুতি দানাদি ক্রিয়াই কর্ম্ম শব্দের অর্থ ; অথবা যে ক্রিয়ায় পূর্ব্বকথিত অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হয় তাহাই কর্ম্ম ! যেমন একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই যে অসংখ্য জীবভাব সম্পাদক সৃষ্টিব্যাপার তাহাই আদি কর্ম্মরূপে অভিহিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের সৃষ্টজীব কর্ম্মনামে অভিহিত হয়।

পূর্ব্ব উদ্ধৃত ঋষিবাক্য অবলম্বনে কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ওই পূর্ব্বকথিত বাক্য কিছু বিশ্লেষিত করা আবশ্যক এবং মানব কি ও তাহার কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ তাহাও জানা আবশ্যক।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ব্রহ্মাণ্ড (macrocosm) এবং মানবকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (microcosm) বলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনও উপাদান নাই যাহা মানব শরীরে বর্ত্তমান না আছে ; তবে মানব শরীরে সকলগুলির সমভাবে বিকাশ হয় নাই ; কতকগুলি অধিক বিকশিত, কতকগুলি স্ফুটনোন্মুখ ; আবার কতকগুলি অস্ফুট অবস্থায় সত্ত্বমাত্র ভাবে,—অশ্বত্থের বীজে যেরূপ অশ্বত্থের মহান শরীর অদৃশ্যভাবে নিহিত থাকে,—সেইরূপভাবে অবস্থিত।

* Because every thought of man upon being evolved, passes into the inner world, and becomes an active entity by associating itself, coalescing we might term it, wsth an elemental—that is to say, with one of the semi-intelligent forces of the kingdoms It survives as an active intelligence—a creature of the mind's begetting—for a longer or shorter period proportionate with the original intensity of the cerebral action which generated it. Thus a good thought is perpetuated as an active, beneficient power, an evil one as a maleficent demon And so man is continually peopling his current in space with a world of his own, crowded with the offsprings of his fancies, desires, impulses, and passions ; a current which re-acts upon any sensitive or nervous organisation which comes in contact with it, in proportion to its dynamic intensity. The Buddhists call this his Shandba ; the Hindu gives it the name of Karma.

The Occult World ..page......30.

মানবের এই উপাদানগুলি বৈদান্তিকেরা "কোষ" তারকব্রহ্মযোগীরা "উপাধি" এবং পরাবিদ্য (Theosophy) "তত্ত্ব" বা (Principles) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত তালিকার সাহায্যে এই তিন মতের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়।

	পরাবিদ্যামতে।	বেদান্তমতে।	তারকরাজযোগমতে।	লোক।
১।	স্থূলদেহ (Dense body)	অন্নময় কোষ	স্থূলোপাধি	ভূ
২।	ছায়া শরীর (Etheric double)			
৩।	প্রাণ (The Life)	প্রাণময় কোষ	সূক্ষ্মোপাধি	ভুবর্লোক
৪।	কাম দেহ (Desire body)			
৫।	মন (The thinker)	মনময় কোষ		
	ক। কাম-মনস্ (Lower manas)			স্বর্লোক
	খ। বুদ্ধি-মনস্ (Higer manas)	বিজ্ঞানময় কোষ		
৬।	বুদ্ধি দেহ (প্রজ্ঞাদেহ)	আনন্দময় কোষ	কারণোপাধি	মহ, জন ও তপঃলোক
৭।	আত্মা	আত্মা	আত্মা	সত্যলোক

মানবের বাসনাদি ক্রিয়া তাহার কামদেহ সাহায্যে, তাহার চিন্তাক্রিয়া মন দেহ সাহায্যে সম্পাদিত হয়। মৃত্যুর পর সে তাহার কামদেহ ধারণ করিয়া ভুবর্লোকে তাহার কাম-কর্ম্মের ফলভোগ করে, মন-দেহ ধরিয়া স্বর্গলোকে অবস্থান করে। স্বর্গলোকের উপরেরগুলি আত্মার চৈতন্যের ও অন্তরতর শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র, জীবন্মুক্ত হইলে এই উচ্চতর কোষ বিকশিত হয়, সাধারণ মানবে ইহা বিন্দুরূপে অবস্থিত। অতএব কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে উচ্চতর কোষগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা এই স্থানে কাল্পিক সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করিব। সৃষ্টির আরম্ভ নাই, সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি। প্রলয়কালে সৃষ্ট পদার্থ সমস্তই মূল প্রকৃতিতে লীন ছিল। তখন নাম কিংবা রূপ ভেদ ছিল না। সমস্তই অব্যাকৃত ভাবে থাকাতে তখন মূল প্রকৃতি এক ছিল —"অজামেকাং"। শ্রীমদ্ভাগবতে মৈত্রেয় প্রদত্ত সৃষ্টি রহস্য হইতে আমরা সাধারণের জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী ভগবান ছিলেন, তিনি সকল জীবের আত্মা। সে সময়ে অন্য দ্রষ্টা কিংবা দৃশ্য ছিল না। যদিও এই জগৎ কারণরূপে অবস্থিত ছিল, তথাপি তাহার পৃথক্ প্রতীতি ছিল না। ভগবান্‌কে উপলক্ষণ করিতে, তখন কোনরূপ নানাত্ব বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা তখন আত্মগত ছিল। তিনি তখন একমাত্র দ্রষ্টা। তাঁহার ভিন্ন অন্য কাহারও প্রকাশ ছিল না। সুতরাং দৃশ্য কিছুই না দেখিয়া, তিনি যেন আপনাকেও না থাকা মনে করিলেন। তাঁহার মায়া প্রভৃতি শক্তি তখন নিদ্রিত ছিল; কিন্তু দৃষ্টিরূপ চৈতন্য তখন প্রকট হইয়াছিল। সেই দ্রষ্টার কার্য্য কারণাত্মক প্রসিদ্ধ শক্তির নাম মায়া। এই মায়ার দ্বারাই ভগবান্ জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাল শক্তির দ্বারা মায়ার গুণসকল ক্ষুভিত হইলে, ভগবান্ পুরুষরূপী স্বীয় অংশে সেই মায়াতে চিৎশক্তিরূপ আত্মবীর্য্যের আধান করিয়াছিলেন। (ক) এবং কাল প্রেরিত অব্যক্ত মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইল।"

(খ) "এই বিবরণে আমরা তিনটি বিষয় দেখিতে পাই—

ক। মমযোনির্মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।

খ। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের "পৌরাণিক কথা" পৃ ১৩ ও ১৪

১। কাল শক্তি।
২। মায়া।
৩। ভগবানের ইচ্ছা।

যখন প্রলয় অবসান কাল আগত হয়, তখন প্রকৃতির গুণত্রয় পুনর্বার কার্য্যোন্মুখ হয়। গুণের ক্ষোভ হইলেই, প্রকৃতির পরিণাম হয়। পরিণাম মায়ার ধর্ম্ম বা স্বভাব। (পুরুষ সকল জীবেই সমভাবে বর্ত্তমান, মায়ারূপ উপধি লইয়াই, সকলের "আমিত্ব"। কিন্তু এই পরিণাম এক নিয়মের বশবর্ত্তী। এই নিয়মের নাম "কর্ম্ম" বা জীবের অদৃষ্ট। প্রলয়ের পর পূর্ব্ব কল্পের জীবের যখন দেহ নষ্ট হইয়াছিল তখন কিন্তু তাহার সংস্কার সকল অদৃশ্যভাবে মূল প্রকৃতিতে লীন ছিল। এই অদৃষ্টই জীবের কর্ম্ম, এবং তাহা অনুসরণ করিয়াই ঈশ্বর বহু হইবার ইচ্ছা করেন। জীবসকলকে তাহা-দিগের স্ব স্ব অবস্থায় প্রকাশ করাই তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার নিজের জন্য কোনও ইচ্ছা নাই। উপনিষদের "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ও ভাগবতের "কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ" একই সত্য প্রচার করিতেছে।

ভগবান্ প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, তাহাকে বহুভাবে প্রকাশ করিলেন এবং জীবপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হইল। এই আবির্ভাব ব্যাপারে তিনটি স্তর আছে ;—

১। তত্ত্ব বা কারণ সৃষ্টি,
২। কার্য্য-সৃষ্টি বা জীব-সৃষ্টি,
৩। মানব-সৃষ্টি।

যেভাবে ভগবান্ প্রথম ব্যাপার সংঘটিত করিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রথম পুরুষভাব। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে, জীবাত্মার বিকাশক্ষেত্র সৃজনের প্রাক্কালে তিনি আপনার চিন্তা শক্তির অনন্ত তরঙ্গ হইতে কতকগুলি মাত্র তরঙ্গ লইয়া—প্রকৃতিকে অনুপ্রাণীত করিয়া থাকেন। ইহাকেই পুরাণে তাঁহার ঈক্ষণ বলা হইয়াছে।

* He (Tird Logos) out of the infinite capacity of His multitude of vibratory powers gives a certain portion to the matter of a particular system in a particular cycle of evolution. This capacity is stamped on matter by the Third Logos and is ever maintained in matter by His Life enfolded in atom--Study in Consciousness.

এই চিন্তাতরঙ্গের দ্বারা নিয়মিত হইয়া প্রকৃতি সপ্ততত্ত্বে পরিণত হয়—আদি, অনুপাদক, ব্যোম, মরুৎ তেজ, অপ ও ক্ষিতি। এই সপ্ত তত্ত্বের প্রত্যেকটি আবার সপ্ত বিভাগে বিভক্ত এই সপ্ততত্ত্বান্বিত প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তলোক। সপ্তলোকের প্রথম দুইটি ভগবানের আত্মলীলাক্ষেত্র—বৈষ্ণবের গোলক ও বৈকুণ্ঠ; তাহাদিগের পরিচয় মানবজ্ঞানাতীত। তাহার নিম্নের দুইলোক (পরাবিদ্যা সমিতির ভাষানুযায়ী "আত্মলোক ও বুদ্ধিলোক" এবং হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী "মহ" "জন" "তপঃ" ও "সত্য" লোক) ঋষি ও জীবন্মুক্ত পুরুষের ক্রিয়াক্ষেত্র। তাহার নিম্নের তিন লোক ত্রিলোকী সাধারণ মানবের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর ক্রিয়াভূমি। আমরা প্রথম দুই লোকের বিষয় আর আলোচনা না করিয়া নিম্নের লোকের বিষয়ই বিবৃত করিব।

পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চলোক সৃজিত হইলে ভগবানের দ্বিতীয় শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইল। প্রথম শক্তির দ্বারা তত্ত্ব সৃজিত হইল সত্য, কিন্তু তাহার সংহতি না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বকল্পের জীবগণ আপন আপন বিকাশ সাধন করিতে এখনও ওই সমস্তক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে পারে না। তাহারা জীবাত্মারূপে গোলকবিহারীকে বেষ্টন করিয়া গোলকে নর্ত্তন করিতেছেন; উপযুক্ত আধার না থাকায় তাঁহাদিগের প্রতিবিম্ব নিম্নলোকে এখনও পরিদৃশ্য-মান হইতেছে না।

আধ্যাত্মিক নয়নে তাঁহারা অগ্নিশিখা মধ্যবর্ত্তী অনন্তস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিভাসিত।*

লোক রচনায় অসমর্থ, অসংবদ্ধ এবং পৃথকভাবে অবস্থিত তত্ত্বগুলিতে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় শক্তি প্রয়োগ করিলেন। এইটি তাঁহার দ্বিতীয় পুরুষ ভাব। প্রথমে বৃক্ষ হইতে কার্পাস-তুলা আহৃত হয়; তাহা অসমবেতভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পর যেমন সেই কার্পাস বাছিয়া লইয়া সূত্র ও পরে বসন প্রস্তুত হয়, সেইরূপ দ্বিতীয় পুরুষ, তত্ত্বগুলিকে আপন প্রাণ-শক্তিদ্বারা প্রথমে মিলিত করিয়া, পরে জীবভোগ্য শরীরে পরিণত করেন।

---

* I sence one Flame, O Gurudeva; I see countless undetached sparks shining in it—Occult Catechism, quoted in the Secret Doctrine I 145.

সোঽহম্ প্রবিষ্টো ভগবাং শ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৬।৩।

ভগবান্ এইরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের ক্রিয়া, অথবা জীবের অদৃষ্ট, যা বিলীন ছিল, তাহার বিকাশ করণান্তর সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে একত্র সংযুক্ত করিয়া দিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতি সপ্ততত্ত্বে পরিণত এবং ব্রহ্মাণ্ড সপ্তলোকে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাও কথিত হইয়াছে যে এই সপ্তলোকের প্রত্যেকটি আবার সপ্তধা বিভক্ত এবং ইহার সর্ব্বোচ্চ স্তর সূক্ষ্মতম অনুদ্বারা গঠিত, (যাহাকে ঐ তত্ত্বের আদি অনু (atom) বলা যাইতে পারে), এবং নিম্নতর স্তর স্থূল হইতে স্থূলতর অনুদ্বারা গঠিত। আমরা এখন পঞ্চলোকের কথা বলিতেছি; অতএব এই পঞ্চলোকের প্রত্যেকটিতে এইরূপে উচ্চতম হইতে নিম্নতম সাতটি স্তর আছে এবং প্রথম স্তর এই তত্ত্বের আদি-অণুদ্বারা গঠিত এবং নিম্নতর স্তর স্থূলতর হইতে স্থূলতম অণুসংগঠিত।

দ্বিতীয় পুরুষের সঞ্জীবনীশক্তি দেবগঙ্গার মত একলোক হইতে অপর লোক ভাসাইয়া প্রবাহমান। তাহার অংশ আদি-অণুগুলিকে ধারণ করিয়া থাকে; ইহারই নাম পরাবিদ্যা সমিতির ভাষায় (Monadic essence) (মোনাডিক্ এসেন্স), এবং ইহার দ্বারাই বিরাট পুরুষের আকার গঠিত। তাঁহার জীবনস্রোতের দ্বিতীয় তরঙ্গ যাইয়া স্বর্গলোকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অণুগুলিকে বিক্ষোভিত করিয়া নানারূপ আকারে বিযুক্ত করে। এই সমস্ত আকারগুলি আপনিই বিযুক্ত হয়, আবার অনপেক্ষ ভাবান্বিত বিশুদ্ধ চিন্তা হইবামাত্র তাহারি শক্তির ক্রিয়ায় আকর্ষিত হইয়া ঐ অণুগুলি যুক্ত হয় এবং চিন্তানুযায়ী আকার গঠন করে। দ্বিতীয় পুরুষাধিষ্ঠিত স্বর্গলোকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মিলিত পরিণামকে ব্রহ্মবিদ্যার সমিতির ভাষায় (First Elemental Kingdom) প্রথম দৈবলোক কহে; এবং এই বিশুদ্ধ ভাবমূর্ত্তি গঠনোপকরণোপযোগী অণুগুলিকে First Elemental Essence (প্রথম দেবভূত) বলা হয়। হিন্দুর দেবতা, খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের Angels or Archangels আর ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির Elementals একই অর্থবোধক।

পূর্ব্বে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এইগুলিকে ইংরাজী ভাষায় Elements বলা হইত। অতএব ঐ সকল তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা পুরুষগণকে এলিমেণ্টাল বলিয়া অভিহিত করা হয় হিন্দুর দেবতাও ঐ সমস্ত তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা। দেবতাদিগের শরীর যে অণু দ্বারা গঠিত হয় তাহাকে elemental essence বা দেবভূত বলা হয়। পূর্ব্বকথিত দ্বিতীয়পুরুষাধিষ্ঠিত অণু হইতেই দেবতাদিগের শরীর গঠিত হয়।

সেইরূপ আবার আর এক জীবনতরঙ্গ দ্বিতীয় পুরুষ হইতে স্বর্গলোকের নিম্নচারি স্তরের অণুগুলিকে বিক্ষোভিত করিয়া দেয়। ইহা হইতেই সাপেক্ষ ভাবান্বিত চিন্তাকৃতি সৃষ্ট হয় এবং দেবতাদিগের শরীরও তাহা হইতে গঠিত। এই চারি স্তর অপেক্ষাকৃত নিম্ন দেবতাদিগের বিলাসক্ষেত্র। ব্রহ্ম-বিদ্যা সমিতি তাহাকে দ্বিতীয় দেবলোক (Second Elemental kingdom) বলেন। সেইরূপে আবার তাঁহার শক্তি ভুবর্লোকের নিম্নতর পঞ্চস্তরের অণু-গণকে আশ্রিত করিয়া রহে। তাহা হইতে বাসনা-আকৃতি (Desire Forms) ও নিম্ন দেবতার বা অপদেবতার শরীর গঠিত হয়। ইহাই তৃতীয় দেবলোক (Third Elemental Kingdom); এবং এইরূপ দ্বিতীয় পুরুষাধিষ্ঠিত ভুবর্লোকীয় অণুকে (elemental essence) বা দেবভূত বলে।

মানবের মত দেবতাদিগের নির্দ্দিষ্ট দেহ নাই, তাহারা ইচ্ছামত পূর্ব্ব-কথিত দেবভূত দিয়া আপনাদিগের দেহ রচনা করেন এবং স্বেচ্ছায় আবার তাহা ত্যাগ করেন। কতকগুলি অণু আকর্ষিত করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের দেহ রচনা করেন; এবং এইরূপে তাঁহাদিগের দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়ায় ঐ গুলি যখন তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রণোদিত হয়, তখন তাঁহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন দেহ রচনা করেন। তাঁহাদিগের স্ব স্ব শক্তি প্রসারের উপাদান হওয়ায় এই সমস্ত অণুগুলি তাঁহাদিগকে শক্তি-সঞ্চিত করিয়া রাখে। এই সমস্ত দেবশক্তি-রঞ্জিত অণু দিয়াই আমাদিগের দেহ গঠিত। আমাদিগের শরীর—এইরূপে দেবাধিষ্ঠিত বলিয়াই বাহ্যিক স্পন্দন আমাদিগের বাসনা বা ভাবনা পরিণত হইতে পারে।

এই তত্ত্ব অতিশয় দুরূহ, পরে আলোচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫। (ক) দানব রাজত্বের শাসন প্রণালী, সভ্যতা এবং শিল্প।

দানব রাজত্বের প্রথম সময়ে অভূতপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চর্য্য সভ্যতার সূত্রপাত হইল। প্রাচীন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নব্য সম্প্রদায় পরিচালিত হইতে লাগিল। নব্য সম্প্রদায় বিনয়ী, পরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের বাধ্য হইয়া তাহাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল। জ্ঞানধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইয়া এই সভ্যতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, উক্ত সৌন্দর্য্য অধিককাল স্থায়ী হইল না। এই সভ্যতার অভ্যুদয়ের সময়ে বর্ত্তমান মাডাগাস্কার দ্বীপের সন্নিকটে সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপর ইহার অনুকরণে এইরূপ আরও বহুসংখ্যক নগর নির্ম্মিত হইল। সেই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বা তাহা স্থানান্তরিত করিতে আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ ইঞ্জিনিয়ারগণ সাহস পান না। এই সকল সৌধরাজির কারুকার্য্য এবং গঠনপ্রণালী দেখিয়া এই পণ্ডিতগণ একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হন।

প্রাচীন মিশর এবং গ্রীস দেশবাসীগণ এই তৃতীয় দানবজাতি হইতে বহুবিধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্টালিকা পাইয়াছিলেন। মিশরের অন্তর্গত কর্ণেকদেশের মন্দিরে দানব সভ্যতার শিল্প নৈপুণ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান পাওয়া যায়। মিশরের জগদ্বিখ্যাত পীরামিড যে কি কৌশলে, এবং কি শক্তিবলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং ইঞ্জিনিয়ারগণ অনুমান করিতেও সক্ষম নহেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের একটী অনুমানও প্রকৃত নহে। অতি প্রকাণ্ড প্রস্তরসমূহ কি উপায়ে যে শূন্যমার্গে উত্থিত ও স্থাপিত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা কি যে কৌশলে এ হেন অভ্রভেদী অত্যুচ্চ মন্দিরসমূহ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কল্পনাতেও আইসে

না। প্রকৃত প্রস্তাবে, যে সকল মহাপুরুষ অলৌকিক যোগবলে শক্তি সঞ্চয় করিয়া পার্থিব বিদ্যুতের প্রচণ্ড অথচ অদ্ভুত শক্তিপুঞ্জকে ইচ্ছামত পরিচালিত ও প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের সামান্য অঙ্গুলির নির্দ্দেশেই এই সকল প্রস্তর উর্দ্ধে, শূন্যমার্গে উত্তোলিত এবং সংস্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণ পাশব কিম্বা মানববলে অথবা কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্যে কখনই তাহাদিগকে উত্তোলন করার ক্ষমতা হয় নাই। দোলায়মান প্রস্তর খণ্ডের ওতপ্রোত আন্দোলনে যেরূপ উপরিস্থ অধ্যাত্মরাজ্য হইতে নিম্নতন মনুষ্যজগতে বার্ত্তা আগমন করিয়া থাকে, এবং সুপ্রসিদ্ধ মর্শ বার্ত্তাবহের (Morse telegraph এর) সূচ যেরূপ বার্ত্তাবহন ও বানান করে, ঠিক সেই রহস্যময় গুহ্য উপায়েই কথিত দোলায়মান প্রস্তরসকলকে আকাশপথে উত্থিত এবং সংস্থাপিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দিরসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(খ) দানবজাতির অধঃপতন।

পুরাণপাঠে জানা যায়, পুরাকালে দানবগণ পবিত্র এবং ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। পরে ক্রমশঃ তাহাদের অধোগতি হইতে লাগিল। এখন দেখা যাউক, কিরূপে এই অধঃপতন ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তখন মানবজাতি স্বভাবতঃই অধোগামী হইতেছিল। পাঞ্চভৌতিক পদার্থ ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল; মানবদেহও তদনুরূপ অধিকতর কঠিন এবং কর্কশ হইতে লাগিল। এই মানবদেহ আয়তনে অতি প্রকাণ্ড, সুদৃঢ় এবং তেজোবলসম্পন্ন ছিল। স্ত্রীপুরুষজাতি চিহ্ন পরস্পর পৃথক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সা ও সংসর্গপিপাসা সাতিশয় বলবতী ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। ইহার পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষভেদচিহ্নবর্জ্জিত মানবজাতিতে কামতৃষ্ণা এরূপ অদম্য ছিল না। সন্তানোৎপাদিকাশক্তি অতি শান্ত এবং স্থিরধীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তাহাতেই প্রজাবৃদ্ধি হইত। কিন্তু তৎপর স্বাভাবিক পাশব শক্তির সঙ্গে ইন্দ্রিয়লালসার এবং সুখভোগেচ্ছার সংযোগ হওয়াতে এই দুরাসদ কামরিপু অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। তাহা প্রথম প্রথম প্রাণীজগতে দেখা দিল; পরে মানবকুলকেও আক্রমণ করিয়া বসিল।

যে সকল অগ্নিষ্বাত্ত এবং সৌর পিতৃগণ এই মানবকুলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, দেহ তাঁহাদের জন্মজন্মান্তরে ক্রমশঃ অধিকতর দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হইতে লাগিল। তাঁহাদের বোধশক্তি সুতীক্ষ্ণ হওয়ায় তাঁহারা নিজকে নিজেই পৃথিবীতে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রকাণ্ড দেহে এবং অত্যুগ্র ও দৃঢ় মনে কামভাব প্রচণ্ডাকার ধারণ করিল। এইরূপ প্রবল কামানলে উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতীয়া কামিনীগণের মনোহর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে স্ত্রীত্বে বরণ করিলেন। এই সংসর্গে যে সকল সন্তান জাত হইল, তাহারা আরও জঘন্য হইল। দেবগণ সুন্দরী মানবীদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। তজ্জন্য তাহাদের সন্তান-সন্ততি নির্ম্মলভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সংসার-সাগরের পাপ-পঙ্কিল সলিলে নিমজ্জিত হইতে লাগিল; কোমল স্বচ্ছভাব সাতিশয় আবিলময় এবং পূতিগন্ধযুক্ত হইয়া মানুষকে অধিকতর পশুভাবাপন্ন করিয়া তুলিল।

বিষয়বাসনা ও ইন্দ্রিয়লালসাকে সম্যকরূপে বশীভূত করিতে হইলে তাহার নিম্নতন শেষ স্তরে যাওয়ার দরকার এখানেও তাহাই হইল। তাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ জন্মিলে, তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের সৃষ্টি হইল। এই প্রথম কুরুক্ষেত্র সমরে অনেকেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইল। এই দুই দলের মধ্যে একদল ভগবানের বিধিনিষেধ মান্য করিয়া সৎপথাবলম্বী হইলেন। তাঁহারা দেবগণ অপর পক্ষ জঘন্য ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হইয়া দেবগণের অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করিয়া উন্মার্গগামী হইল। তাহারা দানবগণ।

পরে এই দুই দলের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হওয়াতে পরস্পরমধ্যে দারুণ যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে যাঁহারা পবিত্রাত্মা এবং ধর্ম্মপ্রাণ, তাঁহারা আস্তে আস্তে উত্তরদিগে সরিয়া পড়িলেন। যাহারা তমোভাবাপন্ন তাঁহারা দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রভৃতি নানা দিগদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া সেই সকল দেশ অধিকার করিয়া বসিল, এবং দেবার্চ্চনাদি সৎকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ভূত প্রেতের পূজোপাসনায় রত হইল। তাহারা দৈত্যকুলের পূর্ব্বপুরুষ। দৈত্যকুলে বাহ্যবস্তু দৃঢ়তার চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল। জ্যোতিঃ বা সৎপথাবলম্বী সুর এবং তামশ বা অসৎপথাবলম্বী

অসুরদের মধ্যে এই প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিল। তাহা পরবর্ত্তী দৈত্যগণের আমলে ভীষণাকার ধারণ করিয়া শোচনীয় ফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ঘোরকর্ম্মা প্রধান প্রধান দানবগণকে পরবর্ত্তী মানবজাতি দেবতা ও অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবীর জ্ঞানে পূজার্চ্চনা করিয়াছে। তাহাদের অলৌকিক বীরত্ব, অসাধারণ যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অমানুষিক বল বিক্রমের সম্বন্ধে নানা দেশে নানারূপ কিম্বদন্তি, গল্প ও আখ্যায়িকা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

৬। লিমুরিয়া বা দানবরাজ্য ধ্বংস।

উভয় পক্ষ মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যতই ঘনীভূত হইতে লাগল, ততই নৈসর্গিক দুর্ঘটনায় এবং ভয়াবহ প্রলয়েকেও দানবরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। প্রবল ভূকম্পনে দেশ খণ্ড বখণ্ড হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে প্রচণ্ড প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরি হঠাৎ ফুটিয়া উঠিয়া ধূম এবং উত্তপ্ত গলিত ধাতু উদ্গারণ করিতে লাগিল। তাহা চতুর্দ্দিগে বিকীর্ণ হইয়া দেশ ভাসাইয়া চলিল তাহাতে মানুষ, প্রাণী, তরুলতা সমস্তই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাদেশ সমূহ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়াতে তদ্দ্বারা বড় বড় দ্বীপের সৃষ্টি হইল, সেই দ্বীপ সকল এক একটা মহাদেশ তুল্য। তাহা আবার নূতন নূতন প্রকম্পনে বিদীর্ণ হইয়া গেল দেশময় প্রলয়ঙ্করী অগ্নিরাশি ধূ ধূ করে জ্বলিয়া উঠিল। তপ্ত ধাতুস্রাবের অসংখ্য নদী, খাল, নালা দিগ্বিদিগে খর তর স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অগ্নি এবং জলের পরস্পর সংঘর্ষণে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশিতে নভো-গুল আচ্ছন্ন হইয়া গেল! এই প্রকাণ্ড অগ্নিরাশির এবং উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল ভীম-নাদী সমুদ্রের আবর্ত্তসমূহ সেই দ্বীপসকলকে একে একে গ্রাস করিয়া ফেলিল! এইরূপে অতি বিস্তৃত, প্রকাণ্ড দানব সাম্রাজ্য তৃতীয় যুগারম্ভের (দ্বাপরের ?) সাতলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী হইতে চিরকালের মতন অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার আর চিহ্ন মাত্র রহিল না। কালের কি অসীম ক্ষমতা। কি অপার মহিমা।।

(ক) দানবরাজ্যের ও দানব জাতির ধ্বংসাবশেষ।

যে সকল দেশ এই প্রলয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, তন্মধ্যে কোন

কোনটী পরবর্ত্তী দৈত্যরাজ্যের অংশ বিশেষ হইল; কতকগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রের মাঝে পৃথক পৃথক ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়াদেশ পূর্ব্বে দানবরাজ্যভুক্ত ছিল। এখন সাগব বক্ষে পৃথক ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সুদূর অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ সকল দেশে বহুকাল ব্যাপিয়া কতকগুলি তৃতীয় বা দানব জাতীয় লোক বাস করিত। অসভ্য, আদিম অষ্ট্রেলিয়াবাসী ও টেস্‌মেনিয়াবাসীগণ এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী দানব এবং দৈত্যজাতির সংসর্গে মালয়া ও পাপুয়া, এই সঙ্কর জাতি দ্বয়ের উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান হ'টেন্‌টট্‌স্‌ জাতিও দানব-কুলের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। দাক্ষিণাত্যেব কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় দেশীয়গণ তৃতীয় বা দানবজাতির সপ্তম বিভাগ ও চতুর্থ জাতিব দ্বিতীয় বিভাগের সংসর্গে উৎপন্ন হইয়াছে এ জন্য ইহা সঙ্কব জাতি। আফ্রিকাদেশের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি বা নিগ্রোগণ দানব জাতির ধ্বংসাবশেষ। বর্ত্তমানে এইরূপ নিবিড় ও ঘোর কৃষ্ণকায় জাতি দেখিলে তাহাদিগকে দানব জাতির বংশধর বলিয়া অবাধে ঠিক কবা যাইতে পারে।

৭। বানরের উৎপত্তি। ডারুউইনের মত খণ্ডন।

এই অধ্যায় শেষ করার পূর্ব্বে উপসংহারে একটী আবশ্যকীয় বিষয়েব উল্লেখ না করিয়া পারা গেল না। ক্রমোন্নতিতে অসুরগণ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা অসম্মত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উন্মার্গগামী হওয়াতেই ঘোর বিপর্য্যয় ঘটিল। ভগবানেব অলঙ্ঘ্য নিয়মের অবাধ্য হইয়া চলাতে অসুরগণের দ্বারা বিষম অবনতি ঘটিল। তাহারা এক অতি নিকৃষ্ট জাতি উৎপাদন করিল। এই জাতি ক্রমোন্নতির নিয়মে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া বিপবীত এবং বিষময় ফল উৎপন্ন হইল। এই বংশধরগণেব বিষম অবনতি ঘটিল। তাহা হইতে মর্কট জাতির উৎপত্তি হইল।

এ সম্বন্ধে ডারউইন্‌ প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণের বিবর্ত্তন বাদ মতের সঙ্গে গুপ্তবিদ্যার মতের ঘোর বিরোধ। এই উভয় মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক পণ্ডিতেরা মানুষের এবং মর্কটের একই পূর্ব্ব-পুরুষ বা জনক এক বন্য জন্তুকে নির্দ্দেশ কবেন। তাহাদের মতে কোন

বন্য জন্তু হইতে বানরের উৎপত্তি হইয়া পরে ক্রমোন্নতিতে সেই বানর কালে মানুষরূপে পরিণত হইয়াছে। গুপ্তবিদ্যামতে ইহা ভ্রমাত্মক। গুপ্তবিদ্যা বলেন, তৃতীয় অর্থাৎ দানবজাতির শেষ সময়ে মানুষ ও পশুর সংসর্গে বানরের উৎপত্তি হইয়াছে। তৃতীয় মণ্ডলের অবসান সময়ে কতকগুলি অতি নিকৃষ্ট নরনারীর আবির্ভাব হইল। তাহারা পশুত্ব ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র মানুষপদবাচ্য হইয়াছিল। তাহাদের মস্তক ক্ষুদ্র এবং তাহারা বোধ শক্তি বিহীন ছিল। তাহাদের স্ত্রীপুরুষ বিভাগ পৃথক হওয়ায় তাহারা সর্ব্বদাই কামে মত্ত থাকিয়া কেবল কাম রিপু দ্বারাই পরিচালিত হইত। তাহাদের মধ্যে সপ্তম বা শেষ বিভাগের কতকগুলি নিকৃষ্ট মানব মর্কট সদৃশ জন্তুর সঙ্গের মিলিত হইল। এই জাতীয় মানবে এবং শেষোক্ত বানরতুল্য জন্তুতে আকারে আচারে বড় কিছু প্রভেদ ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা ক্রমোন্নতিতে শেষোক্তগণ অনেক পশ্চাদ্‌পদ ছিল। এই অতি নিকৃষ্ট, বন্য মানবজাতির ও মর্কটাকার জন্তুর সংসর্গে এক অতি অদ্ভুত সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইল। তাহাদের অর্দ্ধেক শরীর মানবাকার এবং অপরার্দ্ধেক পশুর আকার। এই সঙ্কর জাতির বংশধরেরা আবার চতুর্থ জাতি অর্থাৎ দৈত্যকুলের হেয় ও নরাধম জাতির সঙ্গে মিলিত হওয়াতে এই উভয়ের সংসর্গে আর এক অভিনব জাতির উদ্ভব হইল। তাহারা পুরাতন গ্রীক জাতির ইতিবৃত্তে সেটির (Satyrs) বা পরী নামে খ্যাত। তাহারা নির্জ্জনে বনে বাস করিয়া সুসভ্য নরনারীর ভীতি এবং বিভীষিকা উৎপাদন করিত, আচার ব্যবহারে ঠিক পশু তুল্য ছিল। বর্ণিত জঘন্য সংসর্গের ফলে এই বন্য অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইল। বোধশক্তিবিহীন, পশুতুল্য মানবের পাপের এই পরিণাম !

গুপ্তবিদ্যা মতে এই সকল জীব হইতেই মর্কট জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এবং ক্রমোন্নতিতে আমাদের এই চক্রেই কালে তাহারা মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। বর্ত্তমানে চতুর্থ মণ্ডল চলিয়াছে। এই মণ্ডলের ষষ্ঠ ও সপ্তম মৌলিক জাতির আবির্ভাবে ইহারা মানবীয় কামদেহ মাত্র লাভ করিবে। পরবর্ত্তী পঞ্চম চক্রে তাহারা প্রকৃত রূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। কালে বানর পূর্ণ মানুষ হইবে।

দৈত্যকুলের আবির্ভাবের এবং ক্রমোন্নতির জন্য মাতা বসুমতী উপযোগিণী হইলেন। কাল ক্রমে তাহাদের জন্ম হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহাদেব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ

সাংখ্যদর্শনং।

সাংখ্যসুধাখ্যয়া নূতনব্যাখ্যাসমেতং।

(আ) জিজ্ঞাসুশিষ্যানুগ্রহার্থং শাস্ত্রমারভমাণঃ পরমদয়ালুর্মহর্ষির্ভগবান্ কপিলঃ শাস্ত্র প্রতিপাদ্যং মুখ্য যোজনমাহ।

(সূ°) অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১।

(অ) অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ অত্যন্তপুরুষার্থঃ (উচ্যতে)।

(ব্যা) অথ শব্দ উচ্চারণমাত্রেণ মঙ্গলরূপঃ প্রকৃতে আনন্তার্থঃ। ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ (ত্রিপ্রকারাণি যানি দুঃখানি, তেষাং অত্যন্তং অত্যন্ত (অন্তং অতিক্রম্য বর্ত্তমানা) যা নিবৃত্তিঃ) সম্পূর্ণোচ্ছেদঃ, অত্যন্তপুরুষার্থঃ (অত্যন্তঃ পুরুষার্থঃ) মুখ্য প্রয়োজনং, উচ্যতে) শাস্ত্রৈঃ শাস্ত্রকৃদ্ভির্বেতি শেষঃ।

দুঃখং তাবৎ ত্রিবিধং—আধ্যাত্মিকং আধিভৌতিকং আধিদৈবিকঞ্চ; তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ, তত্রাদ্যং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণাং বৈষম্য-নিমিত্তং জ্বরাদিকং; দ্বিতীয়ং কামক্রোধাদিজনিতং মাশমাত্র নিমিত্তং; পশুপক্ষ্যাদিনিবন্ধনমাধিভৌতিকং, গ্রহাদিনিমিত্তকমাধিদৈবিকং, উক্তানাং দুঃখানাং স্থূলসূক্ষ্মসাধারণেন বর্ত্তমানভাবিত্বেন সম্পূর্ণোচ্ছেদঃ অত্যন্তপুরুষার্থঃ পুরুষস্য চরমং প্রয়োজনং মোক্ষ ইত্যর্থঃ ধর্ম্মার্থকামানাং পুরুষার্থত্বেঽপি ক্ষয়িত্বেন অতিশয়িত্বেন চ নাত্যন্তপুরুষার্থত্বমিতি॥ ১॥

অনুবাদ। জিজ্ঞাসু শিষ্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান্ কপিল জীবের চরম প্রয়োজন কি তাহাই বলিতেছেন। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ বা জীবের মুখ্য প্রয়োজন। ত্রিবিধ দুঃখ কি?

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক আবার দ্বিবিধ—শারীর ও মানস। বাতপিত্তশ্লেষ্মার বৈষম্যে শারীরিক, কামক্রোধাদি হইতে মানসিক, পশুপক্ষ্যাদি হইতে আধিভৌতিক এবং গ্রহাদি হইতে আধিদৈবিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই সকল দুঃখের স্থূলভাবে ও সূক্ষ্মভাবে অর্থাৎ বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে (অর্থাৎ চিরকালের জন্য) সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইলেই জীবের পরম প্রয়োজনসিদ্ধি (মোক্ষপ্রাপ্তি) হয়। ধর্ম্মার্থকামও পুরুষের প্রয়োজন বটে, কিন্তু তাহাদের তারতম্য ও বিনাশ থাকায় পরমপুরুষার্থ নহে।

আ নন্বু লৌকিকোপায়াদৌষধাদিতএব তৎসিদ্ধৌ তদর্থং কথমনেকজন্মপরম্পরাসম্পাদ্যে শাস্ত্র প্রতিপাদ্যে অতিদুষ্করোপায়ে প্রবৃত্তিরিত্যত আহ।

(সূং) ন দৃষ্টাত্তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ ॥ ২ ॥

(অ) দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিঃ ন (ভবতি), (কুতঃ) নিবৃত্তেঽপি অনুবৃত্তিদর্শনাৎ।

(ব্যা) দৃষ্টাৎ লৌকিকোপায়াৎ ঔষধাদিতঃ ; তৎসিদ্ধিঃ (তস্য সিদ্ধিঃ) ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপস্য অত্যন্তপুরুষার্থস্য নিষ্পত্তিঃ ; ন (ভবতি), অত্র হেতুমাহ নিবৃত্তেঽপীতি। দৃষ্টোপায়াৎ ঔষধাদিতঃ দুঃখে সামান্যতো বিনষ্টেঽপি ; অনুবৃত্তি দর্শনাৎ (অনুবৃত্তের্দর্শনং তস্মাৎ) পুনরাবির্ভাব দর্শনাৎ।

দৃষ্টোপায়াৎ সর্ব্বং দুঃখং ন নিবর্ত্ততে, যদপি নিবর্ত্ততে তজ্জাতীয়ং কাল বিশেষে পুনরাবির্ভবতীতি দৃষ্টোপায়ো দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিহেতুরিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। ঔষধাদি লৌকিক উপায় দ্বারাই তো এই সকল দুঃখের শান্তি হইতে পারে। তবে শাস্ত্রোক্ত কঠোর উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের "অত্যন্ত" নিবৃত্তি হয় না। "ক্ষণিক" নিবৃত্তি হইতে পারে। তাহাও আবার সকল দুঃখের হয় না। যে সকল দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু পুনরায় তজ্জাতীয় দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব লৌকিক উপায় দ্বারা পরমপুরুষার্থ লাভ অসম্ভব।

তর্হি দৃষ্টোপায়সাধ্যায়াং দুঃখনিবৃত্তেঃ কথং পুরুষার্থত্বমিত্যত্রাহ।

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং ॥ ৩ ॥

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ (দৃষ্টোপায়সাধ্যদুঃখনিবৃত্তেঃ) পুরুষার্থত্বং (অঙ্গীকার্য্যং)।

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ (প্রাত্যহিকায়াঃ ক্ষুধঃ প্রতীকার, প্রাত্যহিকর ক্ষুৎপ্রতীকারঃ বা তদ্বৎ) প্রতিদিন নিষ্পন্নক্ষুধানিবৃত্তিবৎ ; তৎপ্রতীকারবেষ্টনাৎ (তস্যপ্রতীকারঃ তস্য বেষ্টনং তস্মাৎ) দুঃখত্রয়াশ্চ লৌকিকোপায়েন নিবৃত্ত্যভিসন্ধানাৎ (দৃষ্টোপায়সাধ্যদুঃখনিবৃত্তেঃ) পুরুষার্থত্বং (অঙ্গীকার্য্যং)। যথা অন্নভক্ষণাদিনা প্রত্যহং নিবৃত্তায়াঃ ক্ষুধায়াঃ পুনরাবর্ত্তনেন প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারস্য পরমপুরুষার্থত্ববিরহেঽপি পুরুষার্থত্বং বিদ্যতে তথাত্রাপি ঔষধাদিনা নিবৃত্তস্য দুঃখস্য পুনরাবর্ত্তনেন দৃষ্টোপায়সাধ্যদুঃখনিবৃত্তেঃ পরমপুরুষার্থত্বাভাবেঽপি পুরুষার্থত্বসত্ত্বেবেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। দৃষ্ট উপায় দ্বারা যখন জীবের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তখন এগুলি অবলম্বন করিয়া লাভ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—লাভ আছে। পরম প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলেও, কোন না কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যেমন অন্নপানাদি দ্বারা চরম উদ্দেশ্য সাধিত না হইলেও ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হয়, সেইরূপ ঔষধাদি দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি না হইলেও ক্ষণিক শান্তি হইয়া থাকে।

দৃষ্টোপায়সাধ্যঃ পুরুষার্থো বিবেকিভির্হেয়ঃ ইত্যাহ।

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি সত্ত্বাসম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবে অপি সত্ত্বাসম্ভবাৎ প্রমাণকুশলৈঃ (দৃষ্টোপায়সাধ্যোদুঃখপ্রতীকারঃ) হেয়ঃ।

সর্ব্বাসম্ভবাৎ (সর্ব্বেষাং অসম্ভবঃ তস্মাৎ) দৃষ্টোপায়েন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্ত্যসম্ভবাৎ ; (যদ্বা সর্ব্বেষু অসম্ভবস্তস্মাৎ) সর্ব্বদুঃখেষু দৃষ্টোপায়ৈঃ প্রতীকারাসম্ভবাৎ ; সম্ভবেঽপি দৃষ্টোপায়েন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তেরঙ্গীকারেঽপি , সত্ত্বাসম্ভবাৎ (সত্ত্বস্য অসম্ভবঃ তস্মাৎ) তাদৃশদুঃখনিবৃত্তেঃ স্থৈর্য্যাসম্ভবাৎ পুনস্তজ্জাতীয়দুঃখাবশ্যম্ভাবাদিত্যর্থঃ ; প্রমাণকুশলৈঃ সুখদুঃখতত্ত্বাভিজ্ঞৈঃ বিবেকিভিঃ ; (দৃষ্টোপায়সাধ্যো দুঃখ প্রতীকারঃ) হেয়ঃ ত্যাজ্যঃ উপেক্ষণীয়ঃ দুঃখপক্ষে বিবেচনীয়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। কিন্তু বিবেকী ব্যক্তিগণ এই সকল লৌকিক উপায় পরিত্যাগ করেন। কেন না ইহাদ্বারা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব। আর সম্ভব হইলেও, ঐ নিবৃত্তি স্থিরা বা চিরস্থায়িনী হইতে পারে না। অর্থাৎ, কিছুকাল পরে দুঃখ পুনরাবির্ভূত হয়।

বিবেকিপ্রার্থনীয়শ্চ মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বং প্রতিপাদয়তি।

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

মোক্ষস্য উৎকর্ষাৎ অপি উৎকর্ষো (ভবতি) (কুতঃ) সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ।

মোক্ষস্য দৃষ্টোপায়াসাধ্যস্য পরমপুরুষার্থস্য ; উৎকর্ষাৎ অপি উৎকৃষ্টাৎ স্বর্গাদিতোঽপি, ন কেবলাৎ স্রক্‌চন্দন বরাঙ্গনাদিত ইত্যপ্যর্থঃ, উৎকর্ষঃ শ্রেষ্ঠত্বং, (ভবতি) ; (কুতঃ), সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ (সর্ব্বেভ্য উৎকর্ষঃ, তস্য শ্রুতিঃ তস্যাঃ) নিখিলপুরুষার্থেভ্য উৎকর্ষশ্রবণাৎ। স্বর্গাদীনাং ক্ষয়িত্বেন হীনাধিকভাবেন চ ন সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বং মোক্ষস্য অক্ষয়িত্বেন তারতম্যশূন্যত্বেন চ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বামিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। এক্ষণে মোক্ষই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। পুষ্পমাল্য, চন্দন, সুন্দরী রমণী প্রভৃতি যাবতীয় পার্থিব ভোগ্যবস্তু হইতে কেবল যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে ; উৎকৃষ্টতর স্বর্গীয় সুখ অপেক্ষাও ইহা শ্রেষ্ঠ। কেন? এইরূপ শ্রুতি আছে। বাস্তবিক পার্থিব সুখের ন্যায় স্বর্গীয় সুখ ও নশ্বর এবং তারতম্যদোষযুক্ত। সুতরাং মোক্ষই সর্ব্বোত্তম।

ননু নিবর্ত্ততাং দৃষ্টোপায়ঃ, অলৌকিকাৰ্ব্বৈদিককর্ম্মণ এব পরমপুরুষার্থসম্ভবে কিং বহ্বায়াসসাধ্যবিবেকাশ্রয়েণেত্যাৎ।

অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥ ৬ ॥

উভয়োঃ অবিশেষঃ চ।

উভয়োঃ দৃষ্টাদৃষ্টয়োঃ উপায়য়োঃ—দৃষ্টোপায়স্য ঔষধাদেঃ অদৃষ্টোপায়স্য শ্রুত্যুক্ত যাগাদেশ্চ ইত্যর্থঃ, অবিশেষশ্চ অবিশেষএব, চ শব্দ এবার্থে বিশেষো ন্যাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। যথাদৃষ্টসাধনেন ঔষধাদিনা নাত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিঃ তথা অদৃষ্টসাধনেন যাগাদিনাপীতি দৃষ্টাদৃষ্টসাধনায়াঃ ঔষধাদিযাগাদ্যোঃ দুঃখাত্যন্ত প্রতীকারেঽসামর্থ্যাৎ বিশেষাভাব এবেতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি না হইলেও, যাগযজ্ঞাদি অলৌকিক উপায় দ্বারা তো ইহা হইতে পারে। তবে শাস্ত্রোক্ত কঠোর নিয়মের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন যে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় উপায়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ মোক্ষপ্রদানে দুইটিই তুল্যরূপে অসমর্থ

অথ বন্ধমোক্ষয়োরুপপত্তয়ে বন্ধস্য স্বাভাবিকত্বং নিরাকরোতি।

ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ। ৭।

স্বভাবতো বদ্ধস্য (পুরুষস্য) মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ ন (সম্ভবতি)

স্বভাবতঃ স্বভাবাৎ স্বভাবেন বা, বদ্ধস্য দুঃখযুক্তস্য স্বাভাবিকদুঃখসম্বন্ধস্য (পুরুষস্য) মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ (মোক্ষায় মোক্ষস্য বা সাধনং, তস্য উপদেশঃ, তস্য বিধিঃ) মোক্ষপ্রযোজকবিবেকজ্ঞানোপদেশবিধানং শ্রৌতস্যানুষ্ঠানমিত্যর্থঃ ন নৈব (সম্ভবতি), স্বভাবস্য যাবদ্দ্রব্যস্থায়িত্বাদিতি ভাবঃ। ৭ ॥

অনুবাদ। পুরুষের বন্ধন স্বাভাবিক নহে, কারণ, বন্ধন স্বাভাবিক হইলে, বন্ধন নহে। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে কেহ রত বা ব্রতী হইতেন না।

কিমায়াতমেতেন ইত্যাহ।

স্বভাবস্যান পায়িত্বাদনমুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যং। ৮।

স্বভাবস্য অনপায়িত্বাৎ অননুষ্ঠানলক্ষণং অপ্রামাণ্যং (ঘটতে)।

স্বভাবস্য অবশ্যরূপস্য (বনস্য), অনপায়িত্বাৎ অবিনাশিত্বাৎ যাবদ্দ্রব্যস্থায়িত্বাৎ, অননুষ্ঠানলক্ষণং (ন অনুষ্ঠানং, তৎ লক্ষণং যস্য তৎ) অনুষ্ঠানাভাবরূপং; অপ্রামাণ্যং প্রমাজ্ঞানাসাধকত্বং (ঘটতে)। স্বভাবস্যযাবদ্দ্রব্যস্থায়িত্বেন স্বাভাবিকবন্ধনিরাসার্থং অনুষ্ঠানাং বিফলমিতি অননুষ্ঠানেন তদুপদেশশ্রুতীনামপ্রামাণ্যমিতি ভাবঃ। ৮ ॥

অনুবাদ। যাহার যেরূপ স্বভাব তাহা চিরকালই সেইরূপ থাকে, কিছুতেই তাহার বিনাশ সাধন হয় না। বন্ধন যদি পুরুষের স্বভাবই হয়, তাহা হইলে সে চিরকাল বদ্ধই থাকিবে; আর বন্ধন মুক্তি হেতু লোকে যদি শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান না করে তবে শ্রুতি অর্থাৎ শাস্ত্রের উপদেশ বৃথা হয়।

নমু শ্রুতিবনাদেবানুষ্ঠানং ঘটতামিত্যাহ।

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ। ৯।

অশক্যোপদেশবিধিঃ ন (সম্ভবতি) (যতঃ) উপদিষ্টে অপি অনুপদেশঃ।

অশক্যোপদেশবিধিঃ (অশক্যায় অশক্যস্য বা উপদেশঃ তস্য বিধিঃ) সাধয়িতুমযোগ্যায় উপদেশবিধানং শ্রৌতবিধ্যনুষ্ঠানং, ন (সম্ভবতি); (যতঃ) উপদিষ্টেঽপি অশক্যফলস্য উপায়ে কথিতেঽপি; অনুপদেশঃ উপদেশাভাব এব। তাদৃশ উপদেশঃ উপদেশাভাসএব নং পরমার্থত উপদেশ ইত্যর্থঃ। ৯ ॥

যদি বলেন যে শাস্ত্রোক্ত উপদেশ মত একবার অনুষ্ঠান করিয়া দেখা যাউক তদুত্তরে বলিতেছেন যে অশক্য ফলের উপদেশ দেওয়া না দেওয়া সমান। অর্থাৎ, সে উপদেশ মত ক্রিয়ায় কিছুতেই ফল লাভ হয় না।

অত্রশিক্ষতে।

শুক্লপটবদ্ বীজবচ্চেৎ। ১০।

শুক্লপটবৎ বীজবৎ চেৎ (ঘটতে)। শুক্লপটবৎ (শুক্লঃ পটঃ তদ্বৎ), বীজবৎ বীজস্যেব, চেৎ, যদি (ঘটতে)। যথা শুক্লবস্ত্রস্য স্বাভাবিকমপি শৌক্ল্যং মঞ্জিষ্ঠাদিনা নিরাক্রিয়তে, যথা বা বীজস্য স্বাভাবিকীস্যপি অঙ্কুরজননী শক্তিঃ বহ্নিনা দূরীক্রিয়তে তথা পুরুষস্য স্বাভাবিকমপি বন্ধনং তত্ত্বজ্ঞানেনাপনীয়েতেতি তৎ সাধনোপদেশবিধির্ঘটতেত্যাসাঙ্কার্থঃ। ১০॥

এরূপ আপত্তি হইতে পাবে যে কোন কোন স্থলে স্বভাবেরও ব্যতিক্রম দেখা যায়—যেমন শুক্লবস্ত্র মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা রঞ্জিত হইলে তাহার স্বাভাবিক শুক্লত্ব নষ্ট হয় আর অগ্নির উত্তাপে বীজের জনন শক্তিও নষ্ট হয় তেমন পুরুষেরও স্বাভাবিক বন্ধন নষ্ট হইতে পারে। ইহার উত্তরে পরসূত্রে বলিতেছেন—

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ॥ ১১॥

অশক্যোপদেশঃ ন (ভবতি) (কুতঃ শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং।

অশক্যোপদেশঃ (অশক্যায় অশক্যস্য বা উপদেশঃ) নিরাকরোতি। ন (ভবতি), অত্র হেতুমাহ শক্ত্যেতি। (উদ্ভবশ্চ অনুদ্ভবশ্চ তৌ, শক্তেরুদ্ভবানুদ্ভবৌ তাভ্যাং) শক্ত্যাবির্ভাবতিরোভাবাভ্যামিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তে বস্ত্রাগে রজকব্যাপারেণ শুক্লস্যাবির্ভাব, মঞ্জিষ্ঠাদিনা তিরোভাব, যোগিসঙ্কল্পাদিনা অঙ্কুরজননশক্তেরাবির্ভাবঃ অনলেন তিরোভাব স্বমস্ববর্ত্তি ননু স্বাভাবিকয়োঃ শৌক্ল্যাঙ্কুরশক্ত্যোর্নিরাকরণমিতি ভাবঃ॥ ১১॥

তাহা নহে—অশক্যের উপদেশ ঘটে না। দৃষ্টান্তস্থলে মঞ্জিষ্ঠা ও রজক ব্যাপারে শুক্লের তিরোভাব ও আবির্ভাব যোগীদের কৃপায় বহ্নিদগ্ধ বীজের পুনঃ জননশক্তি ঘটিতেছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে বস্ত্রের শুক্লত্ব ও বীজের অঙ্কুরজননীশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই (নিরাকরণ হয় নাই) প্রচ্ছন্নাবস্থায় ছিল। ইতি স্বাভাবিক প্রকরণ। ক্রমশঃ

শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (আদর্শাবলী)।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রমজীবীদিগের উপর মূলধনীগণের অত্যাচার পরিমিত করণার্থে বিধি বিধান এবং অন্যান্য অসংখ্য জনহিতকারী চেষ্টা সংসাধিত হইতেছে। সাধারণ বিবেকের পরিবর্দ্ধন ও সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশ উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, এবং পূর্ব্বতন স্বার্থপরতা ও পার্থক্যভাবের উপর বিজয় লাভ করিতেছে। যে স্বত্বাদর্শ চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছে তাহা, যে কর্ত্তব্যাদর্শ ঐ দৃঢ়তাকে সৌজন্য ও মধুরতাময় করিবে, তাহার নিকট এক্ষণে হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছে, এবং ইটালী নগরীয় স্বাধীনতাদূত ম্যাজিনীর শিক্ষার মুখ্য বিষয় এই যে সকল ব্যক্তিরই স্বত্ব প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করা অপেক্ষা বরং কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে শিক্ষা করাই বিধেয়।

যৎকালে পাশ্চাত্য জগৎ সম্প্রসারণ প্রণালী অবলম্বনে উহার আদর্শের ক্রমপরিবর্ত্তন সংসাধন করতঃ কর্ত্তব্যকে স্বত্বাপেক্ষা উচ্চতর আসন প্রদানে উদ্যত হইয়াছে, তৎকালে প্রাচ্য জগৎ সঙ্কোচন প্রণালীর দ্বারা ইহার কর্ত্তব্যের পরিসর উত্তরোত্তর সঙ্কীর্ণ করতঃ ইহার আদর্শকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে। ইহা এবং অন্যান্য শোচনীয় ফলাদি আধ্যাত্মিক ভাবের ক্রমহীয়মানতা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং একত্ব জ্ঞানের অপক্ষয়ের সহিত কর্ত্তব্যও অধিকতর সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পারিবারিক কর্ত্তব্য-সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত আহরণে প্রতিযোগীতার পরিবর্ত্তে সহযোগীতা, ও অধিকতর সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পারিবারিক কর্ত্তব্য জ্ঞান এখনও অত্যন্ত বলবৎ আছে বটে, কিন্তু সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান, জাতীয় কর্ত্তব্য-জ্ঞান, কোথায়? বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই, যৎসামান্য লোকেরই, সাধারণের প্রতি ও স্বদেশের প্রতি কোনরূপ ব্যবহারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক জ্ঞান হীয়মান হওয়াতে বিশ্বব্যাপী সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞানও উহার অনুসরণ করিয়াছে। পুরাকালের "জনহিতব্রতরত" সেই মনস্বীগণ এক্ষণে কোথায়? এক্ষণে আমাদিগের মধ্যস্থলে অন্যায়াদি আচরিত হইতে দেখিলে লোকে বলে "ইহাতে আমার আবশ্যক কি? ইহাতে আমি হাত দিব কেন?" জনৈক প্রতি অন্যায় আচরণ যদ্বশতঃ সর্ব্বজন প্রতি অন্যায় আচরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে সেই ঐক্যভাব কোথায়? কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে নিগৃহীত হইতে দেখিলে আপন সহোদর বোধে তাহাকে ত্বরিত সাহায্য দানে অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি কোথায়? কোন অন্যায়াচরণ দর্শনে, কোন বিগর্হিত ব্যাপার শ্রবণে, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে এইরূপ অনুভব হওয়া উচিত যে "যখন আমার ভ্রাতার প্রতি কোনও অন্যায় আচরিত হই-

য়াছে, তখন ইহা আমার প্রতিই আচরিত হইয়াছে; তাহার নিগ্রহ আমারই নিগ্রহ, আমার বল তাহারই বল।"

বৎসগণ, তোমরা কি বিবেচনা কর যে, ছাত্রগণকে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করাইবার উদ্দেশে, তাহাদিগকে কেবলমাত্র কৃতকর্ম্মা উকীল, প্রতিভাবান বিচারক, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিজীবী ও সুদক্ষ পণ্ডিত অথচ দেশানুরাগবর্জ্জিত ও সাধারণহিতানবহিত মানবগণ স্বরূপ জগতে প্রেরণ করিবার উদ্দেশে, এই কেন্দ্র হিন্দু বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না! ভারতের ভবিষ্যতের জন্য, তাঁহার অধিবাসীগণের সমুন্নতির জন্য, মাতৃভূমীর সমুদ্ধারের জন্য, আমরা শ্রম ও সময় ব্যয়ে, আত্মত্যাগ স্বীকারে, এই বিদ্যালয়টীকে অটল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ও সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত করিতেছি। যাহাতে লোকে সাধারণহিতোৎসাহী, স্বদেশমঙ্গলপরায়ণ, উদারচরিত ও উন্নতাভিলাষী হইতে পারে, যাহাতে এই অযুতাযুত ভারতবাসীগণের সান্দ্র সংখ্যাকে নিঃসহায় জনতা মাত্র ও উহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা না করিয়া, স্নেহভাজন ভ্রাতৃবৃন্দ জ্ঞানে উহাদিগকে উপদেশ দান ও সাহায্য করিতে উদ্যুক্ত এবং সাধারণহিতব্রতরত ব্যক্তিগণ ভারতক্ষেত্রে পুনঃপ্রেরিত হইতে পারে, তদুদ্দেশেই আমরা এখানে শ্রমপর হইয়াছি। গৌরব, বা অর্থ, বা যশ, বা ক্ষমতা, বা প্রভুত্বের জন্য তোমাদিগকে আমাদের ছাত্রগণ স্বরূপ বিদ্যা উপার্জ্জনে রত দেখিতে, বা তোমাদিগের তরুণ হৃদয়ে উৎসাহাশিখা প্রজ্জ্বলিত দেখিতে আমরা ইচ্ছা করি না। পরন্তু, তোমাদের তরুণ হৃদয়ে একটী বরণীয় আদর্শ পূজিত হইতে দেখিতেই, এবং, দুর্ব্বলজনগণকে রক্ষা করিয়া, দরিদ্রদিগের প্রতিপালনে ও তাহাদের অবস্থা উন্নয়নে সহায়তা করিয়া, "ভারতভূমীকে" জগদ্বাসীগণের মধ্যে উচ্চাসনে আসীনা করাইয়া ও জাতীয় জীবনে একত্ব দর্শনকারী কর্ত্তব্যাদর্শ স্ব স্ব জীবনে প্রকটীকৃত করিয়া গৌরবার্জ্জন করিবার গরীয়সী আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তোমাদের তরুণ হৃদয় প্রোৎসাহিত দেখিতেই আমাদের বাসনা।

শ্রীসাধুসেবক শর্ম্মা।

অলৌকিক ঘটনা।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুড়ুলগাছি নামে একটী গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামে বিষ্ণুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাস। তিনি এক জন বদ্ধিষ্ট ব্যক্তি। আজ কয়েক বৎসর তাঁহার বাটীতে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব হইতেছে। এই উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উপায়ন্তর না দেখিয়া বাটী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে অন্যত্র যাইয়া বাস করেন, তথাপি

ভূতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না—তথায়ও নানারূপ উপদ্রব হইতে লাগিল। কি করেন নিরুপায় হইয়া অগত্যা আবার নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসেন। এখনও পূর্ব্ববৎ উপদ্রব হইতেছে। কত ওঝা আসিল, কত মন্ত্র পাঠ হইল, কত হোম স্বস্ত্যয়নাদি হইল,—কিন্তু কিছুতেই উপদ্রবের নিবৃত্তি হইল না। সে মৃত ব্যক্তি কে, কি চাহে, কেন এরূপ উপদ্রব করে, তাহা কিছুই সে প্রকাশ করিয়া বলেও না আর উপদ্রব করিতেও ক্ষান্ত হয় না। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার পরিবারস্থ যত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল গয়াধামে যাইয়া তাহাদের সকলের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। তিনি এক্ষণে বিষম বিপদে পতিত হইয়াছেন—কিরূপে উদ্ধার লাভ করিবেন ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন।

এইরূপ ব্যাপার শুনিয়া একদিন পল্লীস্থ কয়েকজন ভদ্রলোক ভূত দেখিবার মানসে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে ভূতযোনি সম্বন্ধে নানারূপ কথোপকথন হইতেছে—তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন—"কৈ, আমরা এতক্ষণ বসিয়া আছি, কিছুইত দেখিতে পাইলাম না।" এই কথা বলিবামাত্র তাঁহারা শুনিলেন যেন কোন এক ব্যক্তি উচ্চ হাস্য করিতে করিতে বৈঠক-খানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া যাইল। তাঁহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—কেবল উচ্চহাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন। উপর্য্যুপরি কয়েকবার এইরূপ হইল। তাঁহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

প্রতিদিন নানারূপ উপদ্রব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে দুই একটী বিবৃত হইল।

কাহাকেও ভাত দিবার জন্য হয়ত মেয়েরা কেহ অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া ভাতের থালা লইয়া যাইতেছে, অকস্মাৎ থালা হস্ত হইতে শূন্যে কোথায় চলিয়া যাইল, কে—কোথায় লইয়া গেল, কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। অনেক অনুনয় বিনয় করিলে পর থালা আবার যথাস্থানে স্থাপিত হইল। কোন দিন বা উপর হইতে গৃহমধ্যে একটা বিষ্ঠার হাঁড়ি পড়িল। কোন রাত্রে বা যখন সকলে নিদ্রায় অচেতন—গৃহের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ—অকস্মাৎ উপর হইতে হুড় হুড় শব্দে জল পড়িয়া শয্যাদি সমস্ত ভিজাইয়া দিল। এখনও প্রত্যহ ইত্যাকার নানারূপ উপদ্রব হইয়া থাকে।

এক দিন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি ভূতকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—"হাঁরে, তুই কেবল এই রকম উৎপাত করবি—যদি আমাদের কিছু টাকাকড়ি দিস্ তাহলেও বুঝি যে পেটে খেলে পিঠে সয়।" এই কথা বলিবামাত্র গৃহমধ্যে যেখানে সকলে বসিয়াছিলেন উপর হইতে সেইখানে একটী পয়সা পতিত হইল। সকলে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—যথেষ্ট হইয়াছে—আর আবশ্যক নাই।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যান্নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ } অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

একীকরণ।

প্রায় জীবমাত্রের ভেদজ্ঞান আছে। এটা ভাল এটা মন্দ, এটা ধর্ম্ম এটা অধর্ম্ম, এটা শুচি এটা অশুচি, এটা উষ্ণ এটা শীতল, এটা মধুর এটা তিক্ত, ইহা সুগন্ধ উহা দুর্গন্ধ, ইহা সুশ্রাব্য উহা কুশ্রাব্য, ইহা সুন্দর উহা কুৎসিত—ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বোধ সকল জীবেই বিদ্যমান। এবং এই দুয়ের মধ্যে যেটি ভাল তৎপ্রতি অনুরাগ এবং যেটি মন্দ তৎপ্রতি বিদ্বেষ—ইহাও প্রত্যেক জীবের অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং ভগবান ইহার সমর্থন করিয়াছেন যথা "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ"। কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়াছেন "তয়োঃ ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ"।—কদাপি রাগদ্বেষের (দ্বন্দ্বের) বশীভূত হইও না, কারণ উহা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী। বাস্তবিক, এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিতেই পারে না,—নির্দ্বন্দ্বতাই ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ ভগবান তাহা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন :—

বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ৫। ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ৫।১৯
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে॥ ৬। ৮
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥ ৪। ২৪
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ১৩। ৩০

"গরু, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল এবং বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ—জ্ঞানীর চক্ষে ইহারা সকলেই সমান। যাঁহাদের এই প্রকার সমজ্ঞান জন্মিয়াছে তাঁহারা এইখানেই সংসার জয় করিয়াছেন (অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন) এবং যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সর্ব্বদা একরূপ তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছেন। সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য বন্ধু, সাধু ও পাপীকে যিনি সমান জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। যিনি মনে করেন এই ঘৃত ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, আহুতি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম এবং এই কর্ম্মও ব্রহ্ম (অর্থাৎ যিনি জগতে বিভিন্ন বস্তু দেখিতে না পাইয়া এক ব্রহ্মই সর্ব্বত্র দেখিতে পান), তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। যিনি এই অসংখ্য পৃথগ্‌বস্তুগুলিকে একবস্তু হইতে উৎপন্ন এবং একই বস্তুতে লীন হইতে দেখেন, তিনি ব্রহ্ম হন।" উপনিষদেও ঠিক এই কথা পাওয়া যায়,—যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।

তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ঈশ-৭

"সকল বস্তুই আত্মা (ব্রহ্ম) যাঁহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, যিনি বহুত্বের মধ্যে একত্ব দেখিতে পান, তাঁহার মোহ কি এবং শোকই বা কি?"

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে প্রকৃতির সর্ব্বত্র এই অসংখ্য বহুগুলি মিশিয়া এক হইবার জন্য যেন প্রাণপণে একটা সংগ্রাম করিতেছে। সূর্য্য গ্রহগণকে আকর্ষণ করিতেছে এবং গ্রহগণও সূর্য্যকে টানিতেছে; নির্ঝর নদীতে মিশিতেছে, নদী সমুদ্রাভিমুখে ছুটিতেছে, সমুদ্র চন্দ্রের সঙ্গমেচ্ছু। প্রত্যেক

পদার্থই অপরের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে। একটি পরমাণুও একাকী থাকিতে ভালবাসে না, সর্ব্বদা কাহারো না কাহার সহিত মিলিয়া থাকিতে চায়। আপনি যদি বলপূর্ব্বক একটি জলজান (Hydrogen) পরমাণুকে তাহার অম্লজান (Oxygen) ভ্রাতা হইতে বিচ্যুত করেন, দেখিবেন এই অবস্থায় (in the nascent state) তাহার কি রোষ, কি তেজ! সে তখন যাহাকে নিকটে পাইবে তাহার সহিত মিশিতে যেন কৃতসংকল্প! প্রাণিগণও সর্ব্বদা দলবদ্ধ থাকিতে চায়—পিপীলিকা, মশক, মধুমক্ষিকা, পক্ষী, মেষ, মহিষ, মৃগ, হস্তী, বানর। জোড়ের একটি পায়রাকে হত্যা করায় অপরটি মনোদুঃখে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। মানবের সমাজপ্রিয়তার তো কথাই নাই। খুব কঠিন অপরাধের জন্য "নির্জ্জন কারাবাস" ই উপযুক্ত দণ্ড ইহা হইতেই বুঝা যায় মানুষ অপরের সহিত কিরূপ মিশিয়া যাইতে চায়। কবি শেলি প্রতিভাবলে প্রকৃতির সর্ব্বত্র এই মিলনেচ্ছা—এই একীভবনের চেষ্টা বেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি মানবের অভ্যন্তরটি পরীক্ষা করি, তাহা হইলে সেখানেও এই একীকরণের চেষ্টা (attempt at unification) স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। দেখা যায়, মানব ঘটনামাত্রের কারণ জানিতে চায়। আজ যদি তাহার সম্মুখে একটা অভিনব বা অসাধারণ ঘটনা ঘটে, কেন ইহা হইল, কিরূপে হইল ইত্যাদি জানিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং যদবধি না জানিতে পারে তদবধি শান্তি পায় না। প্রত্যেক ঘটনা আমরা বুঝিতে চাই,—কারণ জানিতে চাই। এই "বুঝা" শব্দের অর্থ কি দেখা যাউক। প্রকৃতির কতকগুলি নিয়ম আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি। যদি অভিনব ঘটনাটিকে এই সকল পরিচিত নিয়মের অধীন করিতে পারি, অন্ততঃ একটি নিয়মের মধ্যেও ফেলিতে পারি, তবেই আমরা বলি "ঘটনাটি বুঝিয়াছি"। মনে করুন বৃষ্টিপাত একটি ঘটনা। যখন মানব ইহার কারণানুসন্ধানে প্রথম প্রবৃত্ত হন, তখন প্রকৃতির নিম্নোক্ত নিয়মগুলি তাঁহার জানা ছিল, যথা (১) উত্তাপ বস্তু মাত্রকে (অন্ততঃ জলকে) বাষ্পে পরিণত করিতে পারে, (২) শৈত্য সংযোগে বাষ্প ঘনীভূত ও তরল হইতে পারে, (৩)

মাধ্যাকর্ষণ বশতঃ গুরু বস্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় ইত্যাদি। সুতরাং একটু চিন্তা ও কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে বৃষ্টিপাত একটা অভিনব ঘটনা নহে,—তাঁহার পরিচিত নিয়মগুলিরই একটা দৃষ্টান্ত মাত্র (a particular instance only)। এইরূপে তিনি প্রত্যেক ঘটনাকে "এটিও আমার চিরপরিচিত বন্ধু" বলিয়া চিনিয়া লইতেছেন। বাস্তবিক, আমাদের স্বভাবই এই যে বিক্ষিপ্ত এবং অসংলগ্ন ঘটনা (stray and unconnected facts) আমরা দেখিতে পারি না—ভালবাসিনা, সর্ব্বদা তাহাদিগকে সংলগ্ন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চাই, একই নিয়মের মধ্যে আনিতে চাই। ইহা কি আমাদের একীকরণ প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন নহে?

প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক বস্তু মিলিত ও একীভূত হইবার জন্ত যেন অজ্ঞাতসারে ছুটিতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে যাহা অজ্ঞাত ভাবে ও অল্পে অল্পে ঘটিতেছে তাহা আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক চেষ্টা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র ঘটাইতে পারি কি না? ভেদজ্ঞান দূর করিবার, নির্দ্বন্দ্বতার পথে অগ্রসর হইবার কোন উপায় আছে কি? সাধনার কথা ছাড়িয়া কেবল চিন্তা ও বিচারের পথ লইলে আমরা মোটামুটি দুইটি উপায় দেখিতে পাই। ইহাদের একটিকে আরোহী ও অপরটিকে অবরোহী মার্গ বলা যাইতে পারে। আরোহী মার্গে অসংখ্য বহু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ একে উঠিতে হয় এবং অবরোহী মার্গে এক হইতে আরম্ভ করিয়া বহুতে নামিতে হয়। প্রথমোক্ত উপায়ে আমরা বহু-গুলিকে একে পরিণত ও পর্য্যবসিত করি এবং শেষোক্ত উপায়ে একই বহুভাবে ও বহুরূপে প্রকটিত—বিরাজিত ইহাই দেখিতে চেষ্টা করি। দুয়েরই উদ্দেশ্য—বহুত্বের মধ্যে একত্বস্থাপন বা অভেদজ্ঞান। আমরা এই প্রণালী দুইটির সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

আমরা চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বস্তু দেখিতে পাই—মানব, পশু, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, বায়ু ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ইহাদের প্রায় সকলগুলিই যৌগিক পদার্থ (compound bodies)। কেবল ৭০ টি বা ৭৫ টি মাত্র মূল পদার্থ (Elements) আছে এবং ইহাদেরই অসংখ্য সংযোগে অসংখ্য স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমষ্টি, লবণ সোডিয়ম ও ক্লোরিনের সমষ্টি,

চুণ , ক্যাল্‌সিয়ম ও অক্সিজেনের সমষ্টি। তিনি চন্দনে যে হাইড্রোজেন, কার্ব্বন প্রভৃতি দেখিতে পান, বিষ্ঠাতেও হয়ত বিভিন্ন অনুপাতে তাহাই দেখিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট মূত্র এতটুকু ফস্‌ফেট্‌, এতটুকু সলফেট্‌, এতটুকু ইউরিয়া ইত্যাদির সমষ্টি মাত্র। সুতরাং ইহার কিরূপ স্বাদ, কিরূপ ঘ্রাণ, আপেক্ষিক গুরুত্ব কত প্রভৃতি বিষয় তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি চিনির সরবতে যে মূলভূতগুলি দেখিতে পান, ক্ষারেও সেইরূপ কতকগুলিকে দেখিয়া দুটিকেই সমান চক্ষে দেখেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতবর ক্রুক্‌স্‌ (Crookes) প্রমাণ করিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিকের ৭০টি মূলভূত (স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি) প্রকৃতপক্ষে এক একটি যৌগিক পদার্থ,—একই চরম পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে উৎপন্ন। তাঁহার মতে স্থূল জগতের একটি মাত্র মূল উপাদান আছে। ইহাকে তিনি প্রোটাইল (Protyle) বলিয়াছেন। এই প্রোটাইল পরমাণুর বিশেষ বিশেষ সংঘাতে বিশেষ বিশেষ মূলভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রোটাইলের পরমাণু এক প্রকারে সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোজেন, অন্য প্রকারে সংযুক্ত হইয়া স্বর্ণ, তৃতীয় প্রকারে সংহত হইয়া পারদ ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে। এই আবিষ্কারের আলোকে দেখিলে মধ্যযুগের সুবর্ণীকরণের শক্তিটা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রবাদ আছে যে লৌহ, তাম্র প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারা যায়। যিনি লৌহাদিকে প্রোটাইলে পরিণত করিতে পারেন, স্বর্ণের উপাদান (Composition) অবগত আছেন এবং প্রোটাইলের পরমাণুকে সেইভাবে সংযোজিত করিতে সমর্থ, সুবর্ণীকরণ তাঁহার পক্ষে আদৌ অসম্ভব নহে।

সে যাহা হউক, ক্রুক্‌সের চক্ষে দেখিলে আমরা জগতে কি দেখিতে পাই ? দেখিতে পাই জল, বায়ু, মৃত্তিকা, প্রস্তর, ঘর, বাড়ী, রাস্তা, ঘাট, কাগজ, কলম, পোষাক, পরিচ্ছদ, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, নর, বানর, চন্দ্র, সূর্য্য— সমস্তই এক প্রোটাইল। স্বর্ণ যে প্রোটাইল, মৃত্তিকাও সেই প্রোটাইল, সুচিক্কণ বহুমূল্য মকমল্‌ যে প্রোটাইল বল্কলও সেই প্রোটাইল, চিনি যে প্রোটাইল কুইনাইনও সেই প্রোটাইল, মস্ত যে প্রোটাইল দুগ্ধও সেই প্রোটাইল, বরফ যে প্রোটাইল জ্বলিত অঙ্গারও সেই প্রোটাইল। দুর্গন্ধবাহী

ও কুৎসিৎ মেথর যে প্রোটাইল, জাহ্নবীস্নাত চন্দনচর্চ্চিতদেহ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণও সেই প্রোটাইল। জগতে যেন আর কিছুই নাই—সর্ব্বত্রই এক প্রোটাইল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন একটি অখণ্ড বিশাল প্রোটাইল-সমুদ্র এবং উহাতে যেন তদ্বিকারজাত অসংখ্য বস্তু ভাসিতেছে। একই প্রোটাইল নানারূপে ও নানাভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন সমুদ্রে অসংখ্য তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্বুদ উত্থিত হইয়া আবার মিশিয়া যায়, সেইরূপ এই প্রোটাইল হইতেই অসংখ্য ভূত উৎপন্ন হইতেছে, প্রোটাইলেই অবস্থিত আছে এবং প্রোটাইলেই বিলীন হইতেছে। এইজন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"অন্নাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে অন্নেন জাতানি জীবন্তি অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" এই "অন্ন" বা ultimate physical matter, প্রোটাইলেরই নামান্তর মাত্র।

যখন পূর্ব্বোক্ত চিন্তা খুব গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, যখন ভাবুক অন্ন ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না এবং তাঁহার মনে হয় তিনিই অখণ্ড বিরাট অন্ন-সমুদ্র, তখন গুরুদেবের গম্ভীর অথচ করুণাব্যঞ্জক ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়—"বৎস, ইহাই চরম নহে। আরও অগ্রসর হও।" শিষ্য পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে থাকেন—"আচ্ছা, অন্নই কি সব? অন্ন কি স্বয়ং পরিণমিত হইয়া এই বিশ্ব উৎপাদন করে? তা তো নয়। ঐ যে উহার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি—উহার প্রাণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অতএব এই প্রাণই সব। এই প্রাণই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ,—"প্রাণাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে প্রাণেন জাতানি জীবন্তি প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে প্রাণের ক্রিয়াটি স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। প্রাণ, শক্তিরই নামান্তর। Electric, Magnetic, Vital—সর্ব্ববিধ শক্তিই প্রাণ। লর্ড কেলভিন্ বলেন যে প্রোটাইলে বা ইথার-সমুদ্রে এক প্রকার ঘূর্ণন (Whirling motion) আবির্ভূত হইলে, ইথার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অসংখ্য স্থূলভূতে পরিণত হয়। যতক্ষণ এই ঘূর্ণী শক্তিটি থাকে ততক্ষণ ভূতগুলি ও থাকে; যেমন ঘূর্ণন বন্ধ হয় অমনি ভূতগুলি ইথারে পরিণত হইয়া যায়। অতএব শক্তিই ভূতগুলির উৎপত্তি ও নাশের কারণ। বিজ্ঞান আরও বলে যে, যে সকল পদার্থ আমাদের নিয়ত ইন্দ্রিয়গোচর

হইতেছে তাহারা প্রকৃত কিরূপ (অথবা আছে কিনা) নিশ্চয় বলা যায় না ; কেবল মাত্র এই বলা যায় যে নানাবিধ স্পন্দন (Vibrations) আছে। দেখা যায় একই স্পন্দন বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন করে। একটি উদাহরণ দিতেছি। সকলেই অবগত আছেন যে দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলি (Optic nerves) মস্তিষ্কের এক নির্দ্দিষ্ট কোটরে মিলিত হইয়াছে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলির (Auditory nerves) আর একটি নির্দ্দিষ্ট কোটর আছে, এইরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য মস্তিষ্কে পৃথক পৃথক কোটর বর্ত্তমান। এখন মনে করুন, কোন ব্যক্তির নেত্রসংলগ্ন স্নায়ুগুলিকে অক্ষি-জাল (Retina) হইতে বিচ্যুত করিয়া কর্ণের সহিত সংযুক্ত করিলাম এবং কর্ণ-সংলগ্ন স্নায়ুগুলিকে ঐরূপে নেত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম। ইহাতে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে দেখা যাইবে। * বায়ুর স্পন্দন উক্ত ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন আলোকরূপে এবং ইথারের স্পন্দন বিভিন্ন শব্দরূপে অনুভূত হইবে। তাঁহার নিকট রাগরাগিণীযুক্ত একটি গান গাহিলে তিনি কিছুই শুনিতে পাইবেন না, নানারূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইবেন এবং চক্ষুর সমীপে নানাবস্তু ধরিলে কিছুই দেখিতে পাইবেন না, বিবিধ শব্দ শুনিতে পাইবেন। যে স্পন্দন আমার নিকট একটি বৃক্ষ তাঁহার নিকট তাহাই একটি শব্দ, আবার হয়ত তৃতীয় ব্যক্তির নিকট তাহাই একটি স্বাদ (কটু বা তিক্ত)। ইহা দেখিয়া এই কথা বলা যায় না কি যে বৃক্ষ, শব্দ, স্বাদ—ইহাদের কোনটিই সত্য নহে, কেবল স্পন্দনই একমাত্র সত্য ? ভাল, এই স্পন্দন শব্দের অর্থ কি ? ইহাই কি শক্তি বা প্রাণ নহে ? অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল এক অখণ্ড বিরাট প্রাণই নানাবিধ স্পন্দনের দ্বারা নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন।

এইরূপে শিষ্য যখন সমগ্র জগৎকে প্রাণে লয় করেন, যখন প্রাণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না এবং নিজের সত্ত্বা ও প্রাণে মিশাইয়া দেন, তখন আবার গুরুদেবের স্বর শুনিতে পান—"বৎস, ইহাই শেষ নহে, আরও

* "If we could interchange the inward connections, we should feel the world in altogether new ways. If for instance, we could splice the outer extremity of our optic nerves to our ears and that of our auditory nerves to our eyes, we should hear the lightning and see the thunder, see the symphony and hear the conductor's movements." Prof James's Textbook of Psychology, page 12

অগ্রসর হও।" তিনি আবার চিন্তায় নিমগ্ন হন—"ভাল, স্পন্দনই কি সব? তাহা তো বোধ হয় না। এই তো আমার সম্মুখে একটি আম্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু যেমন এক পবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি Hypnotizer) দৃঢ়রূপে সংকল্প করিলেন যে উক্ত আম্র আমার নিকট একটি টাকা বলিয়া বোধ হইবে, কি আশ্চর্য্য তৎক্ষণাৎ আমি টাকাই দেখিতে লাগিলাম, আম্র দেখিতে পাইলাম না, অথচ আম্রটি বরাবরই সম্মুখে রহিয়াছে, আম্রের স্পন্দন বরাবরই মস্তিষ্কে আঘাত কবিতেছে। আবার একদিন রুদ্ধদ্বার গৃহে বসিয়া কয়েকটি বন্ধুব সহিত আলাপ করিতেছি। তন্মধ্যে একজন দৃঢভাবে (মনে মনে) সংকল্প করিলেন আমি এক ঝড়তুফানময় ভীষণ সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমি তৎক্ষণাৎ এক অকূল সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলাম! উঃ! কি ভয়ানক প্রকাণ্ড তরঙ্গ। কি প্রচণ্ড ঝড়!। কি ভীষণ গর্জ্জন।।। প্রাণের আশা ছাড়িযা দিলাম, তথাপি একবার প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে শেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার এই ভাব দেখিয়া পার্শ্বস্থ বন্ধুগণ তো অবাক্। যেমন উক্ত ব্যক্তি তাঁহার সংকল্পের প্রত্যাহার করিলেন, অমনি আব কোথায় কিছুই নাই,—বন্ধুপরিবেষ্টিত হইয়া আমি যেখানে বসিয়াছিলাম ঠিক সেই খানেই আছি। স্পন্দনই যদি সব হয় তাহা হইলে রুদ্ধদ্বার গৃহে সমুদ্রের স্পন্দন বা ঝড়ের স্পন্দন বা ভীষণ তরঙ্গের স্পন্দন কোথা হইতে আসিল? অতএব দেখা যাইতেছে স্পন্দন না থাকিলেও আমাদেব জ্ঞান বা অনুভূতি হইতে পারে। কিরূপে? সংকল্পের দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, মনের দ্বারা। আবাব আমাদের স্বপ্নটাই বা কি? শয্যায় নিদ্রা যাইতে যাইতে কত নূতন স্থানে যাইতেছি, কত অপূর্ব্ব বস্তু দেখিতেছি। ইহাদের একটিও আমার নিকট অপ্রকৃত নহে, সবগুলিই তৎকালে বাস্তব (Real)। কিন্তু উহাদের স্পন্দন কোথায়? অতএব মনই সব। এক অখণ্ড বিরাট মনই আছে, আর কিছুই নাই। এই অসীম মন অসংখ্যরূপে যে অসংখ্য চিন্তা করিতেছে, তাহাই জগৎ। বিরাট মন যখন সকল সংকল্প হইতে বিরত হইবে, সকল চিন্তা পরিহার করিবে, তখন জগৎ থাকিবে না—তাহাতে লীন হইয়া যাইবে। মন হইতেই জগতের উৎপত্তি, মনেই স্থিতি এবং মনেই লয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ধর্ম্ম সংস্থাপনই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাবতারের মুখ্য কারণ এবং সাধুগণের সাবধান ও দুরাচারগণের বিনাশ উহার আনুষঙ্গিক বিধায় গৌণ কারণ। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ স্বভাব, যাহার যাহা স্বভাব, তাহা তাহার ধর্ম্ম। স্বভাব প্রধানতঃ দ্বিবিধ; ঔপাধিক ও অনৌপাধিক। ঔপাধিক স্বভাব আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে দ্বিবিধ; আর অনৌপাধিক স্বভাব আধ্যাত্মিক; অতএব ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ। আধিভৌতিকাদি ত্রিবিধ ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতার হইয়া থাকে। ভূতসকল নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, উহাদিগকে পুনর্ব্বার নিজ নিজ ধর্ম্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান প্রপঞ্চে অবতরণ করেন; দেবতারা অভিমান বশতঃ নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, উহাঁদিগকে পুনর্ব্বার নিজ নিজ ধর্ম্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান প্রপঞ্চে অবতরণ করেন; জীবাত্মা নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, তাহাকে পুনর্ব্বার নিজ ধর্ম্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। ভূতসকলের ধর্ম্ম, জীবাত্মার ভোগ দ্বারা মোক্ষবিধানার্থ উপাধিনির্ম্মাণ; দেবতাদিগের ধর্ম্ম নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া উক্ত উপাধি নির্ম্মাণের সাহায্য করণ, আত্মার ধর্ম্ম, গুণাষ্টক বিশিষ্ট শুদ্ধ জীবত্ব প্রকৃতিগুণোৎপন্ন ভূতসকল কালবশে জীর্ণ হইয়া জীবের ভোগসমাধানে ও যথাযোগ্য উপাধিনির্ম্মাণে অসমর্থ হইলে, দেবতারা অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং অধিকারভ্রষ্ট হইলে, জীবসকল বিপথগামী হইয়া স্বাভাবিক শুদ্ধত্বলাভে বঞ্চিত হইলে, শ্রীভগবান ভূতসকলকে, দেবতাসকলকে ও জীবসকলকে স্ব স্ব ধর্ম্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের অবতরণে প্রপঞ্চে প্রয়োজনানুরূপ শক্তিসকলের সঞ্চার হইয়া থাকে। শক্তি সঞ্চারের ইহাই নিয়ম। আত্মার ভোগমোক্ষ বিধানার্থ করুণাময়, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর এইরূপই নিয়ম করিয়াছেন, জীবের ভোগমোক্ষ এই নিয়মেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; উহার প্রকারান্তর দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃত

ভূতসকল প্রকৃতি হইতে শনৈঃ শনৈঃ উৎপন্ন ও উপাধিরূপে পরিণত হইয়া জীবের ভোগমোক্ষের সাধন হয়; আধিকারিক দেবতাসকল শনৈঃ শনৈঃ আপনাপন অধিকার লাভ করিয়া জীবের ভোগমোক্ষের সহায়তা করেন; জীবসকল শনৈঃ শনৈঃ ভোগ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া মোক্ষ অর্থাৎ গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধ স্ব স্বভাব প্রাপ্ত হয়েন। উপাধিভাব ভূতসমূহের উৎকর্ষ; অধিকার-ভাব দেবতাদিগের উৎকর্ষ; গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধভাব-লাভ জীবাত্মার উৎকর্ষ। উক্ত উৎকর্ষের পথে প্রভূত বিঘ্ন বাধা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম না করিয়া কেহ কখনও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। বিঘ্ন বাধাই উন্নতির সোপান। বিঘ্ন বাধাই উন্নতির আনুকূল্য করিয়া থাকে। বীজ হইতে পুষ্প-ফল প্রসব-কারী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কোন বীজকেই প্রাকৃতিক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম না করিয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া পুষ্পফল প্রসব করিতে দেখা যায় না। বীজ বপনার্থ ক্ষেত্রের প্রয়োজন। ক্ষেত্র মধ্যে বপন ব্যতিরেকে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। ক্ষেত্রমধ্যে উপ্ত বীজ সর্ব্বদিগ্বর্ত্তিনী মৃত্তিকা দ্বারা বাধিত হইয়াই উষ্মাসংযোগে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ দ্বারা অধোভাগে মূল ও উর্দ্ধভাগে কাণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। এইরূপে বীজ সঞ্জাত অঙ্কুর উৎপন্ন ও বাহ্য প্রকৃতি দ্বারা ব্যাহত হইয়াই ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল ও পল্লবিত হয়। শাখা পল্লবাদি সমন্বিত বদ্ধমূল বৃক্ষও রবিকিরণ সংযোগ ও মেঘাম্বুসেক ব্যতিরেকে যথেষ্ট পুষ্পফল প্রসবে সমর্থ হয় না। তদ্রূপ প্রকৃতির গুণত্রয় পরস্পরাভিভাবকতা ব্যতিরেকে স্বস্বোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, এবং কথঞ্চিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন, অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাকৃতিক বিঘ্নবাধাসকল অতিক্রম পূর্ব্বক জীবোপাধি সংসাধনে সমর্থ হয় না; দেবতাসকল অসুরগণ কর্ত্তৃক পরিভূত না হইয়া নিজ নিজ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, এবং কথঞ্চিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন অনুগ্রহ ভিন্ন আসুরিক বিঘ্ন বাধা সকল অতিক্রম পূর্ব্বক শক্তিময় অধিকারে অবস্থান করিতে পারেন না; জীবাত্মাসকলও মায়া বিভব ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না; এবং কথঞ্চিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন, অনুগ্রহ ভিন্ন পরমপুরুষার্থ লাভে সমর্থ হয়েন না। ভোগাভিনিবেশ ও তজ্জনিত দুঃখ,

নৈরাশ্য, নৈরপেক্ষ্য, আগ্রহ ও শ্রীভগবৎকৃপাই সংসারকূপপতিত জীবের উদ্ধরণাবলম্বন। ভোগাভিনিবেশ ও তজ্জনিত দুঃখাদি ব্যতিরেকে জীবের আত্মোন্নতির উপায়ান্তর দেখা যায় না। আবার কথঞ্চিত উন্নতি লাভ করিয়াও শ্রীভগবানের করুণা ভিন্ন কোন জীবই শ্রীভগবদ্দাস্যরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন না। অতএব জীবের প্রতি কৃপা বিস্তারার্থই শ্রীভগবান প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণ দ্বারা যে কৃপা বিতরিত হয়, তদ্দ্বারাই জীবসকলের চরমোন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

কর্ম্ম তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে প্রথম পুরুষ কিরূপে ঈক্ষণদ্বারা তত্ত্ব উদ্ভূত করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় পুরুষ তত্ত্ব সকলকে অণুপ্রাণিত করিয়া জীবদেহ গঠন করিয়া দিলেন। জীবদেহে তিনি প্রাণরূপে থাকিয়া তাহাকে ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়াই জীবাত্মা সেই দেহ-সাহায্যে আপনার গুপ্ত ও অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশ করিতে পারেন। দ্বিতীয় পুরুষের প্রেরণায় জীবাত্মা ধাতু, উদ্ভিদ ও পশুদেহ আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধতর উঠিতে থাকেন। এখনও জীবাত্মার প্রকাশভার দ্বিতীয় পুরুষের হস্তে সম্পূর্ণ ভাবে ন্যস্ত; তাহার পর যখন ধীরে ধীরে তাহার কারণদেহের উন্মেষ হইল—যখন জীবাত্মা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীসমন্বিত মানবদেহ আশ্রয় করিতে সক্ষম হইলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি আপনার ভার আপন হস্তে লইতে আরম্ভ করিলেন। এই খানে বাস্তবিক কর্ম্ম আরম্ভ হইল। স্রোতমুখে যেরূপ তৃণখণ্ড ভাসিয়া যায়, ইহাতে তাহার যেমন কোনও স্বাধীনতা থাকে না, মানবজন্মের পূর্ব্বেও জীবাত্মা দ্বিতীয় পুরুষের জীবনস্রোতে ভাসিয়া চলিতে-ছিলেন, তাহার উন্নতি আপনার হস্তে নির্ভর ছিল না, কিন্তু এখন হইতে তাঁহার কর্ম্মের তিনিই স্বামী। তৃতীয় পুরুষের কার্য্য এই খানে আরম্ভ। এত দিন যে শক্তি ঘন অবরোধে অপ্রকাশ ছিল তাহা মনুষ্যের হৃদয় গহ্বরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—ইহাই তৃতীয় পুরুষভাব। দ্বিতীয় পুরুষের ভাব জননী-

ভাব। তিনিই জগন্মাতারূপে মানবকে উপযুক্ত সময়ে প্রসব করেন। জন্মাইবার পূর্ব্বে মাতৃজরায়ু মধ্যে মানবের দেহ বর্দ্ধন হইতে থাকে; জননী যাহা আহার করেন, তিনি যে চিন্তা বা বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাহা যাইয়া গর্ভস্থ শিশুশরীর পোষণ করিতে থাকে। যতদিন না শরীর-পুষ্টি-ক্রিয়া শেষ হয়, যতদিন না জরায়ু হইতে শিশু ভূমিষ্ট হয়, ততদিন তাহার স্বাধীন কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে না; কিন্তু ভূমিষ্ট হইবার পর হইতে, সে এই দেহ আশ্রয় করিয়া স্বাধীন ভাবে অবস্থান করে। অবশ্য নরদেহ আপন অধিকারে আনিতে তাহার সাত বৎসর অতিবাহিত হয়। ঠিক সেইরূপ, যতদিন না মানবের কারণশরীর গঠিত হয়, ততদিন মানবজীবাত্মা দ্বিতীয় পুরুষের গর্ভে অবস্থান করেন, অবশেষে তাঁহার কারণশরীর প্রস্তুত হইলে তিনি মানবরূপে স্বাধীন ভাবে ভূমিষ্ট হয়েন। ইহাই তৃতীয় পুরুষভাব। নবজাত শিশুর মত প্রথমে মাতৃবক্ষে স্তন্য পান করিয়া তাহার পর সংসারের মধ্যেও আত্মীয়ের সকাশে জগতের অনন্ত উপদেশের মধ্যে বর্দ্ধন হইতে হইতে পূর্ণ মানবে পরিণত হন। মানবজীবাত্মা তাঁহার পিতার মতই সচ্চিদানন্দময়, তবে প্রথমে তাঁহার সৎভাব, চিৎভাব, ও আনন্দভাব বীজরূপে অন্তর্নিহিত থাকে, পরে ইহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। আমরা মানব কি তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিলাম, এবং তাহার দেহ কিরূপ গঠিত ও তাহার কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ তাহাও দেখিলাম। এই বার আমরা পূর্ব্ব উদ্ধৃত ঋষিবাক্য ও কর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিব।

ননশ্যতি কৃতং কর্ম্মসদা পঞ্চেন্দ্রিয়ৈরিহ।
তেহ্যস্য সাক্ষিণো নিত্যং ষষ্ঠ আত্মা তথৈব চ॥

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব—অঃ ৭।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, এবং তাহা নষ্ট হয় না; মন ও ইন্দ্রিয়গণ তাহার সাক্ষী স্বরূপ থাকে। মানবের মানসে কোনও ভাব উদিত হইলেই, তাহার প্রভাব চিত্তে অঙ্কিত হয় এবং তৎসঙ্গে একটী মানসিক মূর্ত্তি অন্তর্জগতে গঠিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবাধিষ্ঠান-রঞ্জিত অণু দিয়াই আমাদিগের কাম ও মনোদেহ সৃজিত এবং ঐ সমস্ত অণুই আবার দেবদেহ গঠন করিয়া থাকে। কোনও বাসনা হৃদয়ে আবির্ভূত

হইলেই ভুবর্লোকীয় দেবাধিষ্ঠান-রঞ্জিত অণুগুলির স্পন্দন হইতে থাকে এবং একটী নির্দ্দিষ্ট আকারে গঠিত হইয়া যায়; এই নবনির্ম্মিত আকার-মন্দিরে তত্রত্য একজন দেবতা আসিয়া আশ্রয় লয়। ইহাই ঋষিবাক্যের "এলিমেণ্টল" —অভিনিবেশ। এই দেবাধিষ্ঠিত সৃষ্ট মূর্ত্তির অপর নাম ভুবর্লৌকিক মানসিক মূর্ত্তি। কারণ এই মূর্ত্তিগুলি বিশুদ্ধ বাসনা দ্বারা সৃজিত নহে, তাহারা চিন্তা সংমিশ্রিতা, যেরূপ ভাবনা করা যায়, তদনুযায়ী মূর্ত্তি গঠিত হয় ও একজন উপদেবতা আসিয়া তাহাকে অমনি আশ্রয় করে।

তমোগুণের ভাবনা হইলে তমোগুণী দেবতা আসিয়া, রজোগুণের ভাবনা হইলে রজোগুণী দেবতা আসিয়া, সাত্ত্বিক ভাবনা হইলে সত্ত্বগুণী দেবতা আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। যগুপি কেহ ক্রোধকে চিত্তে স্থান দেয়, তাহা হইলে ক্রোধ চিন্তার দ্বারা ভুবর্লোকের নিম্নস্তরের অণুদ্বারা যে মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহাতে তৎধর্ম্মী একজন অপদেবতা আশ্রয় গ্রহণ করিবেন—যাহার স্বভাবই অপরের অনিষ্ট করা। কেহ যগুপি বিষয়-ভোগ-বাসনা চিত্তে স্থান দেয়, তাহা হইলে তাহার সৃষ্ট ভুবর্লোক প্রকৃতিজাত-আকারমন্দিরে রজোগুণী অপদেবতা আসিয়া বাস করতঃ তাহার ভোগ-ইচ্ছা বাড়াইয়া দিবেন। সেইরূপ পরোপকার চিন্তায় যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হইবে তাহাতে সত্ত্বগুণী দেবতা আসিয়া বাস করেন ও পরোপকার ব্রতে আস্থা বাড়াইয়া দেন। যেমন স্থূল জগতে কার্য্য করিতে হইলে স্থূল দেহের সাহায্য ব্যতিরেকে হয় না, সেই রূপ সেই ভিন্ন ভিন্ন গুণ যুক্ত অপদেবতাগণ তাহাদিগের আপন আপন সূক্ষ্মদেহ সাহায্যে আমাদিগের সূক্ষ্মদেহের উপর কার্য্য করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র পূর্ব্বকথিত মানব-সৃষ্ট মূর্ত্তিকে "কৃত্যা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কোথাও আবার তাঁহাদিগকে "যজ্ঞদেবতা" বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত চিন্তাপ্রসূত মূর্ত্তির এক একটী নির্দ্দিষ্ট আকার ও বর্ণ আছে। সূক্ষ্মদর্শী সাধারণ মানবের ইন্দ্রিয়াগোচর, এই সমস্ত মূর্ত্তিকে দেখিতে পান। কিন্তু যজ্ঞের দ্বারা বা চিন্তার প্রাখর্য্যে এই সমস্ত মূর্ত্তি এত স্থূলীভূত হয় যে সাধারণ মানবও তাহাদিগকে কখন কখনও দেখিতে পায়।

যে ভাবনা হইতে ভুবর্লৌকিক মানসিক মূর্ত্তি উদ্ভূত হইয়াছে তাহার তীব্রতা ও একযোগিতার উপর ঐ মূর্ত্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করে। যাহা

বিশেষ তীব্রতার এবং মনোযোগিতার সহিত ধ্যায়িত হয় এবং বহুক্ষণ ধরিয়া চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, সেই ভুবর্লৌকিক মূর্ত্তি অধিককাল স্থায়িনী; কিন্তু যে সমস্ত সাধারণ ভাবনা মানসে উদিত হয় মাত্র, কিন্তু বিশেষভাবে ধ্যায়িত হয় না, তাহাদিগের দ্বারা যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হয় তাহা অতি শীঘ্র নষ্ট হয়।

এই চিন্তাসৃষ্ট মূর্ত্তিগুলির সহিত তাহাদিগের জনয়িতার একটী বিশেষ বৈদ্যুতিক সম্বন্ধ জন্মায়, এবং তাহার ফলে একটী চিন্তা আসিলে সেই জাতীয় চিন্তা বার বার আসিতে থাকে। এইটি আমরা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিব। সাধারণ মানবের অধিককাল বাঁচিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, অতএব ঐরূপ চিন্তার দ্বারা সেই সম্বন্ধীয় যে চিন্তামূর্ত্তি সৃজিত হয় তাহা তাহার অধিককাল থাকিবার ইচ্ছাকে প্রবল করিতে থাকে; এবং ঐ চিন্তা বার বার পোষণ করায় সে ঐ রূপ বহু মূর্ত্তির স্রষ্টা ও পোষয়িতা হওয়ায় তাহার অন্তরে এইরূপ এমন এক শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় যাহাতে তাহার আয়ু বাড়িয়া যাইতে পারে। কোন দুষ্টভাবনাজাত অনিষ্টকর চিন্তামূর্ত্তির বিশেষভাবে বার বার সেইরূপ ভাবনা দ্বারা পুষ্টি সাধিত হইলে তাহার বিশেষ কোন ইচ্ছা না থাকিলেও ঐরূপ দুষ্ট ভাবনা স্বতঃই আসিয়া পড়ে এবং অনিচ্ছায় অনেক মন্দকার্য্য হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনও মন্দ কর্ম্ম করিতে আমাদিগের আদৌ ইচ্ছা নাই, অথচ তাহা হইয়া পড়িতেছে; তাহার কারণ পূর্ব্বে ঐ সমস্ত চিন্তা এত পোষণ করিয়া আসিয়াছি, আমাদিগের সৃজিত চিন্তামূর্ত্তিগুলিকে এত প্রবলভাবে আমাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অভ্যস্ত করাইয়াছি যে এখন আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন এবং তাহাদিগের ক্ষুদ্র দাসের মত তাহাদিগের ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছি। পুনশ্চ আমাদিগের চিন্তার দ্বারা যেমন চিন্তাকৃত্যা সৃষ্ট হয় সেইরূপ আমাদিগের কামদেহ ও মনোদেহ গঠিত হইতে থাকে। সৎ চিন্তা দ্বারা আমাদিগের যে দেহ গঠিত হয় তাহা সাত্বিক ভাবপূর্ণ, সেইরূপ অসৎ চিন্তায় তামসিক অণুর দ্বারা আমাদিগের দেহ সৃজিত হয়। আমরা যে বৈদ্যুতিক সম্বন্ধের কথা বলিয়াছি তাহার কারণ সৎ ও অসৎ চিন্তার জন্য আমাদিগের দেহে যে সাত্বিকাদি অণু গ্রথিত হইয়া গিয়াছে তাহাই ঐ সমস্ত চিন্তাকৃত্যাগুলিকে আকর্ষণ

করিতে থাকে, এই আকর্ষণ ব্যাপার স্রষ্টার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

কিন্তু বিশেষ যত্ন সহকারে কার্য্য করিতে থাকিলে, পাপচিন্তা ও পাপ-কার্য্য করিবার বাসনাকে মানবমন হইতে উৎপাটিত করিতে পাবে।

অবশ্য তাহার দেহ ঐ সমস্ত অপবিত্র অণুসংগঠিত হওয়ায় (বা তাহার পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ) ঐ সমস্ত দুষ্ট চিন্তা বা পাপকার্য্যের বাসনা মনে প্রথম প্রথম স্বতঃই উদিত হইবে, কিন্তু মানসে উদিত হইবামাত্রই ঐ চিন্তা যদ্যপি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রথম প্রথম অকৃতকার্য্য হইলেও তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা ত্যাগ না করা হয় এবং তাহাব পরিবর্ত্তে তৎবিরুদ্ধধর্ম্মী উত্তম ভাবনা করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে নব নব দুষ্ট ভাবনা সংজাত ভুবর্লৌকিক মূর্ত্তির অভাবে পূর্ব্ব সৃষ্ট চিন্তামূর্ত্তি দুর্ব্বল হইতে থাকে। আবার দেহস্থ অপবিত্র অনুগুলিও অপবিত্র চিন্তার অভাবে ক্রমশঃ দেহ হইতে দূরীভূত হয়। এইরূপ মানব পূর্ব্ব অভ্যাস নষ্ট করিতে পারে। একদিকে প্রবল চিন্তা সৃষ্ট মূর্ত্তিগুলির ধ্বংস যেমন দুরূহ, অপবদিকে সেইরূপ মানবের পক্ষে আপনার দেহ পরিবর্ত্তনও অতিশয় আয়াসসাধ্য। মানবের আত্মশক্তির বিকাশ যত শীঘ্র সাধিত হয়, তাহার দেহের পরিবর্ত্তন তদনুযায়ী হয় না। যাঁহারাই আপন আপন চরিত্রগঠনকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাই এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সাধনের ইতিহাসের প্রতিছত্রে সাধকের নয়নাশ্রুতে এই সত্য প্রচাবিত। "হায়,—গুরুদের, এ আবার তোমার কি খেলা—যে পাপবাসনা মনে উদিত হইবা মাত্র আমি আপনার নিকটই লজ্জায় মৃতকল্প হইতেছি সেই বাসনার দ্বারাই আবার- আমি সময়ে অবিভূত হইতেছি! একি লীলা প্রভু, যে পাপচিন্তাকে আর মনে স্থান দিব না বলিয়া এত দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি, কোথা হইতে তাহা আবার আসিয়া আমাকে ভাসাইয়া দিতেছে।' অপবিত্র চিন্তার দ্বারা যে বাসনা ও মনোদেহ গঠিত হইয়াছে তাহা এখনও পূর্ণভাবে পবিত্রীকৃত হয় নাই,—এখনও তাহাতে অপবিত্র অণুর সমাবেশ আছে, তজ্জন্যই অসৎ ভাব ও অসৎ বাসনা আসিতেছে। কোনও অঙ্গ সঞ্চালন না করিলে তাহা যেমন কালে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায় সেইরূপ অপবিত্র দেহের পুষ্টি-সাধক পাপচিন্তা ও

বাসনা হইতে বিরত থাকিলে, মানবের অপবিত্র দেহ দুর্ব্বল হইতে থাকে। ক্রমে যেমন আমাদিগের শুষ্কচর্ম্ম দেহ হইতে দূরীভূত হয়, সেইরূপ সংচিন্তার দ্বারা পুণ্যদেহের পুষ্টি সাধনে আমাদিগের সূক্ষ্ম দেহের অপবিত্র অংশও দূরীভূত হয়। এক জন সুরাপায়ী মদ্যপানের বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল যে মদ্যপান আর করিবে না এবং মদ্যপান লালসাকে এতদূর বিমর্দ্দিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল যে তাহার জাগ্রত অবস্থায় পানেচ্ছা আসা দূরে থাকুক, সুরার নামে ঘৃণা আসিত। কিন্তু হায়! পূর্ব্ব অভ্যাস হইতে নিবৃত্ত হওয়া এত কঠিন যে স্বপ্নে মদ্যপানের সুখ অনুভব করিত। মদ্যপানের আশক্তি হইতে এবং পূর্ব্ব অভ্যাসের নিমিত্ত তাহার বাসনাদেহে অপবিত্র অণুর এত দৃঢ় সমাবেশ হইয়াছে যে এখন তাহা তাহার দেহ হইতে পরিষ্কৃত হয় নাই। তাহার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সেই সমস্ত চিন্তাকে জাগ্রত অবস্থায় আসিতে দেয় না সত্য, কিন্তু নিদ্রার কালে যখন তাহার বাসনাদেহ স্বাধীন ভাবে থাকে তখন পূর্ব্ব অভ্যস্থ চিন্তা ও বাসনা ক্রীড়া করিতে থাকে।

সেইরূপ আবার চিন্তামূর্ত্তিগুলিকেও ধ্বংস করা কঠিন। অতএব মন্দ চিন্তার পুষ্টির দ্বারা এবং মন্দ কার্য্যের দ্বারা উহাদিগকে প্রবল হইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। এই অতিশয় আবশ্যকীয় তত্ত্বটি আমাদিগের সাবধানে ধারণা করিয়া রাখা উচিত। হয়ত পূর্ব্ব জন্মের পরস্পরের কোনও কুকর্ম্মের জন্য এই জীবনে কোনও লোকের উপর কাহারও ঘৃণার ভাব সতঃই উদিত হয়, ঘৃণা মানবের উন্নতির পথের কণ্টক, যতদিন ঘৃণার ভাব থাকিবে ততদিন তাহার উন্নতি অসম্ভব, অতএব এই ভাব দমন করা তাহার বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। সকলেই আমরা ভগবানের অংশ এবং অন্তে তাঁহারি সকাশে যাইব, এই মুক্তবেণী তাঁহাতে যাইয়া আবার মুক্ত হইব! পার্থক্য ভাব রহিয়া যাইতে পারে না, এবং আমরা যদ্যপি সেচ্ছায় তাহা অপসরণ না করি, যদ্যপি কর্ম্মদেবতার ইঙ্গিত অবহেলা করি, তাহা হইলে যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে সেই ঘৃণার ভাবের পরিবর্ত্তে প্রেমের বন্ধন শিখিব। এই সংসার-অভিনয় ক্ষেত্রে আমরা যে একত্রে আসিয়াছি—শত্রু, মিত্র, রাজা, প্রজা, ভাবে যে সংমিলিত হইয়াছে—তাহার কি কোনও উদ্দেশ্য নাই? আমরা যে পূর্ব্ব জন্মে ঋণবন্ধনে পরস্পর জড়িত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে

তাহারই সুযোগ হইয়াছে মাত্র। অতএব ঘৃণার ভাব বর্দ্ধন না করিয়া শত্রুর যে গুণগুলি ভাল আছে তাহারই চিন্তা করা উচিত, ইহাতে তাহার সহিত একটী অদৃশ্য বন্ধন জন্মাইয়া যায়,—বৃক্ষ হইতে বায়ব্য শিকড় বাহির হইয়া যেমন তাহাকে অপর আশ্রয়ের সহিত সুদৃঢ় বন্ধন করে ও তাহার পুষ্টিসাধন করে, এই নবজাত প্রেম-শিকড়ও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও সুদৃঢ় হইয়া উভয়ের হৃদয়কে বাঁধিয়া ফেলে।

সৎচিন্তার অনুশীলন ও সাত্বিক কর্ম্মের দ্বারা সাত্বিক ভুবর্লৌকিক মূর্ত্তি জন্মায় ও পুষ্ট হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ তাহা এত বলবান হয় যে তাহাদিগের শীঘ্র নাশ হয় না। সেই ভাগ্যবান্ লোকের স্বভাব সাত্বিক ভাবাপন্ন হয় এবং রুচি ও চিন্তা সাত্বিক হয়।

চিন্তামূর্ত্তিগুলি অপর উপায়েও পুষ্ট হইতে পারে, যখনই এইরূপ মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়, সমান স্বভাবাপন্ন অপর সৃজিত মূর্ত্তিগণ স্বতঃই আকর্ষিত হইয়া উহার সহিত যুক্ত হয় ও যুক্ত হইয়া উহাকে প্রবল করিতে থাকে। উত্তম চিন্তামূর্ত্তি অপর সৃষ্ট উত্তম মূর্ত্তিকে আকর্ষণ করে এবং কর্ত্তার স্বভাব উন্নত করিয়া তাহার সৎকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দেয়। সঙ্গীতশাস্ত্রবিদেরা জানেন যে যদ্যপি কোনও স্থানে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র এক নির্দ্দিষ্ট সুরে সমন্বিত থাকে তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে কোনও একটীতে সঙ্গীত করিবা মাত্র অপরগুলিও সেই সুরে বাজিয়া উঠে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চিন্তা কৃত্যার নির্দ্দিষ্ট বর্ণ আকার ও শব্দ আছে অথবা প্রত্যেক মূর্ত্তিই একরূপ স্পন্দনকারী অণুসংগঠিত; অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম কিরূপে অপর চিন্তাকৃতির দ্বারা আমাদিগের চিন্তামূর্ত্তি পরিপুষ্ট হইতে পারে।

যেইরূপ কাহার চিন্তামূর্ত্তিসৃজিত সেই স্বভাবসম্পন্ন অপর মূর্ত্তিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ আবার তাহার সৃষ্ট মূর্ত্তি অপরের পাপ ও পুণ্য বৃদ্ধি করে। এইরূপে কোনও লোকের সহিত আমরা পার্থিব সংযোগে না আসিলেও আমাদিগের চিন্তা ও বাসনা অপরের ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধন করে। অপরের চিন্তার বা কর্ম্মের আমরা আংশিক দায়ী। আমাদিগের সৎচিন্তার দ্বারা অপরের উপকার সাধন করি, অসতের দ্বারা অপরের অনিষ্ট সাধন করি। আমাদিগের প্রার্থনা দ্বারা অপরের যে উপকার সাধিত হইতে পারে, ইহা

ঋষির কল্পনা নহে, ইহা সনাতন সত্য বাক্য। সেইরূপ অসৎ কৃত্যের দ্বারা প্রাণীদিগের অনিষ্ট সাধিত হয়।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অধ্যায়।

মানব জাতি।

১। ব্রহ্মার পরমায়ু।

৩৬০ দিনে এক বৎসর হয়।

কৃত যুগের পরিমাণ ১,৭২৮,০০০ বৎসর।

ত্রেতা যুগের পরিমাণ ১,২৯৬,০০০ বৎসর।

দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮৬৪,০০০ বৎসর।

কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২,০০০ বৎসর।

এই চারি যুগে এক মহাযুগ হয়।

তাহার পরিমাণ ৪,৩২০,০০০ বৎসর।

একাত্তর (৭১) মহাযুগে এক মন্বন্তর।

তাহার পরিমাণ ৩০৬, ৭২০,০০০ বৎসর।

এইরূপ চতুর্দ্দশ মনুর রাজত্ব কালে ৯৯৪ মহাযুগ গত হয়। তাহার পরিমাণ ৪, ২৯৪,০৭০,০০০ বৎসর। মনু + অন্তর = মন্বন্তর। এক এক মনুর অন্তরকালকে সন্ধি কহে।

এই সন্ধির পরিমাণ ছয় মহাযুগ, অর্থাৎ ২৫, ৯২০, ০০০ বৎসর।

এই চতুর্দ্দশ মনুর রাজত্ব কাল ও সন্ধির পরিমাণ ১০০০ এক সহস্র মহাযুগ।

এক সহস্র মহাযুগে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার এক দিন হয়।

এই দিনের পরিমাণকে কল্প কহে।

তাহার পরিমাণ ৪,৩২০,০০০,০০০ বৎসর। ব্রহ্মার এক রাত্রির পরিমাণও ঠিক্ তত বৎসর। ব্রহ্মার এক দিবসের (দিবা রাত্রির) পরিমাণ ৮,৬৪০, ০০০,০০০ বৎসর।

এইরূপ ৩৬০ দিবসে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। তাহার পরিমাণ ৩,১১০, ৪০০,০০০,০০০ বৎসর। এইরূপ ১০০ এক শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। ইহাকে এক মহাকল্প কহে।

তাহার পরিমাণ ৩১১,০৪০,০০০,০০০,০০০ বৎসর। এক কল্পের ইতিহাসকে পুরাণ কহে। পর + অদ্ধ = পরাদ্ধ। পরাদ্ধের অধিক গণনা নাই। ব্রহ্মার অদ্ধেক পরমায়ুর পরিমাণকালকে এক পরাদ্ধ কহে। ব্রহ্মার পরমায়ুর পরিমাণ দ্বিপরার্দ্ধ কাল। এতাধিক কাল, ভাবনা ও গণনার বাহিরে।

২। বিশ্ব বা সৌরজগৎ।

সপ্ত গ্রহে এক ব্রহ্মাণ্ড বা সৌরজগৎ। অর্থাৎ, এক বিশ্বে সাতটী গ্রহ আছে। আমাদের পৃথিবীও এইরূপ একটী গ্রহ। পৃথিবীর উৎপত্তি হইতে অবসান পর্য্যন্ত তাহাতে ক্রমে ক্রমে সপ্ত মৌলিক জাতির উৎপত্তি ও বিলয় হইয়া থাকে।

এক একটী গ্রহের অবস্থিতি কালকে এক এক গ্রহ স্থিতি কাল (World period) কহে। সাতটী গ্রহস্থিতি কালে এক চক্র (Round) হয়। একটী চক্রের অবস্থিতি কাল ১,৭৬৪,০০০,০০০ বৎসর (১৭৬ কোটী ৪০ লক্ষ বৎসর) অর্থাৎ, কিঞ্চিদধিক ৪০৭ মহাযুগের পরিমাণ। সপ্ত চক্রে এক মন্বন্তর।

সপ্ত মন্বন্তরে এক উন্নতি ক্রম (Scheme of Evolution)। এইরূপ সপ্ত উন্নতি ক্রমে এক বিশ্ব বা সৌর জগৎ (Solar system)।

৩। মনু ও মন্বন্তর।

এক এক বিশ্বের অবস্থিতি কালে ঊনপঞ্চাশ মন্বন্তর গত হয়।

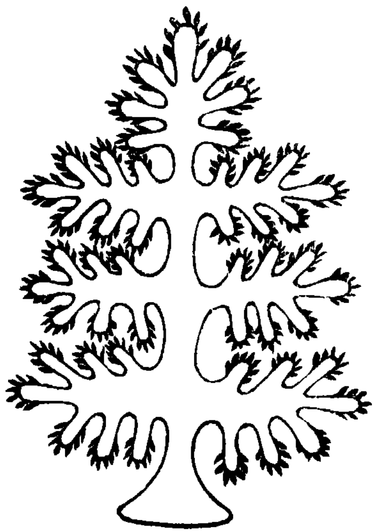
সত্তর (৭০) বৎসরের তুলনায় এক সেকেণ্ড যেরূপ, এক এক মনুর পরমায়ুর তুলনায় আমাদের পরমায়ু ও তদনুরূপ।

সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশ মনুঃ—স্বয়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ,

বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি। এই চৌদ্দ জন মনু। এখন বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর অধিকার কাল। এই মন্বন্তরের এক কোটী আশি লক্ষ বৎসর গত হইয়াছে।

এই মন্বন্তরের পরে দেবী দুর্গার বরে সুরথ রাজা সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হইবেন।

৪। মানব জাতি বিভাগ।



মানব জাতি রূপ মহীরুহ।

পৃথিবীর স্থিতি কালে ক্রমশঃ সপ্ত মৌলিক মানব জাতির (Root-Race এর) উদ্ভব হয়। প্রত্যেক মৌলিক জাতি সপ্ত উপবিভাগে (Sub-race এ) বিভক্ত।

এই সপ্ত উপবিভাগ প্রত্যেকে সপ্ত শাখাজাতিতে (Branch এ) বিভক্ত।

এইরূপ প্রত্যেক শাখাজাতি আবার উপশাখাতে (Tribes বা nations এ) বিভক্ত।

উপশাখা বংশে, বংশ পরিবারে বিভক্ত। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের সমষ্টী দ্বারা এক এক পরিবার গঠিত হয়। উপরে অঙ্কিত মহাবৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র ইত্যাদি দ্বারা সপ্ত মৌলিক জাতি, সপ্ত উপজাতি, শাখা জাতি, উপশাখা জাতি, বংশ, পরিবার ও পরিবারের লোক ইত্যাদি বুঝায়। এক একটী শাখাজাতির পরিমাণ সাধারণতঃ ত্রিশ সহস্র বৎসর কাল ব্যাপক।

একটী মৌলিক জাতির উদ্ভব হইতে অবসান কাল পর্য্যন্ত তিন কোটী ষাইট লক্ষ বৎসর লাগে। অর্থাৎ, কিঞ্চিদধিক আট মহাযুগ ব্যাপিয়া একটী মৌলিক জাতি পৃথিবীতে অবস্থান করে, তদনন্তর ইহা অন্তর্হিত হয়। এই জাতি যে রাজ্যে বা মহাদেশে বসতি করে, তাহাও প্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইরূপে এক একটী মৌলিক জাতি ও মহাদেশ নাশ পাওয়ার পর অপর এক মহাদেশের ও অপর এক মৌলিক জাতির আবির্ভাব হয়।

এখন চতুর্থ চক্র এবং পঞ্চম মৌলিক জাতির কাল চলিয়াছে।

ত্রিশকোটী বৎসর হইল বর্ত্তমান মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

এক এক মৌলিক জাতিতে এক একটী ইন্দ্রিয় লাভ হয়। সমুদয়ে সপ্ত ইন্দ্রিয়। আমরা পঞ্চম জাতি, আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয়। পরবর্ত্তী ষষ্ঠ মৌলিক জাতির ছয়টী ইন্দ্রিয় ও দুইটী মেরুদণ্ড হইবে। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ তাহাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় উন্মোষিত হইবে। সুদূর ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহিত সপ্তম মৌলিক জাতিতে অধ্যাত্মজ্ঞানলাভের জন্য সপ্তম ইন্দ্রিয় উন্মীলিত হইবে। এবং স্ত্রী পুরুষ সংসর্গ ব্যতীত সন্তানোৎপত্তি হইবে।

৫। চতুর্থ মহাদেশ বা কুশদ্বীপ (Atlantis)

চতুর্থ মৌলিক জাতি বা দৈত্য জাতি (Atlanteans)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দানব রাজত্বের মধ্যসময়ে স্ত্রী পুরুষ দেহ পরস্পরে পৃথক হইয়াছে। তাহা বহুকালের কথা। সেই সময় হইতে এক কোটী আশি লক্ষ বৎসর (১৮,০০০,০০ বৎসর) অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

বাহ্য বস্তুর দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে মানবের ললাটস্থ তৃতীয় চক্ষুর ক্রিয়া ক্রমশঃ লোপ পাইতেছিল। পরিশেষে চতুর্থ জাতির অভ্যুদয়ে তাহা একেবারে

অদৃশ্য এবং অন্যায়কারী হইয়া পড়িল। এই জন্যই দৈত্য-কুলকে প্রকৃত মানব এবং পার্থিব জাতি বলা হয়।

ভূমিকম্পে, আগ্নেয় গিরির গলিত ধাতুস্রাবে এবং অন্যান্য নৈসর্গিক দুর্ঘটনায় এক দিগে যেমন দানবরাজ্য ধ্বংস হইয়া অপার জলধিজলে নিমজ্জিত হইতে লাগিল, অপর দিগে তেমনি ভাবী দৈত্য রাজত্বের লীলাভূমি ও কার্য্যক্ষেত্র কুশদ্বীপ নামক মহাদেশ সাগরগর্ভ হইতে আস্তে আস্তে মস্তকোত্তোলন করিল।

দানবজাতি ধ্বংস হওয়ার প্রাক্কালে তাহাদের মধ্যে যাহারা বল বিক্রমে এবং শৌর্য্য বীর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, তাহাদিগকে ঐ জাতির মনু পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে লইয়া গিয়া শ্বেতদ্বীপে স্থাপন করিলেন। তাহারা নির্জ্জনে ভগবান মনুর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল। যে প্রলয়কাণ্ডে দানবরাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, তদ্দ্বারা এসিয়ার উত্তর প্রান্তের কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই, তাহা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই শ্রেষ্ঠ দানবগণ মনু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া প্রথমে এসিয়ার উত্তরভাগে উপনিবেশ স্থাপন করিল।

স্বর্গীয় রাজাদের শাসন সময়ে এই জাতির আধ্যাত্মিক জীবন সর্ব্বাধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ইহাই দৈত্যরাজত্বের সবিশেষ গৌরবের কাল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহাকে ইওছিন যুগ (Eocene Age) বলে, সেই সময়ে তাহারা ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বলের উন্নত সোপানে আরোহণ করিয়াছিল।

চল্লিশ লক্ষ বৎসর গত হইল দৈত্যরাজত্ব ধ্বংসের সূত্রপাত হইয়াছিল। সেই সময়ে মাইওছিন যুগের (Miocene Age এর) মধ্যাহ্ন সময়। প্রলয়ের প্রথম দুর্ঘটনার পর সুপ্রসিদ্ধ টল্‌টেক (Toltec) সভ্যতা এই দৈত্য-রাজত্বকে সাতিশয় গৌরবান্বিত করিয়াছিল। সাড়ে আট লক্ষ বৎসর গত হইল, এই সভ্যতা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দৈত্যরাজত্বের সময়ে অন্যান্য সভ্যতারও অভ্যুদয় হইয়াছিলে বটে, কিন্তু কোনটীই টল্‌টেক্ সভ্যতার ন্যায় গৌরব বা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত প্লেটো তাঁহার গ্রন্থাদিতে যে দ্বীপকে পসিডনিস (Poseidonis) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই দৈত্যরাজ্যের শেষ ভগ্নাবশেষ। খ্রীষ্টীয় শতাব্দির ৯৫৬৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ এগারো হাজার বৎসর গত হইল দৈত্যরাজ্যের

এই শেষ দ্বীপকে মহাসমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দৈত্যরাজ্যকে পুরাণে কুশদ্বীপ কহে পাশ্চাত্য জাতির গ্রন্থাদিতে ইহাকে আটলান্টিস (Atlantis) মহাদেশ কহে। মহাসমুদ্রের যে ভাগ এই মহাদেশকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার নামানুসারেই ইহা আটলান্টিক মহাসাগর নামে খ্যাত হইয়াছে।

(ক) কুশদ্বীপ।

দৈত্যরাজ্য বা চতুর্থ মহাদেশকে কুশদ্বীপ কহে। ইহার বিস্তার ও সীমা। ইহার উত্তরে উত্তর এসিয়া। ইহা এসিয়ার উত্তর দিগস্থ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই সাগর এখন মরুভূমিতে পরিণত। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ গবি মরুভূমি। পূর্ব্বদিগে চীন সাম্রাজ্য, জাপান ও তাহার পূর্ব্বদিগস্থ বর্ত্তমান প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর দিগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উত্তর আমেরিকার পশ্চিম দিগ্‌কে প্রায় স্পর্শ করিয়াছিল। তখন ইহা সমুদ্র ছিল না, এক অখণ্ডনীয় সুদৃঢ় ভূমিখণ্ডরূপ স্থল ছিল। দক্ষিণে ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে পারস্য, আরব, সিরিয়া, লোহিত সাগর, আবিসিনিয়া এবং ভূমধ্য-সাগরের শাখা প্রশাখা সহ দক্ষিণ ইটালি এবং স্পেইন দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড, ও আটলান্টিক মহাসাগর এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এখন স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড যেরূপ সাগর পরিবেষ্টিত, এবং আটলান্টিক মহাসাগর এখন যে স্থানে বিদ্যমান আছে, তথায় তখন জল ছিল না, স্থলময় ছিল। চল্লিশ লক্ষ বৎসর গত হইল এই রাজ্য বিধ্বংস হইয়া পৃথক্ পৃথক্ সপ্তদ্বীপে বিভক্ত হইয়াছিল। এই দ্বীপসকল আকারে পরস্পর ছোট বড় ছিল।

তখন নরওয়ে, সুইডেন, দক্ষিণ ইউরোপের অধিকাংশ ভাগ, মিশর দেশ, আফ্রিকার ও উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ ভাগ মহাসমুদ্রের উপবিভাগে ভাসিয়া উঠিল। এবং উত্তর এসিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হওয়ায় শ্বেতদ্বীপ হইতে দৈত্যরাজ্য পৃথক হইয়া পড়িল।

বর্ত্তমান আটলান্টিক মহাসাগরের স্থানে যে স্থল ভাগ তখন ছিল,

তাহাকে পরবর্ত্তী সময়ে কৃত ও দৈত বলা হইত। ইহা আমেরিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু এক সুদীর্ঘ ও অপরিসর স্থলভাগ কটিবন্ধ রূপে এই দেশদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া বাঁধিয়াছিল। ৮ লক্ষ ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে খণ্ডপ্রলয় হইয়াছিল, তদ্দ্বারা এই সংযোজক সরু স্থলভাগটী চিরদিনের মতন জলমগ্ন হইয়া যাওয়াতে, এই দুই স্থলভাগ পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপ রূপে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ন্যূনাধিক দুইলক্ষ বৎসর গত হইল, এই দেশদ্বয়ও বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে, কেবল পসিডনিস্ দ্বীপটী অতীতের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ আটলান্টিক মহাসাগরের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান রহিল।

ক্রমশঃ

মঙ্গল সেবক।

মরণ ও মরণান্তে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পন্থার ২৪১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

মরণের পর মানবের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটে তাহা বিবৃত করার পূর্ব্বে, মানব কি কি উপাদানে গঠিত, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা সঙ্গত বোধ করি।

পরাবিদ্যা মতে মানব নিম্নলিখিত উপাদানে গঠিত।

অবিনশ্বর উপাদান বা রূপত্রয়।

(The Immortal Triad)

(১) আত্মা।

(২) বুদ্ধি।

(৩) মনঃ।

নশ্বর উপাদান বা রূপচতুষ্টয়।

(The perishable Quaternary)

(৪) কাম।

(৫) প্রাণ।

(৬) পিণ্ড দেহ (Etheric Double.)

(৭) ভাণ্ড দেহ বা স্থূল শরীর (Dense body)

আমাদের এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহকেই ভাণ্ডদেহ কহে। এই স্থূল শরীর বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও স্থূল উপাদানে নির্ম্মিত। পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহের অবিকল অনুরূপ। তাহা স্থূল আকাশে বা ঈথারে (Ether এ) নির্ম্মিত। ইহাকে ছায়াদেহও বলা হয়। জীবনীশক্তিই প্রাণ। এই প্রাণ শরীরের যাবতীয় অণুগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া রাখে, তাই জীবদেহসমূহ বিশেষ বিশেষ আকার বিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান থাকে। ইহা সেই বিশ্বব্যাপী মহা প্রাণের অংশ বিশেষ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল রকমের ভোগবাসনার সমষ্টি কাম নামে অভিহিত।

জীবদেহে যিনি ভাবনা করেন তিনিই মনঃ।

আত্মার বাহন ও অধিষ্ঠান ক্ষেত্রকে বুদ্ধি কহে। বুদ্ধিতেই আত্মার প্রকাশ হয়। মনঃ অবিনশ্বর রূপত্রয় ও বিনশ্বর রূপচতুষ্টয়ের সংযোগকারী সেতু স্বরূপ। এক এক জীবনে ইহা দুইরূপে প্রকাশ পায়। এই জন্য ইহা দুইভাগে বিভক্ত—অহংকার (Higher Manas) and অন্তর্মুখী মন (Lower Manas)। অন্তর্মুখী মন অহংকারের একটা রশ্মি। এই রশ্মি জীবমস্তিষ্কে বোধসত্বা বা ধীশক্তিরূপে কার্য্য করে। ইহা কাম বা বাসনার সঙ্গে মিলিত হইয়া কাম মনস বা বহির্মুখী মন নামে অভিহিত হয়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহাকে মন (Mind) কহে, এই কাম মনস তাহার একটী অংশ বিশেষ। এই কাম মনসই অহংকারের এবং অন্তর্মুখী মনের সংযোজক, ইহা জীবন সংগ্রামের রণভূমি স্বরূপ। মনসের এই উভয়াত্মক ভাব ধরিয়া মানবের সপ্তরূপকে নিম্ন লিখিত রূপে বিভাগ করা যায়।

অমর { আত্মা
বুদ্ধি
অহংকার (Higher Manas)

আপেক্ষিক অমর। বহির্মুখী মনঃ (Kama Manas)

মর	প্রাণ পিণ্ডদেহ (Etheric Double) ভাণ্ড দেহ (Dense Body)

কোন কোন খ্রীষ্টান লেখক শেষোক্ত বিভাগটীকে পশন্দ করেন। তাহাদের মতে আত্মা (Spirit) স্বতঃ অমর ; মনঃ (Soul) আপেক্ষিক অমর অর্থাৎ আত্মার সহযোগে অমরত্ব লাভে সক্ষম। দেহ স্বতঃ মর। কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণ খ্রীষ্টানগণ মানবকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলে। এক দেহ, যাহা মরণ কালে নাশ পায়, অপর জীব বা আত্মা, যাহা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান থাকে।

দেহাবসানে জীবের যে অবস্থান্তর ঘটে তাহার মীমাংসা করিতে হইলে সাধারণ খ্রীষ্টানদের এই শেষোক্ত বিভাগটী নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। মানবের তিন রূপ বলিয়া যে খ্রীষ্টানগণ পূর্ব্বোক্তরূপে বিভাগ করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ নহে, কারণ তদ্দারা মানবজীবনের সকল অবস্থার মীমাংসা করা যায় না। সপ্তধাখ্য বিভাগটীই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া বোধ হয়।

স্থূলদেহ।

মানবদেহ ও তাহার ক্রিয়াকলাপাদি বিশদরূপে বুঝিতে হইলে, এই দেহ কি কি উপাদানে গঠিত, তাহা বিস্তৃতরূপে জানা আবশ্যক, নতুবা দেহযন্ত্রের কার্য্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। অনবরত মানবদেহের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। দেহের কোন কোন অংশ ধ্বংস হইতেছে, আবার কোন কোন অংশ সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ গঠিত হইতেছে। প্রথমতঃ স্থূলদেহের আধার স্বরূপ মাতৃগর্ভে পিণ্ডদেহের আবির্ভাব হয়। অনবরত এই দেহে নব নব উপাদান সংযুক্ত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিতে থাকে। প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র জীবাণু-সমূহ দেহত্যাগ করে, আবার প্রতি মুহূর্ত্তে অন্যান্য জীবাণু তাহাদের স্থান অধিকার করে। যে সকল জীবাণু দেহ হইতে বাহির হয়, তাহারা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থাবর, জঙ্গম, প্রাণী ও অন্যান্য মানবের কলেবর বৃদ্ধি করে।

প্রস্তরময় ভূপৃষ্ঠ যেভাবে নির্ম্মিত, মানবদেহও ঠিক্ সেই প্রণালীতে অসংখ্য

প্রাণীসমষ্টিদ্বারা নির্ম্মিত। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে এই ভাবটী কখনই আশ্চর্য্যজনক বা বিসদৃশ নহে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলিতেছে মানবের বা অপরাপর প্রাণীর জীবিত বা মৃতদেহ শতাধিক রকমের জীবাণু দ্বারা পূর্ণ। আমরা অবিরত নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস টানিয়া লই, তাহাতে প্রত্যেক শ্বাসে চক্ষুর অগোচর অসংখ্য জীবাণু দেহমধ্যে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ তাহাদিগকে মাইক্রোব (Microbe) কহে। আবার আমাদের দেহাভ্যন্তরে যে অপরিসীম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাণু আছে, তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, লিউকোমেইন (Leucomain) ইরোব্ (Ærobe), আনিরোব্ (Anærobe) ইত্যাদি। গুপ্তবিদ্যা আবও অগ্রসর হইয়া বলেন যে, মানবদেহের ন্যায় প্রাণীদেহ, উদ্‌ভিদ্‌দেহ ও স্থাবরদেহ সমস্তই কথিত জীবাণুসমষ্টি দ্বারা গঠিত। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শ্রেণী ব্যতীত অপর শ্রেণী অত্যুৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। জড়বিজ্ঞান এতদূরে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে মানবদেহের বাহ্য স্থূল অংশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যে সব নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন তদ্দ্বারা গুপ্তবিদ্যার প্রাগুক্ত উক্তি অনেকাংশে সমর্থিত হইতেছে। রাসায়নিক বিজ্ঞান (Chemistry) এবং দেহবিজ্ঞান (Physiology), এই দুই শাস্ত্র ভবিষ্যতে অত্যাশ্চার্য্য, কল্পনাতীত স্থূলদেহ সম্বন্ধীয় নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া অচিরেই জগৎকে মুগ্ধ করিবে।

প্রাণীদেহে ও মানবদেহ, উদ্‌ভিদ্‌দেহে ও মানবদেহে, এমন কি, হিংস্র সরীসৃপাদি জন্তুর আবাসস্থান যে সুদৃঢ় পাহাড়, সেই পাহাড়ে এবং মানবদেহে যে পরস্পর সবিশেষ সাদৃশ্য আছে তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা দিন দিন ক্রমশঃই স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। জীবজগতের স্থূল উপাদান ও রাসায়নিক উপাদানের পরস্পর সুসাদৃশ্য থাকায়, রাসায়ন শাস্ত্র অবাদে বলিতে পারে যে মানবদেহ এবং বৃষদেহ যে যে উপাদানে গঠিত, সেই সেই উপাদান মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কিন্তু গুপ্তবিদ্যা আরও অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিশদ ভাষায় স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিই যে এক, তাহা নহে, যে সকল অতি সূক্ষ্ম, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অগোচর অসংখ্য জীবাণুসমষ্টি দ্বারা

মানবদেহের অণুসমূহ নির্ম্মিত, ঠিক্ তদনুরূপ জীবাণু সমষ্টিদ্বারা গোলাপের সুকোমল কোরকের পরমাণুগুলিও নির্ম্মিত; ঠিক্ সেই জাতীয় জীবাণুসমষ্টি দ্বারা অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের, ক্ষুদ্র পিপীলিকার, প্রকাণ্ডদেহ হস্তির এবং অত্যুন্নত বৃক্ষের দেহও গঠিত। তাহাদের প্রত্যেকটী অংশ এক একটী জীব।

এই অতি ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি স্বাধীন ভাবে ব্যষ্টিতে প্রাণের বাহন স্বরূপ। একত্র সম্মিলিত হইয়া সমষ্টিবদ্ধ হইলে তাহারা স্থূল শরীরের অণু ও কোষরূপে পরিণত হয় এবং জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাহারা দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করে; তাহাতেই চতুঃপার্শ্বস্থ অপরাপরের সঙ্গে মানবের সেতু স্বরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। বৈশ্বানর জীবাণুগণ (Fiery Lives) পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র জীবাণুগণকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাতেই ক্ষুদ্র জীবাণুগণ নিয়মমত সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করিতে করিতে সুন্দর দেহকোষ নির্ম্মাণ করে। আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেমন এক জগদীশ্বর সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যের নিয়ন্তা, ঠিক্ সেইরূপ এই বৈশ্বানর জীবাণুগণ সমষ্টিভাবে এই স্থূলদেহের নির্ম্মাণ কার্য্যে নিয়ন্তা স্বরূপ। কিন্তু যখন তাহারা এই কার্য্য হইতে বিরত হয়, তখনই তাহাদের অধীনস্থ জীবাণুগণ উশৃঙ্খল হইয়া উঠে, তাহাতে দেহ ভগ্ন হইয়া যায়। মানুষের জীবদ্দশায় তাহারা ঠিক সুশিক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যসমূহের ন্যায় অধিনায়কের আদেশক্রমে সুনিয়মে নানারূপ দেহগঠনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। মানুষের মরণকালে তাহারা নিতান্ত উশৃঙ্খল হইয়া উঠে, সুগঠিত শ্রেণী ভাঙ্গিয়া ফেলে, এদিগ্ ওদিগ্ ছুটা ছুটি করিয়া একে অন্যের উপর পড়িয়া নানারূপ উৎপাত ঘটায়, নেতৃহারা হইয়া যথেচ্ছভাবে কার্য্য করিতে থাকে, তাহাতে দেহের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থাকেই সাধারণতঃ মৃত্যু বলে। জীবের মরণ সময়ে কি স্থূল দেহের মৃত্যু ঘটে? অথবা জীবদ্দশায় কি দেহটা জীবিত থাকে? ইহার অর্থ কি? না, ব্যষ্টিভাবে দেহ জীবিত, সমষ্টিভাবে মৃত। সজীব জীবাণুসমূহের আধার স্বরূপ ব্যষ্টিভাবে মরণকালেও দেহ জীবিত, কিন্তু মানবের আধার ও যন্ত্র বিশেষ স্বরূপ ধরিলে তখন সমষ্টিভাবে দেহ মৃত।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের মতে মানব আর কিছুই নহে, কেবল

রহস্যময় অপূর্ব্ব জীবনশক্তিবলে নির্দ্দিষ্ট আকারে পরমাণুসমূহের সাময়িক একত্র সমাবেশ মাত্র। অর্থাৎ, মানুষ অণুসমূহের সমষ্টি মাত্র। পৃথক্ পৃথক্ অণুগুলি গুহ্য প্রাণশক্তিবলে একত্র সংবদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট হইলেই মানবের সৃষ্টি হইল। কথিত বিজ্ঞানীবিদ্‌দের মতে জীবিত ও মৃত মানবে এইমাত্র প্রভেদ যে জীবিতাবস্থায় উক্ত জীবনীশক্তি কার্য্যকারী থাকে কিন্তু মৃত্যুকালে ইহা লীন অবস্থায় অপ্রত্যক্ষ থাকে। এই শক্তি যখন সম্যকরূপে লীন অবস্থায় থাকে বা লোপ পায় তখন দেহস্থ অণুগুলি অপর এক উৎকৃষ্টতর আকর্ষণশক্তির বলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিগের আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। জীবদেহের পরমাণুসমূহের এই বিক্ষিপ্তাবস্থাকেই সাধারণতঃ মৃত্যু বলা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য এই জড়বাদীগণ শাস্ত্রোক্ত আসুরপ্রকৃতির লোক।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরণীশ্বরম্ ॥
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্। ৮।১৬ অঃ গীতা।

এই আসুরিক্ মনুষ্যগণ বলিয়া থাকে জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরস্পরসম্ভূত অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ মিথুনজনিত, এই জগতে অপর কিছুই কারণ নাই, কেবল স্ত্রী পুরুষের কামপ্রবাহই ইহার একমাত্র কারণ। *

---

* আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদীগণে ও শাস্ত্রোক্ত আসুরিক প্রকৃতির লোকে যে কোন প্রভেদ নাই ও তাহাদের পরিণাম যে কিরূপ ভয়ানক ও শোচনীয় তাহা গীতায় শ্রীভগবান পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন। কাজেই পরিণামদর্শী, ধর্ম্মভীরু, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই তাহাদের এই অশাস্ত্রীয় ও অলৌকিক বাক্যে আস্থা প্রদর্শন ও কর্ণপাত করা উচিত নহে।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনান বিদুরা সুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্ গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

কিন্তু জড়বাদীগণ যাহাকে মৃত্যু বলে সেই সময়েওত মৃতদেহের অণুগুলিতে সতেজ প্রাণশক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এলিফাস্ লেভি (Elliphas Levi) বলেন কোন কিছুর

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধ পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যেমনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরো হহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ। ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে ঽশুচৌ॥ ১৬
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপর দেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেবযোনিষু॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢা জন্মণি জন্মণি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

আসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে, অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার বা সত্য কিছুই নাই॥ ৭॥

সেই আসুর ভাবাপন্ন জনগণ বলিয়া থাকে যে, জগৎ অসত্য, (বেদ পুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্য বিহীন অর্থাৎ তাহারা বেদাদির প্রমাণ্য স্বীকার করে না), প্রতিষ্ঠা বিহীন (অর্থাৎ ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কোন ব্যবস্থা নাই, ইহা স্বাভাবিক) ঈশ্বরবিহীন এবং অন্যোন্যসম্ভূত অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ মিথুন জনিত, এই জগতের অপর কিছুই কারণ নাই, কেবল স্ত্রীপুরুষের কাম প্রবাহই ইহার একমাত্র কারণ॥ ৮॥

এইরূপ বিবেচনা অবলম্বন করিয়া মন্দমতি, অল্পবুদ্ধি, ক্রূরকর্ম্মা জনগণ জগতের শত্রুস্বরূপ হয়। সুতরাং তাহারা জগতের বিনাশের জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ৯॥

তাহারা অত্যুৎকট কামনার আশ্রয়ে দম্ভ অভিমান এবং গর্ব্বপরবশ হইয়া মোহ প্রযুক্ত অসদাগ্রহ (এই মন্ত্রে অমুক দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি প্রাপ্ত হইব এইরূপ দুরাশা) অবলম্বন পূর্ব্বক অশুচি (মদ্যমাংসাদি দ্বারা সম্পাদ্য ব্রতপরায়ণ হইয়া অবৈদিক ক্ষুদ্রদেবতার উপাসনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥ ১০॥

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত বিষয়চিন্তা অবলম্বন করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষয়চিন্তা পরায়ণ হইয়া) সেই সকল কামভোগনিরত ব্যক্তি "এই কামোজ ভোগই পরম পুরুষার্থ আর

পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিলেই তাহার গতি (চলনশীলতা) স্বীকার করিতে হয় এবং এই গতিই (Movement) সজীবতার প্রকাশক। যদি শব প্রকৃতই মৃত হইত, তবে ইহা গলিয়া গলিয়া কখনই ক্ষয় পাইত না।

কিছুই নহে" এইরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়া এবং শত শত আশারূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণ এবং কামক্রোধপরায়ণ হইয়া [কামভোগ প্রয়োজনীয়] অর্থ অন্যায় পূর্ব্বক (চৌর্য্যাদি দ্বারাও) সঞ্চয় করিতে সচেষ্ট হয় ॥ ১১। ১২ ॥

অদ্য 'আমার এই লাভ হইল', 'এই অভিলষিত প্রিয় বস্তু পরে পাইব', 'আমার এই ধন আছে', 'এই ধনও আমার হইবে', 'আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অপর শত্রুসকলকেও বিনাশ করিব', আমি সর্ব্বশক্তিমান', 'আমি ভোগাধিকারী, 'আমি সিদ্ধ' (অর্থাৎ কৃতকার্য্য), 'আমি বলবান', 'আমি সুখী'. 'আমি ধনবান্' 'আমি কুলীন্', 'আমার তুল্য আর কে আছে', 'আমি যজ্ঞ করিব (অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারাও অন্য দীক্ষিতগণ অপেক্ষা অধিক যশোভাগী হইব)', [আমার স্তবকদিগকে] 'দান করিব' 'হৃষ্টপ্রাপ্ত হইব', এইরূপে ঐ সকল ব্যক্তি অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া নানাবিধ অভিলষিত বিষয়ে প্রবৃত্তি বশতঃ বিভ্রান্তচিত্ত এবং সূত্রময় জালে আবদ্ধ মৎস্যাদির ন্যায় মোহময় জালে আবৃত ও কামভোগে আসক্তচিত্ত হওয়ায় মহা ক্লেশময় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ১৩। ১৪। ১৫। ১৬ ॥

আপনা হইতে সম্ভাবিত (অর্থাৎ কোন সাধু ব্যক্তি সমাদর না করিলেও গর্ব্বভরে যে ব্যক্তি আপনাকে পূজ্য বলিয়া মনে করে) [অতএব] অবিনয়ী এবং ধনজাত অভিমান ও অহঙ্কার বিশিষ্ট হইয়া তাহারা কেবলমাত্র দম্ভ প্রকাশার্থ অবিধিপূর্ব্বক নাম মাত্র যজ্ঞ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

সৎপথাবলম্বী সাধুগণের অসূয়াকারী সেই সকল ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বদেহে ও পরদেহে [চিদংশরূপে] অবস্থিত আমার দ্বেষ করিয়া থাকে [দম্ভবশতঃ যজ্ঞে শ্রদ্ধার অভাব-হেতু আপনার বৃথা পীড়া হয় আর অবিধিপূর্ব্বক হিংসা করায় চৈতন্যদ্রোহ মাত্র ফল হয় অতএব ঐ সকল ব্যক্তি যথার্থই আমার বিদ্বেষী] ॥ ১৮ ॥

আমি আমার বিদ্বেষী সেই সকল ক্রূরকর্ম্মা, নরাধম, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে সংসারে আসুরী যোনিতেই নিরন্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকি (অর্থাৎ সেই পাপ কর্ম্মাদিগকে তাদৃশই ফল প্রদান করি ॥ ১৯ ॥

হে কৌন্তেয়, সেই মূঢগণ, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে না পাইয়া (মৎপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সন্মার্গও না পাইয়া) তদপেক্ষাও নিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

ধর্ম্মের গ্লানিকর, পাপপ্রবাহবর্দ্ধক সর্ব্বগ্রাসী এই ম্লেচ্ছরূপী পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের নিধন সাধন জন্যই জ্ঞান বিজ্ঞানময় তীক্ষ্ণ অসি ধারণ করিয়া কল্কিরূপী পরাবিদ্যা (থিওসফি) বর্ত্তমানে জনসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পচিয়া যাওয়া বা গলিয়া যাওয়াতে দেহস্থ অণুগুলির গতির বিদ্যমানতা প্রমাণ হয় এবং এই গতিই সজীবতার লক্ষণ। কথিত মরণকালেও দেহস্থিত অণুগুলিকে সজীব দেখা যায় এবং তাহারা তখন পরস্পর পৃথক্ হওয়ার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীসুদর্শন দাস।

বেদান্তাভাস।

জীবনের দিন গেল বয়ে ও মন ভুলে আর থেক না।
এ দেহ খাতায় কর্ম্মের জমা খরচ ঠিক কর না॥

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলে,
এই যে দেহ প্রাপ্ত হলে,
পেয়ে দেহ কি করিলে,
হিসাব করে তাই দেখ না॥১।

কর্ম্ম ভোগে কর্ম্ম ছাড়ে,
না জান্‌লে তায় কর্ম্ম বাড়ে,
দেখ যেন নিকাশ দিতে,
নূতন খাতায় জের তুল না॥২।

জমা খরচ সমান হবে,
ত্রিশূন্য দেখাবে কবে,
ত্রিশূন্য নয় সর্ব্ব শূন্য,
হয় আমার এই বিবেচনা॥৩।

আমি মাত্র বই একাকী,
শূন্যময় সকলই দেখি,
হইয়ে আত্মস্থ সদা,
নিতান্ত আমার বাসনা॥৪।

কর্ম্মী জনের এই যে আভাস,
বেদান্তে আছয়ে প্রকাশ,
অধিকারী করে শ্রবণ,
তদিতরে বিড়ম্বনা॥৫।

শুন তবে এর বিবরণ,
আত্মস্থ যে হয় মহাজন,
সে দেখে সব আত্মাময়,
আত্মা ব্রহ্ম যার ধারণা॥৬।

ক্রমশঃ

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(আ) বন্ধস্য কালনিমিত্তকত্বমপি নিরাকরোতি। (সূ) ন কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ। ১২।

(অ) কালযোগতঃ (পুরুষস্য বন্ধঃ) ন (সম্ভবতি) (কুতঃ) ব্যাপিনঃ নিত্যস্য কালস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ।

(ব্যা) কালযোগতঃ (কালেন কালস্য বা যোগঃ তস্মাৎ) সময়সম্বন্ধাৎ (পুরুষস্য বন্ধঃ) ন (সম্ভবতি) অত্র হেতুমাহ ব্যাপিন ইতি। ব্যাপকস্য, নিত্যস্য সদাতনস্য (কালস্য), সর্ব্বসম্বন্ধাৎ (সর্ব্বৈঃ সর্ব্বেষাং বা সম্বন্ধঃ তস্মাৎ) মুক্তামুক্তনিখিলপুরুষসম্পর্কাৎ। কালসম্বন্ধতঃ পুরুষস্য বন্ধাভ্যুপগমে কালস্য মুক্তামুক্তপুরুষসম্বন্ধতয়া অমুক্তবৎ মুক্তস্যাপি বন্ধপ্রসঙ্গইতি ভাবঃ।১২॥

অনুবাদ। যদি বল কালের বিচিত্র গতি, কাল দ্বারাই পুরুষের বন্ধন ঘটে। তাহা হইতে পারে না, কারণ কাল নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী এবং কালের সহিত সকলেরই সমান সম্বন্ধ। যদি কাল বশেই বন্ধন ঘটিত তাহা হইলে মুক্ত অমুক্ত সকল জীবেরই তুল্যরূপে বন্ধন ঘটিত, যেহেতু কালের সম্বন্ধ সকলেই বিদ্যমান আছে।

বন্ধস্য দেশযোগনিমিত্তকত্বমপি নিরাকরোতি। ন দেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ। ১৩।

দেশযোগতঃ অপি (পুরুষস্য বন্ধঃ) ন (সম্ভবতি) (কুতঃ) অস্মাৎ।

দেশযোগতোঽপি দেশসম্বন্ধাদপি, ন কেবলাৎ কালযোগত ইত্যপিশব্দার্থঃ, (পুরুষস্য বন্ধঃ) ন সম্ভবতি। কুতইত্যাহ অস্মাদিতি, পূর্ব্বোক্তদোষতঃ। দেশসম্বন্ধতঃ পুরুষস্য বন্ধাঙ্গীকারে ব্যাপিনো নিত্যস্য দেশস্য মুক্তামুক্তসম্বন্ধতয়া অমুক্তবৎ মুক্তস্যাপি বন্ধপ্রসঙ্গ ইতিভাবঃ। ১৩॥

অনুবাদ। দেশ ও বন্ধনের কারণ নহে। কেন না কালের ন্যায় দেশ ও নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, এবং সকলের সহিত সম্বন্ধ, সুতরাং তদ্দ্বারা বন্ধন ঘটিলে অমুক্ত পুরুষের ন্যায় মুক্ত পুরুষেরও বন্ধন ঘটিতে পারে।

বন্ধস্য অবস্থাজন্যত্বং নিরস্যতি ! নাবস্থাতো দেহধর্ম্মত্বাৎ তস্যাঃ। ১৪।

অবস্থাতঃ (পুরুষস্য বন্ধঃ) ন (ঘটতে) (কুতঃ) তস্যাঃ দেহধর্ম্মত্বাৎ।

অবস্থাতঃ সংঘাতবিশেষাত্মিকায়াঃ দেহরূপায়াঃ অবস্থায়াঃ (পুরুষস্য বন্ধঃ ন (ঘটতে), অত্র হেতুমাহ তস্যা ইতি। অবস্থায়াঃ, দেহধর্ম্মত্বাৎ শরীর-বৃত্তিত্বাৎ। শরীরধর্ম্মস্য পুরুষবন্ধকত্বে অমুক্তধর্ম্মেণ মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তি-রিতি। ১৪ ॥

অনুবাদ। অবস্থা নিবন্ধন ও পুরুষের বন্ধন ঘটে না ; কেননা অবস্থা শরীরের ধর্ম্ম, পুরুষ অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম নহে। একের ধর্ম্মে অন্যের বন্ধন হইলে অমুক্ত পুরুষের কার্য্যে মুক্ত পুরুষের ও বন্ধন হইতে পারে।

নন্ববস্থায়াঃ দেহধর্ম্মত্বে কিং প্রমাণমিত্যাহ। অসঙ্গোহয়ং পুরুষ ইতি। ১৫।

অয়ং পুরুষঃ অসঙ্গঃ ইতি (অবস্থায়া দেহমাত্রধর্ম্মত্বং)।

অয়ং এষঃ পুরুষঃ, অসঙ্গঃ অবস্থাত্মকবিকারকারণসংযোগাখ্যসঙ্গশূন্যঃ, ইতি হেতোঃ (অবস্থায়া দেহমাত্রধর্ম্মত্বং), অবস্থায়াঃ পুরুষধর্ম্মত্বে অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ ইতি শ্রুতির্ব্যাহন্যেতেতি। ১৫।

অনুবাদ। অবস্থা দেহেরই ধর্ম্ম, পুরুষের নহে, ইহার প্রমাণ শ্রুতিবাক্য। শ্রুতি বলিতেছেন—পুরুষ অসঙ্গ অর্থাৎ যে সংযোগ বা সম্বন্ধে বিকার বা পরিণাম ঘটে তাহা পুরুষের নাই। কিন্তু দেহাদিরই বিকারের কারণ সংযোগ আছে, এই জন্য দেহাদিই বিকার বা পরিণাম গ্রস্ত হয় ; অতএব দেহাদিই অবস্থার অধীন, পুরুষ নহে।

বন্ধস্য কর্ম্মজন্যত্বমপাকরোতি। কর্ম্মণা (পুরুষস্য বন্ধঃ) ন (ভবতি) (কুতঃ) অন্যধর্ম্মত্বাৎ অতিপ্রসক্তেশ্চ ন কর্ম্মণান্যধর্ম্মাদিতি প্রসক্তেশ্চ। ১৬ ॥

কর্ম্মণা বিহিতয়া নিষিদ্ধয়া চ ক্রিয়য়া (পুরুষস্য বন্ধঃ) ন (ভবতি)। অত্র হেতুমাহ অন্যেতি। কর্ম্মণঃ বুদ্ধিধর্ম্মত্বাৎ ; অন্যধর্ম্মস্য সাক্ষাদন্যবন্ধকত্বে মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিরিতি অসকৃদাবেদিতং। স্বস্ববুদ্ধিক্রিয়য়া বন্ধাভ্যুপগমে দোষমাহ অতিপ্রসক্তেশ্চেতি ; অতিপ্রসঙ্গাৎ, প্রলয়াদাবপি তাদৃশবুদ্ধিকর্ম্মণা বন্ধপ্রসঙ্গাৎ। চশব্দ উক্তসমুচ্চয়ে। ১৬ ॥

অনুবাদ। যদি বলেন কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, কর্ম্মদ্বারাই জীব বদ্ধ হয়, তাহা ও সম্ভব নহে, কেন না, কর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্ম নহে, বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। বুদ্ধিই

কর্ম্ম করেন, পুরুষ নিষ্ক্রিয়। একের দোষে অপরের দণ্ড হইবে ইহা কি সম্ভব? ইহাতে অতি প্রসক্তি দোষ হয় অর্থাৎ অমুক্ত পুরুষের দোষে মুক্ত পুরুষের ও বন্ধন ঘটিতে পারে।

নমু কর্ম্মসামানাধিকরণ্যেন দুঃখযোগাত্মকস্ত বন্ধস্ত চিত্তমাত্রবৃত্তিত্বে কাক্ষতিরিত্যাহ।

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে। ১৭।

অন্যধর্ম্মত্বে বিচিত্রভোগানুপপত্তিঃ (ঘটতে)।

অন্যধর্ম্মত্বে দুঃখযোগাত্মকবন্ধস্ত চিত্তমাত্রবৃত্তিত্বে; বিচিত্রভোগানুপপত্তিঃ (বিচিত্রো ভোগঃ তস্ত অনুপপত্তিঃ) পুরুষাণাং বিলক্ষণভোগাভাব প্রসঙ্গঃ (ঘটতে) কশ্চিৎ সুখভোক্তা কশ্চিৎ দুঃখভোক্তেতি ব্যবহারাসম্ভবঃ, বুদ্ধিধর্ম্মেণ বন্ধেন পুরুষাণাং বিলক্ষণভোগাসম্ভব ইতি। ১৭॥

অনুবাদ। বন্ধন যদি চিত্তমাত্রের ধর্ম্ম হয়, তবে পুরুষের বিচিত্র ভোগ ঘটিতে পারে না, অর্থাৎ কোন পুরুষ সুখভোক্তা কোন পুরুষ দুঃখভোক্তা ইত্যাদি বিসদৃশ ব্যবহার সম্ভব হয় না।১৭॥

বন্ধস্ত সাক্ষাৎ প্রকৃতিনিমিত্তকত্বমপি নিরাকরোতি। প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেন্ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যং। ১৮।

প্রকৃতিনিবন্ধনাৎ (পুরুষস্ত বন্ধো ভবতীতি) চেৎ, ন তস্যাঃ অপি পারতন্ত্র্যং।

প্রকৃতিনিবন্ধনাৎ (প্রকৃতিঃ নিবন্ধনং তস্মাৎ) প্রকৃতিনিমিত্তাৎ, (পুরুষস্ত বন্ধঃ ভবতি ইতি) চেৎ যদি, উচ্যতে ইতি শেষঃ, ন তদপি ন সম্ভবতি, কুত ইত্যাহ তস্যা অপীতিরপি, প্রকৃতে পারতন্ত্র্যং সংযোগাধীনত্বং। প্রকৃতিরপি সংযোগদ্বারেণৈব বন্ধহেতুর্ভবতি নতু সাক্ষাৎ, প্রকৃতেঃ সাক্ষাৎ বন্ধহেতুত্বে তস্যাঃ ব্যাপিত্বেন সর্ব্বপুরুষসম্বন্ধাৎ মুক্তস্যাপি বন্ধপ্রসঙ্গঃ প্রলয়াদাবপি দুঃখযোগাপত্তিরিতি। ১৮॥

অনুবাদ। প্রকৃতি সাক্ষাৎরূপে পুরুষের বন্ধনের কারণ নহে, কেন না প্রকৃতি সংযোগের অধীন, সংযোগ দ্বারাই প্রকৃতি পুরুষকে বদ্ধ করিতে পারে, অন্যথা নহে। যদি এই সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি স্বয়ং বন্ধন ঘটাইতে পারিত, তাহাহইলে মুক্ত পুরুষের ও বন্ধাশঙ্কা থাকিত এবং প্রলয় কালে ও পুরুষের বন্ধন থাকা অসম্ভব হইত না। ১৮॥

তর্হি কথং বন্ধ ইতি জিজ্ঞাসায়ামাহ। ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে। ১৯।

তদ্ যোগাৎ ঋতে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তভাবস্য তদ্যোগঃ ন (ঘটতে)।

তদ্ যোগাৎ (তস্য যোগঃ তস্মাৎ) প্রকৃতিসংযোগাৎ বুদ্ধিতত্ত্বসম্বন্ধাৎ ; ঋতে বিনা, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য (নিত্যঃ শুদ্ধঃ বুদ্ধঃ মুক্তঃ স্বভাবো যস্য) নিত্যঃ কালানবচ্ছিন্নঃ, শুদ্ধঃ পাপপুণ্যহীনঃ, বুদ্ধঃ অলুপ্তচিদ্রূপঃ, মুক্তঃ পারমার্থিক দুঃখাসম্পৃক্তঃ, তথাবিধস্বরূপস্য পুরুষস্য ; তদ্যোগঃ (তস্য যোগঃ) বন্ধযোগঃ দুঃখসম্বন্ধঃ, ন (ঘটতে)। বন্ধস্য ঔপাধিকত্বজ্ঞাপনায় নঞ্দ্বয়েন বক্রোক্তিঃ। ১৯ ॥

অনুবাদ। তবে বন্ধ কিরূপে ঘটে তদুত্তরে বলিতেছে। পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মুক্ত স্বভাব। অতএব তাহার বন্ধ বা দুঃখ সংযোগ প্রকৃতির সংযোগ ব্যতীত ঘটিতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হইল প্রকৃতির সংযোগই বন্ধের কারণ।

বৌদ্ধবিশেষসম্মতং বন্ধস্যাবিদ্যাজন্যত্বং দূষয়তি। নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনঃ। বন্ধাযোগাৎ। ২০।

অবিদ্যাতঃ অপি (পুরুষস্য বন্ধঃ) ন (সম্ভবতি), (কুতঃ) অবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ।

অবিদ্যাতঃ অপি মিথ্যাজ্ঞানাদপি (পুরুষস্য বন্ধঃ) ন (সম্ভবতি); অত্র হেতুমাহ অবস্তুনেতি। অদ্বৈতবাদিনাং মতে অবিদ্যায়া অবস্তুত্বেন স্বাপ্নরজ্জুকল্পেন অবিদ্যাত্মকেন অসত্যবস্তুনা, বন্ধাযোগাৎ (বন্ধস্য অযোগঃ তস্মাৎ) বন্ধাসম্ভবাৎ। নচ বন্ধোঽপ্যবাস্তব ইতি বাচ্যং বন্ধস্য অবাস্তবত্বে তন্নিরাসার্থং যোগাঙ্গানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ। ২০।

অনুবাদ। কেহ কেহ বলেন অবিদ্যাই বন্ধনের কারণ, তাহা হইতে পারে না, কেননা যাহার বাস্তব সত্তা নাই,—যাহা আকাশ কুসুমবৎ অলীক তাহা দ্বারা বন্ধন কিরূপে ঘটিবে ? কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দৃষ্ট রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হয় কি ? পুরুষের বন্ধন অবাস্তব বা কাল্পনিক নহে, কারণ তাহা হইলে সাধনাদির উপদেশ থাকিত না।২০॥ ক্রমশঃ

শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি।

গীতাবলি।

১

সাল আখেরি হয়ে এল ওমন ভুলে আর থেকোনা।
এ দেহ খাতায় কর্ম্মের জমা খরচ ঠিক কর না॥
গত জন্মের কর্ম্ম ফলে,
এই যে দেহ পেয়েছিলে,
সেই অবধি কি করিলে,
হিসাব করে তাই দেখনা॥
কর্ম্মভোগে কর্ম্ম ছাড়ে,
না জান্‌লে তায় কর্ম্ম বাড়ে,
দেখ যেন নিকাশ দিতে
নূতন খাতায় জের তুলনা॥

২

যেন কে মনমে শিবরাম বসে
তেন সাধন আওর কিয়ে না কিয়ে।
যেন শান্ত-চরণ-রজঃ স্পর্শ কিয়ে
তেন তীরথ আওর কিয়ে না কিয়ে॥
ভূতদয়া যেন কো মনমো
তেন কোটিন দান কিয়ে না কিয়ে।
যেন কো মনমো সৎভাব নেহি
তেন দেবহুয়ে জীয়ে না জীয়ে॥

ভগবৎ ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং॥

শ্রীমদ্ভাগবতং।

অলৌকিক ঘটনা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোন এক কাউন্টিতে বিবি শ্রীমতী * * বাস করিতেন। তিনি বিশেষ গুণবতী ও বিদ্যাবতী ছিলেন এবং মাতৃভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি নানা বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধ্যাত্মবাদ, প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় সকল তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। উক্ত বিষয়ক রাশি রাশি গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং কোথাও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন ঘটনার কথা শুনিলে তিনি মহা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইতেন এবং অপর কর্ত্তৃক সাধিত (যথা প্রেত আত্মার আবাহন ইত্যাদি) নানা অলৌকিক ব্যাপার স্বচক্ষে সন্দর্শন করিতেন কিন্তু কিছুতেই তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না—সকলই তাঁহার চক্ষে "বুজরুকী" বলিয়া বোধ হইত। তথাপি তিনি এই বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণ কবিতে জীবনব্যাপী চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে একটী অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রেততত্ত্বকুতুহলী পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য এই স্থানে যথাযথ বিবৃত হইল।

সেই কাউন্টিতে এক সেনাপতি বাস করিতেন। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল। এ সংসারে অনেক সময়ে রূপ সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এই ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য চিতোরের ধ্বংসের কারণই এই রূপ। পদ্মিনীর রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া বিধর্ম্মী আলাউদ্দিন চিতোররাজ্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল—সর্ব্বভুক বৈশ্বানরমুখে চিতোরনগরী ভস্মীভূত হইয়াছিল, সতী সাধ্বী রাজপুত রমণীগণ প্রজ্জলিত চিতানলে তনুত্যাগ করিয়া হিন্দু রমণীর অমূল্য রত্ন সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল—ঐশ্বর্য্যের বৃথা প্রলোভনে তাহাদিগকে ভুলাইতে পারে নাই—ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

এই সেনাপতিকন্যার রূপ তাহাকে মজাইয়াছিল। কোন তরুণ যুবকের প্রলোভনে পড়িয়া সে আত্মহারা হইয়াছিল—কুমারী অবস্থায় তাহার চরিত্রে দোষ স্পর্শ করিয়াছিল। পিতা কন্যার সেই গুপ্ত প্রেমালাপের বিষয় জানিতে পারিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষাহেতু কন্যাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন। কন্যা

অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই পিতার মনে দয়ার উদ্রেক হইল না। তিনি অপত্যস্নেহ ভুলিয়া কর্ত্তব্যের কঠিন আদেশ পালন করিলেন—গৃহ-বিতাড়িত করিয়া ব্যভিচারিণীর যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিলেন। তদবধি কন্যা মর্ম্মবেদনার দারুণ পেষণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া একাকিনী অতি দীন-ভাবে জনমানবসমাগমশূন্য নগরের এক প্রান্তে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে কাল আসিয়া তাহার পিতার জীবন হরণ করিল। পিতার মৃত্যুশোকে তাহার ভগ্নহৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ঘোর অন্ধকার মধ্যে ক্ষীণালোকের ন্যায় সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়কন্দরে একটী আশা জাগিয়া উঠিত—সে মনে করিত হয়ত একদিন তাহার স্নেহময় পিতা তাঁহার পদস্খলিতা কন্যার দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবেন, এই আশার কুহকে সে দারুণ মর্ম্মপীড়ায়ও এত দিন প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। তাহার সেই আশাদীপ নির্ব্বাপিত হইল—ঘোর নৈরাশ্য-অন্ধকারে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল—মর্ম্মবেদনা সহস্রগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল—জীর্ণ শীর্ণ শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল—দেখিতে দেখিতে জীবনের চরমকাল আসিয়া উপস্থিত হইল—কালধর্ম্মে যুবতী ইহধাম পরিত্যাগ করিল। কিন্তু বিবৃত আখ্যায়িকা পাঠে আমরা অবগত হই তাহার যন্ত্রণার শেষ হইল না।

বিবি শ্রীমতী * * যে বাটীতে বাস করিতেন, বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চরণ জন্য তাহার চতুর্দ্দিকে অনাবৃত প্রশস্ত জমী ছিল, সেই জমীর উপর স্থানে স্থানে নানাজাতীয় সুন্দর পুষ্পবৃক্ষাদি রোপিত থাকায় বাটীটী উদ্যানবাটীর ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সেই বাটীতে দাসদাসী ব্যতীত তাঁহার স্বামী এবং দুইটী কুমারী কন্যা বাস করিত।

এক দিন কোন কার্য্যোপলক্ষে বিবি. শ্রীমতী * * স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। বাটী ফিরিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হয়—রাত্রি ১১টা বাজে। পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং গ্যাস নির্ব্বাপিত করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিলেন। তন্দ্রাভরে তাঁহার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল। তিনি শুনিলেন গৃহের এক বাতায়নের দিক হইতে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত করুণস্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। গৃহ প্রাঙ্গণে কেহ কথা

কহিতেছে স্থির নিশ্চয় করিয়া তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাতায়ন সমীপে যাইয়া তাহা উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন এক পরমাসুন্দরী যুবতী এক পুরুষের পদপ্রান্তে পড়িয়া অতি করুণস্বরে যেন নিজকৃত কোন অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে—পুরুষের কঠিন হৃদয় কিছুতেই বিগলিত হইতেছে না। অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না যুবতীর ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বিবি শ্রীমতী * * আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—রমণীর দুঃখে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তিনি গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বল, তোমার কি হইয়াছে, আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি—বল—কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইও না, এস—আমার গৃহে এস।" যুবতী তাঁহার এই কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইয়া শূন্যে মিশিয়া গেল—পুরুষমূর্ত্তি তৎসঙ্গে কোথায় অন্তর্হিত হইল। এই ব্যাপার দর্শনে বিবি শ্রীমতী * * জ্ঞানশূন্যার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে গৃহে আসিয়া পুনঃ শয়ন করিলেন। নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল সেই পুরুষমূর্ত্তি সেই মৃত সেনাপতি এবং যুবতী তাঁহার অপরাধিনী কন্যা। নিজ অপরাধের জন্য পিতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল।

পরদিবস বিবি শ্রীমতী * * এই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা স্বামী এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া অনেকে বলিলেন—মধ্যে মধ্যে সেই যুবতীকে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ | পৌষ, ১৩১৫ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

একীকরণ।

শিষ্য যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, যখন এক বিরাট মন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না এবং আপনাকে এই মন বলিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতেছেন, তখন গুরু প্রসন্ন হইয়া বলেন "আরও অগ্রসর হও"। কিন্তু এখন আর সাধারণ যুক্তি বিচার দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় না। যে প্রদেশে যাইতে হইবে তাহা মনের উপর সংকল্প বিকল্পের অতীত। কাজেই গুরু অন্য প্রণালী দেখাইয়া দেন। এই প্রণালী দ্বারা শিষ্য দেখিতে পান, মনের উপর একটী পদার্থ আছে, ইহার নাম বিজ্ঞান (Abstract idea)। বিজ্ঞান হইতে মনের উৎপত্তি, বিজ্ঞানে স্থিতি এবং বিজ্ঞানেই লয়। তখন তিনি গুরুদেবকে বলেন "প্রভো, এখন বেশ দেখিতেছি, বিজ্ঞানই সব, বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই, বিজ্ঞানাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্ত বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" এইবার গুরুদেব বলেন, "বৎস, চরমের খুব নিকটেই আসিয়াছ। আর এক পদ উঠিলেই

সত্যটী পাইবে।” শিষ্য পুনরায় ধ্যানস্থ হন, সমাধিতে মগ্ন হইয়া পড়েন। এই সমাধি অবস্থায় এক বিরাট আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার অনুভব গোচর হয় না। তিনি দেখিতে পান, এক অসীম আনন্দ-সমুদ্র বর্ত্তমান এবং ইহাতে অসংখ্য তরঙ্গ নিয়ত উত্থিত ও বিলীন হইতেছে। ইহারাই অসংখ্য জীব, অসংখ্য ভূত। তিনিও একটী তরঙ্গরূপে এই আনন্দ সাগরে কখনও ভাসিতেছেন, কখনও মিশিয়া যাইতেছেন। তখন তিনি উচ্চস্বরে বলিয়া উঠেন “গুরো, আনন্দ। আনন্দ।। আনন্দ!!! আর কিছুই নাই, সবই আনন্দ! আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।” ইহাই চরম।

আমরা আরোহী মার্গের যৎ কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এখন অবরোহী মার্গের কথা। এখানে এক হইতে বহুতে আসিতে হইবে একই বহুরূপে বিরাজিত ইহা দেখিতে হইবে। কিন্তু এই এক যে রাজ্যে অবস্থিত, “ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনঃ”—সেখানে চক্ষু, বাক্য কিংবা মন যাইতে পারে না; তবে এক হইতে আরম্ভ করা যায় কিরূপে? আপ্ত বাক্যের আশ্রয় লইতে হইবে। যে সকল জীবন্মুক্ত মহর্ষি যোগ বলে চরম সত্যকে প্রত ক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্যই আপ্ত বাক্য। তাঁহারা চরম পদার্থের যেটুকু আভাস দিয়া গিয়াছেন সেইটুকু অভ্রান্ত বলিয়া আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ যেস্থানে আমরা স্বয়ং যাইতে অপারগ, সেই স্থানটী দেখিয়া আসিয়া কেহ যদি বলেন “তাহা এইরূপ, তাহা এইরূপ”, তাহা হইলে উক্ত বাক্য ভিন্ন আমাদের অন্য অবলম্বন কি আছে? অতএব আরোহী মার্গে কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা (Observation and Experiment) দ্বারা অগ্রসর সম্ভব হইলেও, অবরোহী মার্গে কয়েকটী বিষয় আমাদিগকে অগ্রে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ঋষিগণ বলেন এক অখণ্ড বিরাট শুদ্ধ আনন্দ মাত্র আছেন। এই আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইনিই একমাত্র সত্য। ইনি আনন্দভোক্তা নহেন, ভোগ নহেন, ভোগ্যও নহেন, অথচ তিনের সমন্বয়। এই এক ও অদ্বিতীয় বস্তু হইতে যুগপৎ দুইটী বস্তুর আবির্ভাব হইল, (যুগপৎ দুইটী কারণ একটী ব্যতীত অপরটী থাকিতে পারেন না)। একটী

ভোক্তা, অপরটী ভোগ্য। ভোক্তার নাম পুরুষ বা পুরুষোত্তম এবং ভোগ্যের নাম মূল প্রকৃতি। এই অনন্ত বিরাট পুরুষ অনন্তা প্রকৃতিকে নিয়ত উপভোগ করিতেছেন তাই তিনি "আনন্দময়ো হ্যানন্দভুক্"। তিনি প্রকৃতির মিলন জনিত আনন্দে বিভোর তন্ময়, সুতরাং "ন কঞ্চন পশ্যতি" আর কিছুই দেখিতেছেন না এবং "একীভূতঃ প্রকৃতির সহিত এক হইয়া মিশিয়া আছেন। তিনি সমগ্রা প্রকৃতিকেই ভোগ করিতেছেন; অতএব "ন কঞ্চন কামং কাময়তে"—কিছুই কামনা করেন না, কারণ তাঁহার কামনায় বস্তু কিছুই নাই, তিনি পূর্ণকাম। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বান্তর্যামী।

শুদ্ধ আনন্দ (ব্রহ্ম যে শক্তির দ্বারা আনন্দভোক্তা হইলেন সেই শক্তির নাম মায়া। * তিনি সমগ্র মায়াকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বররূপে সমষ্টি প্রকৃতির সহিত রমণ করিতেছেন এবং মায়ার অসংখ্য অংশ গুলি দ্বারা অসংখ্য জীবরূপে ব্যষ্টি প্রকৃতিকে উপভোগ করিতেছেন। অতএব ঈশ্বরও আনন্দভুক্ জীবও আনন্দ ভুক্, তবে ঈশ্বর সমষ্টিভাবে ভোক্তা, জীব ব্যষ্টি ভাবে ভোক্তা প্রকৃতি উভয়েরই ভোগ্যা; কিন্তু ঈশ্বরের ভোগ্য সমগ্র প্রকৃতি জীবের ভোগ্য—তাহার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ইহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

ভোক্তা—	ভোগ্য—
ঈশ্বর (=ব্রহ্ম+সমগ্রমায়া)	সমগ্র প্রকৃতি
জীব (=ব্রহ্ম+মায়ার অংশ)	প্রকৃতির অংশ।

ঈশ্বর ও জীবের তিনটী অবস্থা আছে সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ। সুষুপ্তাবস্থায় ইঁহারা কিছুই দেখেন না, কিছুই শুনেন না, কিছুই কল্পনা করেন না, কেবল মাত্র আনন্দ ভোগ করেন, অসীম আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। ক্রমশঃ মায়া শক্তি তাঁহাদের সম্মুখে প্রকৃতি জাল বিস্তার করেন। তখন তাঁহারা প্রথমে প্রকৃতির সূক্ষ্ম অংশগুলি দেখিতে পান,—জানিতে পারেন। এখন আর তাঁহারা কেবল ভোক্তা নহেন—দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, কর্ত্তা; তবে "প্রবিবিক্ত ভুক্"—প্রকৃতির সূক্ষ্মাংশগুলিই ভোগ করেন। ইহারই নাম স্বপ্নাবস্থা।

* "পন্থা"য় প্রকাশিত "ব্রহ্ম ও মায়া" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

অতঃপর মায়া স্থূলভূতগুলিও তাঁহাদের সম্মুখে আনয়ন করেন। তখন তাঁহারা "স্থূলভুক্"—প্রকৃতির স্থূলাংশগুলি দেখিতে পান ও উপভোগ করেন। ইহাই জাগ্রদবস্থা। (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ দ্রষ্টব্য)।

অতএব অবরোহী মার্গে আমরা দেখিলাম এক আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই বর্ত্তমান আছেন। ইনি প্রথমে সুষুপ্তাবস্থা ধারণ করিয়া "প্রাজ্ঞ" নামে অভিহিত হইলেন, পরে স্বপ্নাবস্থায় "তৈজস্" বা "হিরণ্য গর্ভ" নামে এবং পরিশেষে জাগ্রদবস্থায় "বৈশ্বানর"রূপে প্রকটিত হইলেন। প্রাজ্ঞ কারণ প্রকৃতিতে লীন হইয়া আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তৈজস সূক্ষ্ম প্রকৃতির সহিত রমণ-নিরত এবং বৈশ্বানর স্থূল প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিতেছেন। সকল অবস্থাতেই ইনি আনন্দ ভোগ করিতেছেন। সমষ্টিতে যাহা, ব্যষ্টিতেও তাহাই; মহাসমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে কোন দিকে প্রধাবিত হইলে, উহার প্রত্যেক জলকণা ক্ষুদ্রভাবে ও স্বীয় সীমার মধ্যে ঠিক তাহাই করিয়া থাকে। বিরাট পুরুষ সমগ্র প্রকৃতির সহিত নিয়ত যে অসীম আনন্দ ভোগ করিতেছেন, প্রত্যেক জীব,—প্রত্যেক অণু পরমাণু স্বীয় গণ্ডির মধ্যে তাহারই অভিনয় করিতেছে।

এই জন্যই দেখা যায় জগতের সর্ব্বত্রই আনন্দ। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া আনন্দ করিতেছেন, বিষ্ণু পালন করিয়া আনন্দ করিতেছেন, শিব সংহার করিয়া আনন্দ করিতেছেন। দেবগণ জীবের প্রেম ও করুণাকে উদ্বোধিত করিয়া আনন্দ পাইতেছেন, অসুরগণ তাহার কাম ক্রোধাদি রিপুকে উত্তেজিত করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ভক্তের ভগবচ্চিন্তাতেই আনন্দ, বিষয়ী বিষয় চিন্তাতেই আনন্দ পাইতেছেন। ভ্রমর, মধু আহরণে আনন্দ পাইতেছে, শূকরের আনন্দ বিষ্ঠাভক্ষণে। নরমাংস খাইতে ব্যাঘ্রের বড়ই আনন্দ, হরিণের আনন্দ বংশীধ্বনি শ্রবণে। কবি স্বভাবের শোভায় আনন্দ পাইতেছেন, বালকের ক্রীড়াতেই আনন্দ। দস্যুর আনন্দ পরস্বলুণ্ঠনে, মাতার সন্তান পালনে, সাধুর দানে, গায়কের গানে, বিলাসীর বেশভূষায়, রাজার রাজ্য-বৃদ্ধিতেই আনন্দ। জীব মাত্রই প্রকৃতির কোন না কোন বস্তুতে আনন্দ পাইতেছে। বাস্তবিক, জগৎ মূর্ত্তিমান আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক অখণ্ড আনন্দ নানাভাবে, অসংখ্য মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। শুভ্র জ্যোৎস্না,

তারকা-খচিত নভোমণ্ডল, বিশাল জলধি, অভ্রভেদী গিরিরাজি, দিগন্তব্যাপী মরু, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী, ফল পুষ্প সুশোভিত বিহঙ্গকূজিত স্রোতস্বিনী-নিনাদিত মনোহর প্রান্তর প্রভৃতি জগতে যত সৌন্দর্য্য আছে (এবং সৌন্দর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই) সমস্তই আনন্দের বিকাশ মাত্র। যাহাকে আমরা ভীষণ বলি, তাহা একপ্রকার সৌন্দর্য্য এবং যাহাকে মধুর বলি তাহা অন্য প্রকার সৌন্দর্য্য। কৃষ্ণবর্ণ ও সৌন্দর্য্য, শুভ্রবর্ণ ও সৌন্দর্য্য, কঠিনতাও সৌন্দর্য্য, কোমলতাও সৌন্দর্য্য; মিষ্টরসও সৌন্দর্য্য, তিক্তরসও সৌন্দর্য্য, বেহাগ রাগও সৌন্দার্য্য, রায়সের রবও সৌন্দর্য্য, ভাবুকের চক্ষে সবই সুন্দর, আনন্দের বিভিন্ন মূর্ত্তি।

জগৎকে এইরূপে দেখিতে দেখিতে ভাবুক যখন ভাবে বিভোর হন, তখন তাঁহার মনে হয় তিনি যেন ভগবদ্বাক্য স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন ভগবান যেন বলিতেছেনঃ—"এক ও অদ্বিতীয় আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমিই সেই আনন্দ। ইচ্ছা করিয়া আমি পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছি। আমি সমষ্টিরূপে সমগ্র প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছি। ইহাই আমার বিরাট যুগলমূর্ত্তি। জীবকে এই রহস্যের আভাস দিবার জন্যই আমি কৃষ্ণ রাধারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার যে এই একটী মাত্র মূর্ত্তি, তাহা ভাবিও না। আমি ব্যষ্টিরূপে প্রকৃতির অসংখ্য অংশগুলির সহিত রমণ করিতেছি। অতএব জগতের সর্ব্বত্র আমার যুগলমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন মিলন আমার একটী যুগলমূর্ত্তি, পেটুক মিষ্টান্নে সংযোগ আর একটী যুগলমূর্ত্তি, স্নেহময়ী মাতার ক্রোড়ে শিশু—তৃতীয় যুগল মূর্ত্তি। মদ্যপায়ী ও সুরার সংযোগে আমার যুগলমূর্ত্তিই দেখিবে, কামুক ও কামিনীর মিলনে এই যুগলমূর্ত্তিই দর্শন করিবে, কৃপণের হস্তে সঞ্চিত ধন—আমার যুগলমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মা ও ক্রিয়াশক্তি, বিষ্ণু ও পালন শক্তি, শিব ও সংহার শক্তি, চিত্রকর ও চিত্র, মক্ষিকা ও মধু, ক্রিমিকীট ও বিষ্ঠা, মার্জ্জার ও মৎস্য, যুবক ও যুবতী, ছাত্র ও পুস্তক, সিংহ ও নিহত মৃগ, জ্ঞানী ও তত্ত্বকথা, চোর ও বহুমূল্য পরদ্রব্য, চক্ষু ও সুন্দর বস্তু, কর্ণ ও সুস্বর, নাসিকা ও সুগন্ধদ্রব্য ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যেক দ্বন্দ্বই আমার এক একটি যুগলমূর্ত্তি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আমি যুগল

মূর্ত্তিতে বিরাজিত—অসংখ্য মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকৃতির অসংখ্য অংশ গুলিকে ভোগ করিতেছি।”

ভাবুক এখন ভক্তিতে বিহ্বল—ভাবে বিভোর। তিনি এই অসংখ্য মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কোন ইতর বিশেষ দেখিতে পাইতেছেন না, কোন প্রভেদ লক্ষ্য করিতেছেন না, সর্ব্বত্রই এক আনন্দমাত্র দেখিতেছেন, সর্ব্বত্রই ভগবৎ সত্ত্বা উপলব্ধি করিতেছেন! এখন আর তাঁহার চক্ষে একটী ভাল, একটী মন্দ, একটি শুচি, একটী অশুচি একটী ধর্ম্ম, একটী অধর্ম্ম বোধ হইতেছে না; এখন সকল গুলিই ভাল, সকল গুলিই পবিত্র, সকল গুলিই ধর্ম্ম, কারণ, সকল গুলিই একই আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র এখন কুকুরকে বিষ্ঠা খাইতে দেখিয়া, তাঁহার ঘৃণার উদয় হয় না, কারণ কুকুর আনন্দের একটী মূর্ত্তি, বিষ্ঠা আনন্দের আর একটী মূর্ত্তি, অতএব আনন্দের সহিত আনন্দই মিলিত হইতেছেন—ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মেরই সংযোগ হইতেছে। এখন সুরাপানোন্মত্ত-লম্পটকে বারাঙ্গনার সহিত বিহার করিতে দেখিয়া তাঁহার অবজ্ঞা বা ক্রোধের উদ্রেক হয় না, পরন্তু সেই অসীম আনন্দের একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তিনি আপনাকে ধন্য বোধ করেন এবং ভক্তি গদ্গদচিত্তে বিরাট যুগল মূর্ত্তিকে অন্তরে নমস্কার করেন। এখন সর্ব্বত্র তিনি একই বস্তু অবলোকন করিতেছেন, তাঁহার ভেদবুদ্ধি ছুটিয়াছে, তিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে—আরোহী ও অবরোহী—উভয় মার্গের দ্বারাই আমরা বহুত্বের মধ্যে একত্ব স্থাপন করিতে পারি, অনেককে একে পরিণত করিতে পারি। ইহাই—একীকরণ

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(খ) দৈত্য জাতি।

দানবগণ দৈত্যগণের আদিপুরুষ। আশিলক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইল, দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে দানবকুল হইতে দৈত্যকুল জাত হইল। তাহারা পরস্পর সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া কুশদ্বীপের সপ্ত উপত্যকা ভূমি অধিকার করতঃ বাস করিতে লাগিল।

দৈত্যকুলে একে একে সপ্ত উপবিভাগ জাতির উদ্ভব হইয়াছিল।

(১) রোওয়া হল্ বা মোওয়া হল্ জাতি (Rmoahal)
(২) ট্লবট্‌লি জাতি (Tlavatli)
(৩) টল্‌টেক্ জাতি (Toltec)
(৪) টুরেনিয়ান্ বা রাক্ষসজাতি (Turanian giants
(৫) সেমিটিক্ জাতি (Semetic)
(৬) আকাডিয়ান জাতি (Akkadians)
(৭) মাঙ্গালিয়ান জাতি (Mongolians)

দৈত্যকুল এই সাত ভাগে বিভক্ত।

তাহারা সোম ও চন্দ্রের অধীনে জন্মলাভ করিল। চন্দ্রের কলঙ্ক হইতে যে সকল কালো কালো রশ্মি বাহির হয়, তদবলম্বনে টল্‌টেক জাতি কৌশলে মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি নানা আভিচারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে। এইরূপে (সোমের কল্যাণে দৈত্যজাতির মধ্যে আভিচারিক বিদ্যার যথেষ্ঠ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। শনির অনুগ্রহে টল্‌টেক্ জাতির বোধশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রাচীন মিশরদেশীয়গণ শনৈশ্চরের অনুকম্পায় তাহাদের অধিকাংশ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। দৈত্যগণকে পদ্মপাণির সন্তান বলা হয়। পদ্ম জননের চিহ্ন। স্ত্রীপুরুষ সংসর্গে দৈত্যকুলের উদ্ভব হইয়াছিল, এই জন্য তাহাদিগকে পদ্মপাণির সন্তান বলা হয়। এই জাতির অভ্যুদয়

কালেই মানবদেহ দৃঢ়তার, আয়তনের এবং বলবিক্রমের চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল। এই জাতির মানবদেহ সাধারণতঃ ১৮ হস্ত পরিমিত ছিল।

১। দৈত্যজাতির প্রথম বিভাগ।

এই প্রথম বিভাগের পাশ্চত্য নাম রোওয়া হল বা মোওয়া হল্ (Rmoahal)। তাহাদের বর্ণ বেশ পরিষ্কার ছিল। তাহাদের মধ্যে পূর্বে অসুরগণ, পরে সৌরপিতৃগণ জন্ম লাভ করিল। বহুকাল পরে তাহারা যখন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইল, তখন দৈত্যজাতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ স্পষ্টভাবে তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইল। অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ তাহাদের সম্রাটরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই স্বর্গীয় সম্রাটগণের শাসন সময়ে কথিত প্রথম বিভাগে এক অতি শক্তিশালী সভ্যতার অভ্যুদয় হইল। আট্লানটিক্ মহাসাগর বক্ষে যে স্থলভাগ উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বহু দানব বাস করিত। আফ্রিকা দেশেও বহুতর দানবের বসতি ছিল। দৈত্যগণ এই উভয় স্থান হইতেই দানবদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিল। পরে তাহারা স্থানে স্থানে সুদৃঢ় নগর সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাজশাসন প্রণালী এবং সমাজ শাসননীতি যথাবিধানে প্রচলিত ও সংস্থাপিত করিল। তখন তাহারা ললাটস্থ তৃতীয় চক্ষুর ব্যবহার করিলেও ভ্রূর নিম্নভাগে দুইটী পার্থিব চক্ষুর বিকাশ হইল; তাহাতে এই তৃতীয়চক্ষুক্রিয়া ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। অপার্থিব বিষয়ের জ্ঞান লাভের জন্যই তৃতীয় চক্ষুটী বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইত। ভুবর্লোক (Astral plane) তখনও সাধারণের দৃষ্টির বিষয়ীভূত ছিল। কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ বা কলহের সূত্রপাত না হইয়া এই নবীন সভ্যতা অতি শান্ত এবং ধীরভাবে পরিচালিত হইয়াছিল।

২। দৈত্যজাতির দ্বিতীয় বিভাগ।

এই বিভাগের পাশ্চাত্য নাম ট্লবট্লি (Tlavatli)। তাহাদের বর্ণ গৌর ছিল। যে দেশ আট্লান্টিক মহাসাগর গর্ভে বিলীন হইয়াছে, সেই দেশে তাহারা স্বর্গীয় রাজাগণের শাসনাধীনে ও তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উন্নত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অসুরগণ এই বিভাগে জন্মলাভ করাতে, তাহাদের মধ্যে কৃষি ও শিল্পবিদ্যার সমধিক উন্নতি সাধন হইয়াছিল।

৩। দৈত্যজাতির তৃতীয় বিভাগ।

এই বিভাগের পাশ্চাত্য নাম টল্‌টেক্ জাতি (Toltec sub-race)। পাশ্চাত্য-ভূভাগে ক্রমশঃ এই জাতিব অভ্যুদয় হইতে লাগিল। তাহারা সুদৃঢ় এবং সবলকায় ছিল। বল বিক্রম, বুদ্ধি বিবেচনায় তাহারা সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ধন জন, যশঃ সৌভাগ্য প্রভৃতিতে তাহারা পার্থিব উন্নতির চরমসীমায় উঠিয়াছিল। কিন্তু হায়! অত্যধিক অভ্যুত্থানই পরিণামে এই সুপ্রসিদ্ধ সভ্যতার দারুণ অধঃপতন ঘটাইল। অভ্যুত্থানং হি পতনায়। প্রলয় কাণ্ডে এই চতুর্থ জাতির প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ সমূলে নাশ পাইল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহাবা ক্রমশঃ খর্ব্বাকৃতি হইতে লাগিল এবং আচার ব্যবহারে অসভ্য বর্ব্বর রূপে পরিণত হইল। দানবজাতির মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের সঙ্গে কথিত দ্বিতীয় বিভাগের লোক উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইল। এই সঙ্কর মিলনের ফল স্বরূপ দ্রাবিড়ের অসভ্য বর্ব্বরগণের (Dravidians) উদ্ভব হইল। তদনন্তর টল্‌টেক্ বিভাগের অভ্যুত্থান হইল। তাহাদের দেহ প্রকাণ্ড হইলেও তাহা অতি সুশ্রী, মনোহব এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাতিশয় সৌষ্টবসম্পন্ন ছিল। তাহাদেব বর্ণ লোহিত ছিল। তাহাদের সুদীর্ঘ দেহ ১৮ হাত পরিমিত লম্বা ছিল। সেই দেহ এত কঠিন ছিল যে সুদৃঢ় লৌহ ও ইস্পাতের স্থূল শিক তাহারা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিত। ছুরি দ্বারা কঠিন পাথরে আঘাত করিলে যেমন তাহা কাটিতে না পারিয়া ফিরিয়া আইসে, সেইরূপ তাহাদের কঠিন দেহে লৌহ-ছুরিকা বিদ্ধ হইত না। সেই দেহ দৃঢ়তাব চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল, পূর্ব্বাপর কোনও জাতির দেহই এত দৃঢ়তা ও কাঠিন্য লাভ করে নাই। আবার আমাদের দেহের তুলনায় বর্ত্তমান স্থাবর যেরূপ শক্ত, তাহাদের শক্ত দেহের তুলনায় তখনকার প্রস্তরাদিও সেইরূপ অতিশয় কঠিন ছিল। সেই কাঠিন্য আমাদেব ধারণায় আইসে না। তাহাদের দেহের আব একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাহাতে গুরুতর আঘাতে গভীর ক্ষত হইলেও তাহা অতি শীঘ্র পূরণ হইয়া যাইত। যুদ্ধে কিম্বা কোন দুর্ঘটনায় তাহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলে, তাহা অতি সহজে ও শীঘ্র আরোগ্য হইত এবং ছিন্ন মাংস অবিলম্বে যোড়া লাগিত।

অস্ত্রাঘাতে দেহের অঙ্গ কাটিয়া গেলে, তাহারা কোনরূপ অস্থির হইত না। গুরুতর শারীরিক দণ্ডভোগ করিলে, কিম্বা অশেষ যন্ত্রণা পাইলেও তাহারা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিত না। আমরা যে আঘাতে একেবারে শয্যাশায়ী ও মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হই, সেইরূপ আঘাতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও কষ্টবোধ হইত না। তাহাদের মাংস পাথরের ন্যায় এবং শিরা ইস্পাতের তারের ন্যায় অতিশয় কঠিন ছিল।

তাহাদের আস্বাদন শক্তির মাত্র বিকাশ হইয়াছিল। জিহ্বার রসাস্বাদন শক্তি তাহাদের প্রবল ছিল না। অতি তীব্র স্বাদ ভিন্ন সামান্য স্বাদের তারতম্য তাহারা টের পাইত না। পচা দুর্গন্ধযুক্ত মাছ মাংস, পলাণ্ডু রসুন ইত্যাদি এবং অতি প্রবল ও তীব্র স্বাদ ও গন্ধযুক্ত খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য তাহাদের নিকট মুখরুচিকর এবং উপাদেয় বলিয়া বোধ হইত। এতদ্ব্যতীত অপর দ্রব্য তাহাদের নিকট স্বাদহীন বলিয়া গণ্য হইত। তাহাদের ঘ্রাণ-শক্তি ছিল না, কাজেই পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করিতে তাহাদের কোনরূপ ক্লেশবোধ হইত না। উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদের দেহ এবং বাড়ী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যত্নপরায়ণ হইলেও জনসাধারণ, দৃষ্টি কটু না হইলে, অতি কদর্য্য এবং দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিতে বিন্দুমাত্রও ক্লেশবোধ করিত না। তাহাদের এই সকল বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার এখনও তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে অল্প বিস্তর পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়। আমরা যে আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভব, সেইরূপ গুরুতর ও সাংঘাতিক আঘাত পাইলেও উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ অনায়াসে তাহা সামলাইয়া উঠিতে পারে এবং সহজে আরোগ্য লাভ করে। যে দৈহিক যন্ত্রণায় আমরা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি তাহা তাহারা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারে। ব্রহ্মদেশবাসীগণ মৃত্তিকার নীচে মাছ মাংস পুতিয়া রাখে; কিছু দিন পরে পচিয়া দুর্গন্ধময় হইলে, তাহারা তুলিয়া অতি আদরের সহিত ভক্ষণ করে। ইহা তাহাদের কাছে অতি সুস্বাদু ও অতুল আদরণীয় খাদ্য। যেখানে বাস করিলে, বা যাহা আঘ্রাণ করিলে আমরা উৎকট রোগ-গ্রস্থ হওয়ার সম্ভব, তাহাতে তাহারা অনায়াসে বসবাস করিতে পারে। কোনরূপ উপদ্রব বা উদ্বেগ বোধ করে না।

মানবদেহ ক্রমশঃ স্থূল হইতে হইতে স্থূলত্বের শেষ সীমায় উপনীত হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় চক্ষুটী লোপ পাইয়া গেল। কিন্তু ইহার আভ্যন্তরিক ক্রিয়া বিদ্যমান রহিল। চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, সূক্ষ্ম ভুবর্লোকের জ্ঞান সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আভিচারিক ক্রিয়ার সবিশেষ প্রচলন ছিল। তদ্দ্বারা তাহারা নিম্ন শ্রেণীর তৃতীয় চক্ষুর ক্রিয়া ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বিনষ্ট করতঃ তাহাদিগকে (নিম্ন শ্রেণীর লোককে) দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিত এবং সময় সময় তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। এই জাতির অন্তর্গত নানা শাখাজাতির মধ্যে বর্ত্তমানেও কিয়ৎপরিমাণে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি. শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বিভাগের মধ্যে প্রাচীন রাক্ষসিক ভাষা প্রচলিত ছিল। চতুর্থ বিভাগ রাক্ষস নামে প্রসিদ্ধ (Turanian Giants) পুরাতন গ্রীক জাতি তাহাদিগকে টিটান্ (Titan) বলিত। ক্রমশঃ।

যুগল সেবক।

মরণ ও মরণান্তে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পিণ্ডদেহ।

যাঁহারা "মানবের সপ্তরূপ" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে পিণ্ডদেহ (Etheric Double) প্রাণের বাহন স্বরূপ। এই পিণ্ডদেহকে অবলম্বন করিয়াই প্রাণ স্থূল দেহে উল্লিখিত নেতৃত্বের ও নিয়ন্তার কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে। মরণকালে পিণ্ডদেহ চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়, উক্ত দেহের সঙ্গে স্থূল দেহের সংযোজক যে অতি সূক্ষ্ম রজতাভ সূত্র থাকে তখন তাহা ছিন্ন হইয়া যায়।

অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দর্শনকারীগণ (clairvoyants) পিণ্ডদেহের এইরূপ তিরোভাব দর্শন করিয়া তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন

অবস্থায় যাহা সাধারণতঃ আপাতঃ দৃষ্টিতে মৃত্যু বলিয়া মনে হয়, তাহার ৩৬ ঘণ্টা অর্থাৎ ১২ প্রহর পরে ভাণ্ড ও পিণ্ডদেহের সংযোজক শুভ্র ও সূক্ষ্ম সূত্রটী ছিন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

অনেকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে ইহা বেগুণে রঙ্গের অতিমসৃণ ধূম্র কুজ্ঝটিকার ন্যায় শবদেহ হইতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, পরে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত ও স্থূলদেহের অবিকল অনুরূপ প্রতিকৃতি বিশিষ্ট হইয়া কথিত উজ্জ্বল রজতাভ সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা উক্ত স্থূল দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, এই সূত্রটী ছিন্ন হইলেই স্থূল দেহের সঙ্গে মানবের অপর ছয় রূপের চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটে। দেহ প্রকৃত মানব হইতে সরিয়া পড়ে, তখন তাহাকে মৃত ও পরলোকগত বলা যায়। মরণের অব্যবহিত পরে মানবের অবশিষ্ট ছয়রূপ একত্র সংবদ্ধ থাকে। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের ন্যায় কেবল স্থূলদেহটী পরিত্যক্ত হয় মাত্র।

দেহ ধারণকালে জীব এক একটী কোষ করিয়া ষড়কোষে আবদ্ধ হয়। মরণকালে বাহ্য স্থূল কোষটী হইতে মুক্তি লাভ করে। কিরূপ? সাপ যেরূপ খোলশ ত্যাগ করে প্রজাপতি যেরূপ তাহার দেহের শক্ত আবরণ ত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়, সেইরূপ মানব স্থূল দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রকৃষ্টতর চৈতন্যসত্বায় উপনীত হয়। মৃত্যুকালে স্থূল দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরে জীব যেমন কামদেহ অবলম্বন করিয়া যমলোকে (Astral worldএ) বাস করে, অথবা উন্নতাবস্থায় আরও সূক্ষ্মতর মানসদেহ অবলম্বন করিয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করে, উন্নত দেহধারী সাধকগণ জীবদ্দশায়ই সজ্ঞানে সেই লোকে গমনাগমন করিতে পারেন। তাহাতে মরণের পরে মানবের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটে, তাহা অবগত হইয়া জনসাধারণের মনে যে মরণের নামে একটা আতঙ্কের ভাব বদ্ধমূল আছে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। এবং কেবল মাত্র স্থূলদেহে যে জীবন নির্ভর করে না এবং তাহার বিনাশেই যে জীবন পর্য্যবসিত হয় না, তাহা নিসংশয়রূপে বুঝিতে পারেন। সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় দেহ হইতে বাহির হইয়া যখন বারংবার অধিকতর স্বাধীনতা লাভ করিয়া জীবনকে বিশদভাবে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তখন চিরদিনের মতন বন্ধনজাল ছিন্ন করিয়া রক্তমাংসময় দেহ

কারাগার হইতে মুক্ত হওয়ার সময় কেন তিনি শোকমোহে অভিভূত বা বিষণ্ণ হইবেন? এই শিক্ষা পরা বিদ্যা সমিতির অন্তরঙ্গা সাধণার একটী প্রধান অঙ্গ।

ঈশ্বর জ্বলন্ত অগ্নি, জীব তাহার এক একটী স্ফুলিঙ্গ বা কণা। এই বহ্নি-কণা ব্রহ্মরূপ কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া স্বীয় আবরণ তৈয়ার করিয়া তাহাতে বাস করে, তাহাতেই আত্মা বুদ্ধি মনঃরূপী জীবের সৃষ্টি হয়। ইহা অবিনশ্বর আত্মার বা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। এই জীবদেহ হইতে আবার একটী রশ্মিকণা বাহির হইয়া ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর পদার্থে জড়িত হইতে থাকে। প্রথমতঃ কামোপদানে গঠিত কামদেহে বা বাসনাময় দেহে বাস করে, এই দেহেই কামের বা বাসনার উদ্ভব ও উদ্রেক হয়। পরে পিণ্ড বা ছায়া দেহে আবদ্ধ হয়। তৎপর স্থূল বা ভাণ্ডদেহে জড়িত হইয়া সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত কারাগার বদ্ধ কারাবাসীর দশা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ অশেষ সংসার যাতনা ভোগ করিতে থাকে। হায়! হায়! নিত্য মুক্ত শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ সচ্চিদানন্দ জীবরূপী ব্রহ্মের কি এই পরিণাম? এইরূপ কঠোর অষ্টপাশে বদ্ধ হইলেও জীব স্বরূপতঃ স্বর্গীয় স্বাধীন বিহঙ্গই থাকে, তবে স্থূলপাঙ্ক ভৌতিক পদার্থে পতিত হওয়ায় তাহার পাখাগুলি জড সড হইয়া যায় ও ইচ্ছামত উড়িতে পারে না।

যখন সৌভাগ্য ক্রমে জীব তাহার স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারে, তখন দেহকারাগারের দ্বার খুলিয়া তাহা হইতে বাহির হইবার জন্য প্রয়াস পায় এবং সময় সময় তাহা হইতে প্রথমে স্থূলদেহভার ও বাসনার হাত হইতে মুক্তি লাভ করে, এবং পবিত্র মানসরাজ্যে বিচরণ করতঃ নৈতিক জীবন লাভ করিয়া নিজে যে কথিত রূপত্রয়ের (আত্মা, বুদ্ধি, মনসের) সঙ্গে স্বরূপতঃ এক, তাহা উপলব্ধি করিতে শিখে, পরে জানিতে পারে যে এই কামতৃষ্ণাময় স্থূলদেহ আর তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। জীবদেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় ও প্রকৃত নবজীবন লাভ করে। যখন মরণকালে দেহ নাশ হয় তখন সেই জীব জানিতে পারে যে সে কোথায় কোন্ রাজ্যে যাইতেছে। কারণ, এই রাজ্য যে তাহার পরিচিত। দেহ ধারণ কালে ইচ্ছা মত কতই না এই রাজ্যে বিচরণ করিয়াছে, তখন সে অত্যা-

বস্তুকীয় এই ধ্রুব সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারে যে এই দেহ বা জড় জগতের সহিত জীবনের কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ, এই জড়দেহ বা জড় জগতের উপর জীবের জীবন নির্ভর করে না। প্রকৃত পক্ষে জীবন, জীবের একটী নিরবচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, সংজ্ঞানময়, জ্ঞানময় অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বের বিনাশ নাই, এই অস্তিত্ব ছিন্ন হইবার নহে। তবে জীব যতকাল এই জড় জগতে বাস করে, সেই কালটুকু অনন্ত জীবনের অতি ক্ষুদ্রতম, যৎসামান্য অংশ বিশেষ। সুদূর পথগামী পথিক যেমন পরিশ্রান্ত হইয়া দিবাবসানে কোন পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই রাত্রিকালের জন্য বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া পরদিন প্রত্যুষে আবার তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়, জীব ও ঠিক সেইরূপ এই সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে কয়েক দিন ভ্রমণ করিয়া যায় মাত্র। মেদ-মাংসময় দেহকারাগারে আবদ্ধ হইয়া জীব স্বাধীনভাবে এই জড় জগতে কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। তাহার ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন জীবনের কথাটী ভুলিয়া যায়, তখন মোহবশে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ, অনিত্যকে নিত্য এবং নিত্যকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান করে।

দেহ ধারণের পূর্ব্বে জীব মুক্ত থাকে, তখন সে দিনমণির দীপ্ত কিরণে রঞ্জিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতুল সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বিমল আনন্দানুভব করিয়া থাকে, পরে জন্মকালে তমসাচ্ছন্ন দেহগহ্বরে পতিত হইয়া সেই দিব্য দৃষ্টি হারাইয়া ফেলে, তখন কোন মিটি মিটি দেখিতে পায়। মরণকালে দেহকারাগার হইতে জীব বাহির হইয়া পুনর্ব্বার সেই সহস্ররশ্মি অংশুমালীর ভাস্বর কিরণমালার সৌন্দর্য্য দর্শন লাভ হইয়া থাকে, তখন সদসৎ বস্তু জ্ঞানে অধিকতর উপযোগী হয়। কালের তুলনায় আলোর অবস্থাপেক্ষা অন্ধকারের অবস্থা অতি সামান্য, কিন্তু আমরা অজ্ঞজীব, মোহ বশতঃ সেই তমসাচ্ছন্ন অবস্থাকেই জীবন বলি ও উহাই প্রকৃত জীবন বলিয়া বিশ্বাস করি, অপর পক্ষে আলোর অবস্থাকেই আমরা মৃত্যু বলি ও সেই অবস্থায় পতিত হইব বলিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি।

মরণকালে দেহী দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর সেই পরিত্যক্ত দেহে অসংখ্য জীবাণু পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করে। জীবদ্দশায় দেহস্থ প্রাণ তাহার বাহন পিণ্ডদেহের সাহায্যে এই জীবাণুদিগকে নিয়মিত করিয়া

রাখে, কিন্তু প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, কে আর তাহাদিগকে শাসনে রাখে? কাজেই তাহারা পরস্পর কাটাকাটি, মারামারি করিয়া মরে। তাহাতেই দেহ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যায় ও পচিতে থাকে, শেষে জীবাণু ও অণু-কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দেহস্থ পরমাণু সকল চলিয়া গিয়া অন্যান্য জড় পদার্থের নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অতএব জড়দেহ সম্বন্ধে সেই দেহ যন্ত্রের বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু, অর্থাৎ, যে বন্ধনবলে অসংখ্য জীবাণু পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া একত্রে পরিণত হইয়াছিল, সেই বন্ধনের বিচ্ছেদই দেহের মৃত্যু।　　　　　　　　　　ক্রমশঃ।

শ্রীসুদর্শন দাস।

বেদান্তাভাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সাধে চাই হই একাকী,
শূন্যময় সকলই দেখি,
"দৃক্ ব্রহ্ম দৃশ্য মায়েতি,"
বেদান্ত করে ঘোষণা ॥ ৭ ।

দৃক দৃশ্যাদি বস্তু নিচয়,
পরস্পর অভিন্ন না হয়,
বৈলক্ষণ্যে বুঝ সদা,
দেখ করিয়ে ধারণা ॥ ৮ ।

দৃক্ অর্থে ব্রহ্ম বিস্ময়,
দৃশ্য যাবৎ মায়াময়,
দৃশ্য তিরোধান বিনা,
সাধনের কোথায় সূচনা ॥ ৯ ।

সর্ব্বশূন্যময় যদি হয়,
দৃশ্য মায়িক বস্তু না রয়,
মায়াতীত ব্রহ্ম আমি,
সপ্রকাশ কি নয় বল না॥ ১০।

ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যার সার,
করিল শাণ্ডিল্য প্রচার,
তাই শাণ্ডিল্য-বিদ্যা বলি,
জগতে আছে ঘোষণা॥ ১১।

সে বিদ্যা বঞ্চিত জন,
ভোগ সুখে নিমগন,
অবিদ্যা আশ্রিত হয়ে,
সংসারে একাগ্রমনা॥ ১২।

এই অবিদ্যায় ধ্যানী ধ্যানে,
কল্পনা-সম্ভূত জ্ঞানে,
দেখে কত লোকালোক,
মূর্ত্তি না হয় গণনা॥ ১৩।

ব্রহ্মবিদ্যা বিবর্জ্জিত,
জন্মে জন্মে প্রকম্পিত,
সংস্কার অব্যাহত,
কারণ ইঁহার বুঝ না॥ ১৪।

বিদ্যায় জ্ঞান হয় স্ফূরিত,
জ্ঞানে মায়া তিরোহিত,
অমায়িক বস্তু কি ধন,
কেউ বুঝে কেউ কদাচ না॥ ১৫।

ক্রমশঃ।

রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সম্বন্ধ তত্ত্ব।

আমাদিগের নিবাসভূতা পৃথিবী পরিদৃশ্যমান্ সৌরজগতের অংশ। সৌরজগৎ নাক্ষত্রিক জগতের অংশ। চতুর্দ্দশ ভুবন বা সমৃণাল লোকপদ্ম ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অংশ। শাস্ত্র সকল চতুর্দ্দশ ভুবনকে সমৃণাল লোকপদ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন এবং সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণও ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনকে ধ্যাননেত্র দ্বারা তদাকারেই দর্শন করিয়া থাকেন। ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ড সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অংশ। সমষ্টিব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রস্থানীয় ব্রহ্মধামের পরিধিস্থানীয়। অতএব ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডকে সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডপরিধির একটী বিন্দু বলিলেও বলা যায়। বিন্দু যেমন রেখার অবয়ব ও রেখা হইতে অনতিরিক্ত, তদ্রূপ ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডও সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অবয়ব এবং উহা হইতে অতিরিক্ত নহে। কেন্দ্রস্থানীয় ব্রহ্মধাম ওতপ্রোত-ভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অন্তঃ আধারস্বরূপে গূঢ়রূপে অবস্থিত হইয়াও লীলাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আধেয়বৎ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐ ব্রহ্মধাম শ্রীভগবানের বৈভববিশেষ—প্রকাশ বিশেষ। ব্রহ্মাণ্ডও শ্রীভগবানের বৈভববিশেষ। ব্রহ্মধাম তাঁহার ত্রিপাদবৈভব বা স্বরূপবৈভব এবং ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার পাদবৈভব বা মায়াবৈভব। উক্ত উভয় বৈভবই শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র। তন্মধ্যে স্বরূপ বৈভবে কেবল সিদ্ধগণের সহিত লীলা হইয়া থাকে। মায়াবৈভব সিদ্ধ ও সাধকের সম্মিলন স্থান। ঐ স্থানে শ্রীভগবান সিদ্ধ ও সাধক উভয়ের সহিত যুগপৎ লীলা করিয়া থাকেন। উভয় লীলাই নিত্য। স্বরূপ বৈভবের লীলা অবিচ্ছেদে এবং মায়া বৈভবের লীলা ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্তরে প্রবাহ রূপে সাধিত হইয়া থাকে। জ্যোতিশ্চক্রস্থ একই সূর্য্য যেমন একটী বর্ষে পূর্ব্বাহ্নাদি সমাপন করিয়া বর্ষান্তরে আবার ঐ পূর্ব্বাহ্নাদি প্রকাশ করেন, শ্রীভগবান্ তদ্রূপ অপ্রকট প্রকাশে নিজধামে থাকিয়াই প্রকটপ্রকাশে এক ব্রহ্মাণ্ডে বাল্যাদি লীলা সমাপন করিয়া অপর ব্রহ্মাণ্ডে আবার ঐ সকল লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। লীলা অলাতচক্রের

স্রোত বা প্রবাহের ন্যায় গমনাগমন করিতেছেন। জন্মাদি মৌষলান্ত লীলা সকল ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্তরে প্রকাশিত হইয়া আপনাদের নিত্যত্ব ব্যক্ত করিতেছেন। মায়াবৈভব স্বরূপবৈভবের ছায়ামাত্র। স্বরূপ-বৈভব বিম্বস্থানীয়, মায়াবৈভব উহার প্রতিবিম্ব। অতএব স্বরূপবৈভবের সহিত মায়াবৈভবের আশ্রয়াশ্রয়িভাব ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ নাই। ঐ আশ্রয়াশ্রয়িভাবও আবার পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। শ্রীভগবান যে কি কৌশলে সঙ্কল্পমাত্র চিদ্বিভূতির সহিত জড়বিভূতির তাদৃশ ঔপাধিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। চিজ্জড়ের একত্র সমাবেশ মানববুদ্ধির অগোচর। বুদ্ধির বিষয় না হইলেও সত্যের অপলাপ করা যায় না। জড়াজড়ের উপাধ্যুপহিত ভাব অস্বীকার করা সঙ্গত হয় না। মায়াবীর মায়ারহস্য বোধগম্য না হইলেও দর্শকের চক্ষুকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারা যায় না। যোগেশ্বরেশ্বর মহামায়াবী মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরের পক্ষে সকলই সম্ভব। তিনি বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীবের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহার স্বরূপবৈভবকে যথেচ্ছ মায়াবৈভবে প্রকট করিয়া থাকেন। অতএব স্বরূপবৈভবীয় লীলা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন মায়াবৈভবীয় লীলাকে স্বরূপ-বৈভবীয় লীলারই প্রকাশবিশেষ বলা যায়। এইরূপে লীলাদ্বয়ের পরস্পর ভেদ না থাকিলেও তদুভয়ের রূপভেদ অনিবার্য্য। অধিষ্ঠানভেদে প্রকাশের ভেদই বিজ্ঞানসম্মত। এই নিমিত্তই অপ্রকট লীলা ও প্রকট লীলা স্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন তদ্দ্বারা অপর একটী মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অনন্ত অপ্রকট লীলার সীমাবদ্ধ প্রকট-প্রকাশে মুক্ত জীবের প্রশান্ত গম্ভীর সুখসাগর তরঙ্গায়িত এবং বদ্ধজীবের মুক্তিসুখসাগরে যথেষ্ট অবগাহন সাধিত হইতে থাকে। শ্রীভগবানের সৃষ্টি-ব্যাপারেই মায়াবৈভবে স্বরূপবৈভবের প্রথম প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরুষাবতার। যিনি প্রকৃতির অন্তর্যামী ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, যিনি অংশ ও বহুরূপ হইয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী হয়েন, যিনি আদি অবতার ও সকল অবতারের বীজ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহার অংশ পরমাত্ম স্বরূপে ভূতে ভূতে বিরাজ করেন, তাঁহারই নাম পুরুষাবতার। এই পুরুষাবতার সম্বন্ধে সংস্কৃত তন্ত্রের উক্তি যথা ;—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীনিরূপানি।
পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ॥
একন্তুমহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তা্নি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

বিষ্ণুর অর্থাৎ মূলসঙ্কর্ষণের পুরুষসংজ্ঞক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতির অন্তর্য্যামী ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, তাঁহার নাম প্রথম পুরুষ। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ও সমষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী তাঁহার নাম দ্বিতীয় পুরুষ। আর যিনি সর্ব্বভূতের বা ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী, তাঁহার নাম তৃতীয় পুরুষ। ক্রমশঃ।

পরাবিদ্যা সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য।

কেহ পরাবিদ্যা সমিতির সভ্য হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উক্ত সমিতির কোন এক সভ্য প্রথমে তাঁহাকে ঐ সমিতির (three objects) ৩ তিনটী উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বুঝাইয়া বলেন, অথবা কাগজে মুদ্রিত উক্ত উদ্দেশ্যত্রয় তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিতে কহেন। ঐ তিনটী (বিশেষতঃ উহার মধ্যে প্রথমটী) প্রবেশার্থীর অনুমত হইলেই তিনি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। প্রথমটী ইংরাজি ভাষায় যেমন লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তৎপরে তাহার (free translation) অনুবাদ বঙ্গভাষায় দিতেছি :—

1. "To form a nucleus of the universal brotherhood of humanity, without distinction of race, creed, sex, caste or colour."

'হিন্দু মুসলমানাদি জাতি ও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম-মতভেদ, স্ত্রীপুরুষের বিভিন্নতা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রাদি বর্ণভেদ—এই সকল পরিদৃশ্যমান পার্থক্যের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া (অর্থাৎ মূলে সকলেই এক ও অভেদ এইরূপ একটা সামান্য জ্ঞান) সকলের মধ্যে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের উদ্দীপনার জন্য একটী বীজ-কেন্দ্র প্রস্তুতকরণ' ইহাই উদ্দেশ্য।

ইংরাজি "object" অর্থে সকলেই জানেন "it is something which is set or "thrown" before you." আমাদের ভাষায় বলিতে বা লিখিতে হইলে আমরা উহাকে 'বিষয়' বলিব বা লিখিব—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ রসাদির অন্যতম বুঝিতে হইবে। এই সমিতি সংস্থাপনকালে পূজনীয়া হেলেনা ব্লাভাট্স্কী ও শ্রদ্ধাস্পদ কর্ণেল মহোদয় সকলের সমক্ষে তিনটীমাত্র বিষয় উপস্থিত করেন, যদ্দ্বারা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে সক্ষম হয়েন। যাহারা কোন একটীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েন, তাঁহারা এই সমিতিতে প্রবেশ করিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয় দ্বারা কেহ আকৃষ্ট হউন বা না হউন তাহাতে বড় ক্ষতি নাই, প্রথমটী সম্বন্ধে কাহারও অনভিমত হইলে তিনি কিছুতেই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না। সুতরাং এই পৃথিবী মধ্যে যে স্থানে যে কেহ ইহার সভ্য হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রথম উদ্দেশ্যটী সম্পূর্ণরূপে মানিতে হইয়াছে। সমগ্র জগত ব্যাপিয়া সর্ব্বদেশের পরাবিদ্যাসমিতির সভ্যগণ যে উদ্দেশ্যটীকে সমভাবে আদর করিতেছেন, সেইটীই শীর্ষস্থানীয় - সর্ব্বোচ্চ—ইহাই 'সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বীজ-কেন্দ্র প্রস্তুত করণ'।

'Universal Brotherhood' সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে আমরা কি বুঝিব এক্ষণে তাহা দেখা যাউক। কোন এক বিশিষ্ট পিতার ঔরসে কোন এক বিশিষ্ট মাতার গর্ভ হইতে নিসৃত জীব সকল ভ্রাতা বা ভগিনী পদবাচ্য। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা টান (attraction) সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সকল পরিবার মধ্যেই সকল স্থানেই ভ্রাতৃভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু এই সকলই নির্দ্দিষ্ট ও স্বল্প সীমাবিশিষ্ট মাত্র—পৃথকত্বের ভিতর কথঞ্চিৎ একত্ব। Universal Brotherhood বলিতে গেলে আর কোথাও কোন প্রতিবন্ধক থাকেনা—ভেদের চিহ্ন কুত্রাপি থাকে না—কেবল এক অনন্ত একত্বেরই ভাব বুঝায়।

এই পৃথিবীর নানাস্থানে অনেকানেক সমিতি দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের watchword Brotherhood—যাহাদের উদ্দেশ্য ভ্রাতৃভাব প্রচার। যে পরিমাণে যে ব্যক্তি বা যে সমিতি এইরূপে ভ্রাতৃভাব কার্য্যে পরিণত

করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই সেই পরিমাণে তাহারা প্রকৃত জগদ্ব্যাপী ভ্রাতৃভাবের পথে অগ্রসর হইতেছে।

অনেকানেক এইরূপ সমিতি বর্ত্তমান সত্বেও এই পরাবিদ্যা সমিতির সংস্থাপকগণ কি কারণে ভ্রাতৃভাব প্রসারণের জন্য আবার একটী নূতন সমিতি স্থাপন করিলেন? অনেকানেক অপর সমিতির সঙ্কল্প যেকালে একতা প্রচার তাহা হইলে কোথায় অপর সকল সমিতির সহিত Theosophical Societyর পার্থক্য?

যে স্থান বা দিক্ হইতে লক্ষ্য করা যায় সেই স্থানের বা দিকের উপর এই পার্থক্য নির্ভর করিতেছে—The difference lies in the different points of view—the different standpoints from which Brotherhood is looked at. বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে একই বস্তু নিম্ন হইতে দেখিলে একরূপ এবং উপর হইতে দেখিলে অন্য একরূপ দেখায়—বাহির হইতে একরূপ ভিতর হইতে অন্যরূপ দেখা যায়। যদি আপনাদের মধ্যে কেহ কখন বিস্তীর্ণ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট পত্রাদিতে পরিপূর্ণ কোন এক বৃহৎ বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়া সুনীলগগনের দিকে দৃষ্টি করেন, তখন সেই বৃক্ষকে একরূপ দেখাইবে; এবং যদ্যপি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ঐ বৃক্ষকে দেখেন তখন আবার উহা অন্যরূপে প্রতীয়মান হইবে। পুনরায় আর একটী উদাহরণ দেখুন—কোন ব্যক্তি কখনও প্যারিস (Paris) নিউইয়র্ক (Newyork) কিম্বা লণ্ডন (London) সহর দেখেন নাই, কিন্তু উহাদের সৌন্দর্য্যের বিষয় বিবিধ প্রকারে শ্রুত আছেন। একদা তিনি কলের গাড়ী চড়িয়া ঐ সকল মহানগরী দেখিতে যাইলেন। বাষ্পীয়যানের অতি বেগগমন এবং সহরের কেবলমাত্র এক অতি ক্ষুদ্রাংশ—একপ্রান্তমাত্র—তাঁহার নয়নগোচর হওন বশতঃ, প্রকৃত পক্ষে স্পষ্ট কিছুই দেখিতে না পাওয়ায়, তাঁহার মন অতি সঙ্কোচিত হইল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে লোকে ঐ সকল নগরীর শ্রী, সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কতই অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। কিন্তু পরে নগরের অভ্যন্তরে উপনীত হইয়া, বিবিধ প্রস্তরসন্নিবেশিত সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মবেষ্টিত অপূর্ব্ব সৌধমালা অবলোকনে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ব্বোৎপন্ন সঙ্কোচিতভাব

তিরোহিত হইল এবং এক অননুভূত আনন্দলহরী তাঁহার হৃদয় মন পরিপূরিত করিয়া ফেলিল। লক্ষ্যের স্থানভেদ বশতঃ দৃষ্ট বিষয়ের এই প্রকার বৈচিত্র ঘটে।

অপরাপর সম্প্রদায় ভ্রাতৃভাব প্রচার দ্বারা পৃথিবী মধ্যে একটী অভিনব অবস্থা স্থাপন বা উৎপাদন করিতেছেন এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। সমাজ মধ্যে প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহার করেন, বলবান দুর্ব্বলকে পীড়ন করে; ইহা দেখিয়া কতিপয় উচ্চশ্রেণীর মহোদয়গণের অন্তঃকরণে এক অতি মহান্ করুণভাব জাগ্রত হওয়ায়, তাঁহারা দুর্ব্বল ব্যক্তির সংরক্ষণার্থে দৃঢ় সংকল্পের সহিত একত্র সম্মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে এক একটী সভা স্থাপন করতঃ সর্ব্বত্র ভ্রাতৃভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন এটী একটী নূতন ভাব এবং তাঁহাদের কর্তৃক ইহা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতীব মহৎ এবং বহু প্রশংসার যোগ্য। নূতন উদ্ভাবিত ভাবের ক্রমশঃ প্রসার অতি যত্নসহকারে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহারা এজন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছেন—অনেক স্থানে অনেকের নিকট অন্যায় ব্যবহারও পাইতেছেন।

পরাবিদ্যা সমিতি সম্পূর্ণ পৃথক্ দিক হইতে দেখিতেছেন। ভ্রাতৃভাবকে তাঁহারা অতি পুরাতন বলিয়া জানেন। মনুষ্য মাত্রেই মূলে পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা—এই বিশ্বাস তাঁহাদের প্রথম সোপান। ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখারূপ জীববৃক্ষে আমরা প্রত্যেকে এক এক শাখা বা প্রশাখা স্বরূপ। এই বিশাল বৃক্ষের মূল ব্রহ্মে সংরূঢ় এবং ব্রহ্মেরই অনন্ত জীবন ইহার কাণ্ডে কাণ্ডে শাখায় শাখায় অবিচ্ছিন্নরূপে সঞ্চালিত হইয়া পরপর সকল স্তরেই বিস্তীর্ণ হইয়া কি দেব, কি মানব, কি পশুপক্ষী, কি উদ্ভিজ, কি খনিজ, সকল রাজ্যেই জীবসমূহকে সম্যক ধারণ ও পরিবর্দ্ধন করিতেছেন। মানবকুল সেই ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব বা ছায়া আমরা সকলেই সেই মহেশ্বরেরই প্রতিমাস্বরূপ (Image)। ঘোর অজ্ঞানাবরণে আবৃত থাকায় আমরা যে সেই পরমাত্মার অংশমাত্র এবং তাঁহার সহিত এক ও অভিন্ন, ইহা বুঝিতে না পারায়, 'আমি', 'তুমি' ইত্যাকার পৃথক জ্ঞানে বদ্ধ। সেই অজ্ঞানাবরণ উন্মোচন করিতে পারিলেই

সেই উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতি সর্ব্বত্র বিকশিত হইবে—তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে এতকাল যাহাদের পৃথক বলিয়া বিবেচনা করিতাম, তাহারা কেহই 'আমি' হইতে পৃথক নহে—সকলেই একই সূত্রে আবদ্ধ মণিবৎ ঈশ্বরাংশ।

"The pure *I-am-non-Consciousness* of the Vasudeva Principle (বাসুদেব সর্ব্বমিতি) which envelopes everything, becomes with the intervention of the upadhi of abstract memory, the centralised life welling up as H. P. B. puts it as the "I am I" সংকর্ষণ principle. এই সংকর্ষণ Principleই Monad বা জীবাত্মা। Again "when not content with the static infinity of existence enfolding all the Divine potentialities, the Life seeks to define itself and its relation with the Nescience of abstract memory (সংস্কার at past universes), when it seeks to cast its reflection on and vivify the abstract Negation, then in consequence there came out from the Radiant Flame thousands of sparks —the hosts of Monads (জীবাত্মা বা কুমার) sharing in the self-indentity of the Divine Life which projected them into being"

The Third Life Wave—Dreamer.

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে Monad বা জীবাত্মাকে বাসুদেবতনয় 'সঙ্কর্ষণ'রূপে (ব্রহ্মসংহিতা মধ্যে) অথবা মহেশ্বরতনয় 'কুমার'রূপে (সূর্য্যপুরাণ প্রভৃতিতে) বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং মুণ্ডক উপনিষদ প্রভৃতিতে অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব (বিস্ফুলিঙ্গ) স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—সে সকলই এক এবং আমরাই সেই সকলের প্রতিবিম্ব— সুতরাং সকলেই এক। শাস্ত্র মধ্যে সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে (বৃহদারণ্যকে ও অন্যান্য উপনিষদে পাইবেন ঈশ্বর স্বীয় প্রতিবিম্ব দ্বারা জীবাত্মারূপে নামরূপ মধ্যে অবস্থিত। এইরূপে আমাদের অর্থাৎ পরাবিদ্যা সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে মূলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জীবের পরস্পর অভিন্নতা উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিতে হয় এবং যিনি যে পরিমাণ শিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণ অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই

অভিন্নতা বা সমত্বজ্ঞান যদিও যোগপথ অবলম্বন না করিলে সম্যক উপলব্ধি হয় না, তথাপি যতদিন সেই যোগপথ কাহারও ভাগ্যে না ঘটে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা পুরাতন ঋষিদিগের উপদেশ হইতে অনেক জানিতে পারা যায়। আমাদেব উপদেষ্টাগণ আমাদেব ঐরূপ শিক্ষা দিতেছেন। সকলেই সেই এক পবম পিতার সন্তান, কেবল উচ্চ জন্মভূমি হইতে ক্রমশঃ নানা স্তর দিয়া অবতরণকালে বিবিধ কোষে আবদ্ধ হওয়ায় আমবা এককূপ আত্মহারা হইয়া 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞানে অভিভূত হইয়া পডিয়াছি। কিন্তু প্রথমে এইরূপ জ্ঞান প্রয়োজন। কারণ এই জ্ঞান দ্বারাই ক্রমে অনন্ত আমিত্ব আসিবে। অসীম বহির্জগতের সহিত অসীম প্রকাবে সংস্রবে আসিয়া, বহির্জগত মধ্যে যে অখণ্ড ব্রহ্মেব জীবন সমগ্র বিশ্ব ধারণ করিয়া জীবগণকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতেছেন, সেই জীবনের সহিত সকলেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন মিশিয়া কালে একীভূত হইয়া যাইবে। গুরুউপদেশ দ্বারা যোগ সাধনা শিক্ষা করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে 'বৃহৎ আমিব সহিত ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম 'আমির' মিলন সম্ভব। পরাবিদ্যা সমিতিব প্রধান উদ্দেশ্যই এই শিক্ষা দেওয়া। পরপ্রবন্ধে ঐ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব।

এক্ষণে বীজ কেন্দ্র বা শক্তি-কেন্দ্র প্রস্তুত করণ চাহি। ইংরাজিতে এই বীজ-কেন্দ্রকে Nucleus শব্দে অভিহিত কবা হইয়াছে Nucleus কথার প্রকৃত অর্থ (Kernel (সারাংশ) of a Nut)। সাধাবণতঃ ইহার ব্যবহার কথঞ্চিৎ প্রশস্ত হইয়া কোন একটী বস্তুর কেন্দ্রকে বুঝায়, এবং সেই কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে পবমাণুসমূহ আসিয়া সংযুক্ত হইয়া সেই বস্তুটী গঠন করে। এই পৃথিবী মধ্যে যে সমস্ত বৃক্ষলতাদি, জীব জন্তু দশন কবিতেছি, সকলেই প্রথমতঃ এক একটী (cell) কোষাণুরূপবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং সেই সকল কোষাণুর অভ্যন্তরে এমন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে যে স্থান হইতে অপর কোষাণু উৎপন্ন হইবার শক্তি সঞ্চালিত হয়। কোষাণুর সেই নির্দ্দিষ্ট অতীব সূক্ষ্ম স্থান বা কেন্দ্রকেই Nucleus of the cell কহে। এবং কোষাণুর (cellএর) সেই নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের অভ্যন্তর দিয়া জীবনীস্রোত প্রবাহিত হইয়া উক্ত কোষাণুর পবমাণুসমূহে এরূপ এক অবস্থান্তর উৎপন্ন করে যদ্দারা উক্ত কোষাণু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটী কোষাণু উৎপন্ন হয় ও ঐ

দুইটী ক্রমশঃ সংবর্দ্ধিত হইলে পুনর্ব্বার ঐ দুইটী হইতে চারিটী হয়; এবং ক্রমশঃ ঐরূপে ঐ নিয়মে সংবর্দ্ধিত হয় ও সংখ্যা অধিক হইতে থাকে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক কোষাণুমধ্যে উহার বীজ-কেন্দ্র (Nucleus) কোষাণু অপেক্ষা আয়তনে অতিক্ষুদ্র হইলেও, উক্ত বীজ-কেন্দ্র মধ্যে সমস্ত জীবনীশক্তি নিহিত আছে—ঐ শক্তি প্রভাবেই এক একটী কোষাণু হইতে শত শত কোষ ও উহা হইতে পুনরায় শত শত দেহ উৎপন্ন ও বিস্তৃত হইতেছে। মানবদেহের দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেও শত শত কোষাণু রহিয়াছে এবং প্রত্যেকের ভিতর তাহার বীজ-কেন্দ্র বা শক্তি-কেন্দ্র নিহিত যদ্দ্বারা ঐ কোষাণুগুলি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের শক্তি কেন্দ্র (Nucleus) তাহা হইলে কাহাকে কহা যায়? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে এই ভ্রাতৃভাবের অস্তিত্ব বাস্তবিকই আছে—কিন্তু সেই একতা বা সমত্ব অতি উচ্চ স্তরে লক্ষিত হয়, সাধারণের সহজে বোধগম্য নহে। সুতরাং শরীরবিহীন একটী সংস্কারের ন্যায় (a great idea, without a body) ইহার বর্ত্তমান অবস্থা (যথার্থ কহিতে হইলে এই Society সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ের এই অবস্থা)। সকলেই অবগত আছেন যে যাহা কিছু আমরা চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতেছি ইহা সকলই ঐশ্বরিক ভাব (Divine Ideation) প্রকৃতিবক্ষে নিহিত হওয়ায় ক্রমে স্থূলভাবাপন্ন হইয়াছে। দৈবীশক্তির দ্বারা এই কার্য্য (linking) সাধিত হইয়াছে। এই স্থলে Secret Doctrine হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে এই বিষয় সকলেরই পরে সহজ হইয়া পড়িবে। মহাপ্রলয় অবস্থায় কেবল এক সৎমাত্র (Be-ness) ছিলেন। "This Be-ness is symbolized in the Secret Doctrine under two aspects. On the one hand, absolute Abstract Space, representing bare subjectivity, the one thing which no human mind can either exclude from any conception, or conceive of by itself. On the other, absolute Abstract Motion representing Unconditioned Consciousness. This latter aspect of the One Reality, ia also symbolized by the term the Great Breath (আমাদের শাস্ত্রে

'মহানিশ্বাস')."...Considering this metaphysical One Absolute Be-ness as the root from which proceeds all manifestation, "the Great Breath assumes the character of Pre-cosmic Ideation. This is the root at all individual Consciousness. On the other hand, Pre-cosmic Root-Substance (Mulaprakriti) is that aspect of the Absolute which underlies all the objective planes of Nature So it is the substratum of Matter in various grades of differentiation" Manifestation কালে সেই সৎ (Be-ness) polarised হইয়া উক্ত দুইভাগে বিভক্ত হন। কিন্তু Cosmic Substance না থাকিলে Cosmic Ideation প্রকাশ হইতে পারে না, এবং Cosmic Ideation পৃথক্ থাকিলে Cosmic Substance কেবল মাত্র শূন্য—জড়বৎ থাকে। "It is only through a vehicle (Upadhi) at matter that consciousness wells up as I am I." Hence a link is necessary. "In the Manifested Universe, there is "that" which links Spirit to Matter, subject to object. This something (যাহাকে "that" বলা হইয়াছে) is called by Occultists Fohat (আদ্যাশক্তি বা দৈবী প্রকৃতি). It is a "bridge" by which ideas existing in the Divine Thought are impressed on Cosmic Substance as the Laws of Nature." S. D.

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে মানবের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব সাধারণ সমীপে কেবল একটী উচ্চ ভাব বলিয়া প্রতীত হয়। যোগী, ঋষি ও অতি উন্নত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যখন ইহা সদাই কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকেন—তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী—তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে অপর কথা। তাঁহারা সতত উচ্চ বুদ্ধিপ্রভৃতি স্তরে বিচরণ করিতেছেন, সেখানে কেবল একাকার জ্ঞান। স্থূল জগতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ঐ জ্ঞান প্রচারের জন্যই Theosophical Society স্থাপিত হইয়াছে। এই পরাবিদ্যা সমিতিকেই Nucleus (শক্তি-কেন্দ্র) করা হইয়াছে, যাহাতে সেই কেন্দ্রের অভ্যন্তর দিয়া সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের শক্তি প্রসারিত হইয়া সমগ্র জগতকে প্লাবিত করিতে পারে।

দৈবীশক্তি (Fohat) যেরূপ ঈশ্বরের ভাব প্রকৃতিতে সংযুক্ত করেন, সেইরূপ শক্তির বাহন করুণাময় Mastersগণ এই সংযোজনা সম্বন্ধে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদের কৃপায় এই সমিতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতি ভ্রাতৃভাবের আধার বা দেহ স্বরূপ—শক্তি-কেন্দ্র। দেহ বলিলেই জড়ভাব বুঝিবেন না; ইহা সদাই কর্ম্মশীল। অনুবীক্ষণ দ্বারা কোন কোষাণু মধ্যে তাহার শক্তিকেন্দ্র দেখিলে দেখিতে পাইবেন ঐ কেন্দ্র সর্ব্বক্ষণই গতিশীল। উহার বেগ বৃদ্ধি হইয়া উহাকে পরিশেষে দ্বিধা বিভক্ত করে—উহারা প্রত্যেকে আবার নূতন নূতন কোষাণু নির্ম্মাণ করে। এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে কোষাণুগুলি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও সংবর্দ্ধিত না হইলে এইরূপে বিভাগ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িতে পারে না—যে সময় ঐরূপ বিভাগ ঘটনা হয় তখন বিভক্ত Nucleus তাহার চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন অণুসমূহ সংগ্রহণে বিলক্ষণ সক্ষম হয় এবং তদ্দ্বারা শীঘ্রই নূতন কোষাণু নির্ম্মিত হইতে থাকে।

Theosophical Societyর বিস্তারের দিকে অবলোকন করিলে দেখিতে পাইবেন যে কোষাণুর পরিবর্দ্ধন ও প্রসারের ন্যায় এই সমিতিরও শাখা প্রশাখা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ জগতে সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে। প্রথমে Madame H. P. B. ও Colonel Olcott রূপ শক্তি-কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া কয়েকজন মাত্র ছিলেন। যে জীবনী-স্রোত অপ্রকাশিতভাবে তাঁহাদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া সতত নূতন নূতন কেন্দ্র প্রস্তুত করণে উন্মুখীন করিতেছিল, তদ্দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকরূপে কেন্দ্রের পর কেন্দ্র—বিবিধ Lodges and Sections—প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই সমিতির শাখা প্রশাখা ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। উপমার আর অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে শক্তি-কেন্দ্র যথাযথ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং কার্য্যেও পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক যদ্যপি কোন Nucleus শক্তি সঞ্চালনে ও কোষাণুর প্রসারণে বাধা জন্মায়, তাহা হইলে তাহার পরিপুষ্টি ও সংবর্দ্ধন হয় না—যে কোষাণু হইতে ক্রমে অশ্ব, হস্তি, মনুষ্যদেহ প্রস্তুত হইত, তাহা না হইয়া তাহা একটী মাত্র কোষাণুই থাকিয়া ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—কারণ উন্নতি-স্রোতে বাধা পড়িলেই সকল স্রোতই মন্দগতি ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও

শীঘ্রই মৃত্যুর অধিকারে উপনীত হইয়া থাকে। সেইরূপ যে কোন কেন্দ্র (Centre or Branch of the Society) শিথিল-উদ্যম হইয়া পড়ে, এবং সংবর্দ্ধন ও প্রসার হইতে যাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, যথাসময়ে তাহাকে বিলুপ্ত হইতে হয়।

Cell কোষ'ণুর সংবর্দ্ধন ও তন্মধ্যবর্ত্তী শক্তি-কেন্দ্রের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বহুতর শিক্ষা পাইতে পারি। পরাবিদ্যা সমিতির প্রত্যেক সভ্যই সেই সমিতিরূপ শক্তি কেন্দ্রের এক একটী অংশ। তজ্জন্য পরাবিদ্যা সমিতিরূপ পূর্ণ কোষাণুটীর সম্যক পরিপুষ্টি, প্রসার ও সংবর্দ্ধন আমাদের প্রত্যেকেরই হস্তে নিহিত—আমরা ইচ্ছা করিলেই উহার উন্নতিপক্ষে সম্পূর্ণ সহায়তাও করিতে পারি এবং বিঘ্ন ঘটাইতেও পারি। যদ্যপি আমরা অলস হই বা ঔদাস্য অবলম্বন করিয়া থাকি এবং সাধারণ জীবনে কিঞ্চিন্মাত্র শক্তি-যোগদানে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে কিরূপে আমাদের শাখা সমিতি (Lodge বা Branch) সুস্থ, পুষ্ট ও সুফলদায়ী হইবে—আমাদের কেন্দ্র বলশীল না হইলে কি প্রকারেই বা তাহা হইতে অপরাপর শাখা প্রশাখা নিসৃত হইয়া পরস্পর সংযোগে এক একটী সমিতিপুঞ্জ (Federated Branches নির্ম্মিত হইবে? কিন্তু যদ্যপি আমরা প্রত্যেকে এক একটী অতি ক্ষুদ্রতম প্রণালী হইয়া একতার অতি সামান্যও একটী করিয়া শক্তি বৃহৎ সমিতি অভিমুখে সঞ্চালিত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদিগের শক্তিস্রোত অন্যান্য শত শত ঐরূপ শক্তিস্রোতের সহিত মিলিত হইয়া বৃহৎ কোষাণুরূপ মহাসমিতির জীবনীশক্তি সম্যক পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকিবে এবং দিন দিন সমৃদ্ধবেগে, আমরা যে সত্য প্রচারে দৃঢ়সঙ্কল্প ও বদ্ধপরিকর হইয়াছি, তাহার যাথার্থতা জগতের সর্ব্বত্রে সংপ্রেষিত করিতে পারিবে। তাহা হইলেই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব জগতে পূর্ণ ও উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে সংপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

কর্ম্ম তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সেই রূপ অসৎ কৃত্যার দ্বারা পাপীদিগের অনিষ্ট সাধিত হয়, (অবশ্য পুণ্যবানের কিছুই করিতে পারে না)। দৈত্যগণ যখন প্রহ্লাদের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না তখন দৈত্য-পুরোহিত তাঁহার বিনাশের জন্য কৃত্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিল না পরন্তু তাহার স্রষ্টাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল।—

"অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পতিতা তত্র যাজকৈঃ।
তানেবসা জঘানাশু কৃত্যা নাশং জগাম চ॥"

আমাদিগের চিন্তা বা ভাবনা হইতে যে ক্রিয়া হয় তাহার শক্তি বিশ্লেষিত হইয়া কিছু সমস্ত জগতের উপর পড়ে, কিছু কোন কোনও লোকের উপর বিশেষ ভাবে কার্য্য করে। কাহার উপকার হউক ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিলে কেবলি যে অভীপ্সিত লোকেরই উপকার হয় তাহা নহে, ঐ সৎবাসনা অদৃশ্যভাবে অপরের মনেও ঐ চিন্তা জাগাইয়া দেয়, এবং এই রূপে অনেকের উপকার সাধন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই সৎ চিন্তার উপকার করিবার ক্ষমতা চিন্তাকারীর মন-শক্তি ও আন্তরিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। যদ্যপি কোনও শক্তিমান পুরুষ অত্যন্ত শক্তিমান ভুবর্লৌকিক মানসিক মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাঁহার স্থূল শরীর নষ্ট হইলেও তাঁহার সৃষ্ট মূর্ত্তি ভুবর্লোকে বর্ত্তমান থাকে। কোনও কামনা করিয়া জপ করিতে করিতে যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়, তাহা যখন জপের দ্বারা শক্তিমান হয়, তখন জাপকের ইচ্ছামত কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। পুরাণে কথিত আছে যে যখন ইন্দ্র কমলাদেবীর মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা দশলক্ষ বার জপ করিয়াছিলেন,মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া তাহা কল্পবৃক্ষ স্বরূপ অভিলষিত সকল বস্তু প্রদানে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপ মন্ত্র সিদ্ধির ভূয়ঃ ভূয়ঃ উদাহরণ পাওয়া যায় এবং ইহারই বলে কামযোগীরা বশীকরণাদি কার্য্যে সক্ষম হয়।

কোনও চিন্তা করিলেই সেই চিন্তাশক্তি প্রথমে ভাবময় অনুর দ্বারা আকারিত হয়, তাহার পর সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর অনু দ্বারা আকারিত হইতে

হইতে অবশেষে পার্থিব মূর্ত্তি ধারণ করে—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই রূপ কোনও চিন্তা করিলে তাহা উর্দ্ধে উঠিয়া সূক্ষ্মতর অনুকে স্পন্দিত করিতে করিতে আকাশ তত্ত্বে এই স্পন্দন অঙ্কিত করিয়া রাখে। মানসিক মূর্ত্তি সৃষ্ট হইলেই তাহার চিত্র আকাশে থাকিয়া যায়। কেবলি ভাবনার চিত্রই যে এইরূপে রহিয়া যায় তাহা নহে; ফটোগ্রাফির যন্ত্রের সম্মুখে যে কোন পদার্থ আসিলে যেরূপ তাহার চিত্র পড়িয়া যায় সেই প্রকার যাহা প্রাণীমাত্র করিতে থাকে, ভাবিতে থাকে, বলিতে ও ইচ্ছা করিতে থাকে তাহার পরিণাম আকাশে চিত্রিত হইয়া যায়। ইহাই চিত্রগুপ্তের খাতা। সাধারণ নয়ন সমীপের ইহা অগোচর; কিন্তু ম্যাজিক ল্যান্টারণের সাহায্যে অদৃশ্য চিত্র যেমন দর্শক মণ্ডলীর নয়ন গোচর করা যায় সেইরূপ চিন্তা ও একাগ্রতার দ্বারা সাধকেরা এই চিত্রমণ্ডলীর মধ্য হইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট চিত্রকে ভুবর্লৌকিক অনু সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

আমরা প্রতিক্ষণে এই জগৎ অদৃশ্য চিন্তামূর্ত্তির দ্বারা পরিপূরিত করি; আমাদিগের প্রতি চিন্তা, প্রতি ভাব, প্রতি বাসনা, প্রতি সংকল্প, হইতে নানা বর্ণের মূর্ত্তি উদ্ভূত হইয়া মহাশূন্য পূর্ণ করে, এবং তাহারা অদৃশ্যভাবে মানবের চিন্তাস্রোত ও জীবনোপায় রঞ্জিত করে। এই সকল চিন্তাকৃতির সমষ্টিই আমাদিগের জন্মের পূর্ব্বে আমাদিগের সূক্ষ্ম দেহ নিয়মিত করে এবং তাহার ফলে মানব বংশগত ও জাতিগত গুণ ও দোষ প্রাপ্ত হয়।

মৃত্যুর পর সাধারণ শ্রেণীর লোক ভুবর্লোকে যায়; এবং তথায় সূক্ষ্ম ভুবর্লৌকিক বাসনা-দেহ ধারণ করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকে। ভোগ শেষ না হইলে ভোগদেহের নাশ হয় না। পুরাণে আছে, "তথায় (ভুবর্লোকে) জীবগণ নিরন্তর দগ্ধ হইয়াও ভস্মসাৎ হয় না, কারণ ভোগ-দেহের বিনাশ নাই।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৩০ অঃ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভুবর্লোকের সাতটি স্তর বা বিভাগ আছে। যে মানবের সংসারে অবস্থানের সময় ইন্দ্রিয়বিষয়ে ভোগ লালসা অধিক ছিল, এবং সেই লালসার চরিতার্থতা সাধন করিতে যে জীবদ্দশায় বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, মৃত্যুর পর ভুবর্লোকের নিম্নস্তরে তাহার অধিবাস হয় এবং তথায় তাহার সেই দুষ্ট ভাবনার ও দুষ্ট সঙ্কল্পের স্ফুরণ হইতে থাকে—

যাহার ফলে তাহার ঐ জাতীয় চিন্তা ও তদনুসারে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি বাড়িতে থাকে, এবং ঐ সংস্কার তাহার চিত্তে অঙ্কিত হইয়া যায়। পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যখন মানব স্বর্গলোক হইতে ভুবর্লোকে অবরোহণ করে, তখন তাহার চিত্তে যেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে তদনুযায়ী ভুবর্লোকের অনু আকর্ষিত হইয়া তাহার বাসনাদেহ (astral body) প্রস্তুত করিয়া দেয় এবং তাহাতে তাহার পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী বিষয়বাসনা, দুষ্ট স্বভাব ইত্যাদি বদ্ধমূল হইয়া পরজন্মে স্বভাবতঃ দুষ্ট কর্ম্ম করণের বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

এক খণ্ড সূত্রে যদ্যপি তিনটি বিভিন্ন জাতীয় লবণ কণিকা সংবদ্ধ থাকে এবং তাহা ঐ ঐ বিভিন্ন লবণময় মিশ্রদ্রাবে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ঐ ঐ লবণ কণিকার চারিদিকে আরও অনেক সেই জাতীয় লবণ কণিকা আবদ্ধ হইয়াছে। মানবের বেলাও অনেকটা সেই রূপ হইয়া থাকে।

মনে করুন আত্মা, বুদ্ধি ও মন সমন্বিত মানব জীবাত্মা (human monad) এক গাছি অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রসব করেন, সেই সূত্রে মনলোকের চতুর্থ স্তরের একটি অনু, ভুবর্লোকের এক আদি-অনু গ্রথিত আছে। আরও মনে করুন ত্রিলোকী মানবের ত্রিলোকের সমস্ত কার্য্য তাহার এই তিনটি নির্দ্দিষ্ট অনুতে মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে ঐ অনুগুলি নির্দ্দিষ্ট বর্ণ ও সুরান্বিত হয়। মানব মৃত্যুর পর স্বকৃত কর্ম্মের ফল কামলোকে ও স্বর্গলোকে ভোগ করিয়া যখন কারণদেহে অবস্থান করে, তখন তাহার ঐ নির্দ্দিষ্ট জীবনসূত্রে আবদ্ধ অনুত্রয়ের বহির্ম্মুখী কোনও কার্য্য থাকিতে পারে না। যেমন তন্তুকীট হইতে তন্তু প্রসূত হইয়া কীটকে আবরিত করিয়া থাকে তদ্রূপ মানব-জীবাত্মা হইতে জীবনসূত্র বাহির হইয়া ঐ গ্রথিত অনুগুলিকে ঘেরিয়া থাকে; তখন বহির্জ্জগতের সহিত তাহারা সম্বন্ধিত হইতে পারে না।

তাহার পর পুনর্জ্জন্মের সময় জীবাত্মা আবার আপন জীবনসূত্র প্রসব করেন এবং সেই আবদ্ধ অনুগুলির নির্দ্দিষ্ট স্পন্দনে তজ্জাতীয় অপর অনু আসিয়া আবদ্ধ হয় এবং ভাবী মানবের সূক্ষ্মদেহ সৃজন করিয়া দেয়। তাহার পর পূর্ব্ব কর্ম্মনিচয় বিচার করিয়া কর্ম্মদেবতারা তাহাকে উপযুক্ত মাতৃগর্ভে নিবিষ্ট করিয়া দেয় এবং পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ স্থূল দেহ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত হইতে হইতে সে উন্নত হইতে থাকে।

আমাদিগের বর্ত্তমান দেহ এইরূপে আমাদিগের অতীত কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া আছে। সহস্র ধেনুর মধ্য হইতে যেমন বৎস আপন মাতাকে চিনিয়া বাহির করে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তাকে অনুগমন করে।

যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতিমাতরং।
তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি॥ শান্তি পর্ব্ব।

যে মানব তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন, এবং যাঁহার বিষয়-বাসনা যাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে না মৃত্যুর পর তিনি ভুবর্লোকের উচ্চতর বিভাগে অবস্থান করেন, কিন্তু কিঞ্চিদপি স্বার্থ সম্বন্ধীয় সাংসারিক বাসনা না থাকিলে, মানবের ভুবর্লোকে স্থিতি না হইয়া তাহার উপর স্বর্গবাস হয়।

সাধারণ শ্রেণীর জীব, যাহার উত্তম বাসনা এবং দুষ্ট ভাবনা উভয়েই চিত্তে সমভাবে স্থান পায়, ভুবর্লোকে দুষ্ট ভাবনার ক্ষয়ের পর স্বর্গলোকে গমন করে এবং তথায় তাহার উত্তম ভাবের বিকাশ হইতে থাকে। স্বর্গবাসের সমস্ত সংস্কার তাহার মনোলোকের নির্দ্দিষ্ট অনুতে মুদ্রিত হইয়া রহে এবং পর জন্মে তাহার উপযুক্ত মনোদেহ গঠন করিয়া দেয়। জীবদ্দশায় জীবের যে উত্তম ভাবনা জনিত মানসিক চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে স্বর্গলোকে যাইবার পর তাহার বিকাশ হইতে থাকে, এবং সেই সৎ ভাবনার পরিপোষক কর্ম্ম করিবার অনেক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায় দেখিতে পাই যে কত লোক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইবার তীব্র বাসনা সত্ত্বেও বিফলমনোরথ হইতেছেন, সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিয়াও বিশেষ সুরবিদ্ হইতে সক্ষম হইতেছেন না, পরন্তু অপরে অল্প আয়াসেই তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া আমরা নিরাশয় ভগ্নোৎসাহ হই এবং ভাবি যে আমরা সকলেই স্বেচ্ছাচারী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য চঞ্চল বালক ধর্ম্মী কোন ও পুরুষের ক্রীড়াপুত্তলী। হায়! তবে আর আমাদিগের স্বাধীন উদ্যমের কি প্রয়োজন! নদীর স্রোত-পথে ভাসমান জড়তৃণের মত আমরা ভাসিয়া চলিতেছি—কখন স্রোতমুখে এই তটদেশ স্পর্শ করিতেছি, কখন বা অপর তটদেশ স্পর্শ করিতেছি—এই অসৎভাব আসিতেছে, তাহাকে বাধা দেওয়ার কিছুই ফল নাই—একটি

সংভাব আসিতেছে তাহার স্ফুরণের চেষ্টা বৃথা। এই ভ্রমপূর্ণ নীতি অনুসরণ করিয়া কত না লোক অধঃপতনের মুখে অগ্রসর হইতেছে, কত দুর্ব্বলচেতা আপন পাপ অভ্যাসের বাধা দিবার অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া যুক্তিদ্বারা আপন কর্ম্মের সমর্থন করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্ব সত্যের পূর্ণ অংশ না দেখিয়া আংশিক ভাব দেখি বলিয়াই এই ভ্রমে পতিত হই। আমরা সাধারণ মনুষ্য—সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে বাসনার দাস, এবং বাসনার প্ররোচনা,--ইন্দ্রিয়ের সুচিরাভ্যস্ত উত্তেজনাকে নিয়ন্তার লীলা মনে করি বলিয়াই এই ভ্রমে পতিত হই।

কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথা কামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি।
যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে, যৎকর্ম্ম কুরুতে, তদভি সম্পদ্যতে॥"

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

(মনুষ্য) কামময় ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; তাহার কামনা যেরূপ, ভাবনাও তদনুযায়ী হয়, ভাবনা যেইরূপ তাহার চেষ্টা বা কার্য্য তদ্রূপ হয়, এবং সেইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার ফলও সেইরূপ হয়।

মৃত্যুর পরপারের বিষয় যদ্যপি আমাদিগের চৈতন্যগোচর হইত তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে আমাদিগের বাঁসনা ও অভ্যস্ত ইন্দ্রিয়-বশীভূতিই আমাদিগের সকল কার্য্যের প্ররোচক।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের সুকৃতির অভাবে কোনও মানব পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়াও তাহাতে বিফলমনোরথ হইতে পারেন সত্য, কিন্তু মৃত্যুর পরপারে তাঁহার স্বর্গবাসের সময় সদুদ্দেশ্যে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই,—তাঁহার অপূর্ণ সমস্ত ইচ্ছাই মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রত্যক্ষীভূত হয় এবং তাঁহার ভবিষ্য জীবনে ঐ চেষ্টা ও ইচ্ছা বলবতী করিয়া দেয়। পুনশ্চ যে সমস্ত তত্ত্ব ও সত্য তিনি জীবনে উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই, তাহা তিনি এইখানে প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, হয়ত জীবদ্দশায় তাঁহার বিশেষ চেষ্টায়ও উপযুক্ত শিক্ষক লাভ হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে দেবতা ও ঋষিগণ আসিয়া কত দুরূহ তত্ত্বের সুমীমাংসা করিয়া দেন। পুনর্জন্মকালে আর তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইতে হইবে না; তাঁহার এরূপ বংশে ও এরূপ প্রাকৃতিক আনুকূল্যে জন্ম হইবে যে তাঁহার পক্ষে তাঁহার এই অভীষ্ট সাধনা পথ সুযোগ হইয়া যাইবে। যোগ-

বাশিষ্টেও এই কথা আছে—মরণের পর পূর্ব্ব সংকল্প প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। রজনীতে নিদ্রার সময় আমাদিগের ভুক্ত দ্রব্যের যেইরূপ পরিপাক হয় এবং তাহা যেমন আমাদিগের শরীর বর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধন করে, সেইরূপ স্বর্গলোকে মনুষ্য মানস আহারের পরিপাক করে এবং তাহা তাহার অন্তঃকরণ বা কারণশরীর বর্দ্ধন করে।

মানবের পার্থিব জীবনের বিষময় বা সুখময় ফল ভোগের দ্বারা ভুবর্লোকে ও স্বর্গলোকে বিচারিত হইয়া তাহাকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দেয় এবং তাহার সংস্কার তাহার অন্তঃকরণে পড়িয়া যায়, ইহাতে পরজন্মে দুঃখফল-প্রসূ কর্ম্ম করিতে তাহার ভীতি ও অনিচ্ছা আসে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর পর তাহার সৎস্বভাব বদ্ধমূল ও অসৎ স্বভাব হীনকর হইতে থাকে। মানবের বিচারশক্তি, বিদ্যা, উত্তম স্বভাব, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব ইত্যাদি ইত্যাদি তাহার পূর্ব্বজীবনের উত্তম ভাবনার পরিণাম, সেইরূপ ক্ষুদ্রতা বিষয়ে আশক্তি, অবিবেকতা, স্বার্থপরতা, ধর্ম্মে বিমুখতা ইত্যাদি ইত্যাদি মানবের দুষ্ট ভাবনার পরিণাম। পূর্ব্বোক্ত ভাবনার ফলে সে স্বর্গে আনন্দভোগ করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাতে এই জন্মে তাহার ঐ সমস্ত সৎভাবনায় আস্থা বাড়িয়াছে; দুষ্ট ভাবনার জন্য সে মৃত্যুর পর কত না যাতনা ও নৈরাশ্য ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সে জন্যই সে সব ভাবনায় তাহার বীতরাগ হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ তাহার মানসে সত্য, এবং অসৎ ভাবনা অনুযায়ী তাহার কখনও কখনও কার্য্য হইয়া যায় সত্য, তথাপি এখন প্রতিপদস্খলনে তাহার অনুতাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবাদ কথা ও তাহার সংস্কৃতানুবাদ।

প্রায় সকল দেশেই সকল ভাষায় লৌকিক প্রবাদ বচন আছে, ঐ সকল প্রবাদ কথা কথোপকথন কালে অনেকেই ব্যবহার করে, বিশেষতঃ প্রাচীন এবং স্ত্রী পরম্পরা প্রায় কথায় কথায় কহিয়া থাকে।

বঙ্গীয় প্রবাদ বচনগুলি বড়ই মধুর, নীতিপূর্ণ ও কৌতুকজনক, সেজন্য তাহার সংস্কৃত অনুবাদও বোধ হয় নীরস হইবে না, উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে অতি সুন্দর শুনায়, এবং প্রমাণিতও হয়। যেমন "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ", "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ" ইত্যাদি সরল সংস্কৃত বচন কথোপকথনে অনেকেই বলিয়া থাকেন, সেই প্রকার বঙ্গীয় বচনগুলিকেও সংস্কৃতে বলিলে বোধ হয় প্রমোদকরই হইবে, তাই সভ্য গ্রাহকদিগকে এক নূতন রীতিতে প্রমুদিত করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম।

প্রবাদ বচনগুলি যে কে কবে রচনা করিয়াছেন, তাহার মূল পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রায় বচনগুলিই দৃষ্টান্ত, অপ্রস্তুত প্রশংসা এবং অন্যান্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এবং প্রয়োজনমূলক লক্ষণা ও বিপরীত লক্ষণা এবং তন্মূলক ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত, অভিধেয়ার্থ তাহাতে অত্যল্প।

অপিচ, যত দূর পারা যায় সংস্কৃতে অবিকল বাঙ্গালার শব্দ ও ভাব রক্ষার যত্ন করা হইয়াছে, যে সকল কথা সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে বিন্যাসের চেষ্টাও করা হইয়াছে, রচনার মাধুর্য্য রক্ষার জন্য মূলভূত সংস্কৃত পরিত্যাগ করা হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যেও বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা অবিকল রাখা হইয়াছে, যাহা অবুদ্ধ শব্দ তাহা (* তারাচিহ্ন দ্বারা নীচে অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

প্রায় প্রবাদ বচনগুলি বৃদ্ধ এবং কলহপ্রিয়া স্ত্রীদিগের নিকট হইতেই যত্নে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বাঙ্গালা।	সংস্কৃত।
১। "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"	বিশ্বাসাৎ প্রাপ্যতে কৃষ্ণ স্তর্কে তিষ্ঠেৎ সুদূরতঃ ॥ ১ ॥
২। "ভাই বল বন্ধু বল সম্পদেরসাথী, অসময় নিদানকালে গোবিন্দ সারথি"	ভ্রাতরো বন্ধবোবাচ্যাঃ সম্পত্তৌতেঽনুচারিণঃ মৃত্যোর্নিদানসময়ে গোবিন্দঃশরণং ধ্রুবং ॥ ২ ॥
৩। "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?"	কৃষ্ণেরক্ষতি কো হন্তি, কঃ কৃষ্ণে ঘ্নতি রক্ষতি ॥ ৩ ॥

৪।	"মন ভাল নয় তীর্থ কর,	চিত্তং দুষ্টং তীর্থং কুরুষে,
	মিছামিছি ঘু'রে মর"	জোঘূর্ণিত্বা ব্যর্থং ম্রিয়সে ॥ ৪ ॥
৫।	"কি করে ঝালে তেলে,	মরীচ-তৈলৈঃ কিংসাধ্যং ?
	কি না হয় দম্‌কা (*) জালে"	কিং ন স্যাত্তীব্রবহ্নিনা ॥ ৫ ॥
৬।	"তোর শিল, তোর নোড়া,	শিলা পুত্রশ্চ তে তে চ,
	তোরই ভাঙ্‌ব দাঁতের গোড়া"	দন্তমূলানি ভঞ্জয়ে ॥ ৬ ॥
৭।	"বুড়ো হাগে মর্‌তে	বৃদ্ধো জোগূয়তে মর্ত্তুং
	ছেলে হাগে তর্‌তে"	তর্ত্তুং জোগূয়তে শিশুঃ ॥ ৭ ॥
৮।	"পরের মাথায় দিয়া হাৎ,	পরস্য মস্তকে হস্তং
	কিরে কাড়ে নির্ঘাত"	দত্ত্বা শপতি দারুণং ॥ ৮ ॥
৯।	"যার লাঠী, তার মাটী"	যস্য দণ্ডস্তস্য মহী ॥ ৯ ॥
১০।	"অতি মর্ম্ম যার,	যস্যাতিপ্রীতিঃ
	হতশ্রী তার"	স ভবেদ্ধতশ্রীঃ ॥ ১০ ॥
১১।	"আপ্‌নি পাগল, পতি পাগল,	স্বয়ংক্ষিপ্তা পতিঃক্ষিপ্তঃ,
	পাগল তার চেলা,	ক্ষিপ্তস্তস্য চ সেবকঃ।
	এক পাগলে রক্ষা নাই	একক্ষিপ্তে ন রক্ষাস্তি
	তিন পাগলের মেলা"	ত্রিক্ষিপ্তানান্তু কা কথা ? ॥ ১১ ॥
১২।	"আগে হাঁটনী পানবাটনী	অগ্রাটনী পর্ণবিবণ্টনী চ
	বৌয়ধাঁই	বধ্বাশ্চ ধাত্রী
	এই তিন জনের যশ নাই"	তিসৃণাং যশো ন ॥ ১২ ॥
১৩।	"ম'রেও না মরে সে,	মৃতোঽপিম্রিয়তে নাসৌ
	যদি লোকে ঘোষে,	যদি লোকেন ঘোষ্যতে।
	বেঁচেও না বাঁচে সে,	জীবিতোঽপি ন জীবেৎ স
	যদি লোকে দোষে।"	যদি লোকেন দূষ্যতে ॥ ১৩ ॥
১৪।	"ব্যাঙেও চায় ঠ্যাঙ্‌মেল্‌তে,	ভেকোঽপিপাদপ্রসরায় চেষ্টতে।
	কুঁজোও চায় চিৎহয়ে শুতে।"	কুব্জোঽপি চিত্রং শয়িতুং সমীহেতে॥১৪

(*) দম্‌কা—বেধড়ক্—খুব্ বেশী।

১৫।	"কাঠ্‌কোটা লোহাপিটা বেণিয়া বিষমজাৎ।"	কাষ্ঠকুট্টো লৌহপিষো বণিজো দুষ্টজাতয়ঃ॥ ১৫॥
১৬।	"কাল বামন্ কটা শূদ্র* কুত্তাগর্দ্দন মুসলমান, এই তিনজনা বেইমান।"	ব্রাহ্মণা অতিকৃষ্ণাঙ্গা তীব্রপীতাস্তু শূদ্রকাঃ। যবনাঃ কুক্কুরগ্রীবা ত্রয় এতে ন ধার্ম্মিকা॥ ১৬॥
১৭।	"না বু'ঝে মলেম গৌরাঙ্গ্ রে।"	গৌরাঙ্গ। রে নৈব বুদ্ধাম্রিয়েঽহম্॥১৭
১৮।	"ধবি মাছ না ছুই পানী।"	মৎস্যংশ্রিয়ে নৈবজলং ছুপামি॥১৮॥
১৯।	ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী, আল্‌গেমারে টাক্‌শচারি।"	নির্লিপ্তদণ্ডী ন স্পৃষ্টা, নীতং শতচতুষ্টয়ং॥ ১৯॥
২০।	"দুষ্টলোকের মিষ্ট কথা ঘনিয়ে বসে কাছে। কথা দিয়া কথা নেয় প্রাণে বধে পাছে।"	মিষ্টং ব্রুবন্ দুষ্টজনঃ সমীপে বসতি ক্রমাৎ। কথয়া ত্বৎকথাং নীত্বা প্রাণান্ হন্ত্যাবশেষতঃ॥ ২০॥
২১।	যুয়ানে যুয়ানে কথা কইতে পত্তৈ (*) কথায় হাস। বুড়ায় বুড়ায় কথা কইতে পত্তৈ কথায় কাস।"	যূনাং যূনাং সংকথায়াং প্রহাসঃ। প্রাচাং প্রাচাং সংকথায়ন্তু কাসঃ॥ ২১॥
২২।	'বাঁশ বামন বাসক, এ তিন ভূমির নাশক।"	ব্রাহ্মণা বাসকা বংশা ত্রয়ো ভূমেস্তু নাশকাঃ॥ ২২॥
২৩।	"হাগা পীড়ালে মুখে দচ।"	মলপীড়িতোস্তু মুখে দ্রঢ়ীয়ান্॥২৩॥
২৪।	"চোরে চোরে মাস্‌তুতভাই"	ভবন্তি মাতৃস্বস্ত্রেয়াঃ সর্ব্বেচৌরাঃ পরস্পরং॥ ২৪॥
২৫।	"চোরের সাক্ষী মাতাল।"	চৌরস্য সাক্ষীতূন্মত্তঃ॥ ২৫॥
২৬।	"যেমন গাবর, তেমন থাপড়।"	যাদৃশশ্চৈব চণ্ডাল শ্চপেটশ্চাপি তাদৃশঃ॥ ২৬॥

(*) পত্তৈ—প্রত্যেক।

২৭।	"যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেতুল।"	অরণ্য শূরণো যাদৃক্ তাদৃং ব্যাঘ্রাখ্যতিন্তিড়ী ॥ ২৭ ॥
২৮।	"যেমন কুকুর তেমন মুগুর।"	যথৈব কুক্কুর স্তথৈব মুদ্গরঃ ॥ ২৮ ॥
২৯।	"দাতা হ'তে বখিল ভাল, ত্বরুৎ যোয়াব দেয়।"	দাতুস্ত কৃপণঃ শ্রেয়ান্ ত্বরিতং মন্নিষেধতি ॥ ২০ ॥
৩০।	"আপন নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ'	ছিত্বা স্বনাসামন্যস্ত যাত্রাভঙ্গো বিধীয়তে ॥ ৩০ ॥
৩১।	"গু খেয়ে সতীনের বাটী নষ্ট"	সপত্নী পাত্রকে ভুক্ত্বা পুরীষং তদ্বিনাশিতং ॥ ৩১ ॥
৩২।	"থাক্ ভিক্ষা কুত্তা সামাল'	আস্তাংভিক্ষা কুক্কুরঃশাম্যতাংতু ॥৩২॥
৩৩।	"না দিলে দান, না দিলে দক্ষিণা, মারতে বলেছে কে ?'	দানং ন দৎসে ন চ দক্ষিণাঞ্চ কস্যানুমত্যা ময়ি মুষ্টিপাতঃ ॥৩৩॥
৩৪।	"এসো চণ্ডীর গুঁতো দক্ষিণা"	মণ্ডূকপ্লুতিচণ্ডাস্তু দক্ষিণা মুষ্টিপাতনং ॥ ৩৪ ॥
৩৫।	"ইহাও বিশ্বাস পায়, হাটেও চোক্ বেচা যায়"।	এতৎ কিমপি বিশ্বাস্যং হট্টে স্যান্নেত্রবিক্রয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
৩৬।	"অস্ত গোধার মাগ্ নাই পুতের কিরে কাড়ে।'	নাস্তি শ্রীপদিনোজায়া পুত্রায় শপতেঽপিতৎ ॥ ৩৬ ॥
৩৭।	"ভাৎ পায়না কয়লা ভাজা খোজে।"(*)	ভক্তং নাপ্তং মার্গতি ভৃষ্টকারবেল্লং ॥ ৩৭ ॥
৩৮।	"মোটেই মা রাঁধেনা গবম আর পান্তা।"	নৈব বধ্নাতি মে মাতা, কোষ্ণং পর্য্যসিতং কিমু ? ॥ ৩৮ ॥
৩৯।	"অলক্ষীর নিদ্রাবেশী দরিদ্রের ক্ষুধা বেশী।"	অলক্ষ্যা অধিকা নিদ্রা, দরিদ্রস্যাধিকা ক্ষুধা ॥ ৩৯ ॥
৪০।	"জ্বর না হ'তে বিছানা বিছায়।"	নাগচ্ছতিজ্বরেশয্যা ॥ ৪০ ॥

(*) খোজে—চাহে—প্রার্থনাকরে। পূর্ব্ববঙ্গ।

৪১। যখনি মেঘ ধরে, তখনি বৃষ্টি ঝরে।"	যাবদ্দৃষ্টো ঘনোব্যোম্নি, তাবদ্বর্ষতি ভূরিশঃ ॥ ৪১ ॥
৪২। "দায়ের কোব্ কুড়ুলে তুলিব।"	দাত্রাঘাতং শোধয়েষ্যং কুঠারৈঃ ॥৪২॥
৪৩। "কায্ না থাকিলে খুড়োর গঙ্গা যাত্রা করাই।"	কর্ম্মণ্যসতি পিতৃব্য গঙ্গাযাত্রাং বিধাপয়ে ॥ ৪৩ ॥

(ক্রমশঃ)

অলৌকিক ঘটনা।

প্রেতের আবেশ।

পন্থার সহিত আমার অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। তথাপি আমি পন্থাকে ভুলি নাই। পন্থা আমার অতি প্রিয় বস্তু। আমি পুনরায় পন্থাতে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। সেবার ভূতের গল্প হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এবারও ভূতের গল্প হইতে আরম্ভ করিলাম। ভূতের গল্প অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, তবে প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিয়া লিখিলাম আমিও অনেক ভূতের গল্প শুনিয়াছি কিন্তু এটি আমার নিজের পরীক্ষিত এবং প্রত্যক্ষীকৃত। * * নগরে আমাদের পল্লীতে একটি দোতালা বাটী আছে। প্রবাদ সে বাটীতে ভূত আছে। অনেকে বাটী ভাড়া লয় কিন্তু ভয় পাইয়া চলিয়া যায়। একটি স্ত্রীলোক এক বার ঐ বাটী ভাড়া লন। মধ্যে মধ্যে তিনিও ভয় পাইতেন। সময়ে সময়ে নানাপ্রকার শব্দ শুনিতেন কিন্তু শব্দের কারণ বুঝিতে পারিতেন না। অনেক সময় রন্ধনশালা হইতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি লোপ পাইত। তথায় কুক্কুর বিড়ালাদি প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না কারণ ঘর বন্ধ থাকিত এবং কুক্কুরাদির উচ্ছিষ্ট করা অন্ত প্রকার। তাহা লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়। যেমনকার হাঁড়ি তেমনি আছে, অথচ ভিতরের দ্রব্য একেবারে চাটপোট। তাহার চিহ্নমাত্র নাই। একদিন রাত্রে আহার করিবার জন্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি বাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় হঠাৎ প্রদীপ নিবিয়া গেল। তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া দেখেন অন্নব্যঞ্জনাদি কিছুই নাই। একেবারে লোপ। যেন থালাতে কিছুই

ছিল না। ঘরের কপাটে শিকল লাগান আছে, হঠাৎ কপাট সজোরে খুলিয়া গেল। এই সকল ঘটনা দেখিয়া স্ত্রীলোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইলে তিনি প্রতিবেশিগণকে জানাইলেন। একদিন স্ত্রীলোকটি হঠাৎ পড়িয়া যাইয়া মূর্চ্ছিতা হন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং ভয়ানক জ্বর হয়। জ্বরের সময় অত্যন্ত ভয় পাইতেন এবং প্রলাপ বকিতেন। বলিতেন— এঘরে অনেক লোক রহিয়াছে। যাহাদের নাম করিতেন তাহারা সকলেই এখন মৃত। তাহাদের জীবিতাবস্থায় তিনি জানিতেন। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে তিনি বিশেষরূপে জানিতেন এবং ঐ স্ত্রীলোক সেই বাটীর মালিক ছিলেন।

অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকটির পীড়া উপশম হয় না দেখিয়া এবং লক্ষণাদিতে প্রেতের আবেশ বুঝিয়া তাঁহার পিতা একজন রোজাকে আনাইলেন, রোজাকে দেখিয়া রোগী ভয়ানক চিৎকার আরম্ভ করিলেন। তখন আর সে লোক নাই। রোজা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? রোগী আমি অমুক লোক বলিয়া সেই বাটীর মৃতা অধিকারিণীর নাম করিলেন। রোজা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কিজন্য ইহাকে পাইয়াছ? রোগী উত্তর করিল—আমার বাটীতে এ কিজন্য আসিয়াছে? এখনই চলিয়া যাউক। এ বাটী আমার, আমি ইহাতে বাস করি। ইহারা এ বাটীতে কিজন্য আসিয়াছে?

রোজা মন্ত্রবলে ভূত ছাড়াইয়া দিল। রোগীর হাতে কবচ বাঁধিয়া দিল। তদবধি আর ওরূপ লক্ষণ দেখা গেল না। ক্রমে রোগী আরোগ্য লাভ করিলেন এবং সেই বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্রে বাস করিলেন, ভূতেরও উপদ্রব ঘুচিল। ভূতের পরিচয় দিবার এখানে আবশ্যক নাই। তিনি একজন সম্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোক সূতিকা গৃহে সন্তান প্রসব করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

প্রেততত্ত্ববাদিগণের ইহা একটি আলোচনার বিষয় বটে। ঘটনা অতি সামান্য, একটি ভূতের গল্প মাত্র; কিন্তু যাঁহারা পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা তর্ক যুক্তি এবং দর্শন শাস্ত্রের মতামত লইয়া মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান করিয়া কূল-কিনারা পান না তাঁহারা এই সামান্য ভূতের উপদ্রবের মধ্যে পরলোক তত্ত্বের কুঞ্চিকা পাইবেন।

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ | মাঘ, ১৩১৫ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

বাস্তব ও অবাস্তব (REAL AND UNREAL)

কোন কার্য্যোপলক্ষে একদিন কোন বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে যাই। দেখিলাম তাঁহার চারি বৎসরের কন্যাটি একটি শিলাখণ্ড লইয়া অপত্য স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। কখনও বিছানা পাতিয়া উহাকে শয়ন করাইতেছে ও বলিতেছে "ঘুম পেয়েছে, বাবা, ঘুমাও" এবং পরক্ষণেই তুলিয়া লইয়া "এত কান্না কেন, খিদে পেয়েছে? আচ্ছা" বলিতে বলিতে আদরে ক্রোড়ে করিয়া খেলা ঘরের ধূলি বালি রূপ উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন উহার মুখে তুলিয়া দিতেছে। আমি অবাক্ হইয়া ইহা দেখিতেছি। এমন সময় গৃহিণীর মসলা পিষিবার জন্য নোড়াটির প্রয়োজন হওয়াতে তিনি দুরন্ত কাল স্বরূপ আসিয়া বালিকার ক্রোড়ের বাছাকে হরণ করিলেন। তাহার সোনার সংসার একেবারে ছারখার হইল। বালিকা হাত পা ছুড়িয়া ভূমিতে গড়াইতে গড়াইতে "আমার খোকা, আমার খোকা" বলিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। গৃহিণী যতবার

বলেন "আরে, খোকা নয়,—নোড়া, নোড়া," বালিকাও ততবার "নোড়া নয়, খোকা" বলিয়া কাঁদিতে থাকে। অবশেষে গৃহিণী ক্রুদ্ধস্বরে "বোকা মেয়ে, নোড়াটাকে খোকা, যা" বলিয়া নোড়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনাটি দেখিয়া আমার যে কিরূপ আনন্দ হইল তাহা বর্ণনাতীত। আমি ভাবিতে লাগিলাম, বালিকাটি শিলাখণ্ডকে যে ভাবে দেখিতেছে তাহাই বাস্তব অথবা গৃহিণী যে ভাবে দেখিতেছেন তাহা বাস্তব? আবার একটি বৈজ্ঞানিক (Geologist কিম্বা Chemist) উক্ত শিলাখণ্ডটি প্রাপ্ত হইলে, উহা "খোকা" বা "নোড়া" এ চিন্তা তাঁহার মনেই আসিবে না। তাঁহার নিকট উহা Sandstone বা Granite, অথবা ভূগর্ভের অমুক স্তরে পাওয়া যায়, অথবা অমুক অমুক উপাদানে গঠিত। আবার, কোন কোন ব্যক্তির নিকট উহা "শালগ্রাম"—সাক্ষাৎ নারায়ণ। উহার দর্শনেই তাঁহাদের ভক্তি উথলিয়া উঠে, প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, উহাঁর নিকট তাঁহারা দুদণ্ড কাঁদিয়া কত মনোবেদনা দূর করেন! এইরূপে একই বস্তুকে নানা লোকে নানা ভাবে দেখিতেছেন। প্রশ্ন এই যে, কে ঠিক দেখিতেছেন?

কোন পল্লীগ্রামে এক রাস্তার ধারে একটি ভগ্ন স্তম্ভ আছে। এক রাত্রিতে উহার উপর ঈষৎ চন্দ্রালোক পতিত হওয়াতে, দূর হইতে বোধ হইতেছে যেন একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। গভীর রাত্রে এক চোর বহুমূল্য পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। স্তম্ভটিকে দেখিবামাত্র সে ভাবিল একজন পুলিশ কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া আছে এবং ভয়ে একেবারে অভি-ভূত হইয়া "হায়, মারা গেলাম" ভাবিতে ভাবিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপরীত দিকে ছুটিয়া পলায়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ভ্রষ্টা রমণী স্বীয় উপপতির সহিত মিলিত হইবার জন্য ঐ পথে যাইতেছিলেন। স্তম্ভটিকে দেখিয়া ভাবিলেন তাঁহার প্রিয়তম তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আনন্দে, উল্লাসে তাঁহার হৃদয় বিবশ হইল। তিনি আর অগ্রসর না হইয়া মৃদুস্বরে একটি গান ধরিলেন, ভাবিলেন তাঁহার নায়ক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আদর করিবেন। "কিন্তু কই, তিনি তো এলেন না, আমি যার জন্য মরি সে তো আমায় চায় না" ইহা ভাবিয়া শোকে ও অভিমানে বাটী ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর এক সাধক তাঁহার ইষ্টদেবের ধ্যান ধারণায় প্রায় সমস্ত রাত্রি দেবমন্দিরে অতিবাহিত

করিয়া রাত্রিশেষে গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। স্তম্ভটি নয়নগোচর হইবামাত্র তিনি ভক্তিগদগদচিত্তে নতজানু হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন এবং কর-যোড়ে বলিতে লাগিলেন "প্রভো, তবে কি সত্যই এ দাসের প্রতি কৃপা হয়েছে? আহা! আজ আমি ধন্য হলাম! নয়ন পরিতৃপ্ত হল!! জীবন সার্থক হল"!!! তিনি তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। একই বস্তুকে তিন জনে তিন ভাবে দেখিলেন। ইহাদের মধ্যে কোনটি বাস্তব এবং কোনটিই বা অবাস্তব?

এক সুন্দর ও সুবৃহৎ উদ্যান আছে। উহা নানাজাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ। একদিকে শ্রেণীবদ্ধ সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষ, অপরদিকে দাড়িম্ব বৃক্ষের শ্রেণী। কোন স্থানে বহুসংখ্যক লিচু গাছ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে, কোথায় বা শত শত গোলাপজাম বৃক্ষ সুপক্ক ফলের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। কোন কোন বৃক্ষ মুকুলিত, কতকগুলি পুষ্পিত এবং কতকগুলি ফলিত রহিয়াছে। নানাবিধ পক্ষীর কলরবে উদ্যানটি যেন সজীব! মধ্যভাগে এক দীর্ঘ জলাশয়, জল স্বচ্ছ নির্ম্মল, গভীর। ছোট বড় নানারকমের মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে এবং রাজহংস সন্তরণ দিয়া পুষ্করিণীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তিনটি ব্যক্তি উদ্যানটি দেখিতে আসিলেন,—একজন বৈজ্ঞানিক (Botanist) একজন বৈষয়িক এবং একজন কবি। বৈজ্ঞানিক দেখিলেন কোন্ বৃক্ষটি কোন্ শ্রেণীর (Genus ও Species-এর) অন্তর্গত, কোন্টি পুংপুষ্প কোন্টিই বা স্ত্রীপুষ্প, কোন্ বৃক্ষে স্বতঃ সম্মিলন হইতেছে এবং কোন্ কোন্ বৃক্ষের মধ্যে শঙ্কর সম্মিলন (Cross breeding) সাধিত হইতে পারে ইত্যাদি। বৈষয়িক দেখিলেন বাগানটি কত বিঘা কত কাঠা কতগুলি আম্রবৃক্ষ, কতগুলি নারিকেল বৃক্ষ প্রভৃতি আছে, প্রত্যেক বৃক্ষে কি পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়, ফলগুলির মূল্য কত হইতে পারে, ফলহীন বৃক্ষগুলিকে চিরিয়া তক্তা প্রস্তুত হইতে পারে কিনা ইত্যাদি। কবি এ সব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন কেবল সৌন্দর্য্য—সুন্দর ফল, সুন্দর পুষ্প, সুন্দর পত্র। তাঁহার সহিত বৃক্ষগুলি কথা কহিল, কোনটি হাসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, কোনটি বা কাঁদিয়া মনোব্যথা জানাইল, পুষ্পবধূগুলি মুচকে হেসে পত্ররূপ অবগুণ্ঠনে মুখ লুকাইল, বিহগগণ মধুর রবে কত মর্ম্মের কথা বলিল,

বিশ্বপতির কতই করুণা কীর্ত্তন করিল !! তিন জন তিন ভাবে দেখিলেন। বাস্তব কোন্‌টি ?

প্রত্যেক মানব,—প্রত্যেক জীব স্বয়ং যেটি দেখিতেছে—অনুভব করিতেছে, তাহার পক্ষে তৎকালে সেইটিই বাস্তব, অপরগুলি অবাস্তব। শিলাখণ্ডটি বালিকার নিকট বাস্তবিকই "খোকা" এবং গৃহিণীর নিকট বাস্তবিকই "নোড়া"। গৃহিণী উহাকে শতবার "নোড়া" বলিলেও বালিকা বুঝিতে পারিতেছে না, এবং বালিকা উহাকে শতবার "খোকা" বলিলেও গৃহিণী বুঝিতে পারিতেছেন না, নোড়াই দেখিতেছেন। কবির নিকট ফুলের হাসি ও বৃক্ষের ভাষা বাস্তব, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চক্ষে উহা স্বপ্ন। আবার বৈষয়িক উদ্যানটির যে অর্থোৎপাদিকা শক্তি দেখিতেছেন, কবি ও বৈজ্ঞানিক তদ্বিষয়ে অন্ধ। চোরের নিকট স্তম্ভটি বাস্তবিকই পাহারাওয়ালা,—সে অন্য ভাবে দেখিতে পারিল না এবং নায়িকার নিকট উহার নায়কত্বই বাস্তব।

অতএব দেখা যাইতেছে একের যাহা বাস্তব অপরের তাহা বাস্তব না হইতে ও পারে। বস্তুতঃ জগতে কোন দুই ব্যক্তি একটি পদার্থকে ঠিক এক ভাবে দেখিতে পারেন না ; যদি পারিতেন তাহা হইলে তাঁহারা দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি থাকিতেন না, মিশিয়া এক হইয়া যাইতেন। একটি ধনী ব্যক্তি সম্মুখে আসিলে কেহ তাঁহার বেশভূষা গাড়ীঘোড়া দেখেন, কেহ তাঁহার যশ, মান, প্রভাব, প্রতিপত্তিই দেখিতে থাকেন এবং কেহ বা পার্থিব বিত্তবাদির নশ্বরত্ব চিন্তা করিয়া তাঁহাকে কৃপাপাত্র মনে করেন। একই যুবতীকে পুত্র মাতৃভাবে দেখিতেছেন, পতি পত্নীভাবে দেখিতেছেন, পিতা কন্যাভাবে দেখিতেছেন। একই ব্যক্তি প্রজাগণের রাজা ও রক্ষক, চোর দস্যুর ভয়দাতা ও দণ্ডয়িতা এবং সাধুসজ্জনের পুরস্কর্ত্তা ও আশাস্থল। যে বৃক্ষচ্যুত ফল সাধারণের চক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার, তাহাতেই নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে পৃথিবী সাধারণের একমাত্র সুখের আলয় ও ভরসাস্থল, বুদ্ধদেবের চক্ষে তাহাই রোগশোকজরামরণসঙ্কুল ভীষণ যন্ত্রণাময় কারাগার। যে ভুর্লোক ও স্বর্গলোক আমাদের মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত থাকিলেও আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যোগিগণ তাহা নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যে "মা" নাম আমাদের নিকট একটা

নির্জীব শব্দমাত্র, সেই "মা" নামেই পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হইয়া আত্মদর্শন করিতেন। এই সকল কারণেই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

"সাধারণ জীবের নিকট যাহা অন্ধকার (অদৃশ্য), যোগিগণ তথায় জাগরিত (অর্থাৎ দেখিতে পান), এবং সাধারণ জীব যাহা দেখে, তত্ত্বদর্শী ঋষি তাহা দেখেন না।"

আমার নিকট যাহা বাস্তব, আপনার নিকট তাহা বাস্তব নহে; রামের যাহা বাস্তব, শ্যামের তাহা বাস্তব নহে। আবার দশ বৎসর পূর্ব্বে আমার যাহা বাস্তব ছিল এখন তাহা অবাস্তব হইয়াছে এবং এখন যাহা বাস্তব হয়ত দশ বৎসর পরে তাহা আর বাস্তব থাকিবে না। বাল্যকালে আপনি জগৎ যে ভাবে দেখিতেন যৌবনে কখনই সে ভাবে দেখেন নাই এবং বার্দ্ধক্যেও সে ভাবে দেখিবেন না। তবেই দেখা যাইতেছে এই সকল বাস্তব দেশ, কাল ও অবস্থার অধীন। সুতরাং ইহাদিগকে চরম নিরপেক্ষ বাস্তব (Final Absolute Reality) বলা যাইতে পারে না; ইহারা আপেক্ষিক বাস্তব মাত্র (Relative Reality)। আপেক্ষিক বাস্তব আর দ্বৈত জ্ঞান একই কথা; এবং নিরপেক্ষ বাস্তব অদ্বৈত পদার্থেরই নামান্তর। মানব যখন যেটি প্রকৃত বলিয়া অনুভব করে তখন সেইটিই তাহার আপেক্ষিক বাস্তব। আমি একটি প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিতেছি, ইহার দাহকতা অনুভব করিতেছি; সুতরাং ইহার উত্তাপ, আলোক ও দহনপটুতাই আমার নিকট আপেক্ষিক বাস্তব। আবার এক ব্যক্তি সেই অগ্নিশিখাতেই পুষ্পকরথ দেখিতে পাইয়া নাচিতে নাচিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। পুষ্পকরথই তাহার নিকট আপেক্ষিক বাস্তব। সাধারণের নিকট সমুদ্রতরঙ্গ ভীষণ জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু চৈতন্যদেব প্রিয়তম নবজলধরমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাতেই ঝাঁপ দিলেন। আমাদের নিকট তরঙ্গের জলত্বই বাস্তব, কিন্তু মহাপ্রভু বাস্তবিকই প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের জ্ঞান বা অনুভূতি (Consciousness) লইয়াই জগতের আপেক্ষিক বাস্তবত্ব। আমার যে টুকু অনুভূতি তাহাই

আমার নিকট বাস্তব, আপনার যাহা অনুভূতি তাহাই আপনার বাস্তব। জগতে যত মানব, যত জীব আছে তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান ও অনুভূতিগুলি যদি একত্র করা হয়, তাহা হইলে যাবতীয় আপেক্ষিক বাস্তবের সমষ্টি পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইতে নিরপেক্ষ বাস্তবের স্বরূপ পাওয়া যাইবে না। আমরা হয়ত বুঝিতে পারি যে একই অজ্ঞাত নিরুপাধিক শক্তি (Energy) বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে। উহা ইথারের মধ্য দিয়া কখনও তড়িৎ, কখনও আলোক, কখনও উত্তাপরূপে, পরমাণুর মধ্যদিয়া আনবিক আকর্ষণ (Molecular attraction) রূপে এবং জড়পদার্থের মধ্য দিয়া মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) রূপে প্রকটিত হইতেছে। কিন্তু তড়িৎশক্তি, উত্তাপশক্তি প্রভৃতি যাবতীয় বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলি জানিলেও আমরা নিরুপাধিক শক্তিটি কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিব কি ? মনে করুন এক ব্যক্তি বিশুদ্ধ শুভ্র আলোক কখনও দেখেন নাই। কিন্তু লাল, নীল, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বিভিন্ন কাচের মধ্যদিয়া উক্ত আলোক যেরূপ আকার ধারণ করে তাহাই অবগত হইলেন। ইহা দ্বারা তাঁহার শুভ্র আলোকের ধারণা জন্মিবে কি ?

মনস্বী যুক্ত পরাঞ্জপে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন * তিনি বলেন শব্দ যে কি বস্তু তাহা আমরা জানি না, জানিতে পারি না ; ইহার বিশেষ বিশেষ বিকাশগুলি (Particular manifestation) মাত্র আমরা জানি। বিভিন্ন সঙ্গীত-যন্ত্রের মধ্য দিয়া ইহা বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। বেহালার তারে ইহা একরূপে প্রকাশ পায়, বংশীর মধ্য দিয়া অন্যরূপে প্রকাশ পায়, আবার মৃদঙ্গের মধ্য দিয়া তৃতীয় আকার ধারণ করে। এখন যদি আমরা জগতের যাবতীয় বিভিন্ন শব্দগুলি অবগত হই,—মক্ষিকার গুন্ গুন্ হইতে সিংহগর্জ্জন, ঘড়ীর টিক্ টিক্ শব্দ হইতে ভীষণ বজ্রনিনাদ এবং সেতার হারমোনিয়ম, এস্রাজ, ক্লারিয়নেট, বীন, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি যাবতীয় বাদ্য হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গীত ("Music of the

---

* "An attempt in the study of consciousness" Theosophy in India, November 1907.

spheres") পর্য্যন্ত আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, তথাপি নিরুপাধিকশব্দটি যে কি বস্তু সে জ্ঞান আমাদের জন্মিবে না। ঠিক সেইরূপে নিরুপাধিক চৈতন্য (Absolute consciousness) যে কি পদার্থ তাহা আমরা জানি না, বিভিন্ন উপাধি দ্বারা ইনি যে সকল বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন তাহাই আমরা জানিতে পারি। জড়ে ইনি প্রায় সুপ্ত, উদ্ভিদে একটু বিকাশ প্রাপ্ত, পশু পক্ষী মানবে আরও পরিস্ফুট, দেবতা মনু প্রজাপতিতে আরও অভিব্যক্ত এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ উপাধিতে বিরাট চৈতন্য বা ঈশ্বররূপে জ্যোতির্ম্ময়। উপাধি যতই সূক্ষ্ম ও বিশাল, বিকাশ ততই অধিক। কিন্তু এই অসংখ্য বিকাশগুলি জানিলে, নিরুপাধিক চৈতন্যকে জানা হইবে না।

উপমাটি অতি সুন্দর। এক একটি বাদ্যযন্ত্র আমাদের এক একটি দেহ বা উপাধি এবং যন্ত্রের এক এক প্রকার vibration বা শব্দ আমাদের এক একটি চিন্তা, জ্ঞান বা অনুভূতি। সেতারটি কোন এক সুরে বাজিতেছে। তাহাকে যদি অন্য সুরে বাজাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তারগুলি 'চড়াইতে' হয় কিম্বা 'নামাইতে' হয়। আমরা জগৎ একরূপ দেখিতেছি, যদি অন্যরূপে দেখিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে উপাধিটি হয় কঠিন করিতে হইবে না হয় শিথিল করিয়া দিতে হইবে। আবার নিরুপাধিক শব্দের যতটুকু সেতার দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে ততটুকুই প্রকাশ পায়, অধিক প্রকাশ পায় না; অধিক প্রকাশিত করিতে হইলে উহার তারের অথবা অবয়বের পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ঠিক সেইরূপে আমার বর্ত্তমান উপাধির মধ্য দিয়া নিরুপাধিক চৈতন্যের যতটুকু প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, ততটুকুই প্রকাশ পায়। অধিক প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা হইলে, উপাধিটি বদলাইতে হয়।

মনে করুন এক নূতন বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হইল, উহা হইতে এক নূতন রকমের শব্দ নির্গত হইতে লাগিল, সেরূপ শব্দ আমরা কদাপি শুনি নাই, কল্পনাও করি নাই। ইহা আদৌ অসম্ভব নহে, কারণ নিরুপাধিক শব্দ উপাধিভেদে যে কত অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে কে জানে? ঠিক সেইরূপে, আমরা যদি একটি সম্পূর্ণ নূতন উপাধি লাভ করি, আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন হইতে পারে যাহা বর্ত্তমানে আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আজ আমাদের যাহা জগৎ বলিয়া বোধ

হইতেছে,—যে জল, স্থল, বায়ু, বৃক্ষ, পশু, মানব, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতির নিত্য অনুভূতি হইতেছে, উপাধির পরিবর্ত্তনে এগুলির বিলোপ অসম্ভব নহে, তখন নূতন উপাধি-যন্ত্র হইতে এক নূতন অশ্রুত-পূর্ব্ব সুর বাহির হইতে পারে; হয়ত আজ যাহাকে বৃক্ষাদি বলিয়া অনুভব করিতেছি, তখন তাহাকে অন্য কিছু একটা বোধ করিব। বাস্তবিক মানবের নিকট যাহা বৃক্ষ, লতা প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি সে গুলি কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, ও দেবতাদির চক্ষে কিরূপ তাঁহা আমরা জানি না।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম একটি মাত্র নিরুপাধিক চৈতন্য আছেন। ইনিই এক মাত্র নিরপেক্ষ বাস্তব (Absolute Reality)। ইনি প্রকৃত অসংখ্য উপাধিতে অসংখ্য ভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। এই অসংখ্য ভাবগুলি প্রত্যেকে এক একটি আপেক্ষিক বাস্তব। কীটরূপ উপাধিতে ইনি যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছেন তাহাই কীটের কীটত্ব এবং কীটত্ব একটি আপেক্ষিক বাস্তব অর্থাৎ কীটের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অনুভূতি কীটের নিকট বাস্তব। আবার শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও অনুভূতি শঙ্করাচার্য্যের নিকট বাস্তব এবং যীশুর ভাব-জগৎ যীশুর নিকট বাস্তব। কিন্তু কোনটিই নিরপেক্ষ বাস্তব নহে—হইতে পারে না, কারণ নিরপেক্ষ বাস্তব উপাধির মধ্য দিয়া প্রকটিত হইলে সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ও বিকৃত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। ইহা আমরা বুঝি না বলিয়াই আমাদের মধ্যে এত বিবাদ ও গণ্ডগোল! প্রত্যেকে তাঁহার ক্ষুদ্র আপেক্ষিক বাস্তবটিকে নিরপেক্ষ বাস্তব মনে করেন। জড়বাদী ভাবেন জড়জগৎই নিরপেক্ষ বাস্তব—ইহা ছাড়া আর কিছুই বাস্তব নাই; বিজ্ঞানবাদী (Idealist) ভাবেন ভাবজগৎই একমাত্র বাস্তব, জড়জগৎ মিথ্যা ও অলীক। উদারনৈতিক (Liberal) রক্ষণশীলকে (Conservative কে) সঙ্কীর্ণচেতা ও ভীরুস্বভাব বলিয়া নিন্দা করেন, রক্ষণশীল উদার-নৈতিককে দুঃসাহসী ও অবিমৃষ্যকারী বলিয়া গালি দেন। রাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রীকে শান্তিভঙ্গকারী ও অপরিণামদর্শী মনে করেন, প্রজাতন্ত্রী রাজতন্ত্রীকে প্রভুত্বপ্রিয় ও স্বার্থপর বিবেচনা করেন। কৃষকের নিকট ক্ষেত্র ও কৃষিকর্ম্মই বাস্তব; শীতাতপ উপেক্ষা করিয়া অনায়াসে দুই বিঘা ভূমি কিরূপ কর্ষণ করা যায় ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারেন; কিন্তু কৃষকের গৃহে এক ব্যক্তি একখানি পুস্তক লইয়া

সমস্ত দিন কিরূপে বসিয়া থাকিতে পারে—ইহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য। সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়াছেন "গানাৎ পরতরং নহি", আবার কোন আচার্য্যের পুত্র যদি শাস্ত্রচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া গীতবাদ্যে লিপ্ত হয়, আচার্য্য ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলেন "ছেলেটা, একবারে বয়ে গেছে"। ভোগবিলাসরত ইউরোপীয়ের চক্ষে আহার বিহার, ব্যবসা বাণিজ্যই বাস্তব; সুতরাং একজন বুদ্ধিমান সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তি নিজের স্ত্রীপুত্র, গৃহ পরিবার, বিষয় কর্ম্ম, যশ মান ছাড়িয়া একটা বনের মধ্যে বা পর্ব্বতগুহায় বসিয়া অনাহারে ও শীতে কষ্ট পায় কেন ইহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না, ইহা তাঁহার নিকট এক বিষম প্রহেলিকা!

ধর্ম্মজগতেও ঠিক এইরূপ—কেহ কাহাকে বুঝেন না। সকলেই ভাবেন তাঁহার ক্ষুদ্র আপেক্ষিক বাস্তবটি নিরপেক্ষ বাস্তব। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, নানকপন্থী, রাধাস্বামী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, প্রোটেষ্টাণ্ট, ক্যাথোলিক—প্রত্যেকে মনে করেন তিনিই ভগবানের স্বরূপ ঠিক জানিয়াছেন এবং অপরের ধারণাটি ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু ভগবান যে নিরপেক্ষ বাস্তব, সুতরাং যিনি যত উচ্চ ধারণা করুন না কেন, ধারণা মাত্রই যে এক একটি সাপেক্ষ বাস্তব,—ইহা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। তবে অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে উপাধি যতই বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম হয়, নিরপেক্ষ বাস্তবটি ততই অধিক প্রকাশিত হন; অতএব একের ধারণা অপরের ধারণাপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ বাস্তব কে (পূর্ণ ভগবান কে) কোন সোপাধিক জীব জানেন না, জানিতে পারেন না। তিনি কেবল নিজেই নিজকে জানেন। জীব যখন সকল উপাধি বর্জ্জিত হন, তখন তাঁহার নিকট সাপেক্ষ বাস্তব বা দ্বৈত জ্ঞান থাকে না। এই সাপেক্ষ বাস্তব লইয়াই জীবত্ব, সুতরাং জীবত্বও থাকে না। অতএব এই অবস্থায় "তত্ত্বমসি" বা "সোঽহং" প্রভৃতি বাক্যের কোন অর্থই নাই; কারণ যখন জীবত্ব নাই, তখন "ত্বং" বা "অহং" নাই, সুতরাং কে কাহাকে "তত্ত্বমসি" বা "সোঽহং" বলিবে? এক নিরপেক্ষ বাস্তব যিনি নিত্য ও সনাতন, তিনিই এখন আছেন—জীবস্বরূপ স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়াছেন।

খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকেরা এখানে আসিয়া হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া এ দেশের কেহ কেহ বলিলেন "তাই তো বটে।"

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, এগুলি পৌত্তলিকতা ভিন্ন আর কি? ঈশ্বর নিরাকার। তাঁহাকে মাটীর পুতুল ভাবিয়া চাল কলা খাইতে দেওয়া তাঁহার অবমাননা নয় কি? পৌত্তলিকতা বিসর্জ্জন কর। প্রতিমা পূজা ছাড়িয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর।" হায়, হায়! তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন না যে জগতের সকলেই পৌত্তলিক, সোপাধিক জীব-মাত্রই পৌত্তলিক, যতদিন জীবের দ্বৈতজ্ঞান বা জীবত্ব থাকে ততদিন সে পৌত্তলিক!। যিনি টাকাকে বাস্তব ভাবিয়া তাহার পূজা করিতেছেন তিনি কি পৌত্তলিক নহেন? যিনি কামিনীকে বাস্তব ভাবিয়া তাহার পূজা করিতেছেন তিনি কি পৌত্তলিক নহেন? যিনি বিজ্ঞান বা দর্শনকে বাস্তব ভাবিয়া তাহার পূজায় নিমগ্ন তিনি কি পৌত্তলিক নহেন? যিনি বিভব ঐশ্বর্য্য, যশ মান, প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত, বাস্তব ভাবিয়া সদাই তাহাদের ধ্যান করিতেছেন, তিনি কি পৌত্তলিক নহেন? মূরের ইউটোপিয়া, কার্লাইলের হিরো ওয়ার্সিপ্, মিল্টনের স্যাম্‌সন্—এ গুলি কি পৌত্তলিকতা নহে? আবার, যিনি ভগবানকে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিতেছেন, কেবল মুখে না বলিয়া যিনি নিরাকার চৈতন্যের একটা কোন ধারণা (Any definite idea) করিতে পারিয়াছেন এবং এই ideaটির পূজা করেন, তিনিও কি পৌত্তলিক নহেন? কারণ, ধারণা শব্দের অর্থ কি? প্রত্যেক ধারণাই এক একটি পুত্তলিকা বা ছবি (Image or picture)। এই ধারণাটি বা ছবিটি মনের মধ্যে রাখিয়াই হউক, অথবা তুলি, কলম বা বাটালির সাহায্যে কোন বাহ্যিক আকারে আকারিত করিয়াই হউক, যতক্ষণ আপনি ইহার ধ্যান বা পূজা করিবেন ততক্ষণ আপনি পৌত্তলিক। র‍্যাফেল একখানি সুন্দর ছবি আঁকিয়া তাহা দেখিতে দেখিতে যখন ভাবে বিভোর হন তখন তিনি পৌত্তলিক, আবার ছবিখানি আঁকিবার পূর্ব্বে যখন তিনি ইহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন তখনও তিনি পৌত্তলিক। হাম্‌লেটের চিত্র যখন সেক্ষপীয়রের হৃদয়পটে উদিত হইয়াছিল, তখন তিনি যেরূপ পৌত্তলিক, উহা নাটকাকারে আকারিত হইলে যে সকল ব্যক্তি ঐ পুস্তকের পূজা করিয়াছিলেন বা করেন তাঁহারাও সেইরূপ পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতার হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। "অসীম করুণাময় ভগবান অসংখ্য জীবকে নিয়ত পালন ও রক্ষা করিতেছেন"—এই

ভাবে যাঁহারা এই বিশ্বব্যাপিনী করুণাটিকে মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে আকারিত করিয়া স্নেহময়ী জগৎপালিকা "অন্নপূর্ণা" মূর্ত্তিতে পূজা করেন তাঁহারাও সেইরূপ পৌত্তলিক। এ দু'য়ে বড় ইতর বিশেষ নাই। তবে একটু প্রভেদ আছে। যতক্ষণ ধারণাটি কেবল মনের মধ্যেই থাকে, ততক্ষণ উহা অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট (Vague & indefinite) থাকিয়া যায়; কিন্তু বাহ্যিক আকারে আকারিত হইলেই উহা একটু সীমাবদ্ধ (Limited) হয় বটে কিন্তু সুস্পষ্ট, জীবন্ত ও বাস্তব (Clear, vivid, real) হইয়া উঠে। কাব্য, সঙ্গীত, আলেখ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য—এগুলি সমস্তই নিরপেক্ষ বাস্তবের সাকারীকরণ মাত্র,—অদ্বৈত বস্তুর মূর্ত্তিদান ও পূজাকরণ মাত্র। এবং ইহারই নাম পৌত্তলিকতা। পৌত্তলিকতা ভিন্ন জীবের গত্যন্তর নাই, কারণ আপেক্ষিক বাস্তবের পূজাকেই পৌত্তলিকতা বলে।

সেতার হইতে এক রকম সুর বাহির হয়, এস্‌রাজ হইতে অন্যপ্রকার সুর নির্গত হয়। এখন যদি আমরা সেতার হইতে এস্‌রাজের সুর বাহির করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সেতারটিকে এস্‌রাজের ন্যায় গঠিত ও তারযুক্ত করিতে হয়। আমি জগৎকে একরূপে দেখি, বুদ্ধদেব অন্যরূপে দেখেন। আমি যদি বুদ্ধদেবের ন্যায় জগৎটি দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমার উপাধিকে বুদ্ধদেবের উপাধির ন্যায় সূক্ষ্ম, পরিমার্জ্জিত ও বিশাল করিতে হইবে। এরূপ করিতে হয়ত আমার বর্ত্তমান উপাধির আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইতে পারে। ইহা এক জন্মেই পারি অথবা বহুশত জন্মেই পারি, করিতেই হইবে। যতদিন করিতে না পারিব ততদিন বুদ্ধদেবের জ্ঞান ও অনুভূতি আমার জন্মিবে না। এইরূপে প্রত্যেক জীব যদি নিজের আপেক্ষিক বাস্তবটি (দ্বৈত জ্ঞানটি) ত্যাগ করিয়া আর একটি আপেক্ষিক বাস্তব লাভ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বীয় উপাধিটির পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

এখন প্রশ্ন এই—কিরূপে উপাধির পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে? নানা প্রণালী আছে। ইহাদিগকে বিভিন্ন সাধন মার্গ বলে। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে মানবের বিবিধ উপাধি আছে। স্থূলোপাধির পরিবর্ত্তন হঠযোগের অন্তর্গত এবং সূক্ষ্মোপাধির পরিবর্ত্তন রাজযোগের লক্ষ্য। পবিত্র ও সাত্ত্বিক

খাদ্যাদির দ্বারা স্থূলোপাধি বিশোধিত হয় এবং চিন্তা দ্বারাই সূক্ষ্মোপাধি পরিবর্তিত হইয়া থাকে। চিন্তার যে কি মহীয়সী বিশ্ববিজয়িনী শক্তি তাহা কেবল যোগিগণই সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছেন। চিন্তাদ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়, সম্ভব ও অসম্ভব হয়; যাহা অবাস্তব ছিল তাহা বাস্তব হয়, আবার বাস্তব ও অবাস্তব হইয়া পড়ে। আপনি আজ যাহাকে একটি বৃক্ষ বলিতেছেন, যদি ক্রমাগত চিন্তা করিতে থাকেন তাহা বৃক্ষ নয় একটি মাতৃমূর্ত্তি, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, গমনে শয়নে ভোজনে উপবেশনে—প্রতি মুহূর্ত্তে যদি ভাবিতে পারেন উহা স্ত্রীমূর্ত্তি, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন আপনার চিন্তাটি ক্রমশঃ বাস্তব হইতেছে, ক্রমশঃ স্ত্রীলোকটির মুখ, চক্ষু, নাসিকা, হস্ত পদ আপনার স্পষ্ট নয়নগোচর হইবে, আপনি তাঁহার মৃদুহাস্য দেখিবেন, তাঁহার কথা শুনিতে পাইবেন। আপনার সূক্ষ্ম উপাধি অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া কালক্রমে এরূপ এক নূতন আকারে গঠিত হইয়া যাইবে যে বাস্তবিকই আপনি বৃক্ষকে সর্ব্বদা স্ত্রীলোক রূপে দেখিতে থাকিবেন। যে বৃক্ষ আপনাব পূর্ব্বে বাস্তব ছিল তাহা এখন অবাস্তব হইবে, যে স্ত্রীমূর্ত্তি অবাস্তব ছিল তাহাই এখন বাস্তব হইবে। এখন যদি কেহ আপনাকে বলেন "উহা বৃক্ষ", আপনি তাঁহাকে বলিবেন "তুমি অন্ধ না হয় বিকৃতমস্তিষ্ক; আমি স্পষ্টই স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতেছি, তাঁহার কথা শুনিতেছি, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতেছি। আর তুমি বলিতেছ বৃক্ষ!"

আবার আপনি যদি বহুকাল ধরিয়া ক্রমাগত দিবারাত্রি ভাবিতে পারেন "আমি অজর অমর, আমার দেহাদি নাই", তাহাহইলে বাস্তবিকই আপনার দেহাদি থাকিবে না, দেহাদির বিন্দুমাত্র অনুভূতি হইবে না, দেহাদি অগ্নিতে দগ্ধ হইলে অথবা অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হইলে আপনি কিছুই জানিতে পারিবেন না, এমন কি দেহপাত (মৃত্যু) হইলেও আপনি বুঝিতে পারিবেন না যে আপনি মরিয়াছেন বা কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কবি যে বলিয়াছেন Mind is its own place and can make a heaven of hell, a hell of heaven, ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পরম যোগী স্বয়ং বশিষ্ঠ দেব এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখা যাক্:—

যেন যেন যথা যদ্ যদ্ যদা সংবেদ্যতেঽনঘ।
তেন তেন তথা তত্তৎ তদা সমনুভূয়তে ॥ ১৬ ॥
অমৃতত্বং বিষং যাতি সদৈবামৃতবেদনাৎ।
শত্রুর্মিত্রত্বমায়াতি মিত্র সংবিত্তিবেদনাৎ ॥ ১৭ ॥
নিমেষে যদি কল্পৌঘসংবিদং পরিবিন্দতি।
নিমেষ এব তৎকল্পো ভবত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
রাত্রিং দ্বাদশবর্ষাণি হরিশ্চন্দ্রোঽনুভূতবান্।
লবণো ভুক্তবানায়ুরেক রাত্র্যা সমাঃ শতং ॥ ২৪ ॥
মধুরং কটুতামেতি কটুভাবেন চিন্তিতং।
কটু চায়াতি মাধুর্য্যং মধুরত্বেন চিন্তিতং ॥ ২৭ ॥
মিত্রবুদ্ধ্যা দ্বিষন্মিত্রং রিপুবুদ্ধ্যা রিপুঃ সুহৃৎ।
ভবতীতি মহাবাহো যথা সংবেদনং জগৎ ॥ ২৮ ॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি প্রকরণ (৬০ সর্গ)

"যে যে ব্যক্তি যে যে বস্তু যখন যে ভাবে চিন্তা করেন সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই বস্তু তখন সেই ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। বিষকে সর্ব্বদা অমৃত চিন্তা করিলে উহা অমৃতই হইয়া যায়, শত্রুকে মিত্র ভাবিলে সে মিত্রেই পরিণত হয়। এক নিমেষকে যদি বহুকল্প জ্ঞান করা যায়, তাহাহইলে ঐ নিমেষ বাস্তবিক সেই কল্প হইয়া যায়; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিশ্চন্দ্র দ্বাদশ বৎসর রাত্রি অনুভব করিয়াছিলেন এবং লবণ এক রাত্রির মধ্যে শত বৎসর আয়ু ভোগ করিয়াছিলেন। মিষ্ট বস্তুকে সর্ব্বদা কটু (ঝাল) ভাবিলে উহা বাস্তবিকই কটু হইয়া যায় এবং কটুকে মিষ্ট ভাবিলে উহা মিষ্টত্বই প্রাপ্ত হয়। শত্রুকে মিত্র ভাবিলে সে মিত্র এবং মিত্রকে শত্রু ভাবিলে সে শত্রু হইয়া যায়। যেরূপ চিন্তা সেইরূপই জগৎ।"

যদি এক ব্যক্তির মনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদিত করা হয় (নিজের দ্বারাই হউক বা অপরের দ্বারাই হউক) যে লবণই শর্করা অথবা প্রজ্বলিত অঙ্গার চন্দনবৎ সুশীতল এবং যদি তিনি অনন্যচিত্তে বিকল্পশূন্য হইয়া উহাকে ঐরূপই ভাবিতে পারেন, তাহা হইলে বস্তুতঃই তিনি লবণে চিনির মিষ্টতা এবং অগ্নিতে চন্দনের শীতলতা অনুভব করেন। অধুনা পাশ্চাত্য জগতে

এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে এবং এখনও পরীক্ষা চলিতেছে। * ভক্তশ্রেষ্ঠ, যোগিশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বহুকাল ধরিয়া ভাবিয়াছিলেন যে জগৎ বিষ্ণুময়, সবই বিষ্ণু, বিষ্ণু ভিন্ন কিছুই নাই, জল স্থল বায়ু অগ্নি, মৃত্তিকা প্রস্তর সর্প হস্তী—প্রত্যেক বস্তুই তাঁহার "দয়াল হরি"; সুতরাং তাঁহার নিকটে অগ্নির দাহকতা নাই, তিনি অক্ষতদেহে অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্গত হইলেন; সর্পের বিষ এখন তাঁহার নিকট বাস্তব নহে, উহা অমৃতে পরিণত হইয়াছে; মত্ত হস্তীর কঠিন পদতল তাঁহার নিকট বিষ্ণুর কোমল ক্রোড়! আর একটি অপূর্ব্ব ঘটনা শুনুন। পরম ভক্ত রামানুজ যৎকালে নিত্য বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন ও বিষ্ণুর পাদোদক পান করিবার অভিপ্রায়ে এক প্রসিদ্ধ দেবালয়ের সন্নিকটে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অসাধারণ প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া বহু লোক তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। ইহাতে দেবালয়ের পুরোহিত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার প্রাণবধের সংকল্প করেন। ভক্ত প্রত্যহ বিগ্রহের যে পাদোদক পান করিতেন, একদিন পুরোহিত তাহাতে উগ্র বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখেন এবং রামানুজ আসিবা মাত্র আগ্রহের সহিত উহা তাঁহাকে পান করিতে দেন। ভক্ত বুঝিলেন ইহা বিষ। কিন্তু তাঁহার নিকট আবার বিষ কি? তিনি বহুকাল বহুজন্ম জগৎকে অমৃত চিন্তা করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং তাঁহার নিকট সমস্তই অমৃত। তিনি অন্য দিন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চরণামৃত পান করিলেন এবং "আহা, বড়ই তৃপ্ত হইলাম! সমস্তই অমৃতময় হউক।!" এই বলিয়া পুরোহিতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুরোহিত ভাবিলেন "আজ যে তীব্র বিষ দিয়াছি তাহা দশজনের জীবন বিনাশে সমর্থ, সুতরাং কল্য প্রাতে ব্যাটার মৃত্যুসংবাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরদিন প্রাতে দেখিলেন অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে পুনরায় মন্দিরাভিমুখে আসিতেছেন! তখন পুরোহিতের চৈতন্য হইল। রামানুজের আশীর্ব্বাদ সফল হইল। সমস্তই অমৃতময় হইয়া গেল। পুরোহিতের

* পন্থায় প্রকাশিত "তন্দ্রারোপ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। Psychical Research Societyর Report এ বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন।

হিংসাবিষ প্রেমামৃতে পরিণত হইল। দারুণ অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর পদপ্রান্তে গড়াইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সমস্তই আপেক্ষিক বাস্তব। এই জগৎ আর কিছুই নয়, অসংখ্য আপেক্ষিক বাস্তবের সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেকের আপেক্ষিক বাস্তব স্বতন্ত্র। যদি বলেন "কই, তাহাতো নহে। রাম এই বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে যেরূপ দেখিতেছে, শ্যাম ও তো প্রায় সেইরূপই দেখে।" ঠিক বটে; কিন্তু তাহার কারণ এই যে মানবমাত্রেরই চিত্তা (সূক্ষ্মোপাধি) প্রায় সমান। যদি উপাধিটি একটা অসাধারণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় (মনে করুন মানব যেন যক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা কোন দেবযোনিতে পরিণত হইলেন), তাহা হইলে তিনি বৃক্ষ লতাদিকে যে ঠিক এইরূপই দেখিবেন তাহার প্রমাণ নাই; অন্যরূপ দেখাই বরং অধিকতর সম্ভব। কারণ, মানবের মধ্যেই উপাধির ইতর বিশেষে জ্ঞান ও অনুভূতির ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়। অতএব দ্বৈত মাত্রই আপেক্ষিক বাস্তব, অর্থাৎ ইহারা সকল জীবের পক্ষে সকল সময়ে বাস্তব থাকে না। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, বৃক্ষলতা পশু নর, ভূভুব আদি সপ্তলোক, ইন্দ্রাদি দেবতা, মনু প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—সমস্তই আপেক্ষিক বাস্তব, ইহাদের অস্তিত্ব জীবের অনুভূতির উপর নির্ভর করে। এই আপেক্ষিক বাস্তবগুলিকেই বেদান্ত অবাস্তব বলিয়াছেন। সুতরাং বেদান্তের ভাষায় ব্রহ্মই একমাত্র বাস্তব, আর সমস্তই অবাস্তব।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরি।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বেমিয়ান প্রস্তরমূর্ত্তি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দৈত্যগণের তৃতীয় বিভাগের মানবদেহ অতি প্রকাণ্ড ছিল। পরে তাহা ক্রমশঃ হ্রস্ব হইতে লাগিল। ইষ্টার দ্বীপে যে প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তাহার উচ্চতার পরিমাণ ১৮ হাতক দৈত্যকুলের

মধ্য সময়ের মানবদেহ যেরূপ ছিল, এই প্রতিমূর্ত্তি তাঁহারই অনুরূপ। সুপ্রসিদ্ধ বেমিয়ান প্রতিমূর্ত্তিগুলি সংখ্যায় পাঁচটী। তাহা দৈত্যকুলে জাত, সিদ্ধ মহাপুরুষগণের উপদেশে ও তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত। এই প্রতিমূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী অপরটী হইতে ক্রমশঃ ছোট। ইহারা প্রথম মৌলিকজাতি হইতে পঞ্চম মৌলিকজাতির মানবদেহের পরিমাণ ব্যঞ্জক। প্রথমটী ১২৬ হাত উচ্চ। ইহা প্রথম জাতির অনুরূপ। প্রথমজাতির দেহ ছায়ার ন্যায়ও ১১৬ হাত দীর্ঘ ছিল। দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি উচ্চে ৮০ হাত। ইহা দ্বিতীয় জাতির দেহপরিমাণজ্ঞাপক। ইহারা স্বেদোৎপন্ন এবং ইহাদের দেহ-পরিমাণ ৮০ হাত ছিল। এইরূপ তৃতীয় মূর্ত্তিটী ৪০ হাত উচ্চ। তৃতীয় মানবজাতির বা দানবগণের দেহ ৪০ হাত দীর্ঘ ছিল। চতুর্থ প্রতিমূর্ত্তিটী উচ্চে ১৮ হাত। পঞ্চমটী আরও ক্ষুদ্র; পঞ্চম জাতির মধ্যে যে দেহ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ছিল, তাহা হইতে ইহা সামান্য উচ্চ। অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৬ হাত উচ্চ। এই প্রতিমূর্ত্তিগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। তাহাদের অনুরূপ মৃণ্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ইহাদিগকে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক। কারণ কথিত প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তিগুলি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের যুগযুগান্তর পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

পুরাণে উল্লেখ আছে, শুক্রাচার্য্য প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণের গুরু ছিলেন। শুক্রের অধীনে তাহারা উন্নতিসোপানে আরোহণ করিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? শুক্রগ্রহ হইতে যে সকল জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে স্বর্গীয় অগ্নিষাত্ত রাজাগণ এই দৈত্যকুলকে শাসন করিয়াছিলেন, এই জন্যই শুক্রাচার্য্যকে দৈত্যগুরু বলা হয়।

অসুর ময় বা ময়দানব।

স্বর্গীয় আচার্য্য এবং রাজাগণের শাসনাধীনে থাকিয়া টল্‌টেক্ সভ্যতা ক্রমে ক্রমে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্ সুপ্রসিদ্ধ অসুর ময় এই সময়ে এই জাতির মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই রাশিচক্রের আবিষ্কারক।* ইহা তিনি সর্ব্বাগ্রে কত দেশবাসী দৈত্য-

গণকে শিক্ষা দেন, তাহার বহুশতাব্দি পরে, কালসহকারে ইহা প্রাচীন মিশরে প্রচলিত হয়। পুরাণে এবং মহাভারতে অসুর ময়কে ময়দানব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

দেবর্ষি নারদ।

এই সভ্যতার সময়ে ইচ্ছাশক্তি ও যোগবলে জাত, ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবর্ষি নারদ পুনঃ পুনঃ এই দৈত্যকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যোগবলে সময়োপযোগী বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া ধরাতলে অবতরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাগ্যচক্র পরিচালনা করিতেন। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, তিনি মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন অদৃষ্টবশে যুগযুগান্তরকাল ব্যাপিয়া পৃথিবীতে যে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব ও নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনাদি চলিয়াছিল, এই নারদ ঋষিই সেই অদৃষ্টচক্রনেমির নিয়ামক ও পরিচালক ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনী এক অতি বিস্ময়কর প্রহেলিকাবৎ সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অতীত এবং গভীর রহস্যযুক্ত।

বায়ু পোত।

যে গুহ্য শক্তির বলে সৃষ্টি কার্য্য চলিয়াছে, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব এই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠগণ লাভ করিয়া তাহা সমাজে প্রচলিত করিয়াছিলেন। স্থূলাকাশকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ঈথার কহে। এই ঈথারে যে অসাধারণ গুহ্যশক্তি নিহিত আছে, তাহার প্রক্রিয়া তাঁহারা অবগত ছিলেন এবং স্বেচ্ছামত, প্রয়োজনাধীন তাহা প্রয়োগ করিয়া অলৌকিক ও অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন। সমুদ্র-বক্ষ ভেদ করিয়া অর্ণবপোত এখন যে ভাবে অবলীলাক্রমে পরিচালিত হয়, তখন বায়ুযানও তদনুরূপ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আকাশমার্গে যথাতথা পরিচালিত হইত। টল্‌টেক্ রাজত্বের অভ্যুদয়ের সময় যখন যুদ্ধ বিগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই ব্যোমযান-গুলি যুদ্ধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

পুরাণ ইতিহাসে এই সকল বায়ুযানের বিবরণ ও তদ্দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্য-দলের মধ্যে আকাশমণ্ডলে নানারূপ যুদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সময়ে

রসায়ন বিদ্যার বলে তাহারা এমন সব ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিল যে, তাহাদের পরিচালনায় অতি অল্প সময়ে এবং অনায়াসে বহু শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইত। শত্রুসৈন্য শূন্যমার্গে বায়ুপোতের মধ্যে থাকিয়া সময় সময় প্রতিপক্ষের মস্তকোপরি অজস্রধারে এমন সব বিষাক্ত বারি বর্ষণ করিত যে তাহাতে অসংখ্য সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইত এবং অবশিষ্ট সৈন্য নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া রণভূমি হইতে পলায়নপর হইত। তাহারা সময় সময় এমন সব সংহারকারী বোমা ছুড়িয়া মারিত, যাহা ভূতলে পতিত হইয়া গভীর নিনাদে ফাটিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইত এবং তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ আগ্নেয় গোলা এবং অনলবর্ষী লক্ষ লক্ষ বাণ ছুটিয়া গিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণী সংহার করিত ও অসংখ্য প্রাণীর হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রণস্থলকে ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করিত।

বিজ্ঞান।

পুরাকালে বিজ্ঞানবলে তাহারা নানারূপ লোকহিতকর কার্য্য করিত। যাহাতে পশুশালায় ভাল ভাল পশু জাত হইতে পারে, বিজ্ঞানবলে তাহার সাহায্য করা, যাহাতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে; যাহাতে ফলমূলাদির উৎকর্ষ লাভ ও ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে, তজ্জন্য তাহারা নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করিত। প্রাণীজগতের ও উদ্‌বিদ রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন মানসে এবং নানারূপ পীড়া ও তজ্জনিত অকাল মৃত্যু নিবারণ করার জন্য তাহারা নানাবর্ণের আলোকের আবিষ্কার করিয়া ব্যবহার করিত।

তাহারা দ্রব্যগুণ অর্থাৎ অপরসায়ন বিদ্যা অবগত ছিল। বস্তু বিশেষের পুট দিয়া তাহারা এক ধাতুকে অপর ধাতুতে পরিণত করিতে পারিত। এইরূপ নানা চাকচিক্যশালী ধাতু প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা গৃহাদি সুসজ্জিত করিত। এই অপরসায়ন বিদ্যা হইতেই কালে রসায়ন বিদ্যার আবিষ্কার হইয়াছে। গৃহ ও মন্দিরাদিতে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ ব্যবহৃত হইত। রাজপ্রাসাদে, ধর্ম্মমন্দিরে, ভজনালয়ে এবং ধনাঢ্য লোকের প্রাসাদে বহু

সংখ্যক সুবর্ণ স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইত। নগরের শোভা সংবর্দ্ধনের জন্য নানারূপ গিল্টির দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত।

শিক্ষা, শিল্প, সমাজ ও রাজ্যশাসনপ্রণালী।

টল্‌টেক্ রাজত্ব সময়ে শিল্প বিদ্যা উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। কোন কোন নগর সৌন্দর্য্যের ও দৃঢ়তার আদর্শ স্বরূপ ছিল, তন্মধ্যে সুবর্ণ তোরণ ও সুবর্ণ দ্বারযুক্ত নগরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। এই সুপ্রসিদ্ধ নগরটী এক শৈলোপরি নির্ম্মিত ছিল উক্ত শৈলশৃঙ্গে অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ মন্দির বিরাজমান ছিল। এই মন্দিরটী নানারূপ কারুকার্য্যময়, সুবর্ণমণ্ডিত বহুতর স্তম্ভে অলঙ্কৃত, সুসজ্জিত এবং বিবিধ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকায় তাহা স্বর্গীয় রাজাগণের রাজপ্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হইত। এই রাজাগণের প্রসাদাৎই টল্‌টেক সভ্যতা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সুন্দর সুন্দর চিত্র, বিবিধ কারুকার্য্যময় সাজ সরঞ্জাম দ্বারা গৃহাদির বহির্ভাগ সজ্জিত করা হইত। বাহবাটী ও প্রাঙ্গন সুসজ্জিত করার জন্য তাহারা নানারূপ ধাতুমূর্ত্তি, টব, সুন্দর সুন্দর ছবি এবং অপরাপর প্রতিমূর্ত্তি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিত।

তাহাদের সামাজিক রীতি নীতি মধ্যে সাধারণতঃ এই নিয়ম ছিল যে, জ্ঞানবান্ এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার না করিয়া তাহাদিগকে আপদ বিপদ হইতে সদাকাল রক্ষা করিত।

শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রকৃতির এবং বিভিন্ন রুচির ছাত্রগণের প্রবৃত্তির অনুরূপ বিভিন্ন রকমের শিক্ষার অনুশীলন করা হইত। যখন টল্‌টেক্ জাতি সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন প্রত্যেক নগরের কেন্দ্রস্থলে এক একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্থাপিত ছিল; তাহার অধীনে বহুতর কলেজ ছিল এবং সেই কলেজগুলি নানা শাখায় বিভক্ত ছিল; তথায় নানা বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার ও আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা বহু আবশ্যকীয় বিষয়ের আবিষ্কার হইত।

বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে দেহবল এবং কার্য্যপটুতাশক্তি কমিয়া আসিলে

রাজকর্ম্মচারীদিগকে শারীরিক শ্রমসাধ্য শাসনকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া অধ্যয়ন ও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। এই নিয়ম থাকায় তখন বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও অশিক্ষিত লোকদিগকে কৃষি এবং শিল্পকার্য্যে এবং সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যার কার্য্যে নিযুক্ত করার নিয়ম ছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রাসাচ্ছাদনের এবং সর্ব্বপ্রকার সুখসচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টিপাত এবং বন্দোবস্ত করাই রাজার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ছিল। যে শাসনকর্ত্তার অধীনের প্রজাগণ অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করিত, কিম্বা উশৃঙ্খল হইয়া উঠিত, অথবা দুর্ভিক্ষপীড়িত হইত, সেই শাসনকর্ত্তাকে উক্ত গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসৃত করা হইত। এবং যদি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী বশতঃ রাজ্যে কোনরূপ উপদ্রব এবং উৎপাত উপস্থিত হইত, তবে তাঁহার অর্থদণ্ড এবং কারাদণ্ড পর্য্যন্তও হইত।

যে সকল অতি প্রাচীন জাতির পুরাতন সাহিত্যাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে তাহা পাঠে, এই সকল রাজ্যশাসন এবং সমাজশাসন প্রণালীর বিবরণ জানিতে পারা যায়। চীন জাতির ও অন্যান্য প্রাচীন জাতির গ্রন্থাদিতে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। দক্ষিণামেরিকার অন্তর্গত পেরুদেশে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে সভ্যতা প্রচলিত ছিল, তাহাতে এই দৈত্যসভ্যতার চিহ্ন দেদীপ্যমান্ ছিল। স্পেইন রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ পিজারো স্পেইন সৈন্যসহ এই পেরুদেশ আক্রমণ ও পেরুভিয়ান্ দিগকে পরাজয় করার পর, সেই উন্নত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা, রাজ্যশাসন-প্রণালী এবং সমাজনীতি ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত ও অবনত হইয়া শেষে একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে।

আট্লান্টিস্ মহাদেশ বা কুশদ্বীপ টল্টেক্ রাজত্বের কেন্দ্রস্থান ছিল। তাহা এখন আট্লান্টিক্ মহাসাগরের গর্ভে নিহিত। উক্ত কেন্দ্রস্থান হইতে ইহা পশ্চিমদিগে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া বর্ত্তমানে যে স্থানে উত্তর ও দক্ষিণামেরিকা দণ্ডায়মান আছে, সেই দেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল। পূর্ব্বদিকে ইহা উত্তর আফ্রিকা এবং মিশর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দৈত্যকুলের অধঃপতন।

স্বর্গীয় রাজা ও জ্ঞানীদের দ্বারা শাসিত এবং শিক্ষিত হইয়া চতুর্থ মৌলিক জাতি উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছিল। সেই রাজা এবং জ্ঞানীগণ ভাবিলেন, "দেখি এখন এই জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে কি না" এই ভাবিয়া তাঁহারা সরিয়া পড়িলেন। তখন হইতেই তাঁহাদের অধঃপতনের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। এই জাতির মধ্যে যে সকল অসুর জন্মধারণ করিল, তাহাদের বলবীর্য্য, রাজ্যশাসন এবং রাজ্যবিস্তার করার ক্ষমতা প্রবল হওয়াতে, তাহারা অভিমান এবং অহংকারে মত্ত হইয়া উঠিল।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীম্॥

তাহারা এই আসুর সম্পদে পূর্ণ হইয়া চলিতে লাগিল:

ইদমদ্য ময়ালব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

এই ভাবিতে ভাবিতে তাহারা হইল কি?

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।
আত্ম সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্।
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কা॥

গীতাঃ ১৬ শ অ।

তাহারা এইরূপে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "আমরাই রাজা" "আমরাই দেবতা।" এই বলিয়া তাহারা নির্ব্বোধ সুন্দরী স্ত্রীলোক গ্রহণ

করিয়া তাহাদের সংসর্গে নানারূপ বিকটাকার, পশুতুল্য মানবের অবতারণা করিল। তাহারা নিজেদের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবমন্দিরে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের পূজার্চ্চনা করিতে লাগিল। তাহাদের তৃতীয় চক্ষু অন্তর্হিত হইল।

শুভ্রকায় সম্রাট্।

তাঁহার সঙ্গে অসুরগণের বিরোধ ও ঘোরতর যুদ্ধ।

স্বর্ণতোরণযুক্ত নগরে শুভ্র সম্রাট্ বাস করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অসুরগণ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম গোপনে চক্রান্ত আরম্ভ করিয়া রাজধানী হইতে প্রেরিত আদেশ অমান্য করিতে লাগিল। দূরবর্ত্তী রাজা অপেক্ষা নিকটবাসী রাজপ্রতিনিধি অধিকতর কার্য্যকারী ও উপকারী, এইরূপ প্রচার করিয়া তাহারা আস্তে আস্তে রাজক্ষমতা অধিকার করিতে লাগিল। তাহাদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য জনসাধারণকে নানারূপ অলৌকিক ভোজবাজি ও ভৌতিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত শক্তির সাহায্যে নানারূপ বিস্ময়কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহারা লোকসমাজে প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিতে লাগিল। ধবলকায় সম্রাটের প্রতি প্রজাবর্গের ভক্তি শ্রদ্ধা হ্রাস করিবার জন্য তাহারা ধর্ম্মোপাসনা ও অর্চ্চনা পদ্ধতিতে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইল। পূজার্চ্চনাকার্য্যে নানা রকমের সুমিষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করিল, নয়নের তৃপ্তিকর নানারূপ চাকচিক্যশালী দৃশ্যের অবতারণা করিল, এবং নানারূপ কুরুচিপূর্ণ অভিনয়ের সৃষ্টি করিল। পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজাগণ ইষ্টকার্য্যে কখনই এইরূপ করিতেন না। তাঁহারা যথাশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া কলাপ সম্পাদনে তৎপর ছিলেন। পুরাতন মন্দিরসকল সুবর্ণে মণ্ডিত এবং বিবিধ ও বহুমূল্য মণি রত্নরাজি খচিত ছিল, তাহাতে তাহাদিগকে অতি মনোহর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুষমার আকরস্বরূপ দেখাইত। চাকচিক্যশালী, উজ্জ্বল, প্রতিভান্বিত সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, কেন্দ্রস্থানে স্থাপিত ছিল। এই সূর্য্য আকাশস্থ সূর্য্যের পরিচায়ক চিহ্নস্বরূপ, আকাশের সূর্য্য আবার তদাধিষ্ঠিত ব্রহ্মাণ্ডপতির আবরণস্বরূপ। সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া তিনি বাহ্য জগতে প্রকাশিত হন।

নৃত্যগীতাদি দ্বারা পূজার্চ্চনার কার্য্য সম্পন্ন হইত। পূজার সময় সৌরভ-যুক্ত পুষ্পমালা এবং প্রচুরপরিমাণে সুগন্ধি ধূপ ধুনা ব্যবহৃত হইত। রাজ-ধানীতে যে হিরণ্য মন্দির ছিল, তাহার মধ্যে এক সুবৃহৎ এবং শুভ্রকায় প্রকোষ্ঠ ছিল; তাহা "দীক্ষা গুহা" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় সিদ্ধ মহা-পুরুষগণ ললাটে দীক্ষার ফোঁটা ধারণ করিয়া উপযুক্ত শিষ্যদিগকে দীক্ষা প্রদান করিতেন। তজ্জন্য এই মন্দির পরমার্থ জ্ঞান লাভের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। আপামর সাধারণ তজ্জন্য এই মন্দিরকে ভক্তির চক্ষে দেখিত।

তৎপর ক্ষমতাপ্রিয় লোভী অসুরগণ ভাবিতে লাগিল যে, যে পর্য্যন্ত হিরণ্য মন্দির এবং শুভ্র প্রাসাদ ও প্রকোষ্ঠ লোকের দৃষ্টিশক্তি আকর্ষণ করিবে, সেই পর্য্যন্ত শুভ্রকায় সম্রাটের প্রতি প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ভক্তির হ্রাস হইবে না। এই ভাবিয়া তাহারা এক নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার রাজসিংহাসনে এক প্রতিদ্বন্দী সম্রাটকে স্থাপন করিল। এই সম্রাটের নাম "দেবতৎ," তিনি রাজ বাটীকার মধ্যে এক নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নূতন এক দীক্ষাপ্রকোষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করিল। তাহারা এই প্রকোষ্ঠে নানারূপ নৃত্যগীত ও পান ভোজনের বিপুল আয়োজন করিয়া সেই সমারোহ ব্যাপারে ভুবর্লোকের নিম্ন শ্রেণীর ভূতযোনী দিগকে মন্ত্রবলে আহ্বান করিত; তাহাদের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য পশু বলি ও সময় সময় নরবলি পর্য্যন্ত দিয়া সেই মাংস তাহাদিগকে নিবে-দন করিত। এই ভূত প্রেতদের পরিতোষের জন্য নানারূপ অশ্লীল ক্রিয়া ব্যভিচার, নির্দ্দয় এবং নৃশংস ব্যাপার সম্পাদন করিত। এইরূপ বীভৎস-কাণ্ডে সারারাত্র যাপন করিয়া দিবাভাগে নানারূপ বিবাদ বিসম্বাদ এবং পশ্বাদি বলিদান করিয়া রাজধানীকে কলুষিত ও বিভীষিকাময় নরক তুল্য করিয়া তুলিত। এই অধঃপাতের অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে আরও অধোগতি হইতে লাগিল। অসুরগণ নিজেদের উপাসনার পাত্র বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। "আমরা রাজা, আমরা দেবতা," এই বলিয়া তাহাদের স্ব স্ব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি খোদিয়া পূজার জন্য সেই সকল দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিল। আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচায়ক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

করিয়া তৎসমুদায়ের পূজার ব্যবস্থা করাতে, তাহা হইতে নানারূপ ব্যভিচারের সূত্রপাত হইল।

এই অসুরগণ নানারূপ অলৌকিক ভোজবিদ্যার ও যাদুবিদ্যার শিক্ষক হওয়ায়, তাহাদের প্রজাগণের মনে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হইল। নিরীহ প্রজাদিগকে নির্য্যাতন এবং নির্ম্মূল করার জন্য অসুরগণ নানারূপ গর্হিত আভিচারিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিল। দানবজাতির ধ্বংসাবাশেষ ক্ষুদ্রশির, পশুতুল্য রমণীগণের সাহায্যে তাহারা অতি কুৎসিত ও অশ্লীল আভিচারিক ক্রিয়ার সংযোগে ভীষণদশন রাক্ষসজাতিকে উৎপন্ন করিল। এই রাক্ষসগণের মধ্যে একাধারে অতুল পশুবল এবং বর্ব্বরের ধূর্ত্ত স্বভাব বর্ত্তমান থাকায় অসুরগণ তাহাদিগকে তাহাদের প্রহরী এবং সন্দেশবাহীরূপে নিযুক্ত করিল। এইরূপে নৃশংস ও অহঙ্কারী অসুরগণ পাশববলবীর্য্যের চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল

একদিকে যেমন অসুরগণ বলবিক্রম সঞ্চয় করিতে লাগিল, অপরদিকে শুক্রকার সম্রাট্ তেমি তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

উর্দ্ধতন অধ্যাত্মজগতে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল। অনেকে সাধনবলে প্রজ্ঞা লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা অধঃপতিত মানবজাতিকে অধ্যাত্মরাজ্যে উন্নীত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ইহার দুই লক্ষ বৎসর পরে মহাত্মাসমাজের আদেশে জনৈক মহাত্মা পরবর্ত্তী পঞ্চম মৌলিক জাতি অর্থাৎ আর্য্য জাতিকে তৈয়ার করিবার জন্য দৈত্যজাতির অন্তর্গত সেমিটিক্ নামক দুর্দ্দমনীয় পঞ্চম বিভাগ হইতে বীর স্বরূপ ভাল ভাল দেখিয়া লোক মনোনীত করিলেন। তিনিই বৈবস্বত নামক সপ্তম মনু। তিনি তাহাদিগকে সুপবিত্র শ্বেত দ্বীপে লইয়া গেলেন। এই দেশ প্রত্যেক জাতির আদিস্থান। চতুর্থ জাতি হইতে এইরূপে পঞ্চম জাতির বীজ পৃথক হওয়ার পর দশ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই উদীয়মান জাতির মধ্যে আমরা ভাবী বৈবস্বতকে দেখিতে পাই। তাহাদের মধ্যে পারস্ক দেশের ধর্ম্মবীর মহাত্মা যারাথুষ্ট্রা (Zarathustra), গ্রীস দেশীয় মহাপণ্ডিত হার্ম্মেস (Hermes), এবং অরফিউস্ (Orpheus), ভাবী গৌতম,

মৈত্রের প্রভৃতি অন্যান্য বহু মহাপুরুষ এই ভবিষ্যত জাতির মঙ্গল কামনায় এবং হিতসাধন মানসে সচেষ্ট হইয়া বিরাজমান রহিলেন। যাহা হউক, আপাততঃ আমরা এই শান্তিধামের কথা স্থগিত রাখিয়া কলহপ্রিয় দৈত্যকুলের ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ কিরূপে চলিয়াছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিব।

* অসুর সৈন্যসামন্ত দলবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ উত্তরদিকে অগ্রসর হইল, তাহাতে তাহাদের এবং শুভ্রকায় সমাটসৈন্যমধ্যে তুমুল সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। বিজয়লক্ষ্মী কখন কৃষ্ণকায় অসুরসৈন্যের আবার কখন কখন শুভ্রকায় সম্রাটসৈন্যের অঙ্কশায়িনী হইতে লাগিল, কিন্তু পরিণামে অসুর-সৈন্যেরই জয়লাভের সূত্রপাত হইল, কারণ পুরুষের (আত্মার) উপর প্রকৃতির আধিপত্যের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া অসুরসৈন্যের দলবল বৃদ্ধি করিল, কারণ জনসাধারণের কামক্রোধানল উদ্দীপ্ত করিবার জন্য অসুরগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কালের বশে পুণ্য পবিত্রতার আধার, তপোবল সমন্বিত, ধর্ম্মপথাবলম্বী, শুদ্ধসত্ব সাধুজনদের প্রতি দুষ্ট ও পাপরত জনসাধারণের ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইল। আস্তে আস্তে কথিত প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদল মধ্যে অবিরাম গতিতে ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নানারূপ রক্তারক্তি এবং প্রাণীবধের পর, পরিণামে অসুরদেরই জয়লাভ ঘটিল। শুভ্রকায় সম্রাট্ তাহার রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইলেন। অসুরসৈন্য হিরণ্যতোরণযুক্ত নগর অধিকার করিল। হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যরাজ সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিল। যে গুহাতে পূর্ব্বে দীক্ষাকার্য্য সমাধা হইত, তাহা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। তোরণদ্বারের স্তম্ভগুলি একে একে ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। ছাদ খসিয়া পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। যে হিরণ্ময় সৌধে পবিত্রাত্মা পুরোহিতগণ পৌরহিত্যকার্য্য করিতেন, সেই সৌধে নিরীহ প্রাণীগণের উত্তপ্ত শোণিতস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে তাহা ভীষণাকার ধারণ করিল। যেস্থানে সূর্য্যনারায়ণের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল, তথায় পাপকাঙ্ক্ষী অসুরগণের বিকট ও ভীমদর্শন মূর্ত্তিসমূহ, বিকট ভ্রূভঙ্গি করিতে লাগিল। পুণ্যের স্থানে পাপ, ও শান্তির স্থানে অশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসমাজে

ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবানের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইল। ক্রমশঃ।

যুগল সেবক।

মরণ ও মরণান্তে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পিণ্ডদেহের পরিণাম।

পিণ্ডদেহ স্থূলদেহেব অবিকল অনুরূপ। জীবিতাবস্থায় সময় সময় ইহাকে স্থূলদেহের অনতিদূরে দেখা যায়। স্থূলদেহ হইতে ইহা বাহির হওয়া মাত্র সেই দেহ জড়বৎ পড়িয়া থাকে, গতিশক্তি ও প্রাণেব অন্যান্য ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যায়; যেহেতু পিণ্ডদেহ প্রাণেব বাহন স্বরূপ। কাজেই ইহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে স্থূলদেহে প্রাণের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। জীবিতাবস্থায় পিণ্ডদেহ ভাওদেহ হইতে পৃথক হইলেও একটী অদৃশ্য সরু সূত্র দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এই সূত্র ছিন্ন হইলেই মৃত্যু ঘটে।

পিণ্ডদেহ ভাওদেহ হইতে যখন চিরকালের মতন বাহিব হইয়া যায়, তখন ইহা সেই দেহ হইতে অধিক দূরে যায় না। সাধারণতঃ ইহা স্থূলদেহের উপরিভাগেই অনতিদূরে আকাশে ভাসমান থাকে। সাম্যাবস্থার মৃত্যু ঘটিলে, সংজ্ঞা স্বপ্নবৎ প্রশান্ত থাকে, কিন্তু শবের চতুর্দ্দিকে দারুণ শোক ও হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ করিলে আসন্নমৃতের অশান্তি ও বিষম ক্লেশ ঘটে। অতএব মরণকালে যখন আস্তে আস্তে পিণ্ডদেহ ভাওদেহ হইতে বাহির হইতে থাকে, তখন মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে রোদনেব রোল না তুলিয়া হিতৈষী আত্মীয় বন্ধুদের সবিশেষ স্থিরধীর ভাব ধারণ করিয়া পরলোকগামী আত্মার সদ্গতির উপায় চিন্তা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে অতীত জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি দৃশ্যপটের ন্যায় অতি দ্রুতগতিতে জীবের মানসচক্ষের সম্মুখ দিয়া একে একে চলিয়া যায়। যাঁহারা জলে ডুবিয়া মরণোন্মুখ হইয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা এই অবস্থাটী উপলব্ধি করিয়া পশ্চাতে এইরূপ বলিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে পূজ্যতম জনৈক মহাত্মা কিরূপ বলিয়াছেন, শুন :—

"মুমূর্ষুকালে ঠিক্ আসন্ন সময়ের শেষ মুহূর্ত্তে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলি মানবের স্মৃতিপথারূঢ় হয়। যৎসামান্য বলিয়া যেসকল ঘটনা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, তাহারা একে একে দৃশ্যপটের ন্যায় মনে উদয় হইতে থাকে। অনেক সময় মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে যখন প্রাণবায়ু বহির্গত হয় ও হৃৎপিণ্ড স্পন্দনশূন্য হয়, ঠিক্ তাহার পর হইতে দেহের জীবনীশক্তির শেষ বহ্নিকণা নির্ব্বাপিত হইয়া দেহ শীতল হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অত্যল্পকাল, এই কয়েক সেকেণ্ড মধ্যেও মস্তিষ্কে ভাবনাস্রোত প্রবাহিত থাকে। এই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জীব অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনাবলি ঝটিতি পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে। অতএব যাঁহারা মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তির হিতসাধনে তৎপর, তাঁহারা সমাহিত-চিত্তে শান্তভাব অবলম্বন করিয়া অতি ধীরে, অতি মৃদুভাবে কথা বলিবেন; দেখিবেন উচ্চরব করিয়া, কিম্বা ক্রন্দনের কোলাহল তুলিয়া যেন তাহার সেই অন্তিমসময়ে শান্তি নষ্ট না হয়! বিশেষতঃ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে চুপ্‌চাপ্, স্থির ধীর, শান্তশিষ্ট থাকা আত্মীয়বর্গ সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। তাই, বারংবার বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতেছি, সেই অন্তিম সময়ের অত্যল্প কাল মাত্র অতি শান্তভাবে, অতি ধীরে, অতি মৃদুভাবে, অতি সন্তর্পণে কথা কহা উচিত; দেখিও যেন তোমাদের হট্টগোলে তাহার গতজীবনের সেই সুগভীর শেষচিন্তা ও পর্য্যালোচনার স্রোত প্রতিহত না হয়; যেন তাহার ভাবী জীবনে তাহারা প্রতিফলিত হইতে কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত না হয়! মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মীয় কুটুম্ব সকলেরই তাহার কল্যাণের জন্য এই উপদেশটির প্রতি লক্ষ্য রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

ঠিক্ এইসময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলি একে একে চিত্রপটের ন্যায় তাহার মনে উদয় হয়; পরে এই চিন্তাচিত্রপটগুলি পরস্পর যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া একত্র সমীকৃত হয়, পরিশেষে সমষ্টিভাবে ঠিক্ একটী জ্যোতির্ম্ময় আকার ধারণ করিয়া ভুবর্লৌকিক জ্যোতিতে প্রতিফলিত হয়। স্বভাবে যে যে আসক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে, যে যে বিষয়ের চিন্তা সবিশেষ উগ্র ও তীক্ষ্ণ থাকে, তাহাদের বীজ সূক্ষ্মভাবে নবজাত জ্যোতির্ম্ময়দেহে

বদ্ধমূল হয়, এবং পরজীবনে তাহারা স্বাভাবিকগুণরূপে আবির্ভূত হয়। অতীত জীবনের সুখ দুঃখ, পাপপুণ্যের এই হিসাব নিকাশের সময়, সুকাজ কুকাজ সমূহের জের হওয়ার সময় যে আত্মীয়বর্গের আর্তনাদ, বিলাপ ও রোদনের কোলাহল উত্থিত হয়, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! কারণ এই সময়টী অতি মহান্! অতি গরীয়ান্!। তখন অতি সাবধানে গম্ভীর ও নিস্তব্ধ থাকা শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

এ সম্বন্ধে স্বর্গীয়া মেডাম ব্লেভেট্‌স্কী কি বলেন শুন; "মরণের শেষ মুহূর্ত্তে এমনকি যখন হঠাৎ মরণ ঘটে, তখনও প্রত্যেক মুমূর্ষু ব্যক্তি তাহার অতীত জীবনের ছোটবড় সমস্ত ঘটনাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পায়; তাহারা একে একে তাহার মনে পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই মুহূর্ত্ত সময় কাল, মায়ামুগ্ধজীব সর্ব্বজ্ঞ জীবাত্মার অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেই সময়টুকুর জন্ত তাহার গতজীবন সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞতা জন্মে। তাহার জীবন কি কি কারণে কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার সূত্র ধারাবাহিকরূপে এই মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহার মনে উদিত হয়। জীব প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা তখন সে বুঝিতে সক্ষম হয়, কারণ তখন তোষামোদ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি মোহাদি দ্বারা সে অভিভূত থাকে না। নাট্যশালার দর্শকের ন্যায় জীব তখন তাহার জীবনের রহস্য বুঝিতে পারে এবং অতীত কালের ঘটনাবলির পর্য্যালোচনা করিতে এবং তাহার ক্রীড়াভূমি এই ভবধামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পরলোকে চলিয়া যায়।"

যখন পিণ্ডদেহ স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার উপরিভাগে শূন্যে ভাসিতে থাকে, তখন সাধারণ লোকের কথিত বিশদ দৃষ্টি আস্তে আস্তে লোপ পায় এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বপ্নবৎ শান্ত চৈতন্য আধ আধ ভাব ধারণ করে। সময় সময় এই পিণ্ডদেহ মৃত্যুশয্যার পাশে বা গৃহের বাহিরে দৃষ্টিগোচর হয়। মরণের সময় যদি সমধিক স্নেহের ও ভালবাসার পাত্র কেহ কাছে না থাকে, এবং তজ্জন্য তাহারপ্রতি মন তখন যদি খুব আকৃষ্ট ও উদ্বিগ্ন থাকে, অথবা মরণকালে যদি তাহার মনে কোন বিষয়ের অত্যুগ্রচিন্তা জাগরুক্ থাকে, অথবা যদি তাহার অবশ্য করণীয় কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকে অথবা তৎকালিক কোন সুরলোকে তাহার শান্তিভঙ্গ হয়, তবে মৃত ব্যক্তির

পিণ্ডদেহ এইরূপে কাহারও দৃষ্টিপথারূঢ় হয়। তখন তাহা অস্পষ্ট, নিঃশব্দ, স্বপ্নাবস্থার স্থায় সংজ্ঞাশূন্যবৎ প্রতীয়মান হয়। যতই দিন যাইতে থাকে, ততই আস্তে আস্তে উর্দ্ধতর পঞ্চরূপ এই পিণ্ডদেহ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। ইহারা স্থূলদেহকে যেরূপ আলোড়িত করিয়া পৃথক্ হইয়াছিল এখন তাহারা আবার পিণ্ডদেহকে সেইরূপ আলোড়িত করিয়া পৃথক হইয়া যায়। পিণ্ড-দেহ শবরূপে পরিণত হইয়া স্থূলদেহের সঙ্গে সঙ্গে বাঁচিতে থাকে। সূক্ষ্ম-জগদ্দর্শীগণ (Clairvoyants) সময় সময় মৃতব্যক্তির স্থূলদেহের অনুরূপ এবং কোন কোন সময় বেগুণে রঙ্গের কুজ্ঝটিকাবৎ পিণ্ডদেহকে গোরস্থানে দেখিতে পায়। কোন কোন সময় ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পচিতে পচিতে এমন বিসদৃশ ও বিভৎস আকার ধারণ করে যে, তাহা দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম জগদ্দর্শনশক্তির পদে নমস্কার। স্থূল ও পিণ্ড এই উভয় দেহের বিশ্লেষণ ক্রিয়া এইরূপে যুগপৎ হইতে হইতে শেষে কেবল অস্থিপঞ্জরময় কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট থাকে, অন্যান্য অংশসকল সূক্ষ্ম অনুরূপে পঞ্চভূতে মিশিয়া অন্যদেহ নির্ম্মাণের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

শবদাহের উপকারিতা।

হিন্দুদের মধ্যে আবহমান কাল হইতে শবদাহ করার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা অতি সুব্যবস্থা; কারণ অগ্নিসংযোগে ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহ যুগপৎ সহজে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। কিন্তু যাহাদের মধ্যে শব মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া গোর দেওয়ার নিয়ম আছে, তাহারাই সময় সময় আংশিক বিশ্লিষ্ট পিণ্ডদেহের বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে। শবদাহে বিন্দুমাত্রও এই আশঙ্কা থাকে না। অতএব চিতাসংস্কারক্রমে শবদাহ কার্য্যের ব্যবস্থাই অতি উত্তম ব্যবস্থা।

মরণের অব্যবহিত পরে এই পিণ্ডদেহকে কতক পরিমাণে সজীব করা যাইতে পারে। ডাক্তার হাট্‌মেন বলেন;—"যদি কেহ হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়, তবে তাহার পিণ্ডদেহকে তাড়িত যন্ত্রের সাহায্যে জীবিত বলিয়া প্রদর্শন করান যাইতে পারে। ঠিক্ সেইরূপ কামদেহ পরিত্যাগক্রমে স্বর্গ-গমন করার পর তাহার কামলোকস্থ শবদেহকে প্রেততত্ত্ববাদীদিগের চক্রস্থ

আবিষ্ট ব্যক্তির আংশিক জীবনী শক্তির সাহায্যে কৃত্রিম ভাবে জীবিত করা যায়। ইহা বুদ্ধিমানের শবদেহ হইলে ঠিক্ বুদ্ধিমানের ন্যায় কথা বলে, কিন্তু নির্ব্বোধের শবদেহ হইলে বোকার ন্যায় কথা বলে"। বলা বাহুল্য যে, এই সকল প্রক্রিয়া বড় অনিষ্টকারী; এবং আভিচারিক বিদ্যার অন্তর্গত বলিয়া সর্ব্বোতভাবে পরিত্যজ্য।

কামলোক। (ASTRAL WORLD.)

প্রাণ ও কামের পরিণাম

কামলোককে যমলোক বা ভুবর্লোক বলা হয়। কাম অর্থে বাসনা, ইন্দ্রিয়ভোগলালসা। মানুষে যেমন কামাদি সহজাত ও স্বাভাবিক, পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীতেও ঠিক সেইরূপ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্ণরানাং।

জ্ঞানই মানুষের বিশেষত্ব, জ্ঞানহীন মানুষ পশুতুল্য।

জ্ঞাননবানামাধিকং বিশেষঃ।

জ্ঞানেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥

মরণের পর ক্রমশঃ স্থূল ও পিণ্ডদেহ পরিত্যাগ করিয়া মানব কামদেহ গ্রহণ ক্রমে কামলোকে বাস করে। এই লোকে অন্যান্য আর প্রাণী বসবাস করে, কিন্তু তাহারা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। যে সকল মানব কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগক্রমে কামলোকে গমন করিয়াছে, মাত্র তাহাদের সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা করা যাইবে।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারা গেল না।

এই বাহ্য জগতের অতিরিক্ত অপর কোন সূক্ষ্ম জগৎ আছে বলিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীগণ বিশেষতঃ জড়বাদীগণ আদৌ বিশ্বাস করেন না কিন্তু পরাবিদ্যা মতে এই স্থূল জগৎ ভিন্ন আরও জগৎ আছে।

স্থূল জগৎ ভূর্লোক, সূক্ষ্মজগৎসমূহভুবঃ,

স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যঃ নামে অভিহিত।

তাহাদের বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মহাত্মাগণ এই

সকল লোক সম্বন্ধে সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বহু সাধকও স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে এই সকল লোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যে সকল গুহ্যশক্তি অন্তর্লীন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, সাধনবলে তাহাদিগকে জাগ্রত ও কার্য্যক্ষম করিলেই তাহাদের বলে এই সকল সূক্ষ্ম জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। সাধক জীবদ্দশায়ই ভাণ্ড ও পিণ্ডদেহ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় এই সকল লোকে বিচরণ করিয়া এবং তাহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আবার পুনরায় স্থূল দেহে ফিরিয়া আসিতে পারেন। তাঁহাকে মৃত্যুর সাহায্যে এই সকল লোকে যাইতে হয় না, তিনি জীবদ্দশায়ই ইচ্ছামত তাহাতে যাতায়াত কবিতে পারেন। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্মদেহধারী জীবের সংসর্গেই আমাদের দেহস্থ সূক্ষ্মজীবের (পবমপুরুষের) প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রকৃতজ্ঞানী ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কথিত সূক্ষ্মলোকের জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা সজ্ঞানে স্ব স্ব মস্তিষ্কে আরোপ করিয়া চৈতন্যাবস্থায় তাহা অবিকল স্মরণ করিতে পারেন। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই প্রকৃত অভিজ্ঞতা, এবং ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। এই রূপেই সিদ্ধযোগীগণ সূক্ষ্ম জগতের গূঢ় তত্ত্বসকল জনসমাজে প্রচার করিয়া থাকেন। আমাদের ইন্দ্রিয়েব এবং অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বলিয়া আমরা তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই না।

যেমন জনৈক পরিব্রাজক আফ্রিকার মরুপ্রদেশে পরিভ্রমণক্রমে তাহার অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন এবং তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া যেমন শ্রোতৃমণ্ডলীর কুতূহল নিবৃত্তি এবং কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করেন সেইরূপ যোগীগণ সূক্ষ্মদেহে চক্ষু কর্ণাদির অগোচর সেই সকল সূক্ষ্ম লোকাদিতে পরিভ্রমণ করিয়া তাহাদের জ্ঞান লাভ করতঃ তাঁহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিপুষ্টি ও লোকসমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করেন। অভিজ্ঞ আফ্রিকা মহাদেশ ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সেই মহাদেশ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কেহ কোনরূপ সমালোচনা করিলে তিনি তাহা গ্রাহ্য মাত্রই করিবেন না এবং গ্রাহ্য না করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি সেই মহাদেশে যাহা দেখিয়াছেন তাহা হয়ত বিবৃত করিলেন, তথায় যে যে জীব জন্তু আছে, তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে হয়ত তিনি বর্ণনা করিলেন;

যে সকল ভূভাগে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাদের মানচিত্র অঙ্কিত করিলেন ; তাহাদের উৎপন্ন, পণ্যদ্রব্য ও তাহাদের গুণাগুণ বর্ণনা করিলেন। সেই মহাদেশে যিনি এ জীবনে পদার্পণ পর্য্যন্তও করেন নাই, এমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি তাঁহার সেই সকল উক্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ সমালোচনা করে, উক্ত বিবরণ সম্বন্ধে হাস্য পরিহাস, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, সংশোধন করিতে প্রয়াস পায়, তবে সেই অভিজ্ঞ পর্য্যটক তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া বা বিরক্তি বোধ না করিয়া তাহা সযতনে উপেক্ষাই করিবেন। পুনঃ পুনঃ গম্ভীর এবং দৃঢ়ভাবে বলিয়াও কি অজ্ঞ ব্যক্তি অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্বমতে আনিতে পারে? অসম্ভব। কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ কেহ তৎসম্বন্ধে সমালোচনা করিলে তাহার যে মূল্য হয়, এইরূপ শত সহস্র জনে সমালোচনা করিলেও সেই মূল্যই হয়। কোন ইতর বিশেষ হয় না অর্থাৎ তাহাব কিছুমাত্রই মূল্য হয় না। যদি কেহ কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন, এবং সেই সম্বন্ধে আরও বহু ব্যক্তি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহা সমর্থন করেন, তবে সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রমাণ অধিকতর দৃঢ় ও বিশ্বাসযোগ্য হয়। কিন্তু অবিদ্যাকে সহস্রগুণ করিলেও তাহা অবিদ্যাই থাকে। বিদ্যা বা জ্ঞানরূপে পরিণত হয় না। মিথ্যাকে শত সহস্র গুণ করিলেও তাহা মিথ্যাই থাকিয়া যায়, তাহা কখনই সত্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। মনে কর, যদি আমাদের চতুর্দ্দিগস্থ অন্তরীক্ষ-লোক জীবশূন্য, প্রাণীশূন্য হইত, এবং একমাত্র পৃথিবীবাসী জীবই কেবল বর্ত্তমান থাকিত এবং তাহাদের অবলম্বনেই যদি জ্ঞান, বুদ্ধি প্রকাশ পাইত, তবে বাস্তবিকই কি ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না?

এই কামলোক স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্মতর জগৎ। স্থূল জগতে যেমন সুবোধ অবোধ অনেক প্রকার নরনারী এবং বিবিধ আকার প্রকারের বহুবিধ জীবজন্তু বাস করে, কামলোকেও সেইরূপ সুবোধ নির্ব্বোধ, বিবিধরূপ আকার প্রকার ও বিভিন্ন আচার ব্যবহার বিশিষ্ট অসংখ্য অসংখ্য মানব ও ইতর জন্তু বসবাস করিতেছে। ভূলোক এবং ভুবর্লোক পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে (Interpenetrating) অনুস্যূত রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া এই উভয়লোকবাসীগণ পরস্পরের সত্বা উপলব্ধি করিতে পারে না। কেবল বিশেষ বিশেষ অবস্থাধীন বিশেষ বিশেষ কারণে

এক লোকবাসীর সত্তা অপর লোকবাসী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। মানুষ অপেক্ষা অনুন্নত বহুবিধ প্রাণী ও ভূতযোনী কামলোকে বাস করে। যোগ শিক্ষাবলে জীবদ্দশায় মানুষ সেই লোকে গমন করিতে ও সেই লোকবাসীদের সংস্পর্শে আসিতে পারে এবং সময় সময় কথিত নিকৃষ্ট ভূতযোনীকে বশে আনিতে পারে। যে সকল নরনারী দেহত্যাগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া কামলোকে গমন করে, তাহাদের মধ্যে যাহাদের বাসনা এবং কামপ্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল, তাহারা পৃথিবীবাসী কামাসক্ত লোকের কামবৃত্তি দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হইয়া কামদেহে তাহাদের সংসর্গে আসিয়া তাহাদের সেই পরিচিত দৃশ্য এবং পরিত্যক্ত বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে। এবং কেহ কেহ বিশেষ গুহ্য উপায়ে এই দেহত্যাগ করিয়া কিছু কালের জন্য কামলোকে গমন করিয়া সেই লোক ও সেই লোকবাসীদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া পুনরায় নিজদেহে প্রত্যাগমন করেন। এখন কোন্ বিষয়টী পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করার বিশেষ দরকার? না, কামলোক বলিয়া যে একটা নির্দ্দিষ্ট লোক আছে তাহাতে যে নানা প্রকার অসংখ্য জন্তু বাস করে এবং যে সকল মানব দেহত্যাগে পরলোকগামী হইয়াছে তাহারাও যে কামদেহ ধারণে এই লোকে বাস করিয়া থাকে এই কয়েকটী কথা সুন্দররূপে বোঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। এই খানেই কথিত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়টীর উপসংহার করিলাম। যে সকল নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইয়া স্থূলদেহ ত্যাগে কামলোকে গমন করে এখন পুনরায় তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুদর্শন দাস।

কাল।

মোহাচ্ছন্ন জীবাত্মা সকল।
ভ্রমে মিন অতল সলিলে
তবু পড়ে ধীবরের জালে।

ফেরে দূরে যোজন সহস্র,
বিহঙ্গম পায় দেখিবারে,
আমিষ পতিত ভূমিতলে,
কিন্তু হায় ! পাশবদ্ধ তাহে,
দেখিবারে আঁধার নয়ন।
কিবা হয় কারণ ইহার ?
বৈষম্যই কারণ ইহার।
বৈষম্যের হেতু হয় কিবা ?
কাল—কাল বৈষম্যের হেতু।
সম্মানের হেতু এই কাল,
দাতা প্রার্থয়িতা করে কাল
মানবেরে ; আশ্চর্য্য ইহাই।
স্বর্গ মর্ত্ত্য চরাচর স্থানে
যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম
সকলেই কালের অধীন।
মন্ত্র, দান, তপস্যা ও পূজা
পুত্র, মিত্র, কলত্র, দুহিতা,
কিছু নহে কিছু এ ভবে ;
কাল প্রপীড়িত যেই জন,
কেহ তারে না পারে রক্ষিতে।
বাতাবলে চলে যথা হয় !
ঘন ঘোর আকাশমণ্ডলে,
সেই মত করয়ে চালনা
কর্ম্মযুক্ত কাল এ সংসারে।
সসাগরা রাজরাজেশ্বর
ধনী, শ্রমী, ভিক্ষুক, সবাই
এক মাত্র কালের সেবক।

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

বেদান্তাভাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবিদ্যা তমসোদ্ভব,
বিদ্যালোক হয় প্রভব,
আলোক তাপ সম্ভব
তাপ অনু অগ্নিকণা ॥ ১৬।

এই আলোকে যৎ প্রকাশে,
অকল্মনে হৃদাকাশে,
সেই সাধন প্রবেশ ক্ষেন
ভাগ্য ক্রমে হয় ঘটনা ॥ ১৭।

অবিদ্যার ঘোর যার কাটেনি,
বিদ্যার যে স্বাদ করেনি
সে বুঝিবে হায়, কেমনে
আত্মবিদ্যা আলোচনা ॥ ১৮।

এই আলোক সর্ব্বজীবে,
বিভাবিত হয় জানিবে,
ইহারই ইতর বিশেষে,
ভক্তাভক্ত হয় গণনা ॥ ১৯।

এই আলোকই জ্ঞানের জনক,
এই আলোকই স্থিতিস্থাপক,
এই আলোকই বিশ্বব্যাপক,
সমষ্টি সূর্য্য দেখ না ॥ ২০।

এই তেজে দর্শনেন্দ্রিয়,
দেখে দৃশ্য যাবতীয়,
এই আলোকে প্রকাশ জগৎ
নইলে তমোময় বুঝনা ॥ ২১।

এই তেজে হয় মানব বিকাশ
স্থূল সূক্ষ্ম ভূত প্রকাশ
মনস্বীর মন এই তেজে,
কার কত বিচারণা॥ ২২।

এই আলোকে লেখ্য লেখা,
এই আলোকে শিখ্য শেখা,
এই আলোকে ব্রহ্ম বিচার,
বিতণ্ডার অবতারণা॥২৩।

ক্রমশঃ।

প্রবাদ কথা ও তাহার সংস্কৃতানুবাদ।

৪৪।	"চোর গেলে বুদ্ধি সঞ্চাবে।"	চৌরে গতে বুদ্ধিরুদেতি নানা॥৪৮॥
৪৫।	"ললাটের ফল, কে খণ্ডাবে বল?"	ললাটস্থ ফলং কেন খণ্ডিতুং শক্যতে বদ॥ ৪৫॥
৪৬।	"দরিদ্রের দুনা ব্যয়, পান্তা ভাতে লবণের ক্ষয়।"	ব্যয়োঽধনস্য দ্বিগুণো জলান্নে লবণক্ষয়ঃ॥ ৪৬॥
৪৭।	"না বাড়্বে মুড়াব (*) নাতি মরে আগে."	অবর্দ্ধমানবংশস্য নপ্তাগ্রে ম্রিয়তে ধ্রুবং॥ ৪৭॥
৪৮।	"কাণা মাঐ! (+) নমস্কার, বচনেই তুষ্ট।"	কাণমাতৃসখি! নমঃ, তুষ্যামি বচসা তব॥ ৪৮॥
৪৯।	"একেই নাচুনী বুড়ী, আরও নাৎনীর বিয়ে।"	একতে নর্ত্তকী বৃদ্ধা, তত্র নপ্ত্র্যাঃশুভোদ্বহঃ॥ ৪৯॥
৫০।	"কাণা গরুর ভিন্ন পথ।"	কাণগোরপরঃ পন্থাঃ॥ ৫০॥
৫১।	"দুষ্ট গরুর চেয়ে, শূন্য গোয়াল ভাল।"	বরং শূন্যং গোগৃহং দুষ্টগোভ্যঃ॥ ৫১॥

(*) মুড়া—বংশ, পূর্ব্ববঙ্গ।

(+) ভ্রাতা ও ভগিনীর শাশুড়ী—মাঐ। পূর্ব্ববঙ্গ।

৫২।	"দুধ্ দেয় গরুর লাথিও ভাল।"	গোর্দুগ্ধদাত্র্যা বরমাঙ্ঘ্রিপাতঃ ॥৫২॥
৫৩।	"কাটা কাণ্ চুলে ঢাকে।"	ছিন্নঃকর্ণঃ কেশতশ্ছাদনীয়ঃ ॥৫৩॥
৫৪।	"পয়সা দিয়ে কাণা প্যাদা।"	দত্ত্বা ধনং কাণপদাতিকঃ কথং ? ॥৫৪॥
৫৫।	"মনের নাম মহাশয়, যা সহাও তা সয়।"	মনো মহাশয়ো নাম্না, যৎ সহ্যং সহতেতু তৎ ॥ ৫৫ ॥
৫৬।	"উপোসে যেমন তেমন পান্নায় দড়।"	উপবাসে যথৈবাস্তাং পারণায়াং বিচক্ষণঃ ॥ ৫৬ ॥
৫৭।	"চোরের মনে গুদ্‌গুতি সার।"	চৌরহৃদ্ধ্যংকতা সারঃ ॥ ৫৭ ॥
৫৮।	"ঠাকুরঘরে কেরে ? আমিত কলা খাই না।"	কস্ত্বং রে বিষ্ণুসদনে, নাম্নামি কদলান্যহং ॥ ৫৮ ॥
৫৯।	"চিনা বামুনের ফোঁটায় কি কায্।"	জ্ঞাতদ্বিজানাং তিলকেন কোঽর্থঃ ॥ ৫৯ ॥
৬০।	"অনভ্যাস কপালের ফোঁটা চচ্চড়্ করে।"	অনভ্যস্তস্য তিলকং, কপালে চচ্চড়ায়তে ॥ ৬০ ॥
৬১।	"অতি ক্ষুধার্ত্তের ভাত গাছের আগায়।"	অতিক্ষুধার্ত্তস্য নগ্রাগ্রতোঽন্নং ॥ ৬১ ॥
৬২।	"না খায় ধনে পর্ব্বত ছোয়।"	অখাদতঃ স্পৃশতি ধনং মহীধরং ॥ ৬২ ॥
৬৩।	"ছাল নাই কুত্তার বাঘা নাম।"	ব্যাঘ্রেতি নাম্না গতচর্ম্ম কুক্কুরঃ ॥ ৬৩ ॥
৬৪।	"কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন।"	কাণা যস্তপ্যসৌ পুত্রো নামতঃ পদ্মলোচনঃ ॥ ৬৪ ॥
৬৫।	"নাজানে সাপেরে কামড় শিখায়।"	অজ্ঞং সর্পং দংশনং শিক্ষয়ন্তি ॥ ৬৫ ॥
৬৬।	"কাছে থাক যতক্ষণ আমার আমার ততক্ষণ।" "পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ী গেলে ঢন্ ঢন্।"	সমীপে স্থীয়তে যর্হি, তদা মম মমেতি বাক্। পথিগে দূয়তে চেতো গৃহগে ঢনঢনায়তে ॥ ৬৬ ॥

৬৭।	"সমুদ্রের ঢেউ দেখে	দৃষ্ট্বা বীচিং সমুদ্রস্য,
	তড়ে (*) আছাড় খায়।"	তটে আস্ফোটনং গন্তং ॥ ৬৬ ॥
৬৮।	"ঘরে আগুন দিয়া	গৃহে দত্বানলং তত্র-
	উগির (†)তলে পলায় (॥)"	মঞ্চনীচৈঃ পলায়তে ॥ ৬৮ ॥
৬৯।	"পঞ্চম মঙ্গল কার,	পঞ্চমো মঙ্গলঃ কস্য,
	রন্ধ্রগত শনি ?"	কস্য রন্ধ্রগতঃ শনিঃ।
	"কে দিল অনলে হাত,	কেনাগ্নৌ দিয়তে হস্তঃ,
	কে ধরিল ফণী ?।"	কেন বা ধ্রিয়তে ফণী ॥ ৬৯ ॥
৭০।	"মাগ্না দুধে পোলা(॥।)বাঁচে না।"	মার্গিত দুগ্ধে জীবতিনার্ভঃ ॥ ৭০ ॥
৭১।	"অব্রাহ্মণের	অব্রহ্মণানাস্তু প্রায়-
	জাঁকাল ফোঁটা।"	স্তিলকাড়ম্বরো মহান্ ॥ ৭১ ॥
৭২।	"বুধার পিণ্ডী উধার ঘাডে।"	বুধপিণ্ড্যধঘাটায়াং ॥ ৭২ ॥
৭৩।	"চাঁদের গায়ে থুথু দিতে	চন্দ্রগাত্রে মনুনিষ্ঠীবনং যৎ।
	আপন গায়ে পড়ে।"	আত্মগাত্রে ধ্রুবমেব পতেত্তৎ ॥৭৩॥
৭৪।	"ধন্বন্তরির মাথা ব্যাথা।"	ধন্বন্তরেঃ শিরঃপীড়া ॥ ৭৪ ॥
৭৫।	"সাপ শ্যালা জমিদার,	সর্পাঃ শ্যালা ভূপতয়,
	এ তিন নহে আপনার।"	এতে নাত্মীয়কাস্ত্রয়ঃ ॥ ৭৫ ॥
৭৬।	"টাকাব নাও পাহাডে চলে,	ধনেন নৌশ্চলতি মহীধবাগ্রতঃ।
	অনুরোধে ঢেকিও গিলে।"	উদখলং গিলতি পরানুরোধতঃ ॥৭৬॥
৭৭।	"ধান্ ভান্‌তে শিবের গান।"	ধান্যাবঘাতে কিমু শৈবগীতং ॥ ৭৭ ॥
৭৮।	"সাদা মনে কাদা নাই।"	স্বচ্ছে চিত্তে কর্দ্দমো নৈব লগ্নঃ ॥ ৭৮ ॥
৭৯।	"পাপ নাই শরীরে	অপাপে শরীরে
	যমেরে নাই ভয়।"	যমান্নাস্তি ভীতিঃ ॥ ৭৯ ॥

(*) তড়—তট, নদীর পাড়। পূর্ব্ববঙ্গ।

(†) উগির—বংশাদিনির্ম্মিত মঞ্চ, মাচা। পূর্ব্ববঙ্গ।

(॥) পলায়—লুকায়।. পূর্ব্ববঙ্গ।

(॥।) পোলা—ছেলে। পূর্ব্ববঙ্গ।

৮০।	"কাঁথা ভরে হাগ্‌লেও যমে ছাড়ে না।"	কন্থায়াং হদতি ন তং যমো জহাতি ॥ ৮০ ॥
৮১।	"দশের লাঠি, একের বোঝা।"	দশানাং লগুড়া যে স্যুঃ, ভার একস্য তে ধ্রুবং ॥ ৮১ ॥
৮২।	"বোঝার উপরে শাকের আঁটি।"	ভারস্যান্তঃ শাকমুষ্টি- র্নভারঃ ॥ ৮২ ॥
৮৩।	"এক দম্ হাজার উমেদ্।"	একশ্বাসাবকাসেঽপি সহস্রং চেষ্টিতুং ক্ষমঃ ॥ ৮৩ ॥
৮৪।	"কোব্ না দিতেই মাথা নিয়া কাড়াকাড়ি।"	প্রাক্ শস্ত্রপাতাৎ শিরসে করাকরি ॥ ৮৪ ॥
৮৫।	"যম জামাই জমিদার, এ তিন নহে আপনার।"	এতে ত্রয়ো নচাত্মীয়া, জামাতা জ্যাপতির্যমঃ ॥ ৮৫ ॥
৮৬।	"শিখেছ কোথায় ? ঠেকেছি যথায়।"	শিক্ষা ক লব্ধা ? যত্রাস পরাস্তঃ ॥ ৮৬ ॥
৮৭।	"বড়্সি ছেড়ে ছিপে কামড়।"	বড়িশং হিত্বা দণ্ডং গিলতি ॥ ৮৭ ॥
৮৮।	"মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা।"	শিরো নাস্তি শিরো ব্যথা ॥ ৮৮ ॥
৮৯।	"হলুদ্ পোঁদে মেখে রাঁধুনী কবলায়।"	হরিদ্রয়া লিপ্তনিতম্ববস্ত্রা বিজ্ঞাপয়ত্যাস্মি সুরন্ধনীতি ॥ ৮৯ ॥
৯০।	"হলুদ খেলে রাঙ্গা ছেলে হয় না।"	হরিদ্রায়াং খাদিতায়াং গৌরঃ পুত্রো ন জায়তে ॥ ৯০ ॥
৯১।	"আপ্‌নি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।"	নাত্মনঃ শয়িতুং স্থানং, তত্র শঙ্করমাহ্বয়েৎ ॥ ৯১ ॥
৯২।	"কামার বুড় হ'লে লোহা টন্‌ক হয়।"	বৃদ্ধশ্চেৎকর্ম্মকারস্যাৎ, লৌহস্তৎকঠিনায়তে ॥ ৯২ ॥
৯৩।	"খোদার মার দুনিয়ার বাহির।"	ঈশপ্রহারো জগতো বহিশ্চরঃ ॥ ৯৩ ॥
৯৪।	"বাঁশের চেয়ে, কঞ্চি দড়।"	বংশতঃ কঞ্চিকা দৃঢ়া ॥ ৯৪ ॥
৯৫।	"ইঁচড়ে পাকা।"	জাতোঽরুচির নাশায়, পক্বঃ পনস কোরকঃ ॥ ৯৫ ॥
৯৬।	"ভাতে বলে মোরে খা' হাস্থর (*) কে'ড়ে ঘরে যা।"	ভক্তং ব্রবীতি মাং খাদয়, জানু ঘৃষ্ট্বা গৃহং ব্রজ ॥ ৯৬ ॥

(*) হাস্থর কেড়ে—হামাগুড়ি দিয়া। পূর্ব্ববঙ্গ।

৯৭। "কিল না দিতেই বাপ্ রে ?"	মুষ্টি প্রদানাৎ পূর্ব্বম্ভ, বপ্রেত্যাক্রন্দ্যতে কথং ॥ ৯৭ ॥
৯৮। "নরম্ মাটি পেলেই বিড়ালে হাগে।"	ত্যজেন্মলং মৃত্তমৃদি- নিত্যমাখুভুক্ ॥ ৯৮ ॥
৯৯। "সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।"	দক্ষোদক্ষোঽন্যোন্য মাশ্লিষ্যতস্তৌ ॥ ৯৯ ॥
১০০। "ছিড়া চুলে খোপা বাঁধা।"	ছিন্নৈস্তু কেশৈঃ কবরী নিবদ্ধা ॥ ১০০ ॥

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

অলৌকিক ঘটনা।

হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল নামে একটী গ্রাম আছে। সেই গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বাস। হরিপালের "রায় বংশ"ই সমধিক সুপ্রসিদ্ধ। এখন সেই বংশের অনেকেব অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তথাপি "নাম" লোপ হয় নাই।

আজ কয়েক মাস হইল উক্ত রায়বংশের কোন এক পরিবার মধ্যে একটী বিবাহিতা কন্যা, বয়স অনুমান ১৫।১৬ বৎসব, গৃহবিবাদহেতু উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। সেই দুর্ঘটনার পর হইতে ঐ আত্মঘাতিনী কন্যার এক ভ্রাতৃজায়ায় মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি একাকিনী পথে ঘাটে যাইতে পারেন না—এমন কি সময়ে সময়ে গৃহমধ্যেও থাকিতে পারেন না—যেন সর্ব্বদা সম্মুখে সেই মৃতা ননন্দাকে দেখিতে পান। এক দিন তিনি এই কথা আত্মীয়স্বজনের নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন—কিন্তু কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং সেই অবলা কুলবধূ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ভয়ে জীবন্মৃতার ন্যায় কোন গতিকে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পরে এক দিন কোন কার্য্যবশতঃ তিনি ছাদের উপর উঠেন এবং অকস্মাৎ তথা হইতে ভূতলে পতিত হয়েন ও তিন দিবস হতচেতন হইয়া থাকেন। তদবস্থা দেখিয়া তখন আত্মীয়েরা ভূতাবেশ হইয়াছে ভাবিয়া ওঝা দেখাইবার ব্যবস্থা করেন।

ওঝা আসিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিলে সেই হত-চেতনা নিস্পন্দা রমণীর মুখে কথা ফুটিল। রোগী যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে ওঝা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে সেই আত্মহত্যাকারিণী কন্যা সেই বধূর স্কন্ধে চাপিয়াছে। তিনি যথাবিধি মন্ত্রাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। রোগীও অচিরে জ্ঞান লাভ করিয়া সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং বহুলোকের সমাগম দেখিয়া লজ্জায় বদনমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করিয়া তথা হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। তদবধি তাঁহার উপর আর কোন অত্যাচার হয় নাই।

বিশেষ কারণ বশতঃ অনেক কথা অপ্রকাশিত রাখিতে বাধ্য হইলাম।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১২শ ভাগ } ফাল্গুন, ১৩১৫ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

সত্যস্য সত্যম্।

উপনিষদে ব্রহ্মের একটী রহস্য নাম "সত্যস্য সত্যম্।"

তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি। [বৃ ২।১।২০]

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। অন্য সমস্ত অসৎ। ব্রহ্মই পরমার্থ (sole reality)। তাঁহারই সত্তায় জগতের সত্যত্বের ভাণ।* সেই জন্যই তাঁহার নাম "সত্যস্য সত্যম্"। ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন:—

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। [১।১২৪।৪৬]

'সদ্বস্তু এক। তাঁহাকে বহুরূপে বলা হয়।' এই যে বহুত্ব, এই যে নানা—ইহা বাক্য মাত্র। বস্তু এক বই দ্বিতীয় নহে।

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্। [ছা ৬।২।১]

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ [ঐতরেয় ১]

* Empirical reality.

"আদিতে একমাত্র সৎই ছিলেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়"। "আত্মাই অগ্রে ইহা ছিলেন।"

উপনিষদের উপদেশ এই যে সমস্তই ব্রহ্ম।

সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম। [ছা ৩-১৪।১]

তিনি ভিন্ন আর কোন কিছু নাই।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদম্ সর্ব্বমিতি। [ছা ৭।২৫।১]

তিনিই অধে তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাই।

নতু তদ্দ্বিতীয় মাস্তি ততো অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ [বৃ ৪।৩।২৩]

যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎপশ্যেৎ

অন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেৎ অন্যোঽন্যদ্রসয়েৎ

অন্যোঽন্যদ্বদেৎ অন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াৎ

অন্যোঽন্যন্মন্বীত অন্যোঽন্যৎ

স্পৃশেৎ অন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ। [বৃ ৪।৩।৩১]

'তিনি ভিন্ন যখন দ্বিতীয় নাই তখন তাঁহা হইতে ভিন্ন কে কিরূপে দেখিবে।' 'যদি অন্য কিছু থাকিত তবে অপর অপরকে দর্শন করিত, আঘ্রাণ করিত, আস্বাদন করিত, বচন করিত, শ্রবণ করিত, মনন করিত, স্পর্শন করিত, বিজ্ঞান কবিত।'

সেই জন্য শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় নানাত্বের নিষেধ করিয়াছেন।

"নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন"।

এ বচন উপনিষদে বহুবার দেখা যায়।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। [বৃ ৪।৪।১৯]

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। [কঠ ৪।১০]

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ কঠ ৪।১১

মনের দ্বারা ইহা দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য যে এখানে কোন কিছু নানা (বহু) নাই। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

যিনি এখানে তিনিই সেখানে। যিনিই সেখানে তিনিই এখানে। যে এখানে নানা দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

মনের দ্বারা ইহা নিশ্চয় করা উচিত যে এখানে কিছু নানা (বহু) নাই। যে এখানে নানা দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

এই নানাত্ব নিষেধের উদ্দেশ্য কি? জগতে আমরা বিবিধ বৈচিত্র্য, বহুভেদ দেখিতেছি। অথচ শ্রুতি অদ্বৈতের উপদেশ করিয়া দ্বৈতের বারণ করিলেন। উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে শ্রুতি দুইভাবে অদ্বৈতের প্রতিপাদন ও ভেদের বারণ করিয়াছেন। শ্রুতি কোথায়ও কোথায়ও বলিয়াছেন যে এই যে নানা, দ্বৈত, ভেদ,—ইহা মায়া মাত্র, অসৎ, অবস্তু। আবার কোথায়ও কোথায়ও দেখাইয়াছেন যে জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (mode)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রকৃতিকে মায়ামাত্র বলিয়াছেন—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ। [শ্বেত ৪-১০]

অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে "জগত যেন আছে" "দ্বৈত যেন আছে, দ্বিতীয় যেন আছে।" অর্থাৎ দ্বৈত, দ্বিতীয় বাস্তবিক নাই। কেবল তাহার ভাণ হয় মাত্র।*

যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি ইত্যাদি। [বৃ ২।৪।১৪]

যত্রবা অন্যদিবস্যাৎ ইত্যাদি [বৃ ৪।৩।৩১]

অন্যত্র উপনিষৎ জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

ধ্যায়তীব লেলায়তীব, [বৃ ৪।৩।৭]

'জীব যেন ধ্যান করে। যেন ক্রীড়া করে।' এই "ইব" শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। জগত যদি মায়ামাত্র না হইত, তবে শ্রুতি জগতের সম্বন্ধে "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে শ্বেতকেতু ঋষি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

---

* The world exists,' as it were (ইব)।

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং ভবতি অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি। [ছা ৬৷১৷৩]

হে ভগবান্! সেই আদেশ (রহস্য উপদেশ) কি, যদ্দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ এমন কোন্ বস্তু আছে যাহাকে জানিলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না। ঋষি দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বস্তুর উপদেশ করিলেন।

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং। [ছা ৬৷১৷৪]

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচা রম্ভণং বিকারোনামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্। [ছা ৬৷১৷৫]

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচা-রম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি। [ছা ৬৷১৷৬]

হে সোম্য! যেমন একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু জানা যায় কারণ তাহারা মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য, যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময় বস্তু জানা যায় কারণ তাহারা স্বর্ণেরই বিকার, বাক্যের যোজনা. নাম মাত্র, স্বর্ণ ইহাই সত্য, যেমনএকখণ্ড লোহকে জানিলে সমস্ত লোহময় বস্তু জানা যায় কারণ তাহারা লৌহেরই বিকার বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, লৌহই সত্য, হে সোম্য! এ আদেশও সেইরূপ।" অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত মাত্র। ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা মাত্র। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ অসৎ, মিথ্যা। যেমন সুবর্ণ কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি আকার প্রতিভাত হইতেছে কাহারও রূপ কুণ্ডলাকৃতি, কাহারও রূপ বলয়াকৃতি, কাহারও নাম কুণ্ডল, কাহারও নাম বলয়। কিন্তু রসায়নের চক্ষে ইহা কেবল নাম—রূপের ভ্রান্তি। বস্তুতঃ কুণ্ডলও নাই বলয়ও নাই আছে কেবল সুবর্ণ। সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন।

জগতের এই যে বিচিত্র বিষয়ভেদ নদী, পর্ব্বত বৃক্ষ, লতা, পশু মনুষ্য

ইহাদেরও কেবল পরস্পরের নাম রূপের প্রভেদ, বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই। কারণ সকলই ব্রহ্ম। সেইজন্য কৌষিতকী উপনিষৎ জগতের নানাত্ব নিষেধ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন :—

তদ্ যথা রথস্য অরেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতাভূত-মাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ। (কৌষিতকী ৩।৮)

যেমন রথের চক্র অরে অর্পিত থাকে এবং অর নাভিতে অর্পিত থাকে এইরূপ ভূত সমূহ ইন্দ্রিয়ে অর্পিত আছে এবং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে অর্পিত আছে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মানন্দ অজর অমর, ব্রহ্ম।

এইভাবে বৃহদারণ্যক্ উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে আত্মা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব, বেদ, ভূত যাহা কিছু এ সমস্তই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যো অনত্র আত্মনো ব্রহ্মবেদ ক্ষত্রংতং পরাদাৎ যো অন্যত্র আত্মনোক্ষত্রং বেদ * * সর্ব্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মানো সর্ব্বং বেদ। ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রং ইমে লোকাঃ ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদয়ম্ আত্মা। (বৃ ২-৪।৬)

অন্যত্র শ্রুতি সমস্ত জাগতিক পদার্থকে ব্রহ্মেরই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ-
ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদ্
আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ-
সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (বৃ ২।১।২০)

যেমন ঊর্ণনাভি হইতে তন্তু নির্গত হয়, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত বেদ নির্গত হইয়াছে। * সেইজন্য ঐতরেয় উপনিষদ বলিয়াছেন :—

---

* There is no universe outside of the Atman, our self, our soul.

[Deussen, p 167

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতীংষীত্যেতানিমানি চ ক্ষুদ্র মিশ্রাণীব,

বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎপ্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। (ঐতরেয় ৫।৩)

এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি এই সমস্ত দেবতা, এই পঞ্চমহাভূত পৃথিবী বায়ু আকাশ অপ ও জ্যোতিঃ এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ, অণ্ডজ জরায়ুজ, স্বেদজ উদ্ভিজ্জ জীব অশ্ব গো পুরুষ হস্তী যাহা কিছু প্রাণী জঙ্গম পক্ষী স্থাবর সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাই লোকের নেত্র প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

এই জন্যই বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন :—

আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতং।

(বৃ ২।৪।৫)

আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান হইলে সমস্তই বিদিত হয়।

অতএব শ্রুতির উপদেশ এই :—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃ ২।৪।৫)

আত্মার (ব্রহ্মের) দর্শন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে, কারণ সমস্ত পদার্থ যখন তাঁহারই প্রকার বা বিধা তখন তাঁহাকে জানিলে আর কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে। এই বিষয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। (বৃ ২।৪।৭)

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। (বৃ ২।৪।৮)

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। (বৃ ২।৪।৯)

অর্থাৎ যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না

কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়, যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়, যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। ব্রহ্ম ও জগত সম্বন্ধেও এইরূপ।

অর্থাৎ যেমন একই বাদ্য হইতে নানা প্রকার শব্দ উত্থিত হয় সে নানাত্ব ভেদ এক বাদ্যেরই প্রকার বা বিধা মাত্র, সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে জগতের এই নানাত্ব প্রতিভাত হইতেছে। এই নানা তাঁহারই বিধা বা প্রকারভেদ। অতএব তাঁহাকে জানিলে তাঁহার প্রকারও বিজ্ঞাত হয়।

সেই জন্য শৌনক ঋষি অঙ্গিরার নিকট

কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। [মণ্ডুক ১।১।৩]

হে ভগবান কাঁহাকে জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়? এই প্রশ্ন করিলে-অঙ্গিরা তাঁহাকে পরাবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন, যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্ম বস্তুকে জানা যায়।

অথ পরা যয়া তদ্ অক্ষরমধিগম্যতে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়। সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ব্বতন মহর্ষিরা বলিয়াছিলেন যে আজ হইতে আমাদের আর কোন কিছু অশ্রুত, অবিজ্ঞাত রহিল না। এতদ্ধ স্মবৈ তিদ্বদ্বাংস আহুঃ—পূর্ব্বে মহাশালা মহা শ্রোত্রিয়া ন নোহদ্য কশ্চনাশ্রুতমবিজ্ঞাতম্ উদাহরিষ্যতীতি [ছা ৬।৪।৫]

এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে যখন সমস্তই ব্রহ্ম, যখন জগত ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র, যখন সমস্ত জাগতিক পদার্থ ব্রহ্মেরই প্রকারভেদ, তখন ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইলে আর কোন কিছু অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

This is also the meaning of the illustrations in Brih 2. 4. 7. 9. The atman is the musical instrument (Drum, Conch, Lyre)—the phenomena of the universe are its notes ; just as the notes can only be seized, when the instrument is seized, so the world of plurality can only be known when the atman is known. (Deussen p. 76)

আমি ও আমার দেহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বর্লোক। মনোময় কোষ।

ভূর্লোকের পর ভুবর্লোক, তাহার পর স্বর্লোক। স্থূলদেহের মৃত্যু হইলে আমরা যেমন ভুবর্লোকে গমন করি, সেই রূপ ভুবর্লোকে ভোগ শেষ হইয়া যখন আমাদের কামময় দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন আমরা স্বর্লোকে গমন করি। এই স্বর্লোকই সাধারণতঃ স্বর্গ নামে পরিচিত।

অতি সূক্ষ্ম উপাদানে এই লোক নির্ম্মিত। স্বর্লোকের যাহা স্থূলতম ক্ষিতি তাহা ভুবর্লোকের সূক্ষ্মতম পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। ব্যাপার বুঝুন! আধুনিক বিজ্ঞান ইথারের অস্তিত্ব মাত্র কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও এরূপ শক্তিশালী অণুবীক্ষণের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, যাহাতে স্থূলতম ইথারও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। অথচ সূক্ষ্মতম ইথার ভুবর্লোকের স্থূলতম উপাদান অপেক্ষাও স্থূলতর। ইহা হইতেই স্বর্লোকের উপাদান যে কিরূপ সূক্ষ্ম তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। স্থূল ইন্দ্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, অতি সূক্ষ্ম ভুবর্লোকদর্শনক্ষম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও স্বর্গদর্শনের সম্ভাবনা নাই।

মনোময় কোষের সূক্ষ্মতর অংশই স্বর্লোকে বিচরণ করিবার যান, কার্য্য করিবার যন্ত্র। মনোময় কোষের হীনতর ও স্থূলতর অংশ—যাহা দ্বারা ভুবর্লোকে কার্য্য করা যায়—তাহাকে আমরা "কামময় দেহ" নামে অভিহিত করিয়াছি। কারণ উক্ত দেহই আমাদের নিম্ন শ্রেণীর কামনা সমূহের আধার। অতঃপর "মনোময় কোষ" বলিলে আমরা কেবল মনোময় কোষের সূক্ষ্মতর অংশ---যাহা স্বর্লোকের যান—তাহাকেই বুঝিব। এই দেহের সাহায্যে আমাদের যুক্তি বিচারাদি মানসিক ব্যাপার সমূহ সাধিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ উচ্চতর চিন্তাস্রোত এই দেহ অবলম্বন করিয়াই প্রবাহিত হয়।

মানবের আদিম অবস্থায় চিন্তাশক্তি বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, সুতরাং সে সময় এই দেহের বিকাশ অতি অল্পই হয়। একজন অশিক্ষিত বর্ব্বরের

মনোময় কোষ একটা ক্ষুদ্র অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখা যায়, একটু চেষ্টা করিয়া না দেখিলে তাহার অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। সেরূপ দেহের দ্বারা যে কোন কার্য্য হইতে পারে তাহা একেবারেই বোধ হয় না। কিন্তু একজন চিন্তাশীল মনস্বী ব্যক্তির মনোময় কোষের প্রতি দৃষ্টি (অবশ্য স্থূল দৃষ্টি নহে) নিক্ষেপ কর, দেখিবে তাহা কেমন সুগঠিত, কিরূপ সুন্দর, কত মনোহর বর্ণে রঞ্জিত, কত কার্য্যশীল,—তাহার অবিরাম স্পন্দনের মধ্য দিয়া জীবনস্রোত যেন উথলিয়া পড়িতেছে।

এক জন্মের পর আর এক জন্ম চলিয়া যায়, কিন্তু তন্নিবন্ধন স্থূলদেহের বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমার স্থূলদেহের যেরূপ আয়তন ছিল, আমার এই জন্মের দেহের আয়তন তদপেক্ষা বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই, হয়ত আমি তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কলেবর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর কোন নূতন অঙ্গেরও অভিব্যক্তি হয় নাই। তখনও আমার যেমন দুই হাত, দুই পা, দুই চক্ষু ছিল, এখনও আমার সেই রূপ দুই হাত, দুই পা, দুই চক্ষু আছে। কামময় দেহ সম্বন্ধেও এই কথা কতকটা খাটে,—জন্মান্তরের সহিত তাহার আয়তনের বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। বস্তুতঃ কামময় দেহ স্থূলদেহের অনুরূপই হইয়া থাকে। তবে ক্রমোন্নতির সহিত তাহা ক্রমশঃই অধিকতর জটিল, সুগঠিত ও কার্য্যক্ষম হয়। কিন্তু গঠনের জটিলতার বৃদ্ধি হইলেও আয়তনের বৃদ্ধি হয় না।

কিন্তু এ বিষয়ে মনোময় কোষের একটু বিশেষত্ব আছে। যেমন জন্মের পর জন্ম যাইতে থাকে এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, ইহার আয়তন তদনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কামময়দেহের ন্যায় ইহার গঠনও জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে। কিন্তু কামময় দেহের ন্যায় ইহার আকার স্থূলদেহের আকারের অনুরূপ হয় না। ইহা অণ্ডের ন্যায় গোলাকার এবং ইহা ভিতর দিকে স্থূল ও কামময় দেহের সহিত জড়িত থাকিয়া বাহিরে উক্ত উভয় দেহকে সমুজ্জ্বল ছটার ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া থাকে। মানসিক শক্তির বৃদ্ধির সহিত এই ছটার বিস্তৃতি ও উজ্জ্বলতা সমধিক বৃদ্ধি পায়।

উপরেই বলিয়াছি স্থূল বা কামময় দেহের ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে স্বর্লোক দৃষ্টিগোচর করা যায় না। তজ্জন্য 'মানস ইন্দ্রিয়' সমূহের বিকাশ আবশ্যক। "মানস ইন্দ্রিয় সমূহ" বলিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক মনের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করা ভুল, একবচনই প্রয়োগ করা উচিত। মনোময় দেহের পাঁচটা ইন্দ্রিয় নাই, এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাহার সকল জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা আবশ্যক। মনে করুন আপনার সম্মুখে একটী কমলা লেবু রহিয়াছে। এই কমলা লেবু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আপনাকে নানা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে হয়। আপনি চক্ষু দ্বারা ইহার রূপ ও আকার দেখেন, নাসিকা দ্বারা ইহার, আঘ্রাণ লয়েন, জিহ্বা দ্বারা ইহার আস্বাদ গ্রহণ করেন, স্পর্শ দ্বারা ইহার আকার ও গঠন নির্দ্ধারিত করেন। এইরূপে এক একটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর এক এক অংশের মাত্র জ্ঞান লাভ হয় এবং সেই খণ্ড খণ্ড জ্ঞানগুলি একত্র করিলে তবে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু 'মানস ইন্দ্রিয়' এরূপ একদেশদর্শী নহে, সে একেবারে সমস্ত বস্তুটাকে যেন 'আঁকড়াইয়া' ধরে, তাহার রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সমস্ত একসঙ্গে আহরণ করিয়া লয়।

কোন বস্তু নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমরা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহলোকে শব্দই মনের ভাব প্রকাশ করিবার প্রধান উপায়। আমাদের ভাষা শব্দসমষ্টি মাত্র। কিন্তু কেবল শব্দের দ্বারা বস্তুর যে জ্ঞান হয় তাহা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। একটা দৃষ্টান্ত দি। আজকাল আমরা অনেকেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। 'চেরী' যে একটা ফলের নাম তাহা অনেকেই জানি, কিন্তু যদি কখন "চেরী" না দেখিয়া, ছুঁইয়া বা খাইয়া থাকি তাহা হইলে "চেরী" সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান একরূপ কিছুই নয় বলিতে হইবে। সুতরাং ইহজগতের ভাষার সাহায্যে যে জ্ঞান জন্মে তাহা যে বড়ই অসম্পূর্ণ তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। মানস-জগতের ভাষা কিন্তু এরূপ শব্দসমষ্টি মাত্র নয়; সেখানে একটী মন আর একটী মনের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে কেবল শব্দের সাহায্য গ্রহণ করে না। পরন্তু সেখানকার ভাষা চিত্রময়ী। সেখানে মনোময় কোষের প্রত্যেক স্পন্দন চিত্ররূপে প্রতিফলিত হয়, প্রত্যেক চিন্তা

আকার ধরিয়া আবির্ভূত হয়। এই ছবিগুলির দ্বারাই সেখানে ভাবের বিনিময় হয়। এরূপ চিত্রময়ী ভাষা যে আমাদের শব্দময়ী ভাষা অপেক্ষা কত অধিকতর সম্পূর্ণ তাহা বোধ হয় আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। ভাষার অসম্পূর্ণতা বশতঃই এখানকার শিক্ষকদিগকে শিক্ষা-প্রদানকালে চিত্র প্রদর্শনাদি নানা সহকারী উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু স্বর্লোকের শিক্ষকদিগের এরূপ কর্ম্মভোগের প্রয়োজন নাই, গুরুর জ্ঞান শিষ্যহৃদয়ে সহজেই প্রতিফলিত হয়।

মনোময় কোষে প্রতিবিম্বিত আত্মার নামই মন। সাধারণতঃ এই মনকেই আমরা আত্মা বলিয়া মনে করি, এতদপেক্ষা উচ্চতর আত্মার সহিত আমাদের অধিকাংশেরই পরিচয় নাই। মনোময় কোষে তরঙ্গ উঠিতেছে, আমি বলি "আমি" ভাবিতেছি, ইহার বাহিরে আর কোন "আমি" আছে কি না জানি না। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান—যাহা আমরা বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া থাকি তাহাতে এই "আমি"র কথাই লেখা আছে। বাস্তবিক এই "আমি"র অভিব্যক্তিই বর্ত্তমান মানবজাতির প্রধান কার্য্য। স্থূলদেহের "আমি" বহুপূর্ব্বেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুসভ্য মানবসমাজে কামময় দেহস্থ "আমি"ও বিকশিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তাঁহারা এই মনোময় কোষের "আমি"র অভিব্যক্তি সাধনে নিযুক্ত। অবশ্য অনেক মহাত্মা এই সোপানও উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর "আমি"র সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা সমগ্র মানবসমাজের তুলনায় অতি অল্প। অতএব মোটের উপর বর্ত্তমানকালকে মানসিক অভ্যুন্নতির কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

আধার স্বচ্ছ না হইলে তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং মনোময় কোষে প্রতিবিম্বিত "আমি"র সম্যক বিকাশ করিতে হইলে উক্ত দেহের সংস্কার সাধন অপরিহার্য্য। কি উপায়ে এই সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে এক্ষণে আমরা তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যেরূপ অন্নের দ্বারা অন্নময় কোষ ও কামনা দ্বারা কামময় দেহ পুষ্ট হয়, সেই রূপ চিন্তা দ্বারা মনোময় কোষ বর্দ্ধিত হয়। চিন্তাই মনের খাদ্য, চিন্তা দ্বারাই মনোময় কোষ গঠিত। আমরা যে পরিমাণে চিন্তাশীল হই সেই পরিমাণে আমাদের মনোময় কোষ পুষ্টিলাভ করে। যেমন ব্যায়ামের দ্বারা

মাংসপেশীগণ দৃঢ় ও সবল হয়, সেইরূপ অনুশীলনের দ্বারা মানসিক বৃত্তিসমূহ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। আমরা কলা বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে যতই চিন্তা করিতে থাকি ততই আমাদের মনোময় কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। যাঁহার এই রূপ চিন্তা করা অভ্যাস আছে, দেখিবে প্রতি বৎসরই তাঁহার মনোময় কোষের আয়তন কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে। কিন্তু এই চিন্তা স্বাধীন হওয়া আবশ্যক, নতুবা কেবল পরের চিন্তার আধার হইয়া থাকিলে মনোময় কোষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের বিশেষ আশা নাই। অপরের মাংসপেশী আনিয়া নিজ মাংসপেশীতে বাঁধিয়া দিলে যেমন তাহার বলবৃদ্ধি হয় না, সেই রূপ কেবল অপরের চিন্তার বোঝা চাপাইয়া মনোময় কোষের উন্নতির প্রত্যাশা করা বৃথা। জড় পুস্তকালয় লক্ষ গ্রন্থের ভাণ্ডার হইলেও তাহার ভিতর কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানের বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। পিতলের উপর সহস্র বার গিল্টি করিলেও তাহা সুবর্ণে পরিণত হয় না। পরমুখাপেক্ষী জড়তায় উন্নতির প্রতিষ্ঠা হয় না—উন্নতির ভিত্তি আত্ম চেষ্টায়। যদি আত্মবিকাশ করিতে চাহ, তাহা হইলে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা কর। যিনি স্বাধীন চিন্তা না করেন, তাঁহার জন্মের পর জন্ম কাটিয়া যায় তথাপি মনোময় কোষের আয়তন একটুও বৃদ্ধি পায় না।

আপনার হয় ত মনে হইবে, কেন আমিত দিবারাত্র চিন্তা করিতেছি, ইহাতেও কি আমার মনোময় কোষের উন্নতি সাধন হইতেছে না? এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সে গুলি কি যথার্থই আপনার নিজস্ব চিন্তা? অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখিতে পাই যে চিন্তাগুলিকে আমরা নিজের চিন্তা বলিয়া মনে করি তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক নিজস্ব মৌলিক চিন্তা অতি অল্পই থাকে, প্রায় সকলই পরস্ব। একটু স্থির হইয়া আত্ম প্রশ্ন করিয়া দেখিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। অনেক সময় দেখিবেন বস্তুতঃ আপনি কোন বিষয়েই চিন্তা করিতেছেন না, বা যে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন তাহার একটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আপনি দিতে পারেন না। আবার কখন কখন দেখিবেন আপনার মনের ভিতর দিয়া নানা বিষয়ক চিন্তা-স্রোত বহিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সে চিন্তাগুলা কোথা হইতে কেমন করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সে সময়ে মনের অবস্থা অনেকটা অতিথি-

শালার অনুরূপ হইয়া উঠে,—বাহির হইতে নানা জাতীয় অপরিচিত পান্থ আসিয়া প্রবেশ করিতেছে আর অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াই পুনরায় বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, কাহারও সহিত পরিচয় পর্য্যন্ত করিবার অবসর হইতেছে না। বলা বাহুল্য এই অপরিচিত আগন্তুক চিন্তাগুলির কোনটাই আপনার নিজের চিন্তা নহে, পরের চিন্তা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে আপনার মনের দ্বার খোলা পাইয়া কোন রূপে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, আবার যদৃচ্ছাক্রমে বাহির হইয়া যাইবে, আপনি যে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখেন সে সাধ্যও হয়ত আপনার নাই।

এই সকল পরস্ব চিন্তা দ্বারা যে মনোময় কোষের কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এইরূপ আত্ম প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলে যে উন্নতির প্রথম সোপানে পদার্পণ করা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ মনের ভিতর দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলে বাহিরের চিন্তাগুলি এরূপ ভাবে সকল সময় লুকাইয়া অজ্ঞাতসারে যাতায়াত করিতে পারিবে না। দুই একটা ধরা পড়িবেই। পর ধরা পড়িলেই আপন হয়। যাহা আত্মসাৎ করা যায় তাহা আর পরের থাকে না। পরের মাংস পরিপাক করিতে পারিলে তাহা নিজের মাংসই হইয়া দাঁড়ায়। যদি পরের চিন্তা পরিপাক করিতে পার, তাহা হইলে তাহা তোমার নিজেরই চিন্তা হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু খাদ্য পরিপাক করিতে হইলে তাহাতে যেরূপ আত্মদেহ নিঃসৃত রস সংযুক্ত করা প্রয়োজন হয়, পরস্ব চিন্তা নিজস্ব করিতে হইলে সেইরূপ তাহাতে নিজের চিন্তা মিশাইয়া লইতে হয়।

মোটামুটী নিম্নলিখিত উপায়ে মনোময় কোষের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। প্রথমেই যে চিন্তাগুলি মনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে সে গুলির দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে, দেখিতে হইবে কি মূর্ত্তিতে তাহারা প্রবেশ করিতেছে আর কি মূর্ত্তিতে তাহারা বাহির হইতেছে, বাহির হইবার সময় তাহাতে আমি নিজস্ব কিছু যোগ করিতে পারিয়াছি কি না। যদি কিছু যোগ না করিয়া থাকি তাহা হইলে ভাবিয়া দেখিতে হইবে কিছু যোগ করিতে পারি কি না। প্রথমে হয়ত বিশেষ ফল লাভ হইবে না কিন্তু এই রূপে ভাবিতে ভাবিতে চিন্তা শক্তির স্ফূরণ হইবে, মনের জড়তা ঘুচিয়া যাইবে,

এবং তাহার স্বভাবতঃ যে অপূর্ব্ব সৃষ্টিকারিকা শক্তি আছে তাহা স্বতই ফুটিয়া উঠিবে। এই অখিল বিশ্ব বিশ্বেশ্বরের মন হইতে সৃষ্ট, মানবের মন সেই বিরাট মনেরই অংশ, সুতরাং প্রত্যেক মানবমনে সৃষ্টিকরণের ক্ষমতা বীজরূপে বর্ত্তমান আছে, একটু চেষ্টা, একটু সাধনা করিলেই তাহা ফুটিয়া উঠে। তখন মানব কোথাও বা কবি, কোথাও বা দার্শনিক, কোথাও বা বৈজ্ঞানিক আবার কোথাও বা শিল্পী মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া দেখাইয়া দেয় যে সৃষ্টিকর্ত্তার উত্তরাধিকারিত্বে তাহার দাবী একেবারে অগ্রাহ্য করিবার যো নাই।

কিন্তু এক বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। যে চিন্তাই আসুক বিনা বিচারে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। যেমন খাদ্য মাত্রেই দেহের উপকারী নয়, সেইরূপ চিন্তামাত্রেই মনোময় কোষের হিতকারী নয়। সুখাদ্য শরীরের পুষ্টিসাধন করে কিন্তু কুখাদ্য তাহাকে বিনাশের পথে লইয়া যায়। সেইরূপ সুচিন্তা মনোময় কোষকে উন্নত করে বটে, কিন্তু কুচিন্তার তাহার অবনতি সাধিত হয়। সুতরাং মনোমধ্যে কোন চিন্তা প্রবেশ লাভ করিলেই বিবেচনা করিয়া দেখুন তাহা "সু" কি "কু", যদি "সু" হয় তাহা হইলে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করুন, সে বিষয়ে যতদূর পারেন আলোচনা করুন, তাহাতে আপনি নিজে কিছু যোগ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন এবং এইরূপে তাহাকে যথাসম্ভব পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া পরের উপকারার্থে জগতে ছাড়িয়া দিন। আর যদি "কু" হয়, তাহা হইলে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিন। এইরূপে আপনি যদি স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া ক্রমাগত কেবল সুচিন্তাগুলিকেই আদর করিয়া মনে স্থান দেন, আর কুচিন্তাগুলিকে সেখানে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে দিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে কয়েক দিন পরে এক আশ্চর্য্য ফল দেখা যাইবে। দেখিবেন যে আগন্তুক চিন্তাগুলির মধ্যে সুচিন্তার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে আর কুচিন্তার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। শেষে মনোময় কোষ এমন এক সুন্দর 'চুম্বকে' পরিণত হইবে যে তাহা দ্বারা কেবল সুচিন্তাই আকৃষ্ট হইবে আর কুচিন্তা মাত্রেই আপনা হইতে প্রতিহত হইয়া দূরে সরিয়া যাইবে। তখন আর আপনাকে চেষ্টা করিয়া কুচিন্তা তাড়াইতে হইবে না,—বিনায়াসে মনোময় কোষের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

এইরূপ হইবার কারণ, আমরা 'অভ্যাস' সম্বন্ধে গত বারে যাহা বলিয়াছি তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। প্রত্যহ আমাদের স্থূলদেহ হইতে রাশি রাশি কণা ঝরিয়া পড়িতেছে, আর আমরা খাদ্য রূপ নূতন উপাদান দ্বারা তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছি, এই কথা আমরা স্থূলদেহগঠনপ্রণালী বর্ণনা কালে উল্লেখ করিয়াছি। মনোময় কোষ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। ইহারও পুরাতন উপাদানগুলি ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে আর আমরা নূতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছি। যে চিন্তাগুলিকে আমরা প্রত্যহ মনের মধ্যে স্থান দি, সেই গুলিই এই নূতন উপাদান। সুতরাং তাহাদের প্রকৃতির উপর আমাদের ভবিষ্যৎ মনোময় কোষের প্রকৃতি নির্ভর করিতেছে। তাপ, আলোক, তড়িত প্রভৃতির ন্যায় চিন্তাও একপ্রকার স্পন্দন; তবে তাপাদি ইথারের স্পন্দন, আর চিন্তা স্বর্লোকের সূক্ষ্ম উপাদানের স্পন্দন, এইমাত্র প্রভেদ। আমাদের মনোময় কোষও এই সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত, সুতরাং আমাদের মনোময় কোষে কোন চিন্তা প্রবেশ লাভ করিলে তাহাতে সেই চিন্তার অনুরূপ স্পন্দন উৎপন্ন হয়। এখন আমরা যদি কেবল এক ভাবে স্পন্দিত চিন্তাকেই মনে স্থান দান করি, তাহা হইলে মনোময় কোষ কেবল সেই ভাবেই স্পন্দিত হইতে থাকে, অথবা দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে,—মন তদাকারে আকারিত হয়। এইরূপে মনের ভিতর একটা প্রবল একতান প্রবাহ বা 'একটানা স্রোতে'র সৃষ্টি হয়, তখন কোন বিপরীতাভিমুখী স্রোত তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে চেষ্টা করিলে তাহা স্বতই প্রতিহত হয়। অর্থাৎ আমার যে ভাবের চিন্তা করা অভ্যাস কেবল সেইগুলিই আমার মনের ভিতর ঢুকিতে পায়, অন্যগুলি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। প্রথমে মনের স্রোত অন্যাভিমুখী থাকে বলিয়াই প্রথম সাধনা কষ্টকর হয়, কিন্তু সাধনামার্গে যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই তাহা সুগম হইয়া আসে, কারণ স্রোত ক্রমেই অনুকূল দিকে ফিরিয়া আসে।

মনোময় কোষের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে মনের একাগ্রতা সম্পাদন করা বিশেষ প্রয়োজন। যোগদর্শনকার ভগবান পতঞ্জলি বলেন, মূঢ় ও

ক্ষিপ্ত মনে যোগসাধন অসম্ভব। মূঢ়তা শব্দের অর্থ জড়তা, ও ক্ষিপ্ততা শব্দে মনের চাঞ্চল্য বুঝায়। প্রথমটী তমোগুণের প্রাবল্য ও দ্বিতীয়টী রজোগুণের প্রাবল্য বশতঃ ঘটিয়া থাকে। মনের এ উভয় অবস্থাই দোষের,—কারণ উভয় অবস্থাই উন্নতির অন্তরায়। উন্নতিকামী ব্যক্তিগণের এ উভয় দোষই পরিহার করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহাদের মনের জড়ত্ব অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের মন এতই চঞ্চল যে এক মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিতে পারে না, অনবরত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিতেছে, ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য! এরূপ ক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটী করিলে যে মানসিক শক্তির বৃথা অপব্যয় হয় সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে এ অপব্যয় নিবারণ আবশ্যক। তাই পতঞ্জলি বলেন, চিত্ত একাগ্র না হইলে সাধক প্রকৃত যোগের অধিকারী হন না। পক্ষান্তরে যিনি তাঁহার মনের সমস্ত শক্তি একাভিমুখ করিয়া কোন বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারেন, তাঁহার উন্নতি কেহই রোধ করিতে পারে না। জগতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই মানসিক একাগ্রতার জন্য বিখ্যাত। শুনা যায় নিউটন সময়ে সময়ে এরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িতেন যে আহার পর্য্যন্ত করিতে বিস্মৃত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিৎ আর্কিমিডিসের কথা স্মরণ করুন। চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল, শত্রুরা কেবল নগর ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অপিচ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য অসি উত্তোলন করিয়াছে, কিন্তু তখনও যোগিবর নিশ্চল, নিস্পন্দ, ধ্যানমগ্ন,—গণিতের কঠিন প্রশ্ন সমাধানে নিযুক্ত। অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষাদানকালে অর্জ্জুন ভিন্ন দ্রোণের অন্যান্য শিষ্যগণ লক্ষ্য পক্ষিমুণ্ড ব্যতীত আরও কত কি দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন কেবল সেই পক্ষিমুণ্ডই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এরূপ একাগ্রসাধক ছিলেন বলিয়াই অর্জ্জুন জগতের ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক মনোময় কোষকে উচ্চসাধনোপযোগী যন্ত্রে পরিণত করিতে হইলে এরূপ একাগ্রতাই প্রয়োজন।

কিন্তু উপায় কি? এই দুর্নিবার চঞ্চল মনকে একাগ্র করিবার উপায় কি? পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি—আবার বলি—উপায় 'অভ্যাস'। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করা যায়। আমরা গত বারে এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। পাতঞ্জলদর্শনেও এ কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যান্ তন্নিরোধঃ।"—১।১২ সূত্র।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যাইতে পারে।

চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে বিষয়ান্তর হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া কোন এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হইবে এবং কার্য্য একেবারে সম্পাদন করা দুরূহ বলিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই উপরি উক্ত সূত্রের মর্ম্মার্থ।

কোন একটী বিষয় লইয়া তাহাতে চিত্ত সংযোগ করিতে চেষ্টা করুন। প্রথমে দেখিবেন তাহা কত কঠিন ব্যাপার। একাদিক্রমে দুই মিনিট কাল মনকে ধরিয়া রাখা যাইতেছে না, সে ছুটিয়া অন্য দিকে যাইতেছে। যাহা হউক, হতাশ হইবেন না। মন পলাইলে তৎক্ষণাৎ আবার তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সেই বিষয়ে নিয়োজিত করুন। এইরূপ কিছুদিন করিতে করিতে দেখিবেন, আপনার নির্ব্বাচিত বিষয়ে মনের অবিরাম স্থিতির কাল ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। মনের এই অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ, কারণ বুঝিতে হইবে আপনার মনে ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইতেছে। ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের উদ্রেক বশতঃ আপনার চিত্ত কখন স্থির, কখন অস্থির হইবে। এইরূপ চিত্তকে পতঞ্জলি "বিক্ষিপ্ত চিত্ত" নাম দিয়াছেন। চিত্তের এই অবস্থা যোগ সাধনার প্রথম সোপান। একাগ্রতা দ্বিতীয় সোপান।

কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনকালে একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। অবশ্য যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে 'আদর্শের' উচ্চতার উপর উন্নতির চরমসীমা নির্ভর করে।

"Who aimeth at the sky
Shoots higher much than he that means a tree."

যিনি শরত্যাগকালে আকাশ লক্ষ্য করেন তাঁহার শর বৃক্ষলক্ষ্যকারীর শর অপেক্ষা উর্দ্ধতর স্থানে গমন করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের আদর্শের দ্বারাই আমাদের উন্নতির সীমাবদ্ধ হয়—তাহার বাহিরে আমরা যাইতে পারি না—আমাদের আদর্শ যত ক্ষুদ্র হইবে আমাদের উন্নতির পথও তত সঙ্কীর্ণ হইবে। যিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাকে এই আদর্শরূপ 'গণ্ডীর' সীমা বাড়াইতে হইবে। প্রিয়ার মুখমণ্ডল বা বজতচক্রের মনোহর রূপ ধ্যান করিলে যে কিঞ্চিৎ ফললাভ না হয় তাহা নহে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই শেষ। সাধনা করিয়া এরূপ অকিঞ্চিৎকর ফললাভের যিনি চেষ্টা করেন তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। বিল্বমঙ্গলকে তাহার রক্ষিতা বেশ্যা বলিয়াছিল, "তুমি সামান্য আমাকে দেখিবার জন্ম যে অসাধ্য সাধনা করিয়াছ, যে অমানুষিক চেষ্টা করিয়াছ, তাহা যদি ভগবানের দিকে ফিরাইতে তাহা হইলে এতদিনে তিনি তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।" বিল্বমঙ্গল লম্পট হইলেও বুদ্ধিমান ছিল, তাই এই সামান্য এক কথায় তাহার সমস্ত জীবনের স্রোত ফিরিয়া গিয়াছিল, ফলে পশু দেবতায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ বুদ্ধিমানের সংখ্যা অধিক নহে। আমাদের মধ্যে যিনি বড় ভাগ্যবান, তাঁহারই সময় থাকিতে এরূপ বুদ্ধির উদয় হইতে দেখা যায়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোপি মাম্॥" ৯।২৫

"যাঁহারা দেবগণের আরাধনা করেন, তাঁহারা দেবলোক প্রাপ্ত হন; যাঁহারা পিতৃগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন; যাঁহারা ভূতগণের আরাধনা করেন, তাঁহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হন; আর যাঁহারা আমার আরাধনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন।"

বড়কে আরাধনা করিলে যখন বড়কে পাওয়া যায়, তখন ছোটকে আরাধনা করিয়া বৃথা শ্রম ও সময় অপব্যয় করার প্রয়োজন কি? অপিচ বড়কে পাইলে ছোট আপনা হইতেই আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে। তবে বড়কে একেবারে ধারণা করা সহজসাধ্য নহে। তাই ভাগবত বলেন,

"তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।" ২।১।১৯

ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের মূর্ত্তির এক এক অবয়ব চিন্তা করিয়া দৃঢ়তা সহকারে সমস্ত মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির করিতে হইবে।

ইহাই যোগসাধনার প্রকৃষ্ট পন্থা।

ক্রমশঃ।

শ্রীমন্মথ মোহন বসু।

মরণ ও মরণান্তে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীবদ্দশায় লোক সপ্তরূপবিশিষ্ট থাকে। মরণকালে ভাণ্ড ও পিণ্ডদেহ পরিত্যাগ করাতে তাহার অব্যবহিত পরে মানব পঞ্চরূপবিশিষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পিণ্ডদেহ প্রাণের বাহন। দেহত্যাগে প্রাণের সেই বাহন নষ্ট হওয়াতে দেহস্থ প্রাণ তাহার উৎপত্তি স্থান সেই মহাপ্রাণে গিয়া মিশে। সূর্য্যমণ্ডলই সেই মহাপ্রাণের আধার। ইহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি প্রাণের আকর। যদি একটী বোতল জলপূর্ণ করিয়া তাহা সরোবরে লইয়া জলমগ্ন করা মাত্রই ভগ্ন হইয়া যায়, তবে তদ্‌স্থিত জল যেমন সরোবরস্থ জলরাশির মধ্যে মিশিয়া এক হইয়া যায়, আর পৃথক সত্বা থাকেনা, ঠিক সেইরূপ দেহ নাশ হইলে তদ্‌স্থিত প্রাণ সেই মহাপ্রাণে মিশিয়া অভিন্ন হইয়া যায়। তাই কেবল মরণের অব্যবহিত পরেই পঞ্চরূপ বর্ত্তমান্ থাকে। কিছুকাল পরে প্রাণের প্রয়াণে চারিরূপ অবশিষ্ট থাকে। প্রাণের প্রয়াণে মানব কামরূপ গ্রহণ করে। এই দেহ কামলোকের উপাদানে গঠিত। স্থূলদেহ ধারণ করা কালে অনুভব, অনুরক্তি, বিরক্তি, সুখ দুঃখাদি উপভোগ প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া এই কামরূপ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন পাত্রস্থ তরল পদার্থ যেরূপ সেই পাত্রের আকার ধারণ করে এবং ইহা যেরূপ সহজে বিচলিত ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, কামদেহও সেইরূপ সহজেই বাহ্যরূপ রসাদি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বা মানসিক বৃত্তিসমূহের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া

অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এইজন্য কামলৌকিক উপাদানকে সময় সময় তরল রসাত্মক পদার্থ বলা হয়। এই কামদেহে অবিনশ্বর রূপত্রয়বিশিষ্ট জীব বিরাজমান থাকে। মরণের পর কামদেহ সবিশেষ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন প্রকার ঘনত্ববিশিষ্ট নানারূপ কামলৌকিক উপাদানে এই দেহ নির্ম্মিত। মরণের পর এই উপাদানগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া বহুবিধ কোষ বা আবরণ রূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে যেগুলি লঘু তাহারা মধ্যে থাকে এবং যেগুলি অপেক্ষাকৃত গুরু ও কঠিন তাহারা বহির্ভাগে থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুটী সমস্তের বাহিরে থাকে ; তদ্দ্বারা ভিতরকার সংজ্ঞা বাহিরের চিন্তাদির সংস্পর্শে বড় আসিতে পারে না, আবদ্ধ থাকে। যদি কোনরূপ বাধা বিঘ্ন না পায় তবে সংজ্ঞা অন্তর্ম্মুখী হইয়া পরবর্ত্তী উন্নতিসোপানে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কামদেহের কোষসমূহ ক্রমশঃ একটীর পর আর একটী বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে।

কামদেহের উপাদানগুলি কথিতরূপে সজ্জিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত সকলের অবস্থা প্রায় একরূপই থাকে অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত স্বপ্নবৎ, প্রশান্ত অর্দ্ধ চৈতন্যাবস্থা। যাহারা উন্নত ও পুণ্যাত্মা, তাহারা এই অবস্থা হইতে সম্যক জাগ্রত না হইয়াই শান্তিপূর্ণ ও সুখময় স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এক জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণের মধ্যে এই নিরবচ্ছিন্ন সুখের অবস্থায় লোক অনুপম শান্তি উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত শান্তিনিকেতন। এই স্থানে নর নারীর পাপ পুণ্য ভেদে অবস্থান ও সুখের পরিমাণের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধ, এই সকলের বিবৃত বিবরণের স্থল নহে। দেহ ত্যাগের পর স্বর্গ গমনের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কামলোকে সাধারণ মানব কিরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নত ও অগ্রসর হইতে থাকে, এখন তাহারই কথঞ্চিত আলোচনা করা যাইবে।

যিনি পবিত্রাত্মা, যিনি উন্নতজীবনলাভে সতত প্রয়াসী, তাঁহার কামভাব নিস্তেজ হইয়া যায় ; কাজেই মরণের পর তাঁহার কামলোকে অবস্থিতি কাল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তথায় তাঁহার অবিনশ্বর রূপত্রয় আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। তিনি যে জীবন এইমাত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তাহার ঘটনাবলি, স্নেহমমতা, আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ সমস্তই একে একে তাঁহার

স্মৃতিপথারূঢ় হয়। এইরূপ করিতে করিতে তিনি কামলোক পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় অমরাবতীতে চলিয়া যান। স্বর্গধাম, সুখাবতী, দেবস্থান, দেবলোক ইত্যাদি নানা নামে ইহা অভিহিত।

কামলোক কি? প্রকৃত পক্ষে ইহা কি রূপক? না, একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষ? তদুত্তরে মাডাম্ ব্লেভেট্স্কী বলেন, "আমরা সাধারণতঃ দেশ, রাজ্য বা স্থান অর্থে যাহা বুঝি, কামলোক সেরূপ কোন দেশ, রাজ্য বা স্থান নহে। পাশ্চাত্য দেশবাসী প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে হাদিস্ (Hades), কেহ কেহ লিম্বাস্ (Limbus) বলিয়াছেন। আধুনিক খ্রীষ্টানগণ ইহাকে হেল্ (Hell) বলেন। হিন্দুদের মতে ইহা ভুবর্লোক, বা যমলোক। নরক ও অবীচি নামেও ইহা অভিহিত। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে স্থান বিশেষ বলা চলে না। যদি বলিতে হয়, তবে ভুবর্লৌকিক সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত স্থান বিশেষ বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা নির্দ্দিষ্ট চতুঃসীমা নাই। ইহা সূক্ষ্মাকাশে বিরাজমান আছে, কাজেই আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে।

কামলোক যে বিদ্যমান আছে, ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায়। ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। মরণের পর মনুষ্য ও প্রাণী রাজ্যস্থ যাবতীয় জীব কামদেহ ধারণ করিয়া দ্বিতীয় মৃত্যুর অপেক্ষায় কামলোকে অবস্থান করে। ইহলোকে প্রথম মৃত্যু ও কামলোকে দ্বিতীয় মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় মৃত্যু ঘটিলে, প্রাণীদের কামদেহ বিশ্লিষ্ট হইয়া উপাদানগুলি একেবারে লোপ পায়। কিন্তু মানুষের দ্বিতীয় মরণ ঘটিলে তাহার অবিনশ্বর রূপত্রয় বিনশ্বর রূপসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া যায় ;- তখন প্রথম মরণের ন্যায় ইহাতেও আতঙ্ক এবং সংজ্ঞা লোপ পায় ; পরিশেষে সুখময় স্বর্গধামে গমন করিয়া সুস্পষ্ট সংজ্ঞালাভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তি ভোগ করিতে থাকে।"

কামলোক ভূর্লোকের সঙ্গে সবিশেষ সংসৃষ্ট। উল্লিখিত দ্বিতীয় মৃত্যু কামলোক হইতে মানবের স্বর্গগমনের দ্বার স্বরূপ। সুগভীর স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ আরাম ও শান্তি উপভোগ করা যায়, ঠিক্ সেইভাবে আপামর সাধারণ দ্বিতীয় মৃত্যু উপলক্ষে কামলোক হইতে স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়া থাকে ; এবং

কোনরূপ উৎপাত, বাধা বিঘ্ন দ্বারা শান্তিভঙ্গ না হইলে স্বর্গরাজ্যে উপস্থিতি হইয়া বিমল আনন্দানুভব করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সম্যক্ সংজ্ঞালাভ করিতে পারে না। কিন্তু অত্যল্প সময়ই হউক বা সুদীর্ঘ কালই হউক, দুই চার দিনই হউক বা সহস্রাধিক বৎসর কালই হউক, যতদিন মানব কামলোকে থাকে এবং যতদিন তাহার অবিনশ্বর রূপত্রয় কামের সঙ্গে জড়ীভূত থাকে, ততদিন তাহার এই পার্থিব জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। এইরূপে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীস্থ আত্মীয় কুটুম্বের সংসর্গে আসিতে তাহারা খুব আগ্রহ প্রকাশ করে; কারণ তাহাদের অভিলাষ বাসনাদি পার্থিব বস্তু দ্বারা অনুপ্রাণীত রহিয়াছে, কামলোকের সঙ্গে তখনও ঘনিষ্টতা জন্মে নাই, কাজেই আত্মীয়বর্গের সকরুণ বিলাপের আন্দোলন প্রবাহ তাহার কামদেহকে উদ্দীপিত ও পরিশেষে তাহাকে জাগ্রত করিয়া ফেলিতে পারে। তাহাতে তাহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া যায় এবং এইমাত্র পরিত্যক্ত ইহজগতের যাবতীয় বিষয় পরিষ্কাররূপে তাহার স্মরণপথে পতিত হয়। স্পষ্ট ভাবেই হউক কিম্বা অলক্ষিতেই হউক, প্রেততত্ত্ববাদীদের চক্রে আবিষ্ট ব্যক্তির দেহাবলম্বনে তাহারা রোরুদ্যমান আত্মীয়ের সংস্পর্শে আসিয়া বাক্যে বা লিখায় তাহা ব্যক্ত করে। কিন্তু এইরূপে তাহাদিগকে জাগ্রত করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কারণ ইহাতে অনেক সময়ে তাহার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াবিপর্য্যয় ঘটিয়া তাহার উন্নতিপথে বাধা জন্মে।

মরণের অব্যবহিত পরে আত্মীয় কুটুম্বের তীব্র ও হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে কামলোক হইতে সেই আত্মীয় বন্ধুর সন্নিধানে কেহ কেহ আসিতে পারে বটে, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদি মরণকালে বন্ধু বান্ধব বিলাপ না করিয়া তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দেন, তবে দ্বিতীয় মরণের উপদ্রব ও দুঃসহ যাতনার হস্ত এড়াইয়া নির্ব্বিঘ্নে ও আরামে সে স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে পারে। মানব কামলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলে পর কামদেহের খোসাটা মাত্র কোমলোকে পড়িয়া থাকে। শেষে ইহা আস্তে আস্তে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। সাধারণ নরনারী কামলোকে গিয়া কামদেহ ধারণ করে। মর্ত্ত্যলোকে তাহাদের অন্তর্মুখী মন (Lower Manas) কামের সঙ্গে সবিশেষ সংশ্লিষ্ট ও অনুক্ষণ অশেষ প্রকার ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে

রত থাকায়, তাহাদের কামদেহ বেশ সবল ও সতেজ থাকে। কাজেই অন্তর্মুখী মন নিজকৃত বাসনাজালে জড়িত হইয়া যায়; তাহা ছিন্ন করিয়া তস্য জনক অহংকারের (Higher Manasএর) ও জীবাত্মার সঙ্গে সহজে মিশিতে পারে না; অনেক সময় লাগে। এই জন্যই কামলোক হইতে উত্তীর্ণ হইতে সাধারণ নরনারীর বহু বিলম্ব ঘটে। আস্তে আস্তে হ্রাস হইতে হইতে যখন বাসনা এরূপ নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, তাঁহার আর জীবাত্মাকে আটক করিয়া রাখার ক্ষমতা থাকে না, তখন মনস কামলোক পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় দেবলোকে গমন করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহারা ইহ জীবনে কামাসক্ত ও সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকে, তাহাদের আধ্যাত্মিক দেহের ত কথাই নাই, তাহাদের মানস দেহ পর্য্যন্ত, অভুক্ত ব্যক্তির স্থূলদেহের ন্যায়, নিতান্ত শীর্ণ, ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া যায়। তাহারা কামলোকে বহুকাল বাস করে; তথায় তাহাদের পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা সদাকাল আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু স্থূলদেহ বিবর্জ্জিত হওয়ায় তাহাদের সেই উৎকট লালসা প্রত্যক্ষভাবে চরিতার্থ করিতে পারে না বলিয়া অনুক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকে। প্রেততত্ত্ববাদীদের চক্রে যখন কেহ আবিষ্ট হয়, তখন তাহার সাহায্যে তাহাদের ইন্দ্রিয়লালসা পূরণ করার জন্য তাহার চারিদিগে আসিয়া তাহারা জড় হইতে থাকে। কিন্তু অর্ব্বাচীন ও অপরিণামদর্শী অনেকে কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য এই সকল অনিষ্টকারী ও সাংঘাতিক জীবকে আহ্বান করিয়া আনিয়া অনেক সময় নিজেও বিপদগ্রস্ত হয় এবং অন্যেরও বিপদ ঘটায়। এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া সকলের কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ

শ্রীসুদর্শন দাস।

শিক্ষা।

(বড়িশা স্কুল সংক্রান্ত এক সভায় পঠিত)

সমগ্র জগৎই জীবের বিশাল শিক্ষাক্ষেত্র—বিরাট্ স্কুল এবং প্রকৃতিই বিরাট্ শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষার জন্যই আমাদের জগতে আসা এবং শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আর আসিতে হয় না। আপনারা সকলেই জানেন শাস্ত্র জীবকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। জীবই ব্রহ্ম। ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম কোটি কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতে পারেন, সেই অনন্ত মহাশক্তি প্রত্যেক জীবে—প্রত্যেক অণুপরমাণুতে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইহা নিদ্রিত—প্রসুপ্ত—প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যেমন বীজে ভবিষ্যৎ বৃক্ষ নিহিত থাকে, যেমন স্ফুলিঙ্গে প্রচণ্ড দাহকতা শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জীবে অনন্ত শক্তি অস্ফুট অবস্থায় আছে। প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাতে এই শক্তির ক্রম বিকাশ হয়। এই ঘাত প্রতিঘাতের নামই শিক্ষা এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল—ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি।

দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। মনে করুন একটি ঘাস গাছ। প্রকৃতি ইহাকে পদে পদে কিরূপ শিক্ষা দিতেছেন একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখুন। বেচারার দুরবস্থা ভাবিলে আমাদের চক্ষে জল আইসে। আহা! কতবার ইহা বৃষ্টি জলে নিমজ্জিত হইতেছে, নিয়ত কত মানবের পদদলিত হইতেছে, প্রখর রবিতাপে নিরন্তর দগ্ধ ও শুষ্ক হইতেছে এবং অবশেষে গো মেষাদি দ্বারা কবলিত ও ভক্ষিত হইতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর এইরূপ উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে, ক্রমশঃ ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি একটু একটু জাগিতে থাকে, ক্রমশঃ ইহা আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, ইহার সরু সরু কাণ্ডগুলি ক্রমে মোটা ও শক্ত হয়, ছোট ছোট পাতাগুলি বড় হইতে থাকে, এইরূপে লক্ষ লক্ষ বৎসরে এই ক্ষুদ্র ঘাস গাছটি এক বৃহৎ বাঁশ গাছে পরিণত হয়। কিন্তু তখনও কি শিক্ষার বিরাম আছে? তখনও প্রকৃতি চাবুক হস্তে শিয়রে দণ্ডায়মানা। ঝড়, বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কত চাবুকই তাহার পিঠে নিয়ত পড়িতেছে! এই চাবুক খাইতে খাইতে সে আরও দৃঢ়, আরও সহিষ্ণু, আরও উন্নত হইয়া ক্রমে উচ্চতর বৃক্ষে পরিণত হইতেছে। এইরূপে

যখন তাহার জ্ঞান ও অনুভবশক্তি ঈষৎ উন্মেষিত হইতে থাকে, তখন সে বৃক্ষত্ব হইতে পশুত্বে উন্নীত হয়, উদ্ভিদ জাতি ছাড়িয়া পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

প্রথমে সে ক্ষুদ্র কীটরূপে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হয়। কীট হইতে পতঙ্গ, পতঙ্গ হইতে সরীসৃপ, সরীসৃপ হইতে ক্ষুদ্র পশু, এবং ক্ষুদ্র পশু হইতে উচ্চতর পশুত্বে উন্নীত হইতে থাকে। লক্ষ লক্ষ বৎসর প্রকৃতির শিক্ষাধীনে থাকিয়া যখন সে পশু জীবনের চরম সোপানে উপস্থিত হয়, যখন স্মৃতিশক্তি, কল্পনা-শক্তি, বুদ্ধিশক্তি প্রভৃতি অল্প পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন সে পশুযোনি ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়—আদিম অসভ্য মানবরূপে বন জঙ্গলে বিচরণ করে। সহস্র সহস্র—লক্ষ লক্ষ বৎসর প্রকৃতির তীব্র কষাঘাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সে ক্রমশঃ সুসভ্য মানবে পরিণত হয়। কিন্তু ইহাই উন্নতির চরম নহে। সুসভ্য মানব ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করিতে থাকেন, তিনি ঋষি, দেবতা, মনু প্রজাপতি প্রভৃতির পদ লাভ করিয়া উন্নতিমার্গে ধাবিত হইতে থাকেন। এইরূপে লক্ষ লক্ষ কল্পান্তে তিনি একটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি পালন সংহারকর্ত্তা হইয়া থাকেন। প্রত্যেক মানব—প্রত্যেক জীব কোন না কোন কালে (যদিও এই কাল আমাদের কল্পনাতীত) এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইবেন। ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ইহা কল্পনা বা স্বপ্ন নহে। যাঁহারা জানেন—সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদেরই কথা।

সে যাক্। প্রকৃতির চাবুক খাইয়া জীবের অব্যক্ত শক্তি কিরূপে সুব্যক্ত হইতেছে,—যাহা অন্তর্নিহিত ও প্রসুপ্ত ছিল তাহা কিরূপে বিকশিত ও পরিস্ফুট হইতেছে, তাহার আরও কয়েকটা উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক। আপনারা সকলেই জানেন যে সবুজ ঘাসের মধ্যে যে সকল ফড়িং থাকে তাহাদের প্রায় সকলেরই বর্ণ সবুজ। এবং এক প্রকারের সাপ আছে (ইহাকে এখানে লাউডগা সাপ বলে এবং ইহা গাছের উপর থাকে) যাহার বর্ণও সবুজ। ইহাদের বর্ণ সবুজ হইল কেন, চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক সময়ে ইহারা সবুজ ছিল না। তখন পক্ষিগণ ইহাদিগকে সহজেই দেখিতে পাইত এবং ঠুকরাইয়া মারিয়া ফেলিত: বহু কাল এইরূপে উৎপীড়িত হওয়াতে পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকিবার একটা মর্ম্মান্তিক চেষ্টা ইহাদের মধ্যে

জাগিয়া উঠিল। এই চেষ্টার ফলে তাহাদের বর্ণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠিক পাতার বর্ণ ধারণ করিল, সুতরাং পক্ষিগণ আর সহজে দেখিতে ও সংহার করিতে পারে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় একটী গরু বা ছাগলকে শীতপ্রধান দেশে ছাড়িয়া দিলে দেখিবেন সে প্রকৃতির সহিত কি তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস কালে তাহার গাত্রচর্ম্ম প্রায় লোমশূন্য ছিল, কিন্তু এখন প্রকৃতির তীব্র কষাঘাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ দীর্ঘ ও ঘন লোমে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতেছে। আদিম মানব তরুকোটরে বা গিরিগুহায় বাস করিয়া এবং বন্য জন্তুর কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রথমতঃ বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতির হাত হইতে পরিত্রাণ নাই, তিনি নির্দ্দয়ভাবে চাবুক মারিতে লাগিলেন। আজ ঝড়ে বেচারার তরুকোটরটী ভূমিসাৎ হইল, কাল হয়ত একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর গড়াইয়া আসিয়া তাহার গিরিগুহার মুখ রুদ্ধ করিল (বেচারার জীবন্ত কবর হইল), কয়েক দিন ধরিয়া সে হয় ত বন্য পশু আদৌ পাইল না সুতরাং অনাহারে থাকিতে হইল, এইরূপে বহুকাল নিপীড়িত হইতে হইতে সে বুঝিল যে এপ্রকার জীবন আদৌ নিরাপদ ও সুখকর নহে। তখন এই সকল অসুবিধা ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য তাহার অন্তরে একটা প্রাণপণ চেষ্টা আসিল। এই চেষ্টার ফলে তাহার প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকাশ পাইল—সে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ ও কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিল। সভ্য মানবও প্রকৃতির নিকট বড় কম শিক্ষা পায় না। আজ পুত্রবিয়োগ, কাল অর্থনাশ, পর দিন হয়ত রাজদণ্ড অথবা মানহানি এইরূপ নিয়তই প্রায় কোন না কোন চাবুক খাইতেছে এবং ইহার ফলে সে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে। বাস্তবিক অনেক মানব এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যই আমাদের উন্নতির মূল, যাহার জীবনে কোন বিপদ্ বা দুর্ঘটনা না ঘটে তাহার জীবনই বৃথা। এই জন্যই একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"Adversity makes the man এবং আমাদের কোন ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"বারে বারে তুমি গো মা যে দুঃখ দিতেছ তারা।
সে কেবল দয়া তব জেনেছি মা দুঃখহরা॥

সন্তানমঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,
তাই আমি বহি শিরে শোক দুঃখের পশরা ॥"

অতএব আমরা দেখিলাম যে, যে বাহ্যশক্তি জীবের প্রসুপ্ত শক্তিনিচয়কে বিকাশিত বা অভিব্যক্ত করিতে পারে তাহারই নাম শিক্ষা। ইংরাজি Education শব্দের মৌলিক অর্থও ঠিক তাই—যাহা ভিতরে আছে তাহাকে বাহির করা। এবং আমরা ইহাও দেখিলাম যে, প্রকৃতিই জীবের বিরাট শিক্ষয়িত্রী। মানব তাহার ভ্রাতৃগণের শিক্ষা দানে চেষ্টা করুক বা নাই করুক, প্রকৃতি চিরকালই শিক্ষা দিতেছেন ও দিবেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মানবের এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? প্রকৃতির হস্তে শিক্ষাভার দিলেই ত চলে। এতো মঠ, বিহার, আশ্রম, টোল, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে কেন? কারণ আছে। শিক্ষাদান কার্য্যে মানব প্রকৃতিদেবীকে বিশেষরূপে সহায়তা করে। যদি মানব এই সাহায্য না করিত,—যদি প্রকৃতির উপর সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত, তাহা হইলে ক্রম বিকাশ হইত না তাহা নহে,—কিন্তু বহু বিলম্বে। মানবের সাহায্যে প্রকৃতি যাহা দশ বৎসরে করিতে পারেন, সাহায্য না পাইলে তাহাই করিতে লক্ষ বৎসর লাগিত। গোল আলু যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন উহা এক প্রকার কদর্য্য বন্য মূল ছিল। যদি উহার ক্রমোন্নতির ভার প্রকৃতির উপরই অর্পিত থাকিত, তাহা হইলে সহস্র সহস্র বৎসরেও উহা এরূপ সুস্বাদু আহার্য্যরূপে পরিণত হইত না। কিন্তু মানব উহাকে সযত্নে রোপণ করিয়া, জমীতে সার দিয়া, কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহার কেমন অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছে দেখুন। সেইরূপ, কফি কলা প্রভৃতিও মানবের চেষ্টাতেই এত অল্পকাল মধ্যে উপাদেয় খাদ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। যে গোলাপের সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধে আজ আমরা কতই আনন্দ লাভ করিতেছি, ইহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানেন কি? কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে উহা কুৎসিৎ গন্ধহীন Hedge-row পুষ্প ছিল। যদি মানব উহার উন্নতি সাধনে যত্ন না করিয়া প্রকৃতির হস্তেই উহাকে ফেলিয়া রাখিত, তাহা হইলে সহস্র বৎসরেও প্রকৃতি আমাদিগকে এরূপ গোলাপ দিতে পারিতেন না। কপোত ব্যবসায়ীরা কিরূপে বিচিত্র ও সুন্দর পায়রার সৃষ্টি করে তাহা শুনিলে বিস্ময় জন্মে। সে কতকগুলি বন্য কপোত ধরিয়া আনে এবং

দুইটী ভিন্ন জাতীয় পায়রাকে জোড়ে মিলাইয়া দেয়। ইহাদের সন্তানগুলিকে আবার অপর এক জাতীয় পায়রার সহিত মিলিত করে,—এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ নূতন ও বিচিত্র পারাবতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি প্রকৃতির উপর এই ভার থাকিত, তাহা হইলে সহস্র বৎসরেও ইহা হইত কিনা সন্দেহ। অসভ্য মানবকে বন হইতে ধরিয়া আনিয়া সভ্য সমাজে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, যে একশত বৎসরের মধ্যে তাহারা প্রায় অর্দ্ধ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে,—ঘর বাড়ী বাঁধিয়া ও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের অরণ্যচারী ভ্রাতৃগণ প্রকৃতির শিক্ষাধীনে থাকিয়া তখনও গুহা-গৃহ ও আম মাংস পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

ক্রমশঃ

কর্ম্ম-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সাধারণ মানব বাসনার দাস। আমরা "স্বাধীন স্বাধীন" বলিয়া চীৎকার করি সত্য, কিন্তু প্রায় সকলেই আমরা বাসনার অধীন, তবে কেহ অল্প, কেহ অধিক। কিন্তু যখনই অসৎকর্ম্মের জন্য, আমাদিগের অনুতাপ আরম্ভ হয়, যখনই আমাদিগের পাপ-স্বভাব ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প দেখা দেয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে আমরা ক্ষণেকের জন্যও কামনার হস্ত হইতে মুক্ত হইতেছি,—আমরা যে স্বাধীন ও ঈশ্বরাংশ তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

মহামতী বেসাণ্ট লিখিয়াছেন—"Essentially and fundamentally free, in its origin as the Power of the self, Will has become bound and limited in its attempts to master the matter into which the Self has entered. We need not shrink from saying that matter masters the self, not the se lf matter, and this it does by virtue of the self regarding matter as himself, identifying himself with it ;……"

সাতজন ঋষি বলিয়াছেন—"বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র।"

(যোগের অন্য সময় যখন চিত্ত বিষয়রূপে পরিণত হইয়া বৃত্তিমৎ হয়, তখন চিত্ত ও পুরুষের একরূপ বৃত্তি হয়। চিত্তের বৃত্তি সকল পুরুষের বলিয়া বোধ হয়।)

ব্যাসদেব এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধি-মাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বংভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ। তস্মাৎ চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ"।

চিত্ত বিষয়রূপে পরিণত হইয়া পুরুষকে বিষয় প্রদর্শন করে, বিষয়বিশিষ্ট-চিত্ত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় এই নিমিত্ত পুরুষকে দর্শিত বিষয় বলা যায়। ব্যুত্থানকালে যেরূপ চিত্তবৃত্তি হয় পুরুষেও যেন ঐরূপ বৃত্তি (আমি সুখী, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি) হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চুম্বুক পাথর যেরূপ লৌহের নিকটে থাকিয়া উহাকে আকর্ষণ করে, লৌহের সহিত সংযোগ না হইলেও হয়, তদ্রূপ চিত্ত পুরুষের নিকটে থাকিয়াই উহার উপরে কার্য্য করে—পুরুষকে সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করায়। অজ্ঞান বশতঃ এইরূপ চিত্তবৃত্তি-বোধ পুরুষে হইয়া থাকে, ইহার কারণ চিত্তের সহিত পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ।

আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ ও স্বাধীন আত্মার কর্ম্মক্ষেত্রে পরাধীনত্ব কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা-সংবাদে এই বিষয় অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত আছে।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪

কঠ—তৃতীয়া বল্লী।

(হে নচিকেতঃ, শরীরকে রথস্বরূপ, জীবকে রথী, বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ ও মনকে অশ্ববন্ধনরজ্জু জানিও। জ্ঞানীগণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে রথবাহী অশ্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, ইন্দ্রিয়ের গোচর শব্দাদিকে অশ্বসঞ্চালনের পথ বলিয়া থকেন, আর শরীরেন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মাকে সুখ দুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া বর্ণন করেন।)

যদিও স্বাধীন আত্মার ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন, তত্রাচ যতদিন এই আত্মা অসংযত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের দ্বারা যথেচ্ছা নীত হয়, ততদিন আত্মা বদ্ধ, মুক্ত নয়। যতদিন মানব প্রকৃতির দাস থাকিবে, ততদিন তাহাকে স্বাধীন বলা বাতুলতা মাত্র। আর একখানি উপনিষদের একটী গল্প উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একটী বৃক্ষের উপর শাখায় এক শুক, তাহার নিম্ন শাখায় এক শুক। উপরের শুক স্বাধীন ও দ্রষ্টারূপে নিম্নশাখায় অবস্থিত শুকের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিতেছে। নিম্নস্থ শুক ফলাস্বাদন করিতে করিতে শাখা হইতে শাখান্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। এই বৃক্ষের ফলগুলির আবার বিশেষত্ব আছে; নিম্নের ফল তিক্ত, উপরের ফল সুমিষ্ট। অধস্থ শুক নিম্ন শাখার ফল আস্বাদন করিতে করিতে যতই ঊর্দ্ধে উঠিতেছে ততই উপরের মিষ্ট আস্বাদ পাইতেছে, এবং আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। এইরূপে ফল উপভোগ করিতে করিতে সে যখন প্রায় বৃক্ষশিখরে আরোহণ করিয়াছে, তখন দেখিল যে তাহারই মত আর একটা শুক বৃক্ষচূড়ায় বসিয়া আনন্দে সুন্দর সঙ্গীত করিতেছে ও তাহাকে আহ্বান করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার মোহন সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া তচ্ছকাশে তাহার যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল, এবং অধিকতর দ্রুতগতিতে সে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে সে উপরস্থ শুককে মাঝে মাঝে দেখিতে পায়, মাঝে মাঝে আবার পত্রের অন্তরালে সেই শুক অন্তর্হিত হয়। অবশেষে যখন সে বৃক্ষশিখরে উঠিতে সক্ষম হইল, তখন আর দুইটি শুক রহিল না, দুইটি মিলিয়া এক হইল।

উপনিষদের বৃক্ষ আমাদিগের ভোগের স্থান, আমরা তথায় কামনার তিক্ত ও মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে করিতে, মাঝে মাঝে স্বাধীন আত্মার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে, যখন কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত হইব, তখন আমরা তাঁহার সহিত মিলিব। তাহাই পাতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পুরঞ্জনের উপাখ্যানেও এই শিক্ষা দিতেছে। প্রথমে রাজা পুরঞ্জন অজ্ঞাতকুলশীল তাঁহার সখাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভোগস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে একটী পুরী নয়নগোচর করিলেন। এই পুরীর নব

দ্বার; তাহার অধিষ্ঠাতৃ এক কামচারিণী কামিনী। পঞ্চশীর বিশিষ্ট এক সর্প দ্বারপালরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। সেই রমণীও উপযুক্ত পতি অন্বেষণে ঘুরিতেছেন। পুরঞ্জন অধীরের ন্যায় কামভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সেই মনোহারিণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবতী সস্মিতবদনে বলিল—"আমার নিজের কর্ত্তা কোন ব্যক্তি তাহা আমি জ্ঞাত নহি; যদ্দ্বারা গোত্র ও নামের উৎপত্তি হয়, তাহাও আমি জানি না। অদ্য এখানে যে আমি অবস্থিত তাঁহাকেও আমি জ্ঞাত নহি। আমার এই পাঁচজন পুরুষ সহচর, এবং এই পাঁচ স্ত্রী সহচরী। ইহাদিগকে তোমার সেবায় রাখিব। প্রভু, এই পুরী আপনারই। আমিও আপনার" পুরঞ্জন এই পুরীতে আশ্রয় লইয়া রমণীতে আসক্ত হইয়া রহিলেন। সেই মোহিনী তাঁহাকে যাহা করিতে বলেন, মূর্খের ন্যায় তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। রমণী হাস্য করিলে তিনি হাস্য করেন, রমণী রোদন করিলে তিনিও রোদন করেন। এইরূপে আপনার পৃথক্-অস্তিত্ব রমণীতে ডুবাইয়া দিয়া আপনার স্বভাব বিস্মৃত হইলেন। অবশেষে সেই প্রমোদাকে চিন্তা করিতে করিতে তিনি দেহ পরিত্যাগ করায় পরজীবনে বিদর্ভরাজার গৃহে বর-ললনা-রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। পাঠক, গীতায় ভগবান কি বলিয়াছেন দেখুন—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ॥ অষ্ট-৬।

"যে যে ভাব অন্তরেতে করিয়া স্মরণ,
কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ,
সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়,
কৌন্তেয়, দেহান্তে জীব সেই ভাব পায়।" কুমারনাথের অনুবাদ।

সেই কুমারীর সহিত পাণ্ড্য দেশীয় শক্তিশালী সম্রাট্ মলয়ধ্বজের বিবাহ হয়। মলয়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার্থ কুলাচলে যাত্রা করিলে বৈদর্ভীও তাঁহার সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তাহার পর যখন মলয়ধ্বজ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, রাজমহিষী অরণ্যে বৈধব্যশোকে অস্থির হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি অধীরা হইয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পূর্ব্বতন সখা উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন—"তুমি কে

এবং কাহার? আমি তোমার সুহৃদ্। তুমি পূর্ব্বে আমার সহিত সখ্যসুখ অনুভব করিতে। তুমি পার্থিবসুখে রত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করত মোহিনীর পুরীতে অবস্থান করিতে এবং আমাকেও ভুলিয়াছিলে। তুমি ও আমি আমরা ভিন্ন নহি; সখে। আমাকে তোমা বলিয়াই জান। যাঁহারা তত্বজ্ঞ তাঁহারা আমাদিগের দুই জনের মধ্যে অনুমাত্র প্রভেদ দর্শন করেন না। যেরূপ পুরুষ একমাত্র আপনাকে দর্পণে দ্বিধাভূত দর্শন করে, আমাদিগেরও সেইরূপ জানিবে।"

অহং ভবান ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ ভোঃ।
ননৌ পশ্যন্তি করয়শ্ছিদ্রং জাতুমনাগপি॥
যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শ চক্ষুষোঃ।
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরথা বয়োঃ॥

৪র্থ—২২—৬২, ৬৩।

যখন তাঁহার সখা আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিলেন তখন আপন স্বরূপত্ব তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

বিশুদ্ধ শুভ্র সূর্য্য-রশ্মি বিবিধ বর্ণের কাচফলক দ্বারা নানাবর্ণে প্রকাশ পায়; যাহা শ্বেত, কাচ ফলকের গুণে তাহা রঞ্জিত হয়। সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত মানব-চৈতন্য নিত্যশুদ্ধ ও স্বাধীন; কিন্তু, তাহা যখন প্রকৃতিসাহায্যে কর্ম্মরূপে বিকাশ পায়, তখন তাহা প্রকৃতিগত নিয়মে রঞ্জিত হইয়া পড়ে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি; প্রকৃতিই কর্ম্মের কারণ, পুরুষ স্বাধীন, কিন্তু, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত তাঁহার যোগ থাকা নিবন্ধন, পুরঞ্জন সেইরূপ মোহিনীর সহিত মিলিত হইয়া মোহিনীভাবে পরিণত হইয়াছিলেন, পুরুষ প্রকৃতিধর্ম্মী হয়।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি॥
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥ ১৯
কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতু রুচ্যতে॥ ২০
পুরুষ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ যোনি জন্মসু॥ ২১

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা, ১৩ অঃ।

প্রকৃতি পুরুষ এ উভয়
অনাদি জানিবে ধনঞ্জয়,
ইন্দ্রিয়াদি যে বিকার, সত্ত্ব রজঃ তমঃ আর
প্রকৃতির অঙ্গেতে উদয়। ১৯
কার্য্যাকারণের যেই ফল,
প্রকৃতি ঘটায় সে সকল,
সুখদুঃখ সমুদয় প্রকৃতির গুণচয় ;
গুণভোগী পুরুষ কেবল।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়।—
যে গুণে মিলন যবে হয়,
সেই গুণ অনুসারে সৎ বা অসৎ ঘরে
পুরুষ জনমে ধনঞ্জয়। ২০, ২১

কুমারনাথের অনুবাদ।

বাস্তবিক পক্ষে জীবের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত প্রকৃতিই, আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বরূপ জন্ম ও মৃত্যুর অবস্থা গ্রহণ করে; আত্মার সহিত প্রকৃতির অভিন্নভাবে মিলন থাকায়, তাহাই আত্মার জন্ম মৃত্যু বলিয়া কথিত হয়।

আমরা দেখিয়া আসিলাম পুরুষ স্বাধীন হইয়াও কিরূপে প্রকৃতির অধীন। সেই প্রকৃতি আবার গুণময়ী। প্রকৃতির নিয়ম কেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অগ্নিতে হস্তারোপ করিলে অগ্নির দাহিকাশক্তি হস্তকে দগ্ধ করিয়া দিবে। শূন্যে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে প্রাকৃতিক মহাকর্ষণ তাহাকে আবার পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিবে। আমরা যে অঙ্গ সঞ্চালন করি, তাহাও প্রকৃতির নিয়মিত, দূর সঙ্গীতধ্বনি যাহা আমাদিগের শ্রোত্র-পথে আসে, বা যে দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই, তাহাদিগেরও নিয়ন্তা সেই প্রকৃতি। এই শিক্ষা যখন প্রথমে একজন অশিক্ষিত অসভ্য মানবকে দেওয়া হয়, সে অবশ্য তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবে ; সে ভাবিবে যে প্রত্যেক কার্য্যেই সে সম্পূর্ণ অসহায়। কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারে যে প্রকৃতির নিয়ম কেবল কার্য্যকারণের শৃঙ্খল। প্রকৃতির নিয়ম বল-

পূর্ব্বক তাহাকে কোনও কর্ম্ম করাইতেছে না,—প্রতি কার্য্যে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে মাত্র। প্রকৃতির নিয়ম তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে এই এই কারণ উদ্ভূত হইলে তাহার পরিণাম ও এই এই রূপ হইবে। এই রূপ নিয়মিত বলিয়াই আমরা প্রাকৃতিক শক্তিকে আমাদিগের দাসত্বে পরিণত করি। যে বিদ্যুত তাহার বিপুল শক্তির দ্বারা জগৎ সংহার করিতে পারে তাহাই জ্ঞানের সাহায্যে মানবের দ্বারা ভৃত্যরূপে পরিণত হয়; অগ্নি আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করে। প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ আছে বলিয়াই, মানব তাহার দ্বারা কার্য্য সাধন করিতে পারে। যদ্যপি এক অগ্নি এক সময়ে উত্তাপ, ও অপর সময়ে শীতলতা দিত, তাহা হইলে অগ্নির দ্বারা আমরা কি কোনও কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিতাম?

প্রকৃতির নিয়ম জানিয়া, তাহার দ্বারা কার্য্য সাধন করাইয়া লওয়াই প্রকৃত কর্ম্মতত্ত্ব। কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মধ্বংস করিতে হয়। অতীতের কর্ম্মের জন্ম আমাদিগের চিত্ত যেরূপ ভাবে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মের দ্বারাই আবার পরিবর্ত্তিত হয়। তাহাই নীতিশাস্ত্রবিৎ বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ, বিপৎ কাল উপস্থিত হইলে, কখনও কাতর হননা। সম্পদ্ কিংবা বিপদ্ উভয়ই স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর; পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে এই উভয়ই হয়, অতএব দেহিগণই স্বকীয় কর্ম্মফলে সম্পদ্ এবং বিপদ্ ভোগের কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। যানাদিস্থিত চক্রের প্রান্তদেশ যেরূপ একবার উন্নত এবং একবার অবনত হয়, সে প্রকার জীবগণও জন্মে জন্মে নিরন্তর সম্পদ্ ও বিপদ্ অনুভব করে, সে বিষয়ে অনুতাপ করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। জীব যে স্থানেই অবস্থান করুক, তাহাকে নিজকৃত শুভ কিংবা অশুভ কর্ম্মের ফল সেই স্থানেই থাকিয়া অনুভব করিতে হইবে; যেহেতু পুরুষগণ নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগী হয়, জীব নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ না করিলে শতকোটি কল্পেও সেই ফল ক্ষয় হয় না। কোন না কোন সময়ে তাহাকে নিজকৃত শুভ কিংবা অশুভের ফলভোগ করিতেই হইবে। এ কথা আমাদিগের নয়, শ্রীকৃষ্ণ পদ্মযোনিকে সম্বোধন করিয়া নিজমুখে এই বার্ত্তা সামবেদের কৌথুম শাখায় বর্ণন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের কর্ম্মসম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত উক্তি অতিশয় শিক্ষাপ্রদ।

তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি—

১ অঃ, ১ খঃ, ১০ উক্তি।

(যাঁহারা ওঙ্কারের এই প্রকার তত্ত্ব জানেন এবং যাঁহারা উহা জানেন না, তাঁহাদিগের সকলেরই ওঙ্কার দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে ফললাভ হয় না। কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ফল আছে। তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞের ফলগত তারতম্য অনিবার্য্য। জ্ঞানকৃত কর্ম্মের ফল অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের ফল হইতে পৃথক্। যে কর্ম্ম জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপনিষদুক্ত যোগ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্ম্মই সত্বর অধিকতর ফল প্রদান করিয়া থাকে।)

কোনও অশিক্ষিত লোক যদ্যপি রাসায়নিক আগারে প্রবেশ করিয়া, আপন ইচ্ছায় একটী আরকের সহিত অপর আরক মিশ্রিত করে, তাহা হইলে হয়ত সেই মিশ্রনফলে তাহা এরূপভাবে জ্বলিয়া উঠিবে বা তাহাতে এরূপ একটী বিষ উদ্ভূত হইবে যে, পরীক্ষাকারী তাহাতে আপনার নাশ সাধিত করিবে। কিন্তু, এইরূপ না হইয়া রাসায়নিক নিদেশ ক্রমে যদ্যপি এই কার্য্য সাধিত হইত, তাহা হইলে হয়ত মানবহিতকর একটী নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে পারিত। এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্ররূপ রাসায়নিক আগারে ঠিক তাহাই হয়। যাঁহারা অজ্ঞানী ও শাস্ত্রের নিদেশ না মানিয়া আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে থাকেন, অজ্ঞানতা-প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম তাঁহাদিগের অনিষ্টই সাধন করে। তাহাই হিন্দুর বেদে ও শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের সমাবেশ আছে। কি কার্য্য করিলে উন্নতি হইবে, কোন কার্য্যে অনিষ্ট হইবে, কোন কর্ম্মে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে, কি কর্ম্মে মানব মোহাবরিত হয় শাস্ত্র তারস্বরে তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছে। কর্ম্মনীতিও এক প্রকার প্রাকৃতিক নীতি। এক প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্যগতি আর এক প্রাকৃতিক নিয়মসাহায্যে যেমন পরিবর্ত্তিত করা যায়, সেইরূপ কর্ম্মের বেলাও ঠিক তাহাই হয়। যে মাধ্যাকর্ষণ নীতির বলে আশ্রয়হীন দ্রব্য শূন্য হইতে নিম্নে পতিত হয় তাহারই সাহায্যে আবার মানব ব্যোমে বিচরণ করিতে পারে, নিম্নভূমি হইতে মানব ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের গতি সেইরূপ ফিরান যাইতে পারে।

শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে করিতে স্বধর্ম্ম সাধন করিতে মানব বৈরাগ্য ও অভ্যাসের সাহায্যে যে চিত্তের অধ্যাসে সে এতদিন চালিত হইয়া আসিয়াছে, আবার সেই চিত্তের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে। তাহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "যোগঃ কর্ম্ম সু কৌশলং।" (ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দৈত্যরাজ ও দৈত্যজাতি ধ্বংস।

পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। হিরণ্ময় মন্দিরকে কলুষিত করার পর ৫০ পঞ্চাশ হাজার বছর গত হইয়াছে। আভিচারিক বিদ্যা ও বীভৎস ভৌতিক ক্রিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মা বসুমতী আর গুরুতর পাপের ভার সহ্য করিতে পারেন না।

যোগী এবং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ঘোর বিপ্লবের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য বোধ করিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের আবাস স্থান সুপ্রসিদ্ধ সম্ভল নগর হইতে আদেশ আসিল, "রাজ্যদেশ যেরূপে কলুষিত ও পাপপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহা সংস্কারের উপায় নাই। ইহার ধ্বংস সাধন ব্যতীত গত্যন্তর নাই; অতএব যাহাদের প্রাণের ভয় ও বাঁচিবার সাধ আছে, তাহাদের এই বিনাশোন্মুখ দেশ পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত।"

দারুণ কালের ভেরি বাজিয়া উঠিল। প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল। ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাতে মহাসমুদ্রের ঢেউ অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর স্পর্শ করিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সমুদ্রের তলদেশ প্রকম্পিত হইল, তাহাতে পর্ব্বত প্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া মহা নিনাদে স্থলভাগকে গুরুতর আঘাত করিতে লাগিল। হুহু শব্দে জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তাহাতে মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অসংখ্য জন্তু হাহাকার রবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। পাহাড় পর্ব্বত সকল ভৈরব রবে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে পতিত হওয়াতে, তাহার দারুণাঘাতে অগণ্য জীব জন্তু কাল কবলে নিপতিত হইল। সমুদ্রের প্রলয়ঙ্করী নিনাদ, ঝঞ্ঝাবাত ও ঝড় তুফানের তুমুল

কোলাহল, পর্ব্বত ধ্বংসের ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দ এবং মুমূর্ষু মানব ও জীব জন্তুর গভীর আর্ত্তনাদে ধরণীবক্ষঃ ভীষণ ও ভৈরবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

ঘোর বিপদ ও আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া অসুরগণ তাহাদের বায়ু-পোতের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু হায়! তাহাদের বিধি বাম। মহাপুরুষগণের আদেশে এই সকল বায়ুপোত ও ব্যোমযান অপসৃত হইয়াছে; যেন এই ঘোরকর্ম্মা পাপাশয় অসুরগণ এই উপস্থিত বিপদ ও প্রলয়ের হস্ত হইতে আর রক্ষা পাইতে না পারে। পরিশেষে বহু পুরাতন দৈত্যরাজ্যকে সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিল। সুপ্রসিদ্ধ আট্লান্টিস্ দেশ মহাসাগরের অতল জলে নিমগ্ন হইল। সব ফুরাইল! একটী প্রাণীও বাঁচিলনা। চিরদিনের মতন অসুরগণ কালের কবলে পতিত হইল। রহিল কেবল তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন। আর রহিল তাহাদের কিম্বদন্তি। এই প্রলয়ের ইতিহাস হিন্দুর পুরাণে, মিশরের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে, খ্রীষ্টানদের বাইবেলে এবং অন্যান্য জাতির গ্রন্থে নানাভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

এইরূপে পৃথিবীর ভার অপসৃত হইল। চিরকালের তরে আভিচারিক বিদ্যা অন্তর্হিত হইল। অসুরগণও বিশেষ শিক্ষালাভ করিল, তাহাতে তাহাদের ভাবী উন্নতির পথ প্রসারিত হইল।

---

(৪) দৈত্যজাতির চতুর্থ বিভাগ।

এই চতুর্থ বিভাগের নাম টুরেনিয়ান জাতি। রামায়ণ মহাভারতাদিতে যে দুর্দ্দান্ত, বর্ব্বর, ভীষণাকার ও নৃশংস রাক্ষসাদির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারাই এই টুরেনিয়ান জাতি। পঞ্চম মৌলিক জাতির নাম আর্য্যজাতি। এই উদীয়মান্ আর্য্যজাতির সঙ্গে তাহাদের ঘোর যুদ্ধ বিবরণ আমাদের পুরাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

---

(৫) দৈত্যজাতির পঞ্চম বিভাগ।

দৈত্যজাতির পঞ্চম বিভাগের নাম সেমিটিক্ (Semitic) জাতি।• এই জাতি হইতেই পরবর্ত্তী পঞ্চম মৌলিক জাতির (আর্য্যজাতির) বীজ আনয়ন

করা হইয়াছে। তাহারা অতি বিবাদকারী, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক। তাহাদের এক শাখা হইতে বৈবস্বত মনু পঞ্চম জাতির বীজ গ্রহণ করিয়া শেষে অনুপযুক্ত বোধে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। তাহারাই ইহুদী জাতির (Jew দিগের) আদিপুরুষ।

---

(৬) দৈত্যজাতির ষষ্ঠ বিভাগ।

দৈত্যজাতির ষষ্ঠ বিভাগের নাম আকাডিয়ান জাতি (Akkadians)। প্রলয়কাণ্ডে দুই তৃতীয়াংশ টলাটক্ জাতি (তৃতীয় বিভাগ) বিনাশ পাওয়ার পর এই বিভাগ আবির্ভূত হইয়াছিল। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ উত্তরাভিমুখে গিয়া বহু পরে বর্দ্ধিষ্ণু আর্য্য জাতির সঙ্গে মিলিত হইল। পেলাস্জিয়ান্ জাতি (Pelasgians) এই ষষ্ঠ ও পরবর্ত্তী সপ্তম বিভাগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। ইট্রুস্কান্ জাতি (Etruscans), কার্থেজিনিয়ান জাতি (Carthaginians) এবং সাইথিয়ান জাতি (Sythians), এই ষষ্ঠ বিভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

যুগল সেবক।

বেদান্তাভাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই তাপ হায়, সংগৃহীত
করিবারে শাস্ত্রোদিত,
উপায় কত উদ্ভাবিত,
হয়েছে একবার দেখনা ॥ ২৪ ।

অগ্নির প্রাকার করি,
গৃহস্থলী পরিহরি,
জপাবিষ্ট পঞ্চতপা,
পঞ্চাগ্নি করে সাধনা ॥ ২৫ ।

ষঠ্ সাধনে শীর্ণ দেহ,
চিনিতে না পারে কেহ,
অগ্নিহোত্রী নিত্য হোতা,
হুতাশন করে ভজনা ॥ ২৬ ।

তান্ত্রিকেরা তন্ত্রমত,
যন্ত্র মন্ত্র করে কত,
হোম পূজা যজ্ঞ জপ,
উপচারে দেবার্চ্চনা ॥ ২৭ ।

সন্ন্যাসী জ্বালায় ধুনী,
মৌন রয় যতেক মুনি,
বাক্য ব্যয় তাপস্কর,
করিয়ে অবধারণা ॥ ২৮ ।

কেউ করে কুমারী পূজা,
কেউ করে বা দশভুজা,
কেউ কবে কারণ সহ,
কালী করালবদনা ॥ ২৯ ।

কেউ করে চক্রানুষ্ঠান,
কেউ ভ্রমে মহা শ্মশান,
কেউ করে পঞ্চমকারে
ভয়ঙ্কর শব-সাধনা ॥ ৩০ ।

ক্রমশঃ

অলৌকিক ঘটনা।

প্রতিনিয়ত কোন কার্য্যে রত থাকিলে সেই কার্য্যে মানুষের অভ্যাস জন্মিয়া যায় এবং সেই অভ্যাস পরিত্যাগ কবা সুকঠিন হইয়া উঠে। আমরা দেখিয়াছি কোন কোন লোক মদিরা পানে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, নানারূপ শারীরিক পীড়ায় আক্রান্ত এবং সাংসারিক কষ্টে পতিত হইয়াও তাহারা মদ্যপান পরিত্যাগ করিতে পাবে না। একটা পয়সার অভাবে হয়ত প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের জল খাবার জুটিতেছে না, কিন্তু মদ্যপায়ী পিতার সেদিকে লক্ষ্য নাই, তিনি অকাতরে পয়সা ব্যয় করিয়া মদ্যপান করিতেছেন, কেননা মদ্যপানে তাঁহার অভ্যাদ জন্মিয়াছে। যে ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত—ঘরে পরমাসুন্দরী লক্ষ্মী স্বরূপিনী পরিণীতা স্ত্রী থাকিতেও—সে বারবিলাসিনীগণের সহবাস পরিত্যাগ করিতে পারে না, কেননা বারাঙ্গণা গৃহে যাওয়া তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। যে চোর, সে. চুরি না করিয়া থাকিতে পারে না,

কেননা চুরি করা তাহার অভ্যাস। আমরা জানি এক চোর জীবনের শেষ দশায় ঘটনাক্রমে সাধু সঙ্গে মিলিত হইয়া গুরুর সদুপদেশে চৌর্য্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়াছিল, তথাপি পূর্ব্ব অভ্যাস সে সহজে ছাড়িতে পারে নাই। সময়ে সময়ে তাহার চুরির ইচ্ছা এত প্রবল হইত যে, সে নিদ্রার ভাণ করিয়া নিজের বস্তু চুরি করিত। আজীবন কোন কু অভ্যাসের দাস হইয়া কু কার্য্যে রত থাকিলে মরণান্তেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। নিম্নে ইহার একটী প্রকৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠবর্ণ। যোগ, তপঃ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। এই শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণের মধ্যেও কাহাকেও কাহাকেও কু অভ্যাস হেতু দুষ্কর্ম্মান্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক ব্রাহ্মণ যজমানের বাটীতে যাগযজ্ঞ করিতে গিয়া হোমের ঘৃত চুরি করিতেন। আজীবন তিনি এই ঘৃত চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই কু অভ্যাসের জন্য তাঁহাকে মরণান্তেও বিশেষ কষ্ট, দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার জ্বালায় অস্থির হইয়া একদিন তাঁহার পুত্রকে দেখা দেন এবং বলেন "আমি জীবদ্দশায় বড় এক দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিলাম, এখন ভীষণ অগ্নি-কুণ্ড মধ্যে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি—এ যে কি যন্ত্রণা তাহা বলিয়া বুঝান যায় না, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।" অকস্মাৎ মৃত পিতার সন্দর্শনে ও তদ্-প্রমুখাৎ এতাদৃশী জ্বালাময়ী যন্ত্রণার কথা শ্রবণে পুত্র অতীব বিস্মিত ও কাতর হইয়া বলিল—"পিতঃ, বলুন আমাকে কি করিতে হইবে—কিসে আপনার যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে—আপনি শান্তিলাভ করিতে পারিবেন—আজ্ঞা করুন, আমি এখনি তাহা করিতে প্রস্তুত।" পিতা বলিলেন—"আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তোমরা কেহ অবগত নহ। আমি যজমানের বাটী যাইয়া হোমের ঘৃত চুরি করিতাম, সেই চৌর্য্য অপরাধে আমার এই শাস্তি হইতেছে, তুমি প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দান কর, আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে—আমি চিরশান্তি লাভ করিব।" এই বলিয়া পিতা শূন্যে মিশিয়া গেলেন। পুত্র মৃত পিতার আজ্ঞাপালনে তৎপর হইল। ইহাতেই বোধ হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। ইহার পর আর কখনও তিনি পুত্রকে দেখা দেন নাই।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১২শ ভাগ { চৈত্র, ১৩১৫ সাল। } ১২শ সংখ্যা।

পরাবিদ্যা সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

"To encourage the study of comparative religion, philosophy and science." স্ব স্ব দেশীয় পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান-দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির সহিত তুলনা করিয়া অন্যান্য বিদেশীয় শাস্ত্রাদি অনুশীলনে সকলকে উৎসাহিত করণ, অর্থাৎ পরস্পরের ভাব ও মতাদির বিচার দ্বারা পরস্পরের বিভিন্নতা বা একতা, অংশ বিশেষে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ণয় করণই এই সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন এই সমিতির উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎকালে ইংলণ্ড দেশে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়মধ্যে দুইটী পৃথক শ্রেণী বা বিভাগ লক্ষিত হইতেছিল। (১) কতিপয় চিন্তাশীল পুরুষ ও রমণী স্বাভাবিক নিয়ম ও ভূতত্ত্ববিদ্যার শিক্ষার সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের 'Genesis' ও অন্যান্য কয়েকস্থলে লিখিত বিষয়ের সম্পূর্ণ অনৈক্য সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিতে না পারায় কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই উক্ত ধর্ম্মের মত ও শিক্ষার উপর শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া ঐ ধর্ম্ম পরি-

ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কতকগুলি Agnostic নামে অভিধেয়—তাঁহাদের বিশ্বাস যে কোনরূপে (Spiritual) আধ্যাত্মিক জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এবং অপর কতকগুলি (Materialist) জড়বাদী ছিলেন—জড়বাদীদের মত এই যে, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, এই স্থূল জগতের মাত্র অস্তিত্ব আছে, ইহা ব্যতীত অপর কোন সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর জগৎ নাই ; এবং আপাততঃ আমাদের যে জীবন চলিতেছে ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জীবন—এই দেহান্তে অন্য কোন দেহে আমরা বাস করিব না ও কাহারও পুনর্জ্জন্ম নাই। আত্মা নিত্য, অনন্ত অবিনাশী বলিয়া তাঁহারা একেবারে বিশ্বাস করেন না—আর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা কহেন যে যিশুখৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং কেবল তাঁহারই আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে মানব পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে পারে—নতুবা অন্য উপায় নাই—এ কথাও তাঁহারা কেহ স্বীকার করেন না। (Agnostics) যাঁহারা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব অস্বীকার করেন এবং তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, কহেন—সংক্ষেপে যাঁহাদের অজ্ঞেয়ত্ববাদী কহে, এবং (Materialist) জড়বাদী—এই উভয়েই ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন বা ধর্ম্মবিরোধী—একের অন্যতর। এই বিভাগের লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কিছু অল্প।

(২) দ্বিতীয় দলটীর লোকসংখ্যা অধিক ছিল। তাঁহারা সকলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সাধারণ প্রশস্ত সত্যটী বিশ্বাস করিতেন ; আত্মা অবিনাশী, কোন দেহান্তে আত্মার নাশ নাই,এবং জগৎ ঐশ্বরিক নিয়ম কর্ত্তৃক চালিত—এসম্বন্ধে তাঁহারা কোন সন্দেহ করিতেন না। তাঁহাদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম, এবং যিশুর জন্মের পূর্ব্বে মানবকুলের মুক্তির অন্য কোন উপায় ছিল না। যাঁহারা অধিকতর উদ্যমশীল, তাঁহারা ঐ সত্য প্রচারে ব্রতী হইয়া তমসাচ্ছন্ন (heathen) বিধর্ম্মীদের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তার করিতে লাগিলেন। এসীয়া ও আফ্রিকায় যাবতীয় লোক বিধর্ম্মী পৌত্তলিক ও ঘোর অজ্ঞানে আবৃত—উক্ত প্রচারকদের (Missionary) এই ধারণা ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, পারসী—ইহাদের সকলেরই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রভৃত আগ্রহশীল খৃষ্টানদিগেরই কেবল এইরূপ ধারণা ছিল এমত নহে—তাঁহাদের ন্যায় অজ্ঞেয়ত্ববাদী ও জড়বাদীরাও হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতিকে ঐ চক্ষে দেখিত ও সমধিক ঘৃণা করিত।

কালক্রমে ইংলণ্ডে উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে দুইটী স্রোত ধাবিত হইল। তন্মধ্যে একটী (intellectual) মানসিক শক্তি প্রসূত ও অপরটী (spiritual) আধ্যাত্মিক—এই শক্তিদ্বয় সমগ্র চিন্তাজগতে একটী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটাইল। প্রথম ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্রোতটী মক্ষমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রবরগণ হইতে নিসৃত। প্রাচ্য ভাষা অধ্যয়নকালে হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে আর্য্য ঋষিগণের সুগভীর মনীষা দর্শনে তাঁহারা চমকিত হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মণদিগের বেদ পুরাণ, জোরোয়াষ্ট্রীয়ানদিগের গাথা বৌদ্ধদিগের সূত্র মধ্যে অতি উচ্চতম নীতিশাস্ত্রের উপদেশ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—ঈশ্বর ও বিশ্ব সম্বন্ধীয় এরূপ সুমহৎ ও অতুলনীয় ভাবসমূহ প্রতীচ্য কোন গ্রন্থেই তাঁহাদের কখনও নয়নগোচর হয় নাই। যদিও সুকৌশল ও উপায়াভাবে সেই সকল শাস্ত্রান্তর্গত অনেকানেক গুহ্য তত্ত্ব গূঢ় রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তথাপি তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন যে, যে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহকে পূর্ব্বে তাঁহারা পৌত্তলিক ও অতি নিম্নশ্রেণীভূক্ত বলিয়া ঘৃণা করিতেন, সেই সকল বাস্তবিক তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রাদিসকলের শীর্ষস্থানীয়—বর্ত্তমান প্রতীচ্য শাস্ত্রাদি বহু উন্নতি সাধন করিয়াও সেই স্থান অধিকার করিতে অদ্যাপি সক্ষম হয় নাই—এবং নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উহারা কোন অংশে ন্যূন নহে।

ক্রমশঃ দুই একখানি প্রাচ্য ধর্ম্মগ্রন্থ ইংরাজি ও অপরাপর পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের নিকট উপস্থিত হওয়ায় পুনরায় আরও একটু সত্য প্রকাশিত হইল। যে সকল শিক্ষা ও উপদেশ কেবলমাত্র খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্গত বলিয়া বহু দিন হইতে সকলে জানিতেন, এক্ষণে দেখিতে পাইলেন যে সেই সমস্ত উপদেশ যিশুর জন্ম গ্রহণের শত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে নিহিত হইয়াছে। যিশুর জীবনীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে যে অলৌকিক ঘটনাবলীর দ্বারা পূর্ণ—তাঁহার জন্মের পূর্ব্বের যে সমস্ত দৈববাণী, আকাশে যে সকল মাঙ্গলিক চিহ্ন, তাঁহার মিসর দেশে পলায়ন, তাঁহার crucifixion ও পুনরুত্থান—এইরূপে অনেক ঘটনাবলী অপরাপর দেশে অপরাপর মহাত্মা ও অবতারের জীবনোপাখ্যানেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুনরায়, স্বস্তিক + (cross)

চিহ্ন প্রভৃতি অনেকানেক প্রতিরূপক চিহ্ন যাহা কেবল খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকেই আছে বলিয়া ইউরোপীয়গণ পূর্ব্বে জানিতেন, পরিব্রাজকগণ পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বত্রেই দেবমন্দির প্রভৃতিতে,পূজার দ্রব্যাদিতে সেই সকল চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে সকল ধর্ম্ম মধ্যেই ঐ সমস্ত প্রতিরূপক চিহ্ন বা তাহার অন্যতম পূর্ব্বে ছিল ও এখনও বর্ত্তমান আছে।

প্রথম স্রোতটী প্রবাহিত হইয়া এইরূপে চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত সমাজে অপরাপর পুরাতন ধর্ম্মের ও তৎসংক্রান্ত শাস্ত্রাদির সত্য প্রচার করায় সকলে দেখিতে পাইলেন যে তথাকথিত পৌত্তলিক হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম সমূহ ঘৃণার যোগ্য হওয়া দূরে থাকুক বরং অনেক স্থলে তাহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর, অনেক স্থলে আবার খৃষ্টধর্ম্মের সহিত উহাদের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হয়। এইরূপ দেখিয়া হয়ত অনেকে মনে করিতে পারিতেন যে, যে সকল ধর্ম্মকে পৌত্তলিক বলিয়া আমরা নিতান্ত অশ্রদ্ধা করিতাম, যখন তাহাদের ভিতর এরূপ উচ্চ নীতিশিক্ষা, এত উন্নতভাব লক্ষিত হইতেছে, এবং যাঁহাকে এতকাল আমরা একইমাত্র ঈশ্বরের পুত্র ও মানবের মুক্তির একইমাত্র সেতু বলিয়া জানিতাম, এক্ষণে তাঁহার তুল্য আরও অনেক মহাত্মা ও বহু অবতারের জন্ম সম্বন্ধে প্রাচীন অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলে বোধ হয় কালে কোন উচ্চতর সভ্যসমাজ আবির্ভূত হইয়া প্রচলিত সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক জনশ্রুতি মাত্র কহিতে পারে।' কাহারও কাহারও এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস অনেক শিথিল হইয়া পড়িত। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য যে এই পরিবর্ত্তনটী সাধারণ চিন্তাশীল মানবের মানসিক স্রোত সম্ভূত; শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ত্তৃক যতদুর হইতে পারে এখানে তাহাই হইয়াছিল মাত্র। সুতরাং অনেকের যে নানারূপ সন্দেহও জন্মিতে পারে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্ব শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া কিছুই দেখা হয় নাই—বাহ্যতঃ যতদুর পারা যায় দেখা হইয়াছিল। কাজেই সন্দেহ উপস্থিত হইবার পথ রোধ হয় নাই।

যে সময় পাশ্চাত্য-মহাদেশের বহুসংখ্যক সুপণ্ডিত ও মনীষীগণ এই অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বলবত্তর দ্বিতীয় স্রোতটী পৃথিবী মধ্যে

প্রবাহিত হইল—ইহা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন। ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবেন সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে—পৃথক পৃথক প্রণালী হইতে—এই একই আধ্যাত্মিক শক্তি নানারূপে সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল—উদ্দেশ্য সমগ্রজগৎকে ঈশ্বরাভিমুখী করা। পূজনীয়া হেলেনা ও শ্রদ্ধাস্পদ অল্‌কট্ মহোদয়—উভয়ে সম্মিলিত হইয়া একত্র সংযোগে উক্ত শক্তির একটী ক্ষুদ্র প্রণালিকা স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া (Theosophical Society) পরাবিদ্যা সমিতি সংস্থাপিত করিলেন। সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে এই সমিতির উদ্দেশ্যত্রয়ের প্রথমটীর দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে মনুষ্য মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা—তাঁহারা শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ—যে বর্ণবিশিষ্ট চর্ম্মের দ্বারা আবৃত হউন না কেন, তাঁহারা সকলেই আদি অন্ত বিহীন অবিনাশী জীব, সকলেই সেই একই অনন্ত পূর্ণব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা ছায়া স্বরূপ সন্তানপদবাচ্য। আমাদের ও প্রাচ্য অন্যান্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যখন সকলেই সমভাবে সেই ঈশ্বরেরই সন্তান, তখন জগতের আদি হইতে এপর্য্যন্ত কোন কালেই তিনি আমাদিগকে শিক্ষাবিহীন, উপদেষ্টা বিহীন করিয়া রাখেন নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে এক স্থানে উক্ত আছে যে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াই প্রথমেই তাহাদিগকে তাহাদের সংবর্দ্ধনের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥" ৩ অ ১০।১১

আদি সৃষ্টিকালে লোক সকল সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যজ্ঞ (sacrifice) করিতে উপদেশ দিলেন—তিনি কহিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা সংবর্দ্ধিত হও, ও এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টভোগপ্রদ হউক। ['দেব' অর্থে এখানে Shining ones or higher Intelligences যাঁহারা অন্তর ও বহিরেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা-রূপে স্থিত হইয়া আমাদিগকে চালাইতেছেন ও বর্দ্ধিত করিতেছেন, এবং আমরাও যজ্ঞের দ্বারা তাঁহাদের পুষ্টিসাধন করিতেছি (helping Their

evolution at the same time)। এখানে Cycle within Cycleএর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পে (Human kingdomএর) মানবরাজ্যের মধ্য দিয়া গমন (pass) করিয়া বর্হিষদ্ পিতৃ, অগ্নিষ্বাত্তপিতৃ প্রভৃতি হইয়া উচ্চ ও উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং যাঁহারা মানব দিগের শরীর মন প্রভৃতি দান করিয়াছেন, তাঁহারা অবিরাম আমাদিগকে সাহায্যদানে উন্নতিপথে লইয়া যাইতেছেন, এবং আমাদের কর্তৃক যজ্ঞাদি দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া চলিতেছেন। বর্হিষদ্ পিতৃগণ ক্রমে কল্লান্তে অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃদিগের স্থান প্রাপ্ত হইবেন।] তত্ত্বদর্শী ও আত্মদর্শী পুরুষ প্রয়োজন মতে সদাই মানবের হিতসাধনে উপস্থিত হইয়া থাকেন, ও মানবের ক্ষমতা ও অধিকারানুযায়ী শিক্ষা প্রদান করিতে থাকেন। সেই উপদেষ্টাগণ সাধারণ পুরুষ নহেন—তাঁহাদের অবিদিত নাই যে পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলেও সকলে একই সময়ে আইসেন নাই—কেহ অগ্রে কেহ বা পশ্চাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—কাহারও অল্প কাহারও বা বহুজন্ম অতীত হইয়াছে কাহারও জ্ঞান অধিক স্ফুরিত হইয়াছে, কাহারও বা সামান্য মাত্র অঙ্কুরিত হইতেছে। সুতরাং সেই মহাপুরুষগণ নানাস্থানে, নানাসময়ে, অধিকারী নির্ব্বিশেষে সামান্য বা উন্নতভাবপূর্ণ শাস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছেন—কিন্তু মূলে সকল উপদেশেরই লক্ষ্য এক, সকলই সেই পরমপদ পাইবার সোপান—এক সোপান অতিক্রম করিতে পারিলেই যেমন অপর উচ্চতর সোপানে উচ্চতর উপদেশের অধিকার জন্মায়, অমনি তদুপযুক্ত উপদেশ মানব লাভ করিতে থাকে। খৃষ্টান ধর্ম্মেও মহাত্মা যিশু সাধারণ লোকদিগের জন্য parables (গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা) ব্যবস্থা ও উচ্চ অধিকারীর জন্য (Mysteries of the Kingdom of Heaven) যোগশিক্ষা ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন—Saint John প্রভৃতি শিষ্যগণ যোগের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরাবিদ্যা সমিতির মধ্য দিয়া এই ভাবসমূহ পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রচারিত হইয়াছে। ভারত, মিসর, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য ভূমিতে যে আলোক কখন উজ্জ্বল জ্যোতিতে, এবং কখনও বা অতি মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল, কালবশে ও স্বভাবের পর্য্যায়-নিয়মানুসারে সেই আলোক বহুকাল যাবৎ এক ঘোর

তামসাবরণে আচ্ছাদিত হওয়ায় নির্ব্বাপিতের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছিল। 'Secret Doctrine', 'Isis Unveiled', 'The Voice of the Silence' প্রকাশিত করিয়া H. P. B. সেই আবরণের যেন একটী কোণ উত্তোলন করিয়াছেন। ইংরাজ ও ইংরাজীভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ সকল পুস্তক পাঠে অবগত হইবেন যে প্রাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রভৃতিতে পুরাতন সভ্যসমাজের কি সুন্দর ও গভীর চিন্তাস্রোতের পরিচয় সর্ব্বত্র ভূরি পরিমাণে বিদ্যমান। ইউরোপ যদিও বাণিজ্যে অভ্যুদয় ও জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে অদ্য পৃথিবীতে সকলের অগ্রগণ্য, আমার মতে আমেরিকা অদ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) কিন্তু পূজনীয়া হেলেনা সাহায্যে পাশ্চাত্য সভ্য জগতের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে তাঁহাদের সভ্যসাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, চীন ও মিসর রাজ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও বিবিধ বিদ্যা অতি উজ্জ্বল প্রভায় তাহাদের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল—যে তুলনায় আধুনিক সুমহৎ আবিষ্কারসমূহকে অবনত-মস্তক হইতে হয়। প্রাচ্য শ্রুতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সকল অতি সূক্ষ্ম গবেষণা দ্বারা যে অতি উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিল, উচ্চতা সম্বন্ধে যেরূপ ইউরোপীয় আল্‌প (Alps of Europe) অনন্ত তুষরাবৃত হিমাদ্রিসকাশে সুদূরপরাহতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আধুনিক পাশ্চাত্য শাস্ত্রসমূহও তত্তুলনায় সেইরূপ হইবে সন্দেহ নাই।

এই সকল শিক্ষা পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অনেকের মনের গতি কি পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং শিক্ষিত শ্রেণীর ভিতর কি এক অত্যাশ্চর্য্য অবস্থান্তর ঘটাইয়াছে তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে—আপনারা মনে মনে অনুমান করিয়া লউন। সমগ্র জগতে Theosophical Societyর বিস্তার ও অপরাপর দেশের সভ্যসমূহের কার্য্যশীলতা দর্শনে সহজেই উপলব্ধি হইবে। যাঁহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরের মনোনীত ও বিশেষ দয়ার পাত্র বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদের নিকটেই কেবল ঈশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা বশতঃ একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল যাঁহাদেব এতাবতা দৃঢ় ধারণা ছিল, এক্ষণে তাঁহারা সুস্পষ্ট দেখিতেছেন যে তাঁহারা সর্ব্বশেষে উহা পাইয়াছেন মাত্র, ও অতি পুরাকাল হইতে অধিকারী নির্ব্বিশেষে পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বিবিধ প্রকারে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, এবং তাঁহারা যেরূপ অদ্য

যিশু খৃষ্টকে সসম্ভ্রমে, একান্ত মনে ভক্তিপূর্ণ পূজা অর্পণ করিতেছেন; বহুকাল হইতে প্রগাঢ় চিন্তাশীল মানবগণ শ্রীকৃষ্ণ, (শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার) বুদ্ধদেব ও জোরোয়াষ্টার প্রভৃতি অবতারগণকে সেইরূপে নির্ম্মলান্তঃকরণে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ধ্যান পূজাদি করিয়া আসিতেছেন।

যাঁহারা H. P. B.র পুস্তক এবং উপদেশ কিছুমাত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষ অবগত আছেন যে একতা শিক্ষা দেওয়া ও জগতে একতা স্থাপনে সমধিক যত্ন প্রকাশ তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। একীকরণই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার কার্য্য। একই ঐশ্বরিক নিয়ম দ্বারা সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে —কি উচ্চস্তরে, কি নিম্নস্তরে, সর্ব্বত্রেই একই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম চলিতেছে—এই একত্ব সর্ব্বত্রে অনুভব করিতে পারিলেই মানবের সমস্ত জানা হইল। "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য বর্ণনার সময় এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত আমাদের জানা আবশ্যক যে প্রথম স্রোতের (Force from the Intellectual side) প্রবাহকালীন অনেকের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, এই দ্বিতীয় স্রোত (Force from the Spiritul side) বহনে, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবাহে সকলের লক্ষ্য অন্তর্মুখী হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের কারণ দূরীভূত হইল। চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজের অনেকে আগ্রহ সহকারে পূজনীয়া হেলেনার উপদেশ সকল গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মনিরত হইলেন ও সর্ব্বদেশীয় শাস্ত্রালোচনায় রত হইলেন।

অবশ্য এতদ্দ্বারা আমরা ইহা মনে করিবনা যে পাশ্চাত্য মহাদেশের সকলেরই একেবারে এরূপ মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে তাঁহারা সকলেই প্রাচ্য ধর্ম্ম সকলকে তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় সর্ব্বাংশে উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন—অনেকেই এখনও উহা স্বীকার করেন না। অতি অল্পমাত্রই খৃষ্টান দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা কহেন না যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য ধর্ম্মোপদেশক হইতে যিশুখৃষ্ট অনেকাংশে উচ্চতর, এবং তিনিই যথার্থ ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র—মানবের উদ্ধারার্থে জগতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক্ষণে এমত অনেক উন্নতমনা ও সরল প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা অকাতরে স্বীকার করেন যে

পারসী কিম্বা বৌদ্ধধর্ম্ম একজন পারসী কিম্বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর নিকট যেরূপ, তাঁহাদের Christianity'ও তাঁহাদের নিকট সেইরূপ—ঈশ্বর প্রাচ্যব্যক্তিদিগের নিকট প্রাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মধ্য দিয়া প্রকাশিত, এবং পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণের নিকট Christianity র মধ্য দিয়া প্রকাশিত। আরও প্রাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের কয়েকটী মহারত্ন—যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও কয়েকখানি বৌদ্ধ ও সুফী পুস্তক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচলিত দেশসমূহে প্রায়ই প্রতি ধর্ম্মশীল ও উদার প্রকৃতি সম্পন্ন পরিবার মধ্যে নিত্যপাঠ্য পুস্তক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে গত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত জগতে চিন্তাস্রোতের গতির এক অতি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবিধ জটীল প্রশ্নের কোন মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া 'অজ্ঞেয়ত্ববাদী' (Agnostics) ও 'জড়বাদী' (Materialists) দিগের অন্যতর দলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হওয়ায় এক্ষণে তাঁহাদের অনেকের মতি পুনরায় ধর্ম্মাভিমুখী হইয়াছে। এক্ষণে সকলে জানিয়াছেন যে সূর্য্যদেব একজনের জন্য কোন এক বিশেষ স্থানেই কেবল স্বীয় কীরণ দান করেন না, পরন্তু তাঁহার কিরণ জগতে শর্ব্বত্র সমভাবে বিকীরিত হইয়া স্থাবর জঙ্গম সকলকেই সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন। মর্ত্ত্য আমরা দৌর্ব্বল্যবশতঃ অনাবরিত নেত্রে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিনা—কখন লালরঙের, কখনও বা নীল রঙের কাচ লইয়া তন্মধ্য দিয়া দেখিয়া সূর্য্যকে লাল, নীল, প্রভৃতি নানারঙের নানাজনে কহিয়া থাকি। সুতরাং যিনি যেরূপে দেখিতে পান, তাঁহার বিশ্বাস সেইরূপেই দৃঢ় হইয়া থাকে। এই স্থলেই তিতিক্ষার শিক্ষা পাওয়া যায়—আমরা স্ব স্ব অজ্ঞানাবরণে আচ্ছাদিত থাকিয়া রূপাদি বর্জ্জিত, নিরাকার ব্রহ্মকে—সেই জগৎপোষক সূর্য্যকে—আবরণের ভিতর দিয়া দেখিয়া নানারূপে ধারণা করিতে চেষ্টা করি—সকলেই ন্যূনাধিক অজ্ঞান দ্বারা আবৃত—অতএব কাহারও মতাদিতে ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া আমাদের সকলেরই বুঝা উচিত যে আমাদের অজ্ঞানাবরণ অপসৃত হইলে সকলেই সেই ব্রহ্মকে একই ভাবে দেখিতে পাইব। যতদিন পূর্ণজ্ঞান কর্ত্তৃক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত না হয়, ততদিন কেহ একরূপ হইতে অধিক আলোক পাইয়া থাকেন, অপরে অন্যরূপ হইতে—সেই

জগৎপোষক সূর্য্য বা পরমাত্মার অন্যতম রশ্মি হইতে—অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন।

অতি পুরাকাল হইতে ক্রমশঃ সঞ্চালিত হইয়া যে চিন্তাস্রোত বহিয়া আসিতেছে, কিম্বা যে ভাবসমূহ ঐরূপে বাহিত হইয়া অন্য ধর্ম্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকই ঈশ্বরাংশে পূর্ণ। সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী যাঁহার নিকট আদরণীয় সেই প্রযত্নশীল পুরুষ বিবিধ শাস্ত্র মধ্যে একটীর পর অপর একটী, তৎপরে পুনরায় অন্য একটী, এইরূপে ধীরে ধীরে সত্যের পর সত্য দেখিতে পাওয়ায়, এবং সর্ব্বত্রে মূলে ঐক্য অবলোকন করাতে, তাঁহার অনুসন্ধানেচ্ছা ক্রমশঃ অধিকতর বলবতী হইতে থাকে—তখন তাঁহার সমীপে এই পৃথিবী মহানিধি পরিপূর্ণ এক বিশাল ক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। বহুকাল পূর্ব্বে হিন্দু ঋষিগণ যে সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মিসর দেশের শাস্ত্রাদি পাঠে তথাকার মহাত্মাদিগের দ্বারাও সেই পুরাতন হিন্দুমতসকল সমর্থিত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন। জোরোয়াষ্টার, (Zoroaster) পাইথাগোরস্ (Pythagoras), যিশুখৃষ্ট (Jesus Christ) প্রভৃতি সকল মহাত্মাগণই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দূর দেশে আবির্ভূত হইয়াও পরস্পর পরস্পরের মত মূলে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন—বাহ্যতঃ যদিও সামান্যাংশে পৃথক্, সারাংশে (in essence) সকলই একরূপ। সকল মহাত্মাগণ যে সকল সত্য সমভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, পরিশেষে সেই সত্যের দিকে তিনি সবলে আকৃষ্ট হইতে থাকেন, নিজের শাস্ত্রাদির উপর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্রোল্লিখিত সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েন—অপর ধর্ম্মাদির উপর রাগ, দ্বেষ তাঁহার হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করে। স্বধর্ম্মী ও শাস্ত্রাধ্যয়ন নিরত হইয়া সদা সকলের হিতসাধনে নিযুক্ত হয়েন এবং ক্রমে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী উচ্চতর সত্যের অনুসন্ধানে রত হয়েন। পরিশেষে জ্ঞানোদয়ে, সকল সত্যই সেই ব্রহ্ম এইপ্রকার একাকার জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

প্রথম পুরুষ। প্রলয় লীন, বাসনাবদ্ধ, পরমেশ্বর-বিমুখ জীবসকলের প্রতি করুণাবশতঃ শ্রীভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। বাসনাবদ্ধ জীব সৃষ্ট সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শুদ্ধ হইয়া মৎসাম্মুখ্য লাভ করুক, এইরূপ ইচ্ছা হইতেই শ্রীভগবানেব সৃষ্টীচ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সিসৃক্ষু পরমেশ্বর পুরুষরূপ স্বীকার পূর্ব্বক প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। ঐ ঈক্ষণে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার অপগমে স্পন্দনরূপ ক্ষোভাভিভব উৎপন্ন হয়। গুণক্ষোভে অব্যক্তা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হয়েন। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিলীনবৃত্তিসমূহের স্পন্দন বা অভ্যুদয়ই উহাদের ক্ষোভ। সত্ত্বাদি গুণত্রয় পরস্পরের অভিভব, উপকার, পরিণাম ও সংসর্গ দ্বারা নিজ নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে গুণত্রয়ের বৃত্তির অভ্যুদয়ে ক্রমান্বয়ে মহদাদি ক্ষিত্যন্ত তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হয়। প্রথম পুরুষই তত্ত্ব সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি মহাবিষ্ণু ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁর রূপ বিরাট।

দ্বিতীয় পুরুষ। মহদাদি ক্ষিত্যন্ত অসংহত কারণ-তত্ত্ব-সকলকে ত্রিবৃৎকৃত বা পরস্পর সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত প্রথম পুরুষ অংশতঃ বহুরূপ হইয়া উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই প্রবিষ্ট অংশই দ্বিতীয় পুরুষ। ইহাঁরা প্রবেশের পূর্ব্বে তত্ত্ব সকল অন্তর্নিহিত ক্রিয়া-শক্তি-প্রভাবে পরস্পর অসংহত অবস্থায় একমাত্র স্বাভাবিক সরল গতিতে অনন্ত আধারে নীহারবৎ সঞ্চরণ করিতে থাকে। সরল গতির দিক্‌পরিবর্ত্তন বা বক্রভাব বিরুদ্ধশক্তির প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার উক্ত বক্রভাব ব্যতিরেকে অবয়ব সন্নিবেশও সম্ভব হয় না। অতএব প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় পুরুষ প্রপঞ্চে অবতরণপূর্ব্বক স্বীয় প্রবল আকর্ষণদ্বারা তত্ত্ব সকলকে বক্রগতি প্রাপিত করিয়া থাকেন। এইরূপে তত্ত্ব সকল বক্রগতিবিশিষ্ট, ত্রিবৃৎকৃত, পঞ্চীকৃত চক্রাবর্ত্তে

আবর্ত্তিত ও আকুঞ্চিত হইয়া কৈন্দ্রিক আকর্ষণ অভিভব পূর্ব্বক কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করে। কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সকল দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হয় না; কারণ, সমষ্টির অবয়ব ব্যাষ্টিবস্তু সকল সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া উহার সমান্তর অক্ষরেখাতেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পুরুষ এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি গর্ভোদশায়ী ও প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনিও বিরাট-রূপী।

তৃতীয় পুরুষ। দ্বিতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম। স্থূল সৃষ্টির নিমিত্ত দ্বিতীয় পুরুষ হইতে বিবিধ অবতার সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, তাঁহাকেই তৃতীয় পুরুষ বলা হয়। ইনি ব্যাষ্টিজীবের অন্তর্যামী। ইনি ক্ষীরোদশায়ী ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকেন। ইনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ। ইহাঁকে অন্তর্যামী পরমাত্মাও বলা যায়।

গুণাবতার। স্থূলসৃষ্টি বা চরাচর সৃষ্টির নিমিত্ত গুণাবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সৃষ্টির নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা রজোগুণের অবতার, সংহারের নিমিত্ত সংহার কর্ত্তা তমোগুণের অবতার এবং পালনের নিমিত্ত পালনকর্ত্তা সত্ত্বগুণের অবতার। এই পালন কর্ত্তা সত্ত্বগুণাবতার বিষ্ণু ও পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পুরুষ একই। রজোগুণাবতারের নাম ব্রহ্মা, এবং তমোগুণাবতারের নাম শিব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতিরগুণ নিয়ম্য, অর্থাৎ পুরুষের নিয়মাধীন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবরূপে আবির্ভূত পুরুষ নিয়ামক, অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরিচালন কর্ত্তা। তাঁহারা যে ভাবে পরিচালন করেন, গুণ সকল সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। এইরূপ গুণের সহিত গুণাবতারের নিয়ম্য-নিয়ামকতারূপ সম্বন্ধকে যোগ বলা হয়। অতএব গুণাবতার সকল কখনই ঈদৃশ সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোনরূপ গুণযোগ প্রাপ্ত অর্থাৎ গুণবদ্ধ হয়েন না। তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব সান্নিধ্য মাত্র রজোগুণ ও তমোগুণের পরিচালক হয়েন এবং বিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্র সত্ত্বগুণের উপকারক হয়েন। অতএব বিষ্ণু কোন প্রকারেই সত্ত্বগুণের সহিত যুক্ত হয়েন না।

ব্রহ্মা। সমষ্টি বিরাড়্‌রূপ কারণ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি কেবল ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ

করেন, সেই সমষ্টিজীবাত্মক সূক্ষ্মরূপকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়; আর যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, সেই লোকাত্মক স্থূলরূপের নাম বৈরাজ। সূক্ষ্মরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক ও দেবাদির অগোচর; স্থূলরূপ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক ও দেবাদির গোচর। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনটিই উপাধি। স্থূলোপাধির নাম বিরাট। সূক্ষ্মোপাধির নাম হিরণ্যগর্ভ। আর কারণোপাধির নাম কারণ বা সমষ্টি-বিরাট্। তদুপহিত চৈতন্যই ব্রহ্মা এবং তদন্তর্যামী চৈতন্যই দ্বিতীয় পুরুষ। বৈরাজসংজ্ঞক ব্রহ্মা, সৃষ্ট ও বেদপ্রচারের নিমিত্ত প্রায়ই চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র, অষ্টবাহু হইয়া অভিব্যক্ত হয়েন। কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনা প্রভাবে ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। আর কোন কোন মহাকল্পে তাদৃশ জীবের অভাব হইলে,দ্বিতীয় পুরুষই অংশতঃ ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার জীবকোটিত্ব ও ঈশ্বরকোটিত্ব উভয় সিদ্ধ হইতেছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরাবির্ভাব অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মা অবতার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কেহ কেহ সমষ্টি-রূপ শ্রীভগবানের সন্নিকৃষ্টতা হেতু, অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মাকে সমর্থ জানিয়া শ্রীভগবান ক্ষীরনীরবৎ তাঁহাতে সম্পৃক্ত হইয়া অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন বলিয়া ব্রহ্মাকে অবতার বলেন, কেহ কহ বা তাঁহাকে আবেশাবতারই বলিয়া থাকেন।

শিব। শ্রীশিব একাদশব্যূহাত্মক রুদ্র নামে খ্যাত। ঐ একাদশব্যূহ যথা;—অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, তেজ, সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমান এই তাঁহার অষ্টমূর্ত্তি। তাঁহার দশ বাহু, পঞ্চবদন, এবং প্রত্যেক মুখে তিনটী তিনটী করিয়া নয়ন উক্ত হইয়া থাকে। প্রায়ই ব্রহ্মা শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। কোন কোন কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুই শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন কল্পে তাদৃশ পুণ্যকারী জীবও সংহারকর্ত্তা হয়েন। উক্ত ত্রিবিধ সংহারকর্ত্তাকেই গুণাবতার বলা হয়। কিন্তু যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নহেন; তিনি নির্গুণ এবং শ্রীনারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ, অর্থাৎ বিলাসমূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ। এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী।

বিষ্ণু। পূর্ব্বে যে তৃতীয় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই গুণাবতার বিষ্ণু।

লীলাবতার। শ্রীভগবানের যে সকল যে সকল অবতার আয়াসরহিত, বিবিধ বৈচিত্রপূর্ণ, নিত্যনূতন উল্লাসতরঙ্গদ্বারা তরঙ্গায়িত, স্বেচ্ছাধীন কার্য্য সকল সৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগকেই লীলাবতার বলা হইয়া থাকে। লীলাবতারসকল পূর্ণ, অংশ ও আবেশ ভেদে ত্রিবিধ। ঐ সকল লীলাবতারের মধ্যে অধিকাংশই অংশাবতার ও আবেশাবতার, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার। পূর্ব্বে যে স্বয়ং রূপের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্রীকৃষ্ণই সেই স্বয়ংরূপ। কল্পাবতার ও যুগাবতার সকল লীলাবতারেরই অন্তর্গত, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ পূর্ণ, কেহ অংশ ও কেহ আবেশ। শ্রীমদ্ভাগবতে অনেকগুলি লীলাবতারের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল লীলাবতার যথা—চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়শীর্ষ, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, ব্যাস, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। ইঁহারা প্রতিকালেই লীলার্থ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুদামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু এই চতুর্দশটী মন্বান্তরাবতার। মন্বান্তরাবতার সকলও লীলাবতার হইলেও ইঁহারা যে যে মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েন, সেই সেই মন্বন্তর কালপর্য্যন্ত পালন করাতেই, ইহাঁদিগকে মন্বান্তরাবতারই বলা হইয়া থাকে। যে মন্বন্তরে যিনি মন্বান্তরাবতার হয়েন, তিনিই সেই মন্বন্তরের যুগবিশেষে উপাসনা বিশেষের প্রচারার্থ যুগাবতার হইয়া থাকেন। চারিটী যুগের যুগাবতার চারিটী। সত্য যুগের যুগাবতার শুক্ল, ত্রেতা যুগের যুগাবতার রক্ত, দ্বাপর যুগের যুগাবতার শ্যাম, আর কলি যুগের যুগাবতার সচরাচর কৃষ্ণ। কলিতে কচিৎ পীতবর্ণ যুগাবতারও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চতুঃসন। যে চারিজনের নামের আদিতে 'সন' শব্দ বিদ্যমান, তাঁহারাই চতুঃসন বলিয়া উক্ত হয়েন। তাহাদের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহাদের আকার পঞ্চবর্ষীয় বালকের ন্যায় এবং বর্ণ গৌর। তাঁহারা জ্ঞান প্রচারার্থ আবেশরূপে ব্রহ্মা হইতেই ব্রাহ্মণ হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহারা ব্রহ্মকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার অধিকার পর্য্যন্ত

অবস্থান করেন। তাঁহাদিগের বাসস্থান ত্রিপাদ বৈভবে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক ও পাদবৈভবে প্রধানতঃ তপলোক, এবং কর্ম্ম জ্ঞানপ্রচার। সৃষ্টির অধোমুখ প্রবাহে অর্থাৎ মানব জাতির উৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বিশেষ কোন কর্ম্ম থাকে না। মানব জাতির উৎপত্তির পর তাঁহারা জ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্বকল্পীয় মহত্তম জীব। তাঁহারা পূর্ব্ব কল্পীয় জ্ঞানিচয় ভক্ত অতএব মুক্তির অধিকারী হইয়াও, মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া, সর্ব্বভূতের সেবা ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক, পরকল্পে ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট আবেশাবতার হইয়া স্বসঙ্কল্পিত মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

নারদ। ইনিও পূর্ব্ব কল্পীয় মহত্তম জীব এবং আবেশরূপে ব্রহ্মা হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মার অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ইনি শুদ্ধভক্ত এবং সৃষ্টির উর্দ্ধমুখ প্রবাহে অর্থাৎ মানব জাতির উৎপত্তির পর, জগতে শুদ্ধভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। ইঁহার বর্ণ শুভ্র এবং সর্ব্বভূতের সেবাই ব্রত।

(ক্রমশঃ)

একটি গান।

(কীর্ত্তনের সুর)

"ভূত ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।"

অসংখ্য তনয়ে, স্নেহে কোলে ল'য়ে
হৃদয় পীযূষ দানে।
(ওমা) লালিছ পালিছ, কতই যতনে
জাগিয়া রজনী দিনে॥

অনন্ত সে কোল, অচিন্ত্য অকূল,
কোটি বিশ্ব যায় ভাসে।
ছোট বড় আদি, অগণ্য সন্ততি
নিত্য তাহে পরকাশে॥

(ওমা) অগণিত সুত, হ'য়ে ক্রমোন্নত,
অন্তিমে চিনিবে তোকে।

(তাই) এত আয়োজন, ব্রহ্মাণ্ড সৃজন,
পূর্ণ চতুর্দ্দশ লোকে ॥

এই কাজ তরে, সবার উপরে
কিছু কিছু ভার আছে।
যে সব তনয়, · পালে সদা তাই,
টেনে লও তারে কাছে ॥

(ওমা) যে যেমন সুত, তাকে সেই মত,
দিয়াছ কাজের ভার।
(যেমন) মহাবীর হ'তে কাঠ বিড়ালাদি
সেবে রাম অবতার ॥

তরু লতা পশু, এরা অতি শিশু,
কোলে শুয়ে করে খেলা।
বালক মানব, শিখেছে হাঁটিতে,
পড়ে উঠে সারা বেলা ॥

ইন্দ্রাদি পবন, কিশোর সন্তান,
মায়ের আদেশ মতে।
জল বায়ু দানে, ছোট ভাইগণে
সেবা করে নানা মতে ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র, মা'র যুবা পুত্র,
(জগৎ) গড়িতে ভাঙ্গিতে পারে।
(তাই) ছোট ভাই লাগি, নির্ব্বাণ তেয়াগি,
লক্ষ কল্প সেবা করে ॥

(ওমা) যে অবোধ ছেলে, তব কাজ ভুলে,
ধূলি মাটি ল'য়ে থাকে।
বলিহারি দয়া, স্তন সুধা দিয়া,
তাকেও রেখেছ বুকে ॥

ব্রহ্মময়ী তারা, ওমা সারাৎসারা,
এই ভিক্ষা সদা চাই।
(যেন) জনমে জনমে, করমে করমে
তব সেবা করে যাই ॥

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

আমি ও আমার দেহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বর্লোক। মনোময় কোষ।

ভুবর্লোক যেমন প্রেতলোক ও পিতৃলোক নামক দুই অংশে বিভক্ত, স্বর্লোকেরও সেইরূপ নানা অংশ আছে। ভুবর্লোকের দেহত্যাগের পর সাধারণতঃ মানবগণ স্বর্লোকের যে অংশে গমন করিয়া থাকেন তাহার নাম 'চন্দ্রলোক'। কৌষিতকী উপনিষদ্ এই চন্দ্রলোককে স্বর্গের দ্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যশ্চন্দ্রমাঃ। ১।২

চন্দ্রমা স্বর্গলোকের দ্বার।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ও বলেন, মানবগণ "পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং" পিতৃলোক হইতে চন্দ্রে গমন করিয়া থাকেন। এই পথের নাম 'পিতৃযান' বা 'ধূমযান'। সাধারণ মানব এই পথেই পরলোক যাত্রা করিয়া থাকেন।

চন্দ্রলোক ভিন্ন "সূর্য্যলোক", "ইন্দ্রলোক" প্রভৃতি স্বর্লোকের আরও নানা অংশ আছে। সেই সকল অংশে পুণ্যাত্মারা বিশেষ বিশেষ সৎকার্য্য নিবন্ধন গমন করিয়া থাকেন। এক এক প্রকার পুণ্যের জন্য এক এক ভাগ নির্দ্দিষ্ট—যাঁহার যেমন কার্য্য তাঁহার সেইরূপ লোকপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

সৎকর্ম্মের ফল সুখ, অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ। যাহা হীনকামনা সঞ্জাত তাহাই অসৎকর্ম্ম। অসৎ কর্ম্মের ফলে আমাদের কামময় দেহের স্থূলাংশ পুষ্টিলাভ করে, আমাদের প্রেতলোকে অবস্থিতির সময় বাড়িয়া যায়, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই স্থূলাংশ ক্ষয় না হইলে আমরা ঊর্দ্ধতর লোকে গমন করিতে পারি না। প্রেতলোকে অবস্থান সুখকর নহে, পরন্তু ইহলোকে যাহারা হীন কামনানলে অবিরত ঘৃতাহুতি দিয়া আপন কামময় দেহের স্থূলাংশ বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছে তাহাদের পক্ষে তথায় অবস্থিতি অশেষ যন্ত্রণাদায়ক। অন্তরে ঘোর কামনা অথচ স্থূলদেহ বিহনে তাহার তৃপ্তির উপায় নাই, নিজের কামনানলে নিজেই পুড়িয়া ছারখার হইতেছে—ইহারই নাম "নরক ভোগ"। কামময় দেকের স্থূলাংশ দ্বারা এই ভোগ হয় বলিয়া

শাস্ত্রকারেরা উক্ত অংশের নাম দিয়াছেন,—"যাতনাদেহ"। বলা বাহুল্য এই যাতনাদেহ যে পরিমাণে পুষ্টি লাভ করে নরকভোগও সেই পরিমাণে হইয়া থাকে। ভোগের দ্বারা এই দেহ ক্রমশঃ যত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে আমরা ততই ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে গমন করিতে থাকি। অবশেষে কামময় দেহ যখন একেবারে ঝরিয়া পড়ে তখন আমরা মনোময় কোষের সূক্ষ্মতর অংশ লইয়া সুখের আলয় স্বর্লোকে গমন করি। উচ্চ চিন্তা ও পবিত্র কামনা দ্বারা মনোময় কোষের এই অংশ পুষ্টি লাভ করে, সুতরাং আমরা যে পরিমাণে উচ্চ চিন্তা ও পবিত্র কল্পনা সমূহকে হৃদয়ে স্থান দান করি সেই পরিমাণে আমাদের নরক-ভোগ কালের হ্রাস ও স্বর্গ-ভোগ কালের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পবিত্র কামনা সঞ্জাত এক একটী সৎকর্ম্ম আমাদের স্বর্গস্থ প্রাসাদের এক একখানি ইষ্টক। কোন সৎকর্ম্ম করিবার পর আমরা ইহলোকে মনে মনে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকি তাহা স্বর্গ সুখেরই ছায়া।

ভুবর্লোকে 'মৃত্যু'র পর মানব যখন স্বর্লোকে প্রবেশ করেন তখন তিনি যে অপার আনন্দ, যে অতুলনীয় শান্তি উপভোগ করেন তাহা বর্ণনা করা পার্থিব লেখনীর সাধ্য নহে। হিরণ্ময় দিব্যালোকের ছটায়, মনোমুগ্ধকারী অলৌকিক বর্ণ বৈচিত্র্যের ঘটায়, মধুর হইতে মধুরতর জ্ঞানতরঙ্গের ক্রীড়ায় দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত, উল্লাসিত, প্লাবিত, হিল্লোলিত—ফলে মধু, ফুলে মধু, ওষধিতে মধু, জলে মধু, স্থলে মধু, বায়ুতে মধু—'যে দিকে ফিরাই আঁখি মধুময় সবই দেখি।' তাহার পর সেই মধুময় সাগরের মধ্য হইতে যখন প্রিয়জন সমূহের দুঃখক্লেশহীন প্রফুল্ল মুখমণ্ডল স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া একে একে ভাসিয়া উঠিতে থাকে, তখন মন যে অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া যায়, তাহা বর্ণনা করা দূরে থাকুক, কল্পনা করাও ইহলোকে অসাধ্য। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এ বিষয়ে একমত,—প্রত্যেকেরই মতে স্বর্গসুখ বর্ণনাতীত।

এক্ষণে কথা উঠিতে পারে, এক স্থান বা এক অবস্থা সকলের পক্ষে কি করিয়া সম্পূর্ণ ও সমান সুখজনক হইতে পারে। রুচি বা মনের গতির উপর সুখ নির্ভর করে; আপনার যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাতে না হইতে পারে,—ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। ভোজনবিলাসী ভোজনে,

লম্পট লাম্পট্যে, জ্ঞানী জ্ঞানালোচনায় সুখী। এই ত্রিবিধ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কি একই অবস্থায় সমান সুখী হইতে পারে? এ কথার প্রথম উত্তর এই যে স্বর্গে লম্পট বা ভোজনবিলাসীর স্থান নাই, যতক্ষণ নীচ কামনা বর্ত্তমান, ততক্ষণ স্বর্গে প্রবেশাধিকার হয় না। কিন্তু বলিতে পারেন, যাঁহাদের এরূপ হীন বাসনা নাই তাঁহাদেরও ত সকলের রুচি সমান নহে। মনে করুন একজন সঙ্গীতজ্ঞ, একজন চিত্রকর ও একজন দার্শনিক। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের রুচি ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকারের, সুতরাং ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ও সমানভাবে সুখী করিতে গেলে প্রত্যেকের জন্ম বিভিন্ন অবস্থার প্রয়োজন।

প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু স্বর্লোকে এই প্রয়োজন সহজেই সিদ্ধ হয়, কারণ প্রত্যেক স্বর্লোকবাসী আপন আপন পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিজ রুচি অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের প্রত্যেক চিন্তা সূক্ষ্ম মনোময় জগতে আকাব ধরিয়া আবির্ভূত হয়। স্থূল জগতে সে মূর্ত্তিগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু স্বর্লোকে সেগুলি প্রত্যক্ষ করা যায়, কারণ সেগুলি স্বর্লোকের উপাদান দ্বারাই নির্ম্মিত। সুতরাং চিন্তা মাত্রেই তথায় বাঞ্ছিত বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ হয়। যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই যদি তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, কোন বিষয়ে অভাব হইবা মাত্রই যদি তাহা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে সুখের পথে কোনই বাধা থাকে না। মনে করুন আপনি এক জন চিত্রকর—চিত্রাঙ্কনে ও চিত্র দর্শনে আপনার পরমানন্দ। স্বভাবতঃ আপনার মনে কত মনোহর কল্পনা উদিত হইতেছে কিন্তু ইহজগতের স্থূল যন্ত্রাদির অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি নানা কারণে তাহা ফুটাইতে পারিতেছেন না। আদর্শ মনে জাগিতেছে, তাহাকে ধরিবার জন্ম মন ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না। এজন্ম আপনি ক্ষুব্ধ, অসুখী। স্বর্লোকে কিন্তু এরূপ ক্ষোভের কারণ থাকে না। কল্পনামাত্রেই আপনার আদর্শ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়। আপনি মনে মনে যে কোন সুখের ছবি আঁকুন, তৎক্ষণাৎ তাহা আপনার করায়ত্ত হইবে। ফলতঃ এইরূপে তথায় প্রতেকেই আপন আপন স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন; সুতরাং কাহারও কোনরূপ অসুখের কারণ বর্ত্তমান থাকে না। সেখানে

সকলেই সুখী এবং সম্পূর্ণরূপে সুখী—ইহলোকের তুলনায় ইহাই স্বর্লোকের বিশেষত্ব।

(ক্রমশঃ)
শ্রীমন্মথমোহন বসু।

শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃতি বহুকালে যে উন্নতি সাধন করেন, মানব চেষ্টা করিলে অতি অল্পকালে তাহা ঘটাইতে পারে। একটি বালককে যদি উদ্দাম ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কোনরূপ training বা শিক্ষা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সে প্রকৃতির ধাক্কা খাইতে খাইতে সমগ্র জীবনে যেটুকু উন্নতি লাভ করিবে, যথাবিধানে শিক্ষা দিলে হয়ত এক বৎসরের মধ্যে তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধির ততটুকু উন্মেষ সাধন করা যাইতে পারে। মনে করুন একটি বালক লেখা পড়া না শিখিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বাল্যকাল কাটাইল। যথা সময়ে বিবাহ করিল এবং অল্পকাল মধ্যে স্ত্রী পুত্রাদি প্রতিপালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইল। জীবিকার উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অল্প মূল ধন লইয়া একটি মণিহারীর দোকান খুলিল। দোকানটি উত্তমরূপে চালাইবার জন্য তাহাকে নানাস্থানে গিয়া নানা দ্রব্যের দাম জানিতে হইল, প্রত্যেক জিনিষের দর মনে রাখিতে হইল, খরিদদারদিগের স্বভাব প্রকৃতি বিচার করিতে হইল, কোন্ দ্রব্যে অধিক লাভ হইবে কল্পনা ও যুক্তি দ্বারা স্থির করিতে হইল। এইরূপে অল্পে অল্পে তাহার স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক শক্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। উক্ত ব্যক্তিকে যদি বাল্যকালে কোন বিদ্যালয়ে যথানিয়মে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ৫ বৎসরেই তাহার শক্তিগুলির এরূপ উন্মেষ হইতে পারিত যাহা দোকানদারি করিয়া সে সমগ্র জীবনেও লাভ করিতে পারিবেনা।

অতএব স্কুল বিদ্যালয় যে কতদূর প্রয়োজনীয় ও হিতকর আমরা কতকটা বুঝিলাম। ইহা যে কেবল ইহ জীবনে গ্রাসাচ্ছাদন এবং যশ মানাদি লাভের সুবিধা করিয়া দেয় তাহা নহে, পরন্তু আমাদের প্রচ্ছন্ন শক্তিনিচয়ের বিকাশ

সাধন করিয়া অনন্ত জীবনে সহায়তা করে। এখন আদর্শ শিক্ষা কিরূপ এবং বর্ত্তমান বিদ্যালয়াদি ঐ আদর্শের কতদূর অনুবর্ত্তন করে তাহা দেখা যাউক। আদর্শ শিক্ষা কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য ইহা বিচার করিতে হইলে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীব মাত্রে ব্রহ্মের যাবতীয় শক্তি অব্যক্ত আছে। এই শক্তিগুলিকে পরিস্ফুট করা অর্থাৎ প্রত্যেক জীবকে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর করিয়া তুলা—ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, জীবনের উদ্দেশ্য, সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি আছে, যথা সৎ বা ক্রিয়াশক্তি, চিৎ বা জ্ঞানশক্তি এবং আনন্দ বা ইচ্ছাশক্তি। যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম কোটি কোটি সূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ, চন্দ্র, জল, বায়ু, আকাশ, গিরি, নদী, সমুদ্র, যক্ষ, রক্ষ, মানব, দেবতা, পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষাদি সমন্বিত এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি বা রচনা করিতে পারেন, সেই রচনাশক্তির নামই সৎ বা ক্রিয়াশক্তি। যে শক্তি দ্বারা তিনি কোন্‌টি কোথায় স্থাপন করিতে হইবে, কোন্‌টির দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে ইত্যাদি বুঝিতে, জানিতে, বিচার করিতে পারেন, সেই অনন্ত জ্ঞানশক্তির নামই চিৎ। এবং যে শক্তি দ্বারা তিনি কৃপা পরবশ হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং অসংখ্য জীবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ক্রমোন্নত করিতেছেন, সেই অসীম, অগাধ প্রেমই আনন্দ বা ইচ্ছা-শক্তি। প্রত্যেক জীবে এই তিনটি শক্তি—সৎ, চিৎ ও আনন্দ অস্ফুটভাবে আছে। ইহাদের পূর্ণ বিকাশই আদর্শ শিক্ষা। যে শিক্ষা যে পরিমাণে এই শক্তিত্রয়ের বিকাশ সাধনে সমর্থ, সেই শিক্ষা সেই পরিমাণে আদর্শের নিকটবর্ত্তী।

প্রত্যেক মানবে এই তিনটি শক্তি কিছু না কিছু বিকশিত হইয়াছে। দেখা যায় মানব মাত্রই কিছু না কিছু গড়িতে, প্রস্তুত করিতে, নির্ম্মাণ করিতে পারে। যাবতীয় কলা বিদ্যা (Arts) যথা কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ইত্যাদি এই ক্রিয়াশক্তিরই পরিচয় দিতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে এই ক্রিয়াশক্তিটী বেশ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কলের গাড়ী, জাহাজ, অট্টালিকা, চিত্র, প্রস্তর মূর্ত্তি, টেলিগ্রাফ, কল, কারখানা, বাদ্যযন্ত্র, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, ব্যোমযান, বন্দুক, কামান, টেম্‌স্‌টনেল প্রভৃতি কত নাম করিব—সমস্তই সেই অনন্ত ক্রিয়াশক্তির বিকাশ ঘোষণা করিতেছে।

আবার মানবের চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার, ধ্যান, ধারণা, স্মৃতি, বুদ্ধি, মেধা, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—প্রভৃতি সেই অসীম চিৎ শক্তির পরিচায়ক। এবং দয়া, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, উপচিকীর্ষা, ত্যাগ, বৈরাগ্য,—সেই অনন্ত আনন্দ বা ইচ্ছাশক্তিরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

অতএব আদর্শ শিক্ষা দিতে হইলে আমাদিগকে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ রাখিতে হইবে,—ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি। Manual training অর্থাৎ নানাবিধ দ্রব্যগঠন শিক্ষা দ্বারা প্রধানতঃ ক্রিয়া-শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়; বিজ্ঞান, গণিত, ও দর্শনাদির চর্চ্চা দ্বারা চিৎশক্তি উদ্বোধিত হইতে থাকে এবং কাব্য, সঙ্গীত, আদর্শ-চরিত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি দ্বারা মুখ্যতঃ ইচ্ছাশক্তি বা প্রেমভাব জাগিয়া উঠে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মোটামুটি এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া শিক্ষাকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন;—১ম Physical and Manual training, ২য় Intellectual training, ৩য় Moral and Spiritual training. কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তিনটি শক্তিরই সামঞ্জস্য পূর্ণবিকাশ (Harmonious development) চাই, একটিকে অযথা বিকাশিত করিয়া অপর গুলিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিলে আদর্শ শিক্ষা হইবে না।

এই আদর্শটি সম্মুখে রাখিয়া বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি পরীক্ষা করিলে তাহাদের দোষ ও ত্রুটি আমরা সহজেই দেখিতে পাইব। মনে করুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ইহাতে ক্রিয়াশক্তি ও চিৎশক্তির বিকাশের বেশ বন্দোবস্ত আছে। বালকগণকে বাক্স, টেবিল, টুল, ছুরী, কাঁচি, পেরেক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য নিজ হস্তে প্রস্তুত করিতে হয় এবং বিজ্ঞান, গণিত, জরিপ, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কঠিন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহা দ্বারা প্রথমোক্ত শক্তিদ্বয়ের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু শেষোক্ত শক্তিটি আদৌ অনুশীলিত হয় না। আবার যাঁহারা এল্, এ, বি, এ, পড়েন, তাঁহাদের জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি কতক পরিমাণে অনুশীলিত হইলেও, manual training আদৌ না থাকায় ক্রিয়াশক্তিটি খর্ব্ব হইয়া পড়ে। এখন স্কুল-গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। এখানে কেবল মাত্র জ্ঞানশক্তি বিকাশের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই বোধ হয়;—ক্রিয়াশক্তি ও প্রেমভাব উদ্দীপিত

করিবার বন্দোবস্ত এতই কম যে নাই বলিলেও চলে। বর্ত্তমানে ড্রইং ও ড্রিলের দ্বারা ক্রিয়াশক্তির বিকাশ কিঞ্চিৎ হয় বটে, কিন্তু কোমল কবিতা বা সাহিত্য (যে গুলির দ্বারা পূর্ব্বে বালকদের প্রেমভাব জাগিত) সেগুলিকে ঝাঁটাইয়া দিয়া তৎস্থানে বিজ্ঞান-পাঠ, বিজ্ঞান-রীডার প্রভৃতি বসাইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ বালকদের ইচ্ছাশক্তি বিকাশের পথে কাঁটা দিয়াছেন।

আমরা দেখিলাম শিক্ষার উদ্দেশ্য, জীবনের উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক। অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া ভগবানে মিশিয়া যাওয়া। ইহাই আদর্শ। এই আদর্শটি হিন্দুর একান্ত নিজস্ব—অতি আদরের ধন—বড়ই প্রিয়বস্তু। এই আদর্শ লাভের জন্য ঋষিগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, এই আদর্শ উপনিষদে বজ্রগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইয়াছে, বেদান্ত সাংখ্যাদি ইহারই পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু হায়, আজ আমরা শিক্ষার এই আদর্শ হারাইয়াছি। অধিকাংশ ব্যক্তি আজকাল মনে করেন দুপয়সা রোজগার করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, যেন ইহ জীবনই সব,—এই জীবনটি ফুরাইলেই সব ফুরাইল। আমরা যে অমৃতের পুত্র, আমাদের যে একটা অনন্ত জীবন আছে আজি হিন্দুসন্তান তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা এক জন্মে যাহা কিছু লাভ করি,—যে জ্ঞান, যে বুদ্ধি, যে প্রেম, যে ভক্তি,—যাহা যাহা অর্জ্জন করি তাহার বিন্দুবিসর্গও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, সমস্তই আমাদের সূক্ষ্মদেহে ও কারণদেহে বীজরূপে সঞ্চিত থাকে। পরজন্মে সমস্তই সংস্কার-রূপে প্রাপ্ত হই এবং ইহাদিগকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া আরও অগ্রসর হইতে থাকে। এ জন্মে যে class এ promotion পাইলাম, পর জন্মে সেই ক্লাশ হইতেই পড়া সুরু হইবে, যাহা পড়া হইয়া গিয়াছে আর তাহা পড়িতে হইবে না। এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্মে ক্রমোন্নত হইয়া আমরা অনন্ত জীবন লাভ করি। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যাঁহারা দৃঢ়ব্রত, অধ্যবসায়ী, বলবান্ ও সাহসী তাঁহারা লক্ষ লক্ষ জন্মের কাজ কয়েক জন্মেই সমাধা করিয়া লইতে পারেন।

আমরা এই অনন্তজীবনের কথা ভুলিয়া ইহ জীবনকেই একমাত্র সার মনে করিতেছি। সুতরাং আমাদের শিক্ষার আদর্শও খুব সঙ্কীর্ণ,—খাট হইয়া গিয়াছে। যাহা ইহ জীবনে কাজে লাগিবে, বালকদিগকে তাহা

শিখাইলেই যথেষ্ট হইল, যাহা কাজে লাগিবে না—তাহা শিখাইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা কেন—এ কথাও আমরা বলিয়া থাকি। সংস্কৃত ভাষাতে আফিসে চিঠি পত্রাদি লিখিতে হয় না, এবং সাহেবদের সহিত কথাও কহিতে হয় না, সুতরাং সংস্কৃত শিখিবার প্রয়োজন কি? এই সময়টা বরং ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় কিংবা Short hand লিখনে অতিবাহিত করিলে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়—এরূপ কথা অনেকের মুখে শুনা যায়। আমরা কেবল এই ক্ষুদ্র জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ের গুরুত্ব নিরূপণ করি। অবশ্য, বালকদিগকে যে ইংরাজি শিখান কর্ত্তব্য নহে অথবা যে সকল জ্ঞানলাভ করিলে তাহাদের ইহজীবন সুখস্বচ্ছন্দে কাটিবে সে সকল জ্ঞান প্রয়োজনীয় নহে—একথা আমি বলিতেছি না। আমার অভিপ্রায় এই যে ধন, মান, যশ, প্রভাব, প্রতিপত্তি ইত্যাদি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; ইহার একটি গুরুতর, গভীর, বিরাট্ উদ্দেশ্য আছে। এবং তাহা আমাদিগকে অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করা।

অতএব শিক্ষক ও অভিভাবকদিগের দায়িত্ব বড়ই গুরুতর। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে বালকদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁহারা দায়ী। নিত্য নির্দ্দিষ্ট পাঠটি লইলেই শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল না, বালকগণের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির বিকাশসাধনে তাঁহাকে অনুক্ষণ স্বতঃ পরতঃ যত্ন করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের দেশে অভিভাবকগণের সাধারণতঃ বড়ই শৈথিল্য দেখা যায়। তাঁহারা ভাবেন বালককে একটা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া মাসে মাসে তাহার বেতনটা যোগাইতে পারিলেই তাঁহাদের দায়িত্ব ফুরাইল। বালক শিক্ষকের নিকট যতক্ষণ থাকে, তাহার অন্ততঃ চারি গুণ সময় সে বাড়ীতে থাকে; সুতরাং শিক্ষক অপেক্ষা তাঁহাদের দায়িত্ব চারি গুণ অধিক—এ কথা তাঁহাদের মনেই হয় না। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত প্রকৃত শিক্ষাদাতা—তাঁহারাই, শিক্ষকগণ তাঁহাদের সাহায্যকারী মাত্র।

হে শিক্ষক ও অভিভাবক মহোদয়গণ। আপনারা বড়ই সৌভাগ্যবান্, কারণ আপনারা প্রতিমুহূর্ত্তে জগন্মাতা প্রকৃতিদেবীর সেবা করিবার সুযোগ

পাইয়াছেন। করুণাময়ী প্রকৃতিদেবী তাঁহার অসংখ্য সন্তানগুলিকে ক্রোড়ে ধরিয়া অনন্ত কাল শিক্ষা দিতেছেন। যে ব্যক্তি এমন দয়াময়ী জননীর সাহায্য করিতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক। ঐ শুনুন—স্নেহময়ী জগজ্জননী আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া তারস্বরে কি বলিতেছেন:—"বাছারে, ছোট ছোট সন্তানগুলি আমার বড়ই আদরের ধন; তাহারা অবোধ ও অজ্ঞান, আর কাহাকেও জানে না, সদাই 'মা' বলিয়া আমার মুখপানে তাকায়। তাই আমি তাদের বড়ই ভালবাসি। অনেক কাল লালন পালন করিয়া তো'দিগকে কতকটা উপযুক্ত ও কর্ম্মক্ষম করিয়া দিয়াছি। তবে আয়, বাছা, আয়! তোদের মায়ের কিছু ভার লাঘব কর্।" আহা! মা'য়ের এই করুণ বাক্য শুনিতে পাইলে আপনারা এক মুহূর্ত্তও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, আনন্দে, উৎসাহে প্রেমে হৃদয় উৎফুল্ল হইবে, ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে বলিতে থাকিবেন "মা। বিশ্বজননি !! জগৎপালিনি !! তোর সেবা করিব না তো আর কার সেবা করিব মা? তুই কোটি কোটি কল্প অহর্নিশি জাগিয়া কীট পতঙ্গ পশু চণ্ডাল হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পর্য্যন্ত অসংখ্য সন্তানকে স্তন্যদানে পরিবর্দ্ধিত করিতেছিস। এমন মা আর কোথায় পাব? তুই যে আমার উপর একটু ভার দিলি, তাতেই আমি কৃতার্থ! তোর সেবা করিতে পারিলেই আমার জীবন ধন্য !! এখন এই কর্ মা, যেন সর্ব্বদা তোর সেবাতেই রত থাকিতে পারি, যেন "প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ"—প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, "যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং"—যাহা কিছু করিব তাহা যেন তোরই পূজা হয়, তোরই সেবা হয়।"

কর্ম্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেদান্ত দর্শনে বিজ্ঞানময় কোষকে আমাদিগের সাধারণ কর্ম্মের "কর্ত্তা" বলা হয়। মহামতী বেসান্ত বলিয়াছেন,—"Corresponding to Spiritual, the highest plane, we have the Spiritual or Auric body (the Karanopadhi) the Causal body or "Body of Manas", in which spiritual action resides : Atma working in Buddhi and partly illuminating the developing Soul, or Manas." বিজ্ঞানময় কোষের স্ফুরণের জন্যই আমাদিগের পৃথিবীতে অভিজ্ঞান এবং কার্য্য। মনোময় কোষে বাসনার উদ্রেক এবং প্রাণময় কোষ দ্বারা তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। মনোময় কোষ সাহায্যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। বিজ্ঞানময় কোষে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত থাকে, এবং অতীত জন্মকাহিনী সমস্তই গোচরীভূত রহে ; ভবিষ্যৎ উন্নতি ও পূর্ণতা বীজভাবে নিহিত থাকে। পক্ষীডিম্বে যেমন পক্ষীত্ব, এই মানবডিম্বে, বিন্দুরূপী বিজ্ঞানময় কোষে, মানবের পূর্ণতা নিহিত আছে। বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বের অস্তিত্ব যেইরূপ ভগবানের বহু হইবার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আছে,—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—সেইরূপ মানবজন্ম ও মানবের কর্ম্ম এই বিজ্ঞানময় কোষস্থ জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।

জীবাত্মা ভগবানেরই অংশ ; অতএব ভগবানের সেই সৃজন-ইচ্ছা জীবাত্মায়ও বর্ত্তমান। পুনশ্চ যেইরূপ, দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইলে, দর্পণ-প্রতিবিম্বিত-সূর্য্য-রশ্মিতেও সূর্য্যের তেজ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ মানব-জীবাত্মা বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাঁহার সেই প্রসরণ-ইচ্ছাও বিজ্ঞানময় কোষাবদ্ধ জীবে দেখা যায়। সেই ইচ্ছা হইতেই জীবন-সূত্র বাহির হয়, এবং জালের মত প্রসারিত হইয়া তাহাতে নিম্নলোকের অণুর আবরণ লয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেমন একগাছি জীবন-সূত্র ক্রমান্বয়ে মানস-তত্ত্বের, ভুবর্লোকীয় অণুতে ও পার্থিব অণুতে আবদ্ধ আছে।

এই নির্দ্দিষ্ট অণুগুলির স্পন্দনের উপর মানবের সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ নির্ভর করে। প্রলয়াবসানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভবের সহিত মানবরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পুনর্জীবনের ঐক্যতা আছে। তাহা এই স্থানে বিশদরূপে দেখাইতে আমরা চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সৃষ্টি হইতে হইলে তিনটি বিষয় আবশ্যক,— (১) ঈশ্বরের ইচ্ছা, (২) মায়া বা স্বভাব এবং (৩) কালশক্তি। দিবসের পর রজনী, রজনীর পর পুনরায় দিবস; বৎসর বৎসর, ঋতুর নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনুবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তন; এইরূপ যুগের পর যুগ, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, এক শক্তিপ্রভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাই ভগবানের কালশক্তি। কাল উপস্থিত হইলেই গুণের ক্ষোভ হয়; এবং গুণের ক্ষোভ হইলেই প্রকৃতির পরিণাম হয়। এই পরিণাম আবার পূর্ব্ব কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। ইহাকেই মায়া বা স্বভাব বলা হয়। আমরা এ সব কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। আরও বলা হইয়াছে যে "এই পূর্ব্বকর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই ভগবান বহু হইবার ইচ্ছা করেন।" মানবজন্ম ব্যাপারেও ঠিক তাহাই অভিনীত হয়। মৃত্যুর পর কারণশরীরে অবস্থানের সময়, মানবচৈতন্য আত্মগত থাকে। অবশেষে উপযুক্ত সময় আসিলে, তাহার পূর্ব্বকর্ম্ম জীবকে বহির্মুখী করিয়া দেয় এবং সে তাহার পূর্ব্ব সংস্কার অনুযায়ী সূক্ষ্ম শরীর গঠন করিয়া লয়। তাহার পর কর্ম্মদেবতারা আকাশের গুপ্তচিত্র পরীক্ষা করিয়া তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী ছায়া শরীর নির্ম্মাণ করেন; এবং যে সময়ে, স্থানে, জাতিতে এবং যে মাতাপিতার নিকট আবির্ভূত হইলে তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলভোগের সুযোগ হইবে তথায়, তাহার উপযুক্ত মাতার গর্ভে তাহার স্থূল দেহের বীজ নিহিত করেন। মাতৃ জরায়ু মধ্যে তাহার স্থূলদেহ তাহার ছায়া শরীরানুরূপ গঠিত হইতে থাকে।

পূর্ব্ব কর্ম্মের জন্য মানবকে যে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেই রোগের বীজ মানবের ঐ ছায়াশরীরে নিহিত থাকে। যদ্যপি কেহ এইরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন যে ১০ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহাকে অন্ধ হইতে হইবে, বা ৩২ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহাকে কোনও ভীষণ ব্যাধিগ্রস্থ হইতে হইবে, তাহা হইলে কর্ম্মদেবতা তাঁহার ছায়াশরীর এইরূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন যে,

স্থূল শরীর তদনুযায়ী গঠিত হওয়ায় ১০ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি অন্ধ হন বা ছায়াশরীরে এইরূপ রোগবীজ নিহিত করেন যে তিনি ৩২ বৎসর বয়ক্রম পাইবা মাত্র, সেই ব্যাধি প্রকট হইয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে।

পূর্ব্ব জীবনের ভাবনা, সঙ্কল্পাদির উপর মানবের আন্তরিক যোগ্যতা নির্ভর করে। সেইরূপ তাহার আকার, তাহার রূপ, গৃহ, আত্মীয়, সমৃদ্ধি ইত্যাদি পূর্ব্ব জন্মের তাহার শারীরিক কর্ম্ম অনুসারে মানব প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান জীবনে যদ্যপি কেহ অনশনকে আহার, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে ঔষধ দিয়া থাকেন; যদ্যপি কাহারও শোকাশ্রুর অপনোদন, অভাবের মোচন করিয়া দিয়া থাকেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরজন্মে তাঁহার এরূপ সংসারে জন্ম হইবে যে তাঁহার অর্থাভাব ইত্যাদি থাকিবে না এবং এই জীবনে দয়াবান হইয়া অপরের দুঃখ বিমোচন করিতেছেন বলিয়া, তাঁহার আগামী জীবন সুখময় হইবে। দয়া প্রণোদিত না হইয়া, যশ বা রাজার নিকট উপাধি প্রত্যাশায় পরোপকার করিলেও, তাহার ফলে পরজন্মে অর্থ ও সমৃদ্ধিলাভ হয়; কিন্তু স্বার্থপর বাসনা হইতে এই সৎকর্ম্ম উদ্ভূত বলিয়া ইহাতে মানসিক তৃপ্তি হইতে পারে না বা কোনও সদ্‌গুণ বিকশিত হইবে না। সেইরূপ আবার, কোনও ধনবান জীবদ্দশায় অতিশয় স্বার্থপরতা ও কৃপণতা বশতঃ যদ্যপি কাহারও দীনদশা দেখিয়াও শক্তি থাকিলেও তাহার অভাব মোচন না করেন, তাহা হইলে অভাবের কি যন্ত্রণা তাহা শিখিবার জন্য, পরজন্মে তাঁহাকে অভাবের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

অনাহারে অনাহারে শীর্ণকলেবর মৃতপ্রায় একজন অনাথকে দেখিয়া আমাদিগের পরিচিত একজন যোগী বলিয়াছিলেন যে ইনি পূর্ব্বজন্মে এক ধনাঢ্যের একমাত্র পুত্র ছিলেন, এবং সারাজীবনে কখনও কোনরূপ যন্ত্রণা বা অভাব অনুভব করেন নাই। তাঁহার কখন কোনওরূপ পীড়া, স্বজন-বিয়োগ বা অন্য কোনওরূপ মনঃকষ্টের কারণ হয় নাই। কোনও বস্তুর অভাব অনুভবের পূর্ব্বেই, তাঁহার সেই বস্তু করতলগত হইত, ক্ষুধার উদ্রেক হইতেই চব্যচষ্যলেহ্যপেয়াদি ভক্ষদ্রব্য সম্মুখে দেখিতে পাইতেন। একদিন বিলাস-উদ্যান হইতে সহচরপরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে এক অনাহারে মৃতপ্রায়, রোগযন্ত্রণায় বিকলিতাঙ্গ আতুরকে দেখিতে পাইলেন।

সে তাঁহার নিকট কিছু আহার ও বস্ত্র যাচ্ঞা করিতে করিতে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে কিন্তু ধনীপুত্রের দয়ার উদ্রেক হইল না, তিনি তাহার যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলেন না, তাহার আঁখিজলের কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। অনাহারের কি যন্ত্রণা, অভাবের কি কষাঘাত, তাহাই শিক্ষা করিতে, তিনি এই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বয়ং এই জীবনে অভাবরূপ তিক্ত ফল আস্বাদ করিয়া, পরজন্মে অপরের দুঃখে তাহার দয়া হইবে এবং পরের অশ্রুতে আপন অশ্রু মিশাইতে শিখিবে।

সেইরূপ আবার কোনও লোক এই জন্মে শাস্ত্রালোচনা, ঈশ্বরোপাসনা ইত্যাদি ইত্যাদি যদ্যপি উত্তম মানসিক কর্ম্ম করিতে থাকেন, কিন্তু পরোপকারার্থে শারীরিক কোনও কর্ম্ম না করেন, তাহা হইলে পরজন্মে আন্তরিক উচ্চতায় যদিও তিনি অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিবেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইবেন, কিন্তু, আর্থিক অবস্থা তাঁহার শোচনীয় হইবে; তাঁহার দরিদ্রতা, তাঁহার বিদ্যানুশীলনে ও ঈশ্বরচিন্তায় অনেক ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিবে। কিন্তু এত অর্থাভাবেও তাঁহার মনের স্থিরতাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। তাঁহার পূর্ব্ব অনুশীলিত ধর্ম্মবৃত্তির সহিত, পরজীবনে শিক্ষিত পরোপকার ব্রত মিলিত হইয়া, তাঁহাকে পরজন্মে, সাধনার শ্রেষ্ঠ মার্গে—আত্মোৎসর্গমার্গে লইয়া যাইবে।

সকলেরই আন্তরিক যোগ্যতা এবং সৎগুণ প্রাপ্ত হইবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। এই মানসিক বৃত্তির অনুশীলন ও নৈতিক উন্নতিই মানবকে দীক্ষার দ্বারদেশে গুরুদেবের চরণ সমীপে আনিয়া দেয়। তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের পবিত্র প্রদেশে এই দুইটী দীপ জ্বলিলে তবে মহাপুরুষগণের দর্শন লাভ হয়; অণিমা লঘিমাদি ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। অষ্টসিদ্ধির গৌণ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; কিন্তু সিদ্ধিকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে মহাভ্রমে পড়িতে হইবে। এই সমস্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট লোক মানবের ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে অতিশয় উচ্চ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু হয়ত তাহাদিগের অন্তর প্রদেশ অপবিত্র স্বার্থভাব পূর্ণ। তাহাদিগের বাহ্য মহত্ত্ব মহাপুরুষদিগের নয়নে তাহাদিগের ভিতরের মলিনতাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। মানবের মস্তকের উপর চারিধারে সূক্ষ্ম ওজঃ ঘেরিয়া থাকে, এবং

যাহার সেইরূপ ভাবনা হয়, তাহার ওজঃ ও তদনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট হয়। অতএব বাহ্যমহত্ত্বের ভাণ করিলেও ভিতরের অপবিত্রতা বাহির হইয়া পড়ে।

শাস্ত্রে দুই প্রকার পথের কথা আছে; একপথ প্রবৃত্তিমার্গ, অপর পথ নিবৃত্তিমার্গ। জীবগণ প্রথমে দুঃখের হেতুভূত প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে। এই পথ প্রথম প্রথম স্বচ্ছন্দতাময় ও বিরোধশূন্য বলিয়া বোধ হয়; মানব আপাততঃ মধুলোভে-অশেষ-ক্লেশ-সময়েও আপনাকে সুখী জ্ঞান করে এবং উহা যে পরিণামে নাশের কারণ ও জন্মমৃত্যুজ্বারাদি দুঃখের আকর, তাহা বিবেচনা করিতে পারে না। জীব অনেক জন্ম পর্য্যন্ত কর্ম্মবিহিত নানাযোনিতে সানন্দে ও দুঃখে ভ্রমণ করিয়া তবে নিবৃত্তিমার্গের দিকে অগ্রসর হয়। তাহার পর নিবৃত্তির পথে সাধুসঙ্গরূপ দীপ-জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিলে, মুক্তিমার্গ দেখিতে পান। তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের বন্ধন মোচনার্থে আর এক প্রকার কর্ম্ম আরম্ভ হয়। পূর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংস করিতে হইলে, নূতন কর্ম্ম করা আবশ্যক, একথা আমরা পূর্ব্বেই বার বার বলিয়াছি। কর্ম্ম না করিলে কর্ম্ম ধ্বংস অসম্ভব।, তত্ত্বজ্ঞান পবিস্ফুরণ হইল না, কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া রহিলে, ইহাতে কোন লাভ নাই।

"নচ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি—"গীঃ-৩-৪ শ্লোঃ। এইরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ আর এক প্রকার কর্ম্ম প্রবৃত্ত হওয়া। ইহা এক প্রকার তামসিক কর্ম্ম।

নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে বুদ্ধিবিশুদ্ধ ও জ্ঞান লাভের উপযোগী হয়। পৌরুষ দুই প্রকার। শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়। শাস্ত্রোক্ত পৌরুষ শ্রেয়ো লাভের ও অশাস্ত্রীয় পৌরুষ অনর্থ লাভের কারণ। আমরা বলিয়াছি, কিন্তু আবার বলি অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকা অকর্ত্তব্য। যোগবাশিষ্ট রামায়ণে এই তত্ত্ব বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত আছে। আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দ্বৌ হুড়াবিব যুধ্যেতে পুরুষার্থৌ সমাসমৌ।
প্রাক্তনশ্চৈহিকশ্চৈব শাম্যত্যত্রাল্পবীর্য্যবান্ ॥ ৫
অতঃ পুরুষযত্নেন যতিতব্যং যথা তথা।
সংপু তত্নেণ সদ্যোগত্তেনাশুভতনোজয়েৎ ॥ ৬

যৌ হুড়াবিব যুধ্যেতে পুরুষার্থে সমাসমৌ।
আত্মীয়শ্চান্যদীয়শ্চ জয়ত্যতিবলস্তয়োঃ॥ ৭
অনর্থঃ প্রাপ্যতে যত্র শাস্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ।
অনর্থকর্ত্তৃবলবত্তত্র জ্ঞেয়ং স্বপৌরুষম্॥ ৮
পরম্পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দ্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥ ৯
প্রাক্তনঃ পুরুষার্থোসৌ যাং নিয়োজয়তীতি ধীঃ।
বলাদধস্পদীকার্য্যা প্রত্যক্ষাদধিকানসা॥ ১০
তাবত্তাবৎ প্রযত্নেন যতিতব্য স্বপৌরুষম্।
প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশুভং শাম্যতি স্বয়ম্॥ ১১

মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণং—৫ম সর্গঃ।

(এমন মনে করা উচিত নহে যে, মনুষ্য কেবল প্রাক্তন পুরুষকারেরই অনুবর্ত্তী। অভিজ্ঞলোক মাত্রেই জানেন, ও দেখিতে পান যে, এই শরীরে প্রাক্তন ও ঐহিক উভয়বিধ পুরুষকারই নিরন্তর মেষদ্বয়ের ন্যায় উদ্যম-সহকারে সম বিষমভাবে যুদ্ধ করিতেছে। এই যুদ্ধে যে অধিকতর বলবান, সেই জয়লাভ করে, এবং যে হীনবল সে অভিভূত হয়। সেই জন্যই বলিলাম, মনুষ্য যত্নপূর্ব্বক নিরালস্য হইয়া শাস্ত্রোক্ত পুরুষকারই অবলম্বন করিবেন। যে কার্য্য কল্য করিতে হইবে, অদ্যই তাহা সম্পন্ন করিব, এইরূপ উদ্যোগ বা উৎসাহ সহকারে উদ্যত চিত্তে কার্য্য করিলে অবশ্যই সে বিষয়ে জয়লাভ করা যায়। সম-বিষম-ভাবে উক্ত উভয় পুরুষকারই মেষদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিবে, পরন্তু তন্মধ্যে যে দুর্ব্বল সেই পরাজিত হইবে সন্দেহ নাই। অপিচ, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে কর্ম্মকারী শাস্ত্রোক্ত ফল পায় এবং বিরুদ্ধ কর্ম্মচারী তাহার বিপরীত ফলই পায়। যে স্থলে শাস্ত্রানুযায়ী পুরুষকার আশ্রয় করিলেও অনর্থাগম দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সে পুরুষকার প্রাগ্‌ভবীয় বলবৎ অনর্থের দ্বারা নিরুদ্ধ বা দুর্ব্বল হইয়া আছে। তাদৃশ স্থলে হতাশ্বাস না হইয়া, পুনঃ পুনঃ প্রবলতর পুরুষকার অবলম্বন করতঃ দন্তে দন্ত বিচূর্ণিত করার ন্যায় ঐহিক শুভ উৎপাদনের দ্বারা প্রাক্তন অশুভ চূর্ণিত করিবে। রামচন্দ্র! দুষ্প্রবৃত্তির উদয় দেখিলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে হইবে

যে, অশুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ আমাকে অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছে ও নিযুক্ত করিতেছে। অমনি যেই মুহূর্ত্তেই ঐহিক পুরুষকারের বল বাড়াইয়া তদ্দ্বারা তাহাকে পরাহত করা কর্ত্তব্য। প্রাগভবীয় পুরুষকার ঐহিক পুরুষকার অপেক্ষা বলবান নহে। যাবৎ না অশুভ জনক প্রাক্তন পৌরুষ উপশম প্রাপ্ত হয়, তাবৎ প্রযত্ন সহকারে সুপৌরুষের প্রতি সতত যত্ন রাখা বিধেয়।

কর্ম্মের হস্ত হইতে যদ্যপি প্রকৃত মুক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে যে কর্ম্মে জ্ঞান হইবে সেই কর্ম্ম করিয়া যাও। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, জ্ঞানই কর্ম্মরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর চ্ছেদের কারণ ও সমস্ত অশুভ হইতে নিস্তারকারী। দান, তপস্যা ও অনশনাদি ব্রতরূপ যাবতীয় কর্ম্মে জীবগণের স্বর্গভোগাদি সুখ লাভ হয়। কিন্তু সেই সুখ অনিত্য বলিয়া জ্ঞানীগণ যত্ন পূর্ব্বক পূর্ব্বকাম্য কর্ম্মের মূলোচ্ছেদন করিয়া প্রকৃত সুখের জন্য জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন এবং তথায় যে সাত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে অর্পণ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নির্ব্বাণ মোক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-বিরহে কাতর হইয়া তাহা ইচ্ছা করেন না। নর-লোকের উদ্ধারকারী হরি-সেবকগণ হরিসেবারূপ মুক্তিই প্রার্থনা করেন এবং তাঁহারা প্রহ্লাদের মত বলেন,—

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনেন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ত একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

হে দেব! মুনিগণ প্রায় নিজ নিজ মুক্তি অভিলাষ করিয়া নির্জ্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, পরের জন্য তাঁহাদিগের কোনও যত্ন নাই। এই সমস্ত দীন বালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমি মুক্তি চাহি না।

কর্ম্ম তিন প্রকার,—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। আমরা এই তিন প্রকার কর্ম্মের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া কর্ম্মতত্ত্ব শেষ করিব। এই তিন প্রকার কর্ম্মের যাহা যাহা জ্ঞাতব্য আমরা পূর্ব্বেই তাহা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে তাহা পুনরুল্লেখ করিব মাত্র।

জন্মে জন্মে পুঞ্জীকৃত মানবের প্রাক্তনকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলা হয়; ইহার মধ্যে যে অংশ পক্ক হওয়ায় বর্ত্তমান জীবনে ভোগের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং যাহার ফল অবশ্যম্ভাবী তাহাকে প্রারব্ধ বলে; ইহাকে শাস্ত্র হস্ত-নিক্ষিপ্ত শরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রতি জন্মে মনুষ্য যাহা যাহা নূতন কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাকে বর্ত্তমান, আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বলা হয়। ইহা এক প্রকার কর্ম্মবীজের রোপণ। এই কর্ম্মই পরজন্মে আংশিক সঞ্চিত ও আংশিক প্রারব্ধরূপে প্রকাশ পায়। এই কর্ম্মই আমাদিগের কর্ম্ম-বৃদ্ধি করে। দেবী ভাগবতে উল্লিখিত আছে;—

অনেক জন্ম সংজাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতং।

* * *

ক্রিয়মানঞ্চ যৎকর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে॥

সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ৎকিল।

দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তং॥

প্রারব্ধং কর্ম্মবিজ্ঞেয়ং * * *॥

অনেক জন্ম ধরিয়া যে প্রাক্তন কর্ম্ম সঞ্জাত হইয়াছে, তাহাকে সঞ্চিত বলে; ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে বর্ত্তমান বলে; সঞ্চিতের মধ্য হইতে আহরণ করিয়া, তাহার কিয়দংশ যাহা দেহারম্ভের পূর্ব্বে কালদ্বারা প্রেরিত হয়, তাহাকে প্রারব্ধ বলে।

এক জীবনে একটি স্থূল শরীর ধারণ করিয়া যতগুলি পূর্ব্বঋণ পরিশোধ হইতে পারে, তাহার উপযোগী মানবের পার্থিব দেহ রচিত হয়। কর্ম্মদেবতা বা লিপিকর বা বিধাতা মানবকে তাহার উপযোগী প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মাতৃগর্ভে সঞ্চার করিয়া দেন। এই প্রারব্ধ কর্ম্ম ধ্বংস করা অতীব সুকঠিন, ভোগের দ্বারাই ইহার ক্ষয় হয়।

"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।"

দেবী-ভাগবৎ-৬-২-৮

পূর্ব্ব প্রারব্ধ অনুসারে, এই জন্মে, যাহার যাদৃশ অবস্থা হইবার কথা, যত সম্পত্তি লাভের এবং যে যে বস্তুর পাইবার কথা, সে তাহা অবশ্য পাইবে। প্রারব্ধ কর্ম্মের জন্যই মানব কোনও নির্দ্দিষ্ট গ্রহাবতারের অধীনে নির্দ্দিষ্ট

লগ্নে জন্ম গ্রহণ করে। তাহাই জন্ম পত্রিকার সাহায্যে মানব ভবিষ্যৎ পূর্ব্বেই জানা যায়। কিন্তু উৎকট সাধনার বলে প্রারব্ধ ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ক্ষত্রিয়তনয় গাধিপুত্র উৎকট সাধনায় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র নামে প্রসিদ্ধ আছেন। সাবিত্রীর উচ্চ পাতিব্রত্যে তাঁহার বৈধব্য রূপ প্রারব্ধ খণ্ডন হইয়াছিল। এইরূপ উদাহরণ শাস্ত্রে অনেক আছে। অনুন্নত মানবের জন্মপত্রিকা যত দূর অভ্রান্ত হয়, উন্নত মানবের তত দূর হয় না। অনুন্নত লোক মেষের মত তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদ্বারা যেরূপ ভাবে বাধ্য হয়, উন্নত লোকের সেইরূপ হয় না। শেষোক্তের বর্ত্তমান কর্ম্ম, তাহার অতীত কর্ম্মকে রঞ্জিত করে। কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহা সাধারণ মানবের মত চেষ্টাতেও পবিবর্ত্তিত হইতে পারে না, সে স্থলে মানবের দুঃখ করা বা নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভোগভিন্ন যখন কর্ম্মের ক্ষয় নাই,—

"শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্মং বিনা ভোগাৎ ন তদ্ক্ষয়ঃ"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

তখন দুঃখভোগে ধার শোধ হইল বলিয়া আনন্দিত হওয়া উচিত।

কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ এই জন্মেই ফলে না, ভবিষ্যৎ জন্মে হইয়া থাকে ; কিন্তু উৎকট কর্ম্মের ফল এই জন্মেই ভোগ কবিতে হয়।

"অত্যুৎকট পুণ্য পাপে রিহৈব ফলমশ্নুতে"।

(পুণ্য কিংবা পাপ উৎকট হইলে, তাহার ফল ইহ জন্মেই ভোগ করিতে হয়।)

পাতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন,—

"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়।"

সাধনপাদ—১২

(ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয় ক্লেশমূলক অর্থাৎ ক্লেশ থাকিলেই উহারা ফল প্রদান করিতে পারে। উহারা বর্ত্তমান জন্মে অথবা ভবিষ্যৎ জন্মে ফল প্রদান করিয়া থাকে।

ব্যাসদেবের ভাষ্যে আছে :—

"তত্র পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মাশয়ঃ কাম লোভ মোহ ক্রোধ প্রসবঃ। স দৃষ্ট জন্ম-

বেদনীয়শ্চা দৃষ্ট জন্ম বেদনীয়শ্চ, তত্র তীব্র সংবেগেন মন্ত্রতপঃ সমাধিভি-র্নির্বর্ত্তিতঃ ঈশ্বর দেবতা মহর্ষি মহানুভাগ নামারাধনাদ্বা সঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্র ক্লেশেন ভীতব্যাধিত কৃপণেষু বিশ্বাসোপগম তেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃ পুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে। যথা নন্দীশ্বরঃ কুমারো মনুষ্য পরিণামং হিত্বা দেবত্বেন পরিণতঃ, তথা নহুষোঽপি দেবানামিন্দ্রঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তির্য্যক্ ত্বেন পরিণত ইতি।'

(এই যে ইহজন্ম কৃত পাপ পুণ্য যাহাদের মূলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি—তাহার ফল ইহজন্মে বা জন্মান্তরে জানা যায়। উৎকট পুণ্য সদ্যই ফলবান হয়; যেমন আত্যন্তিকভাবে মন্ত্র তপস্যা সমাধির অনুষ্ঠান অথবা ঈশ্বর, দেবতা, ঋষি কিম্বা মহাত্মার আরাধনা। এইরূপ উৎকট পাপেরও সদ্য ফলভোগ হয়; যেমন পীড়িত ভীত আর্ত্ত স্মরণাগতের প্রতি অত্যাচার অথবা ঋষি তপস্যাদির প্রতি অপকার। যেমন রাজকুমার নন্দীশ্বর মহাদেবের উৎকট আরাধনা করিয়া, মনুষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া দেবশরীর লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে নহুষ রাজা দেবগণের ইন্দ্র হইয়া মহর্ষির শাপ বশতঃ দেবতারূপ স্বকীয় পরিণাম ত্যাগ করতঃ তির্য্যক্‌রূপে অর্থাৎ বৃহৎ অজগর ভাবে পরিণত হইয়াছিলেন।)

প্রারব্ধ আমাদিগকে এক দুর্লঙ্ঘনীয় পরিখা দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিলেও সেই পরিখার মধ্যে, সেই দুর্লঙ্ঘনীয় প্রাচীরের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। প্রারব্ধের ফলে আমাদিগের সুখ বা দুঃখ, পুণ্যক্রিয়া বা পাপক্রিয়া হইলেও, আমরা যদ্যপি স্থির ও সন্তোষের সহিত তাহা সহ্য করি, তাহা হইলে আমাদিগের পূর্ব্বঋণ পরিশোধিত হইবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যও সৎকর্ম্ম সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইব। ক্রিয়মাণ কর্ম্মের দ্বারা এইরূপে আমাদিগের পাপ স্বভাবকে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিরূপে আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাবনা বা কামনার দ্বারা আমরা কর্ম্ম সঞ্চয় করি। এই সঞ্চিত কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের চরিত্র গঠিত হয় এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম আমাদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environments) গঠন করিয়া দেয়। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পাতঞ্জলি "জাত্যায়ুর্ভোগ"

বলিয়াছেন।—'জাতি' অর্থে মনুষ্যের জন্ম, আয়ু অর্থে তাহার জীবিতকাল এবং ভোগ অর্থে সুখদুঃখ ভোগ বুঝিতে হইবে।

কর্ম্মণাজায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥"

ভাগবৎ পুরাণ ১০।২৪।১৩

(জন্তু কর্ম্মবশেই জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মবশেই লয় পায়, এবং সেই কর্ম্মবশেই সুখদুঃখাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।)

সাধারণ মানব কিন্তু উপযুক্ত ক্রিয়মাণ কর্ম্মের দ্বারা আপনার ভবিষ্যৎ অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেনা; তাহারা এই জন্মের অবশ্য ভোগ্য পার্থিব অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া, এক্ষণেই বিশেষ ধনী বা সুখী হইবার জন্যই সচেষ্ট থাকে, এবং তাহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া আপনার মনোসূর্য্য নিরাশ কুহেলায় আবৃত করিয়া পরের উপর অযথা ক্ষোভ এবং ভগবানের প্রতি অযথা উক্তির দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘনঘটাচ্ছন্ন করে। তাহারাও পুরুষকার দ্বারা আপনার ভবিষ্যৎ জন্মের অবস্থা উন্নত করিতে পারিত; কিন্তু তাহা না করিয়া, নিরাশ অন্ধকারে জ্ঞান হারাইয়া বলে "যে ইচ্ছা করিলেই কি ধর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম করা হয়; ঈশ্বর সময় দেন ত সেই ইচ্ছা আপনিই আসিবে, আত্মচেষ্টায় কিছুই হয় না।"

শ্রীকিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

মানবের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭) দৈত্যজাতির সপ্তম বিভাগ।

(MONGOLIANS.)

মঙ্গোলিয়ান জাতিই সপ্তম বিভাগ। তাহারা উল্লিখিত রাক্ষসগণের বংশধর। সমুদ্রোপকূল ব্যতীত সমস্ত চীনদেশবাসীগণ, মালয়দেশীয়গণ, তিব্বতবাসীগণ, হাঙ্গারিয়া দেশীয়গণ, ফিন্‌লাণ্ডবাসীগণ, ঈস্‌কুইমক্সগণ—এই সপ্তম বিভাগের অন্তর্গত। টল্‌টেক বা তৃতীয় বিভাগ উত্তর আমেরিকার

বাস করিত। তাহাদের এবং এই মঙ্গোলিয়ান জাতির সংমিশ্রণে আমেরিকার রক্তকায় ইণ্ডিয়ান (Red Indians) নামক আদিম অধিবাসীগণ জন্মলাভ করিয়াছিল।

প্রাতঃসূর্য্য সাম্নিভ উদীয়মান জাপানি জাতি এই মঙ্গোলিয়ান জাতির অন্তর্গত। তাহারা এই বিভাগের শেষ সময়ে জাত। এই বিভাগের অনেক লোক পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়া এসিয়া মাইনার, গ্রীস ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহে উপনিবেশ স্থাপন করিল। তথায় পরবর্ত্তী আর্য্যজাতির অন্তর্গত আর্য্য সেমিটিক নামক দ্বিতীয় বিভাগের সঙ্গে মিলিত হওয়াতে সেই সংমিশ্রণের ফলে আদিম গ্রীক্ (যুনানী) জাতি ও ফিনিসিয়া বাসীগণ জন্মলাভ করিল।

পসিডনিস্ দ্বীপ সমুদ্রে গ্রাস করার পর হইতে যে যৎসামান্য দৈত্যগণ এথানে সেখানে বর্ত্তমান ছিল, তাহারা ক্রমশঃই অবনত হইতে লাগিল। এসিয়ার পূর্ব্বভাগে যাহারা বিদ্যমান ছিল, তাহারা এই অবনতির স্রোত রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ধ্বংসাবশিষ্ট দানব জাতির সঙ্কর বিবাহে নানা অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির আবির্ভাব হইল। সিংহল দ্বীপের ভেদ্দা নামক আদিম অধিবাসীগণ, বোর্ণিও দ্বীপের লোমশরীরী অধিবাসীগণ, আণ্ডামান দ্বীপের আদিমজাতি, আফ্রিকার বুস্‌মেনগণ (Bushmen) এবং অষ্ট্রেলিয়া দেশের আদিম বর্ব্বর অধিবাসীগণ এইরূপে উৎপন্ন সঙ্করজাতি। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীগণই দৈত্যজাতির অন্তর্গত। তন্মধ্যে কেবল মাত্র জাপান জাতি এবং সম্ভবতঃ চীনা জাতিই ধ্বংসকারী কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার আশা করা যায়।

---

(৬) পঞ্চম মহাদেশ ও পঞ্চম মৌলিক জাতি।

(ক্রৌঞ্চদ্বীপ ও আর্য্যজাতি)

পঞ্চম মহাদেশের নাম ক্রৌঞ্চদ্বীপ এবং পঞ্চম মৌলিক জাতির নাম আর্য্যজাতি। এই জাতিকে উপযুক্তরূপে তৈয়ার করার ভার বৈবস্বত মনুর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তিনি তাহার সহকারীগণ সহ শ্বেতদ্বীপে তাহাদের শিক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। উপযুক্ত গুলিকে গ্রহণ ক্রমে উৎসাহিত করিলেন,

এবং অনুপযুক্তগুলিকে সংশোধন করিতে লাগিলেন। পঞ্চম ইন্দ্রিয় মানব দেহে সংযুক্ত হইল। তখন হইতেই আর্য্যজাতি বর্ত্তমান মানবাকার ধারণ করিল। শ্রেষ্ঠ অসুরগণ যাহাতে এই জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের অতুল বিদ্যা বুদ্ধি এবং প্রভূত শক্তি সামর্থ্য সৎকার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারে, মনু তাহারই প্রতিবিধান করিতে লাগিলেন। সংসার কোলাহলের বহু দূরে, ধ্রুবের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আস্তে আস্তে সুন্দর দেহ ধারণ করত এই নূতন জাতি শশীকলার ন্যায় দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ইতি মধ্যে জলে স্থলে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল। ক্রৌঞ্চ মহাদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা. আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া তখনও আবির্ভূত হয় নাই। বহুপ্রকম্পনের পর ক্রমশঃ এক এক অংশ সমুদ্রগর্ভ হইতে ভাসিয়া উঠিল। অন্যান্য স্থলভাগ সাগরের অতল জলে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। পরিশেষে আজ দুই লক্ষ বৎসর গত হইল আট্‌লানটিক্ মহাসাগরের মধ্যভাগে কেবলমাত্র পসিডনিস্ দ্বীপ ভাসমান রহিল, এবং বর্ত্তমান মহাদেশের মোটামোটি আকার অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইল।

বুধের অধীনে এই জাতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর্য্যজাতির মধ্যে বোধশক্তির বিকাশ হওয়াই সর্ব্ব প্রধান কার্য্য, এজন্য ইহার জন্মক্ষণে বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা, সৌম্য এবং সর্ব্বগুণযুক্ত বুধ ইহার উপরে শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং শুভ রশ্মি প্রেরণ করেন। পুরাণে বুধকে ইন্দুর পুত্র বলা হইয়াছে, যেহেতু ইন্দু দৈত্যজাতির অধিষ্ঠাতা, দৈত্যজাতি আর্য্যজাতির জনক; কাজেই ইন্দুকে বুধের জনক বলা হইয়াছে।

ন্যূনাধিক দশ লক্ষ বৎসর হইল, আর্য্য জাতিব অভ্যুদয় হইয়াছে। যখন বিশেষ বিশেষ জাতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তখন মনু তাহাদিগকে উত্তর মেরু হইতে মধ্য এসিয়ায় লইয়া আসিলেন। তথায় বহুদিন বাস করিয়া কালসহকারে তাহারা এই কেন্দ্রস্থান হইতে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া দিগ্‌দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল।

প্রথমাবস্থায় তাহাদের দেহ সাধারণতঃ ছয় হাত দীর্ঘ ছিল, পরে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া বর্ত্তমানে সাড়ে তিন হাতে নামিয়াছে। কালে আরও হ্রস্ব হইবে।

(১) আর্য্য জাতির প্রথম বিভাগ।

(আর্য্যজাতি)

সে আজ বহু যুগের কথা! প্রায় সাড়ে আট লক্ষ বৎসর অতীত হইল, কথিত কেন্দ্রস্থান হইতে সর্ব্ব প্রথমে এই আর্য্য জাতির প্রথম বিভাগ দক্ষিণ দিকে হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর ভাগে উপনিবেশ স্থাপন করিল। এই প্রথম বিভাগও আর্য্য জাতি নামে খ্যাত, এবং তাহাদের নামানুসারেই ভারতের উত্তর ভাগ আর্য্যাবর্ত্তনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ (কবি), অঙ্গিরা, ক্রতু (কর্দ্দম), এবং দক্ষ, এই সপ্তর্ষি সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের নেতা হইয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সপ্তর্ষির নাম নানা গ্রন্থে, নানারূপ পাওয়া যায়। বসিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ, এই তিন জন সহ সর্ব্ব সমেত দশজন ঋষি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে পূর্ব্বেই মনু এই জাতিকে বিভক্ত করার পর, কথিত দশ ঋষি প্রথম বিভাগকে ভারতবর্ষে লইয়া আইসেন।

দানব, দৈত্য ও রাক্ষসগণের সহিত তাহাদের যে বহুকালব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল, তাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই অবগত আছেন। রামরাবণের যুদ্ধ বিবরণ অনেকেই জানেন।

রাশীচক্র এবং "সেন্‌জার" নামক দেবভাষা এই আর্য্যজাতি মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। "সেন্‌জার" ভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। সেন্‌জারই প্রকৃত দেবভাষা, সংস্কৃত তাহার অপভ্রংশ মাত্র। তাহাদের মধ্যেই চতুর্ব্বিংশতি বুদ্ধ জন্মলাভ করেন। জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাহাদিগকে তীর্থঙ্কর বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

(২) আর্য্য জাতির দ্বিতীয় বিভাগ।

(আর্য্য-সেমেটিক্—Arya-Semitic)

আর্য্য জাতির দ্বিতীয় বিভাগের নাম আর্য্য সেমেটিক্ (Arya Semitic)। তাহারা মধ্য এসিয়া হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়া আফ্‌গানিস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল; পরে ইউফ্রেটিস্ নদী অতিক্রম করিয়া আরব ও সিরিয়া দেশে উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের দ্বারা কাল সহকারে

প্রাচীন এসিরিয়া ও বেবিলনিয়া সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইল। তাহাদের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ান জাতির সংমিশ্রণে ফিনিসিয়ান জাতি, পরবর্ত্তী মিশর দেশীয়গণ এবং পুরাতন গ্রীক জাতি উৎপন্ন হইল। এই বিভাগের অপর এক অংশ পূর্ব্বদিকে গিয়া মঙ্গোলিয়ান জাতির সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া চীন উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিল। চীন সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান সিংহাসনে যে সম্রাট সমাসীন আছেন, তাঁহার বংশ ও এই জাতি হইতে উৎপন্ন।

(৩) আর্য্য জাতির তৃতীয় বিভাগ।

(ইরেনিয়ান জাতি)

মহাত্মা জারাথুষ্ট্রা (Zarathustra) বা জারা ওষ্টার (Zaraoster) এই তৃতীয় বিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতঃ তাহাদিগকে উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে লইয়া গিয়া পারস্য এবং আফগানিস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এই বিভাগের নাম ইরেনিয়ান বা ইরান জাতি (Iranian Sub-race)। কথিত মহাপুরুষ স্বয়ং পারস্যদেশে বাস করিতে লাগিলেন। এই জাতির কতকগুলি প্রথমতঃ আরব দেশে গেল; পরে তথা হইতে মিশর দেশে গিয়া তথাকার ধ্বংসাবশেষ দৈত্যজাতির সঙ্গে উদ্বাহবন্ধনে মিলিত হইয়া বাস কবিতে লাগিল।

এই উভয় শাখার জাতির লোক সূর্য্যের উপাসক। তাহাদের পুরোহিতগণ মগো নামে খ্যাত; ও তাহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিল। প্রথম জারাথুষ্টার নামানুসারে আরও চৌদ্দজন ইরান্ পণ্ডিত এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জাতি নক্ষত্র দেবগণের পূজা করিত, কিন্তু উক্ত ইবান্ পণ্ডিতগণ তাহা নিষেধ করিয়া অগ্নির উপাসনা করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। কারণ তাহাদের মতে অগ্নিই পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রকৃত পরিচায়ক ও প্রতিনিধি। তাহাদের মধ্যে কৃষি বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

যুগল সেবক।